স্বতন্ত্র ভাবনা

মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি

নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী



সম্পাদকমণ্ডলী

সাদকামালী

অভিজিৎ রায়

সভাপতি

অজয় রায়

(সূচীপত্র ও সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের শিরোনামে ক্লিক দিয়ে আসা-যাওয়া করা যাবে)

সূ চি প ত্র

আমাদের কথা ৯

প্রথম অধ্যায় : যুক্তিবাদ, মুক্তচিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্কতা

যুক্তিবাদ কী?
– অপার্থিব ১৫

মন্দের যুক্তি ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব ২২
– অপার্থিব

বিজ্ঞান মনস্কতা ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ নির্মাণ
– অজয় রায় ২৬

ইহজাগতিকতার প্রশ্ন
– সিরাজুল ইসিলাম চৌধুরী ৪০

আদর্শবাদ ও মানুষের সংকট
– গোলাম মুরশিদ ৬৩

ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন নিয়ে কূটকচালি
– অভিজিৎ রায় ১০৭

চৈতন্যের পরিচর্যা
– আহমদ শরীফ ১১৭

যুক্তিবাদ
– বশীর আল হেলাল ১২০

ব্রুনোর আত্মত্যাগ ও যুক্তিবাদ
– শহিদুল ইসলাম ১২৩

ইহজাগতিকতা ও আরজ আলী মাতুব্বর : একজন যুক্তিবাদী দার্শনিক
– অজয় রায় ১৩৪

বাংলাদেশে চেতনা-মুক্তির লড়াই
– অভিজিৎ রায় ১৭৫

ইসলাম যেভাবে নিজের পথ থেকে সরে গেছে
– পারভেজ আমির আলী হুডবয় ১৯৯

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা বনাম কোরানিক বিজ্ঞান
– জাহেদ আহমদ ২০৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : ধর্ম ও নৈতিকতা

ধর্মানুভূতির উপকথা
– হুমায়ূন আজাদ ২২১

মানুষের ধর্ম– মানবতা
– সুমিতা পদ্মনাভন ২২৮

জীবিত ইসলামের মৃত গৌরবের কথা
– জাহেদ আহমেদ ২৩৭

রামায়ণ কাহিনীর ঐতিহাসিকতা : একটি একাডেমিক আলোচনা
– অনন্ত বিজয় ২৫২

নতুন কিছু ধর্মের কথা
– জাহিদ রাসেল ২৭৫

কে মুরতাদ?
– হাসান মাহমুদ (ফতে মোল্লা) ২৮০

মানবভিত্তিক সংবিধান এবং অমানবিক বিধান
– মীজান রহমান ২৯১

নৈতিকতা ও ধর্ম
– অভিজিৎ রায় ৩০৪

ধর্মের উপযোগিতা : জনৈক বিবর্তনবাদীর দৃষ্টিতে
– রিচার্ড ডকিন্স (অনুবাদ : বন্যা আহমেদ ও জাহেদ আহমেদ) ৩৩৪

ধর্মনিরপেক্ষতা
– সনৎ কুমার সাহা ৩৪৪

ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি
– কাজী আবদুল ওদুদ ৩৫০

ধর্মরাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম
– আনিসুজ্জামান ৩৫৫

মানুষের জন্য ধর্ম, না ধর্মের জন্য মানুষ?
– কবীর চৌধুরী ৩৭১

বিজ্ঞান কি উপাসনা-ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী
– প্রদীপ দেব ৩৭৬

তৃতীয় অধ্যায় : অন্যান্য প্রসঙ্গ

শিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যম
– হাসান আজিজুল হক ৩৮৫

হাইপেশিয়া : এক বিস্মৃতপ্রায় গণিতজ্ঞ নারীর বেদনাঘন উপাখ্যান
– অভিজিৎ রায় ৩৯২

শাশ্বত এথেন্সের নারী ও তার বিপর্যস্ত ধারাবাহিকতা
– হাসান আল আবদুল্লাহ ৪০৬

ডারউইনিজমের আতঙ্ক
– ভিক্টর স্টেংগার (অনুবাদ : বন্যা আহমেদ) ৪১৩

সমকামিতা কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ?
– অর্ণব দত্ত ৪১৯

সৃষ্টিতত্ত্ব
– বেগম রোকেয়া ৪২৩

কেন আমার মৃতদেহ মেডিকেলে দান করেছি
– আরজ আলী মাতুব্বর ৪২৮

যারা লেখা দিয়েছেন ৪৩৫

স্বতন্ত্র ভাবনা

মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি

নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী

স্বতন্ত্র ভাবনা

মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি

নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮
পরিমার্জিত সংস্করণ : মার্চ ২০১৫

প্রচ্ছদ
বিপ্লব মণ্ডল

প্রকাশক
চারদিক
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১১০৬৯, ৯৫৬৪৭৯৯

মুদ্রণ
ইমপ্রেশন প্রিন্টিং হাউস
২২ আলমগঞ্জ লেন, ঢাকা-১২০৪
ফোন : ৭৪১০৯৩৬

ISBN 984 802 059 4

মূল্য ঃ ৭৫০.০০ টাকা

আমাদের কথা

'স্বতন্ত্র ভাবনা' বইটি মূলত মুক্তমনা-লেখকদের নির্বাচিত প্রবন্ধের একটি সংকলন। অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় মৌলবাদ, কূপমণ্ডূকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, অলৌকিকতা ও কুসংস্কারকে উসকে দেওয়া ইত্যাদি ধ্যান-ধারণার বিপরীতে মুক্তমনার (www.mukto-mona.com) যে আদর্শিক সংগ্রাম শুরু হয়েছিল আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে, এ বইয়ের লেখাগুলো তারই নিদর্শন বহন করছে। প্রচলিত ধ্যান ধারণার গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসানো লেখা নয় এগুলো, নয় প্রচলিত বিশ্বাস এবং সিস্টেমের প্রতি আনত স্তব। বইটি বিশ্বাস ভাঙার, নির্মোহ দৃষ্টিতে সমাজ ও ব্যক্তিকে দেখার। সে হিসেবে এ বইয়ের লেখকদের ভাবনাগুলো স্বতন্ত্র; সমাজে বিদ্যমান পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণাগুলো থেকে অনেকটাই আলাদা। তাই এ বইয়ের নাম 'স্বতন্ত্র ভাবনা'।

যুক্তিবাদ, সংশয়বাদ, মানবতাবাদ, নাস্তিকতা কিংবা ইহজাগতিকতার মত ধারণাগুলো সমাজ সচেতন মানুষের কাছে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু তবুও এ দেশের অধিকাংশ মানুষ 'বিশ্বাস নির্ভর' গতানুগতিকতার আবর্তে বন্দি। হাজারো প্রচলিত সংস্কার, তুকতাক, অপবিশ্বাস, ব্যক্তিপূজা আর সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইদানীং যুক্ত হয়েছে বৈজ্ঞানিক মোড়কে পুরে সুবেশিত উপায়ে ভাববাদের পরিবেশন। আল-আশারী আর আল-গাজ্জালীর ভাবনাগ্রস্ত সমাজে সে সময়ে যে পশ্চাৎমুখী প্রতিক্রিয়াশীল অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, আজ তা মরিস বুকাইলি আর হারুন ইয়াহিয়ায় এসে ঠেকেছে। বাংলাদেশে বেশ ক'দশক ধরেই চলছে এক মহানির্বুদ্ধিতার খেলা; এখানে 'জ্ঞানের কথা', 'লজ্জা', 'নারী'র মত প্রগতিশীল বই অবলীলায় নিষিদ্ধ করা হয় মানুষের 'ধর্মানুভূতি'তে আঘাত লাগাবার অজুহাতে, আরজ আলী মাতুব্বরের 'সত্যের সন্ধান' আর দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'যে গল্পের শেষ নেই' পড়ার অপরাধে মুক্তিযোদ্ধা ওহাবকে 'জুতোর মালা' পরিয়ে সারা গ্রাম ঘোরানো হয়, তসলিমাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়, মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করার জন্য আহমদ শরীফ-শামসুর রাহমান-আলী আসগর-কবীর চৌধুরীদের

'মুরতাদ' ঘোষণা করা হয়, ড. হুমায়ূন আজাদকে চাপাতির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়; ইনকিলাব, নয়াদিগন্ত গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ধমক দেয়া হয় ড. অজয় রায়, হাসান আজিজুল হক ও ড. জাফর ইকবালকে তাদের মুক্তবুদ্ধির সেক্যুলার প্রগতিশীল মতবাদ পোষণের জন্য; প্রাণ দিতে হয় মুক্তবুদ্ধির ধারক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ইউনুসকে। আর অন্যদিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থব্যয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বের করা হয় 'Scientific Identification in Holy Quran' এর মত ছদ্ম-বিজ্ঞান গ্রন্থ (pseudo scientific book)। ভক্তি-রসের বান ডেকে অদৃষ্টবাদ আর অলৌকিকত্বের রমরমা বাজার তৈরি করে ফেলেছে বুকাইলী-মুর-দানিকেনদের বইয়ের ব্যাপক প্রচার আর প্রসার। বাংলাদেশের সারা বাজার এখন 'আল-কোরান এক মহাবিজ্ঞান', 'মহাকাশ ও কোরানের চ্যালেঞ্জ', 'বিজ্ঞান না কোরান', 'বিজ্ঞান ও আল কোরান' জাতীয় ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক বই-এ সয়লাব। মুক্তমনার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অজয় রায় 'বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ নির্মাণ' নামক একটি নিরীক্ষাধর্মী প্রবন্ধে লিখেছিলেন,

> 'জ্ঞানের একমাত্র উৎস যদি পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি হয়, তাহলে সেই সমাজে নেমে আসবে বন্ধ্যাত্ব, সমাজ হবে জড় চেতনা-চিন্তায় আচ্ছন্ন, সৃষ্টিশীলতার স্থান দখল করবে কুসংস্কার, মূর্খতা, কূপমণ্ডূকতা আর অজ্ঞানতা। আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে কুসংস্কার আর প্রযুক্তিবিদ্যার ফসলকে আত্মস্থ করার পারস্পরিক সহাবস্থান। বিজ্ঞানের যুক্তি চাই না, চাই তার ফসল, পাশে থাক অন্ধবিশ্বাস আর ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ। এই সমাজেই সম্ভব– ড্রয়িং রুমে রঙিন টেলিভিশন সেট স্থাপন, এবং হিস্টিরিয়া-আক্রান্ত কন্যাকে পীরের চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ। এই সমাজেই সম্ভব– অণুরসায়নবিদদের রসায়ন চর্চার পাশাপাশি তথাকথিত পীরের পদচুম্বন।'

সত্য কথা বলার বিপদ অনেক। আজকের বাংলাদেশে তো এটি আরো প্রকটভাবে সত্য। প্রতিক্রিয়াশীলদের ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসী কার্যক্রমে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। শায়খ আবদুর রহমান আর বাংলা ভাইদের সন্ত্রাসী জামানায় জননিরাপত্তা কত নীচে নেমে এসেছিল আমরা সবাই তা জানি। তারপরও জগৎ জুড়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা স্বাধীনভাবে তাদের মত ও বক্তব্য প্রকাশ করতে চান; স্বাধীনভাবে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতে দ্বিধান্বিত হন না। তাদের সেই বিবেকের তাগিদই প্রকাশ পেয়েছে প্রাচীন গ্রীক কবি ইউরিপিডিসের (৪৮০-৪০৬ খ্রি. পূ) একটি বাণীতে : 'Honest words should not be hushed up: let everyone hear'। চিন্তারাজিকে লুকিয়ে রাখার মধ্যে কোন মাহাত্ম্য নেই। চিন্তারাজিকে প্রকাশ করতে যদি লজ্জাবোধ হয়, তবে সে ধরনের চিন্তা না করাই বোধহয় ভাল।

'চিন্তার দাসত্বে'র ক্ষেত্রে যে কেবল মৌলবাদীদের একচ্ছত্র আধিপত্য তা

ভেবে নিলে কিন্তু ভুল হবে। ভ্রান্ত চিন্তা, কূপমণ্ডূকতা আর অন্ধবিশ্বাস কুরে কুরে খাচ্ছে আজকের বাংলাদেশের তথাকথিত প্রগতিশীল নামধারী বুদ্ধিজীবী সমাজকেও। কার্ল মার্ক্স, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, মাদার টেরেসা, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ বড়বড় নামগুলো ইতোমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে কিছু মিথ; জন্ম দিয়েছে শত সহস্র স্তাবকের। এ সমস্ত মনীষী অনেক ক্ষেত্রেই প্রগতিশীল চিন্তা করেছেন সত্যি, কিন্তু সেই সাথে আবার তৈরি করেছেন কিছু অন্ধবিশ্বাসীদের যারা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী মানেই অভ্রান্ত সত্যি। এই বড় মানুষদের চিন্তা-চেতনাও কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধতা ছিল– কালের ঊর্ধ্বে অনেক সময় তাঁরা উঠতে পারেননি– একথা মনে রেখে– একজন প্রকৃত যুক্তিবাদীর দায়িত্ব হচ্ছে ব্যক্তি পূজার ঊর্ধ্বে উঠে নির্মোহ দৃষ্টিতে ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করা।

এ সঙ্কলনের নির্বাচিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে কয়েকটি যুক্তিবাদ নিয়ে দার্শনিক বিশ্লেষণমূলক লেখা। প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব এবং মন্দের যুক্তিও এসেছে। কয়েকটি প্রবন্ধে যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবতাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'ধর্ম' যেহেতু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার তাই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মীয় পরিচয় ঢাক ঢোল পিটিয়ে জানানো জরুরি নয়। কিন্তু সমস্যা হল, যারা কোন ধর্ম মানেন না তারা চাকরি বা শিক্ষার ক্ষেত্রে কলামটা খালি রাখতে চাইলেও আপত্তি ওঠে, এমনকি অসম্পূর্ণ বিধায় ফর্ম বাতিল করা হয়। ভারতীয় মানবতাবাদী সমিতি কিভাবে চাকরির ফর্মে ধর্মের জায়গায় 'মানবতা' লিখবার আইনি অধিকার আদায় করেছে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে 'মানুষের ধর্ম মানবতা' প্রবন্ধটিতে। নৈতিকতার উৎস এবং ভিত্তি যে কেবল ধর্ম নয়, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে 'নৈতিকতা ও ধর্ম' প্রবন্ধটিতে। প্রগতিশীল বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা যুগে যুগে কিভাবে ধর্মবাদীদের কোপানলে পুড়ে আগ্রাসন ও লাঞ্ছনার স্বীকার হয়েছেন, তা তুলে ধরতে ব্রুনো এবং হাইপেশিয়ার প্রসঙ্গ এসেছে, এদের জীবন ও অবদান নিয়ে লেখা হয়েছে দুটি প্রবন্ধ। এই লাঞ্ছনা এবং নিপীড়ন যে কেবল অতীতের ব্যাপার ছিল না, বরং এখনও সময় ও সুযোগ পেলে বিরুদ্ধ মতকে অবদমিত করতে প্রতিপক্ষকে 'মুরতাদ' আখ্যা দেয়া হচ্ছে, – এ প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা হয়েছে 'কে মুরতাদ' প্রবন্ধটি। ইসলামের সংশয়বাদী দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে রয়েছে একটি প্রবন্ধ– 'জীবিত ইসলামের মৃত গৌরবের কথা'। হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক অতিকথন নিয়ে লেখা হয়েছে একটি প্রবন্ধ। শারিয়ার অমানবিকতা নিয়ে লেখা হয়েছে 'মানবভিত্তিক সংবিধান ও অমানবিক বিধান'। একজন বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ধর্মকে বিশ্লেষণ করে লেখা হয়েছে 'ধর্মের উপযোগিতা' প্রবন্ধটি। এছাড়া সমকামিতা, ডারুইনিজম, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন এবং ক্ল্যাসিকাল এথেন্সের

নারীদের নিয়ে রয়েছে আলাদা তিনটি প্রবন্ধ। হুমায়ূন আজাদ, আহমদ শরীফ, আরজ আলী মাতুব্বর, কাজী আবদুল ওদুদ এবং রোকেয়ার মতো প্রয়াত মুক্তমনা লেখকদের একটি করে লেখাও আমরা এতে সংকলিত করেছি ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রবন্ধে উচ্চারিত মতামত নিতান্তই লেখকের নিজস্ব। দরদী মন নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য জনাব মেসবাহউদ্দীন আহমেদসহ 'চারদিক'-এর সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করছি প্রবন্ধগুলো পাঠকদের ভালো লাগবে এবং গ্রন্থটি বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও মুক্তচিন্তা প্রসারে সাহায্য করবে। আমাদের ও প্রকাশকের শ্রম সার্থক হবে।

সম্পাদকমণ্ডলী
৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৭

প্রথম অধ্যায়

যুক্তিবাদ মুক্তচিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্কতা

যুক্তিবাদ কী?

অপার্থিব

যুক্তিবাদ এক কথায় এমন একটি জীবনাদর্শ বা ব্যক্তিগত দর্শন যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেখানে প্রযোজ্য সেখানে যুক্তি এবং সাক্ষ্যই প্রাধান্য পায়। যুক্তিবাদ কেবল 'যুক্তি, প্রমাণ ও সুবিচার চিন্তার দ্বারাই সত্যতা যাচাই ও বাস্তব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়'– এই পথকে স্বীকৃতি দেয়। যুক্তিবাদের এক আবশ্যিক প্রথম শর্ত হল সংশয়বাদ, অর্থাৎ যুক্তি প্রমাণ ও সহায়ক উপাত্তের অভাবে কোন কিছুর সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের ব্যাপারে চূড়ান্ত বিচার বা সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকা। অনেকে যুক্তিবাদের সাথে মুক্তচিন্তাকে যুক্ত করেন। যুক্তিবাদ যদিও আবশ্যিকভাবে মুক্তচিন্তা বোঝায়, কিন্তু মুক্তচিন্তা সব ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের সমার্থক নাও হতে পারে। মুক্তচিন্তার অর্থ হল বস্তুজগৎ বা জীবন সম্পর্কে কোন স্থির মতবাদ বা দৈব আদেশ বা ধর্মীয় বিধানকে আশ্রয় না করে স্বকীয় চিন্তার দ্বারাই অভিমত বা সিদ্ধান্ত নেয়া। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে যুক্তিবাদ আবশ্যিকভাবে মুক্তচিন্তা বোঝায়, যেখানে স্বকীয় চিন্তার দ্বারাই অভিমত বা সিদ্ধান্ত নেয়া এবং প্রমাণের দ্বারা চালিত। কিন্তু 'স্বকীয় চিন্তা' যুক্তি এবং প্রমাণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নাও হতে পারে, যদিও তা কোন মতবাদ বা দৈব আদেশের উপর নির্ভরশীল নয়। সে ক্ষেত্রে মুক্তচিন্তা যুক্তিবাদের সমার্থক হতে পারে না। যেমন উত্তর-আধুনিকতাবাদ বা বিশৃঙ্খলাবাদ। এই দুই মুক্তচিন্তা ভিত্তিক 'বাদ' যুক্তি প্রমাণের উপর নির্ভর করে না, আবার কোন প্রচলিত মতবাদ বা ধর্মীয় বিধানও স্বীকার করে না। অনেকটা 'যেমন খুশী তেমন ভাব'-এর মত ব্যাপার।

যুক্তিবাদ এমন একটি দর্শন যা কঠোর মানসিক শৃঙ্খলা দাবি করে। কাজে ও কর্মে এটা অনুসরণ করা অনেকের কাছেই কষ্টকর ব্যাপার মনে হতে পারে। আবার অনেকে সত্যিকার অর্থে যুক্তিবাদী না হয়েও নিজেকে যুক্তিবাদী হিসেবে গণ্য

করেন। এর কারণ হল তারা কিছু আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে যুক্তিবাদের অংশ বলে মনে করেন, যদিও আসলে তা যুক্তিবাদের ফলশ্রুতি নয়। যুক্তিবাদের একমাত্র আবশ্যকীয় শর্ত হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। একজন যুক্তিবাদী কোন রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শের প্রতি অন্ধ বা নিঃশর্ত আনুগত্য বা সমর্থন প্রদর্শন করতে পারেন না। একজন যুক্তিবাদী অনির্বচনীয় বাক্যকে (non-propositional statement) প্রমাণ বাক্য (statement of truth) বলে চালাতেও পারেন না। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তিবাদীরা এই ঘোষণা দিতে পারেন না যে 'ঈশ্বর নাস্তিমান', কারণ ঈশ্বরের সঠিক ও অসঙ্গতিমুক্ত সংজ্ঞা না থাকায় ঈশ্বর কোন প্রতীতি ধারণা নয়। তাই 'ঈশ্বর নাস্তিমান' এটা সত্যিকার অর্থে কোন বচন বাক্য (proposition) নয়। কাজেই এটা প্রমাণ বাক্যও হতে পারে না। যুক্তিবাদীরা আস্তিকদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের দাবি ও তার সহায়ক যুক্তির ত্রুটিসমূহ প্রতিযুক্তির মাধ্যমে বা দ্বান্দ্বিক পথে ধরিয়ে দিতে পারেন। এর বেশি নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নে যুক্তিবাদীরা তাই আবশ্যিকভাবেই অপ্রতীতিবাদী (noncognitvist)। তারা অজ্ঞেয়বাদীও (agnostic) হতে পারেন না, কারণ অজ্ঞেয়বাদীরা ঈশ্বরের সংজ্ঞা আছে ধরে নিয়েই (যদিও তারা সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে অক্ষম) কেবল এটাই বলেন যে ঈশ্বর আছেন কি নেই এটা তাদের জানা নেই, বা প্রমাণের অভাবে এখনো জানা সম্ভব নয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃত সংজ্ঞা না থাকায় যুক্তিবাদীরা অজ্ঞেয়বাদীদের এই বাক্যকেও যুক্তিবহির্ভূত মনে করেন।

যুক্তিবাদের আলোচনা থেকে অনেকের মনে হতে পারে যে, যুক্তিবাদীদের কোন ব্যাপারে অভিমত থাকতে পারে না। কিন্তু তা ঠিক নয়। কোন অভিমত যদি যুক্তি, প্রমাণ ও পর্যবেক্ষণ বিরোধী না হয়, তাহলে তা যুক্তিবাদ বিরোধীও নয়। এরকম অভিমত যুক্তিবাদীরা আপাতত গ্রহণ করতেই পারেন। তবে পরে প্রমাণ ও পর্যবেক্ষণ তা ভুল বলে প্রতীয়মান করতে পারে এই সম্ভাবনাকে মেনে নিয়ে খোলা মন রাখাও যুক্তিবাদের অংশ। অণুকল্প (Hypothesis) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অণুকল্পকে বৈজ্ঞানিক অভিমতই বলা যায়। অনুকল্প যখন বৈজ্ঞানিক আশ্রয়বাক্য (premise) সহযোগে প্রপঞ্চবিষয়ক কোন প্রমাণবাক্য দেয় তাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলা হয় (scientific theory)। তত্ত্ব যখন পুনঃ পুনঃ পর্যবেক্ষণ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় তখন তা বৈজ্ঞানিক সূত্র বা বিধি (law) বলে গণ্য হয়। আগেই বলেছি যুক্তিবাদ কোন স্থির মতবাদে বিশ্বাস করে না। সেহেতু স্থির মতবাদভিত্তিক রাজনৈতিক দল যেমন ধর্মবাদী বা কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক দলের অন্ধ সমর্থক হতে পারেন না। কোন কোন বুদ্ধিজীবী বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শকে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়ে ভুলবশত যুক্তিবাদের সঙ্গে যুক্ত করেন। স্থির মতবাদ ভিত্তিক নয় এমন রাজনৈতিক আদর্শ বা দলের ব্যাপারে অবশ্য যুক্তিবাদ নিরপেক্ষ। সেখানে ব্যবহারিক বিবেচনা ও সাধারণ জ্ঞানের

মৌলিক প্রয়োগই যথেষ্ট। অনেক বুদ্ধিজীবী আবার মনে করেন যে যুক্তিবাদী মাত্রই গর্ভপাতের প্রশ্নে ইচ্ছা/অনিচ্ছা অর্থাৎ পছন্দের পক্ষ নেবেন, বা মানুষের আচরণে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাবের প্রশ্নে পরিবেশের পক্ষ নেবেন, বা নৈতিক আপেক্ষিকতায় (moral relativism) বিশ্বাস করবেন ইত্যাদি। এও ভ্রান্ত চিন্তা। যুক্তিবাদীরা বিজ্ঞানের আলোকেই শুধু বিচার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বিজ্ঞান ও যুক্তি যেখানেই চালিত করে যুক্তিবাদীরা সেখানেই দ্বিধাহীনভাবে যেতে প্রস্তুত থাকবে, যদি তা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সহজাত প্রবৃত্তিজনিত পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধেও যায়। সত্য অপ্রিয় হলেও তাকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়াই হচ্ছে যুক্তিবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। যুক্তিবাদ হৃদয়হীন। যুক্তি ও প্রমাণের কাছে নিজের আপনজন, প্রিয়জন, নিজের দেশ, ধর্ম, ভাষা কোনটারই বিশেষ স্থান নেই। যুক্তির কাছে সবই সমানভাবে একই নিরিখে বিচার্য। এ কারণে যুক্তিবাদীর জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা খুব একটা বেশি নয়। যুক্তিবাদ রাজনৈতিক সঠিকতার ধার ধারতে পারে না। সব মন্দ বা দোষ সমান এমন স্বীকার্য যুক্তিবাদবিরোধী, যদিও রাজনৈতিক সঠিকতা তাই বলে। যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা ভাল বা মন্দের মানগত তারতম্য নির্ধারণ করাই যুক্তিবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যুক্তিবাদের কাছে জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম ইত্যাদি গৌণ। যুক্তি ও প্রমাণই মুখ্য। কোন সময় যুক্তিবাদ জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে, আবার কোন সময় তার বিরুদ্ধে যেতে পারে। এমনকি মানবতাও যুক্তিবাদ থেকে লব্ধ কোন ধারণা নয়। মানবতা একটি পৃথক স্বতঃসিদ্ধ (aniom) হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। মানবতা যুক্তিবাদের সঙ্গে যুক্ত হলে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি লব্ধ হয়। মূল্য বিচার (value judgement) যুক্তিবাদের এখতিয়ারভুক্ত নয়।

এখন প্রশ্ন হল প্রকৃত যুক্তিবাদী কোন নিরিখে বিচার্য? সবাই তো নিজেদের যুক্তিবাদী দাবি করতে বা ভাবতে চায়। ধর্মবাদী, সাম্যবাদী বা যে কোন 'বাদী'রাও দাবি করবেন যে তারা যুক্তি ও প্রমাণ মেনে চলেন ও কাজ করেন। এই প্রশ্নের আলোচনায় যেতে একটু সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। স্থির বা ডগমাটিক মতবাদের সমর্থকদের যুক্তি ও প্রমাণ সার্বজনীন বা বস্তুনির্ভর (objective) নয়। বস্তুত তাদের যুক্তি হল পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার উদ্দেশ্যে যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়ম বহির্ভূত নিজস্ব সৃষ্ট সুবিধাবাদী ও আত্মনির্ভর বা বিষয়ীমুখ (subjective) যুক্তি। কিন্তু যুক্তিবাদীদের যুক্তি হল সেই যুক্তি যা শত শত বছরের পরীক্ষিত, যা সার্বজনীন ও বস্তুনির্ভর, শিক্ষায়তনের পাঠ্যসূচিতে গৃহীত এবং যার প্রয়োগের মাধ্যমেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সৃষ্টি, যার সাফল্য অবিসংবাদিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যুক্তিশাস্ত্রের মধ্যে গুণগত কোন তফাৎ নেই। আশ্রয়বাক্যের

(premise) গঠন ভিন্ন হতে পারে কিন্তু সিদ্ধান্তের (inference) পদ্ধতির বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। নির্ভুল যুক্তি যেহেতু বস্তুনির্ভর, সেহেতু আবশ্যিকভাবেই সার্বজনীন।

এখন আসা যাক যুক্তিবাদ সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণার আলোচনায়। কেউ বলেন যে যুক্তির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভর করা ভুল। কারণ যুক্তিরও ভুল থাকতে পারে। কারণ যুক্তি তো মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। শুনতে 'যুক্তিসঙ্গত' কথাই মনে হয়। কিন্তু মানুষের ভুলের জন্য যুক্তি ভুল হয় না। বরং মানুষের ভুল হয় বলেই যুক্তির উপর নির্ভর করা প্রয়োজন, যুক্তির সৃষ্টিই সে কারণে। যুক্তিবিজ্ঞানের কোন নিয়ম বা পদ্ধতি ভুল প্রমাণিত হলে তা অবশ্যই সংশোধিত হত। তাছাড়া কোন যুক্তি ভুল না শুদ্ধ সেটা যাচাই করতেও তো যুক্তি বা প্রমাণেরই আশ্রয় নিতে হয়, যুক্তি-প্রমাণের বাইরে থেকে নয়। অনেকে যুক্তির সীমাবদ্ধতার কথা বলেন। যুক্তির সীমাবদ্ধতা মানুষের সীমাবদ্ধতারই প্রতিফলন। কিন্তু যুক্তির সীমাবদ্ধতার ধুয়া তুলে যুক্তির প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না, বা যুক্তির চাইতে শ্রেয় কোন বিকল্পের প্রশ্নও ওঠে না। এবং এই সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করেই তো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সত্যকে সর্বদা পরীক্ষামূলক (tentative) মর্যাদা দেয়। 'পরম সত্যের' কোন স্থান নেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মানুষের ভুল হওয়ার সম্ভবনাকে গুরুত্বের সাথে স্বীকৃতি দেয়। অনেকে স্বজ্ঞা বা অভিকল্পকে (intuition) সত্যকে জানার জন্য যুক্তি প্রমাণের চেয়েও উন্নততর পন্থা বলে মনে করেন। কিন্তু কোন বিশেষ ক্ষেত্রে স্বজ্ঞার প্রয়োগে আপাত সত্যে উপনীত হওয়া গেলেও এটা প্রমাণিত হয় না যে সাধারণভাবে স্বজ্ঞা যুক্তির চেয়ে শ্রেয়। তবে যুক্তি যে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে সব সময়ে প্রযোজ্য হবে এটা মনে করাও ভুল। অনেক ক্ষেত্রে যেখান সঠিক বা আগাম তথ্য জানা সম্ভব নয়, সেখানে বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান স্বজ্ঞার ওপর নির্ভর করতেই হয়। অবশ্য সে ক্ষেত্রেও যুক্তি সঠিক অনুমানের জন্য সহায়ক হতে পারে।

যুক্তিবাদ জীবনের সর্বপ্রকার সমস্যা নিরসনের বা সব ব্যাপারে সাফল্যের গ্যারান্টিও নয়। যুক্তিবাদ জীবনের সর্বক্ষেত্রে (যেমন বিবাহ) সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারেও গ্যারান্টি দিতে পারে না। অনেকে যুক্তিবাদকে রসকষহীন, সৌন্দর্য বা রোমান্টিকতাহীন, মায়া মমতাহীন বলে হেয় জ্ঞান করেন। এটি এক ধরনের ভিত্তিহীন চিন্তা। যুক্তিবাদ মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পৃথকীকরণের ওপর জোর দেয় ঠিকই, তবে হৃদয়কে সরিয়ে সেখানে মস্তিষ্ক বসানোর কথা বলে না। কিছু কিছু মানবিক বৈশিষ্ট্য সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত, কাজেই তা যুক্তিবাদের আওতায় পড়ে না। প্রেম, ভীতি, পরোপকারিতা, বিবেক, ইত্যাদি জীববৈজ্ঞানিক সহজাত প্রবৃত্তিতে

(biological instinct) নিহিত। যুক্তিবাদের সঙ্গে প্রবৃত্তির কোন সম্পর্ক নেই। সহজাত প্রবৃত্তি বহুলাংশে বংশাণুজনিত (genetic), যা মস্তিষ্কের বিশেষ এক আঙ্গিকতন্ত্র (limbic system) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যুক্তিবাদী চিন্তা মূলত বংশাণুজনিত হলেও পরিবেশের প্রভাবেরও অবদান আছে, আর যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার নিয়ামক হল মস্তিষ্কের বল্কল (cortex) নামক অঙ্গ। লিম্বিক তন্ত্র সকল মানুষের মস্তিষ্কেই বিরাজমান। যুক্তিবাদের দ্বারা (অর্থাৎ কর্টেক্স এর দ্বারা) লিম্বিক তন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কাজেই অন্য সবার মতই একজন যুক্তিবাদী ব্যক্তি বিশেষ পরিবেশে ভীতি অনুভব করতে পারেন, বা কোন বিশেষ মানুষের জন্য গভীর আবেগ অনুভব করতে পারেন, কে যুক্তবাদী আর কে ভাববাদী, বা কে বেশি যুক্তিবাদী আর কে কম, সেটা নির্ধারিত হয় তাদের কর্টেক্স এর পার্থক্যের কারণে। কিন্তু সব মানুষের লিম্বিকতন্ত্র একই ধরনের। তাই কোন অতীব সঙ্কটময় মুহূর্তে, যেমন জীবন মরণ প্রশ্নে, যখন লিম্বিকতন্ত্র মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, সেই মুহূর্তে যুক্তিবাদী বা অযুক্তিবাদীর মধ্যে আচরণগত কোন তফাৎ থাকে না। কোন কোন রুচিও অনেকটা সহজাত প্রবৃত্তিজনিত (যেমন খাবারের রুচি, পোশাকের রুচি)। তাই যুক্তির দ্বারা রুচির সৃষ্টি বা পরিবর্তন হয় না।

যুক্তিবাদকে হেয় করে দেখার আর এক কারণ হতে পারে যে, অনেকে মনে করেন যে মানবিক কাজ করার প্রেরণা কেবল হৃদয় থেকে আসতে পারে, যুক্তি বিশ্লেষণের মাধ্যমে নয়। আপাতদৃষ্টিতে কথাটি চিত্তাকর্ষক বটে। কিন্তু আগেই আভাস দিয়েছি যে পরার্থিতা (altrusim), আত্মত্যাগের তাড়না ইত্যাদি জীববিজ্ঞানের মৌলিক তাড়নাতেই নিহিত। কাজেই কেউ যুক্তিবাদী হলেও তার সেই সহজাত প্রবৃত্তি বা তাড়নাটা বিলুপ্ত হয় না। যুক্তিবাদ বড়জোর সেই প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশের রূপকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, প্রবৃত্তির কার্যকারিতা বা সুফলের উপর কোন ঋণাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে না। মানুষে মানুষে এই সহজাত তাড়নার তারতম্যের পেছনে রয়েছে বংশাণুজনিত পার্থক্য। যুক্তিবাদের কোন অবদান নেই এই তারতম্যে। তবে যুক্তিবাদ সহজাত প্রবৃত্তি বা তাড়না সৃষ্টি বা নিয়ন্ত্রণ না করলেও, এই প্রবৃত্তি বা তাড়নার বহিঃপ্রকাশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সঠিক দিকে চালিত করতে পারে, যাতে তা অধিকতর কার্যকরী হয়। আবেগের দ্বারা চালিত পরার্থতা বা আত্মত্যাগ সব সময় সর্বাধিক কার্যকরী নাও হতে পারে। অবশ্য একজন যুক্তিবাদীও আবেগের দ্বারা পরার্থতা বা আত্মত্যাগ করতে পারেন। কারণ তা যুক্তিবিরুদ্ধ নয়। যুক্তিবাদ সত্যিকার অর্থে যেখানে অভিমত, চিন্তা, বিচার, জানা, বোঝা ও সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন, সেখানেই প্রযোজ্য, যেখানে আবেগ বা মূল্যবিচারের প্রশ্ন, সেখানে নয়।

যুক্তিবাদের সংজ্ঞা

ঐতিহাসিকভাবে যে মতবাদে কেবল বৌদ্ধিক যুক্তিকেই (reasons) সত্যকে জানার বা জ্ঞানার্জনের মুখ্য উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয় তাকেই যুক্তিবাদ বলা হয়। এ মতবাদের প্রবক্তারা মনে করতেন যে মানুষের মধ্যে সত্যকে জানার এক বংশানুগত বুদ্ধি (intellect) ও পূর্বজ্ঞান (apriori knowledge) আছে যার দ্বারা সত্যকে জানা সম্ভব, যা অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জন করা যায় না।

এ মতবাদের পর্যবেক্ষণ ও ইন্দ্রিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানাহরণের ক্ষেত্রে গৌণ বা অবান্তর বিবেচনা করা হয়। ঐতিহাসিক যুক্তিবাদের সাথে জাগরণ যুগের (rennaissance) তিন প্রখ্যাত দার্শনিককে জড়িত করা হয়। এরা হলেন :

১. রেনে দেকার্তে (Rene Descartesm, 1596-1650)
২. গটফ্রিড উইলহেলম লাইবনিজ (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716)
৩. বারুখ স্পিনোজা (Barukh Spinoza, 1632-1677)

ঐতিহাসিকভাবে যুক্তিবাদের প্রতিযোগী মতবাদকে অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) বলা হয়, যেখানে প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণকেই সত্যকে জানার বা জ্ঞানার্জনের মুখ্য উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক (John Locke), ডেভিড হিউম (David Hume) ও বিশপ বার্কলে (Bishop Berkeley). তবে এটি বলা বাহুল্য যে ঐতিহাসিক যুক্তিবাদ অন্ধ বিশ্বাস আর মতাদর্শেরও (dogma) পরিপন্থী। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের প্রখ্যাত মার্কিন যুক্তিবাদী দার্শনিকেরা অন্ধ বিশ্বাস আর মতাদর্শবাদের (dogmatism) বিরুদ্ধেই বেশি সোচ্চার হয়েছিলেন তাদের লেখায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'জনের নাম হল রবার্ট ইঙ্গারসোল (Robert Ingersoll) ও ইথান এলেন (Eathan Allen). ইঙ্গারসোলের বিখ্যাত লেখার মধ্যে নাম করতে হয় ১৮৫৪ সালে লেখা বই 'যুক্তি: মানুষের একমাত্র দৈববাণী' (Reason: The Only Oracle of man) তিনি যুক্তি আর সুবিচার চিন্তার (critical thinking) গুরুত্বের কথা জোর দিয়ে লেখেন। আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির আলোকে ঐতিহাসিক যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের পার্থক্য এখন আর স্পষ্ট করে টানা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা জানতে পারি যে জ্ঞান আহরণ ও বিকাশে বংশাণু (Gene) এবং অভিজ্ঞতা দুইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আবার বিজ্ঞানের আলোকে এও জানতে পারি যে সত্য জানার ব্যাপারে স্বজ্ঞা ও ইন্দ্রিয় উভয়ই কখনো কখনো বিভ্রান্তিকর হতে পারে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি (logic) সাক্ষ্য (evidence) ও অভীক্ষা

(testing) অপরিহার্য। তাই বিজ্ঞানের আলোকে যুক্তিবাদের ঐতিহাসিক ধারণাকে অপরিপক্বই বলা যায়। যুক্তিবাদকে আরো বৃহত্তর দৃষ্টিতে দেখা প্রয়োজন। যদিও বিজ্ঞানের গবেষণায় আমরা জানি যে, জ্ঞান ও সত্য জানার ব্যাপারে বংশাণুগত স্বজ্ঞার (genetic intution) ভূমিকা আছে, কিন্তু আবার বিজ্ঞানের ফলশ্রুতিতেই জানতে পারি যে বংশাণুগত স্বজ্ঞা অনেকক্ষেত্রেই মানুষকে বিভ্রান্ত করে। কাজেই বর্তমান দৃষ্টিতে সত্য বা জ্ঞানের আহরণে বংশাণুগত স্বজ্ঞার গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েও সত্য ও জ্ঞানের যথার্থতা যাচাই করায় সার্বজনীন দর্শনলব্ধ যুক্তি (logic) ও প্রমাণকেই (evidence) প্রাধান্য দেয়, অন্ধ বিশ্বাস বা মতবাদকে নয়।

মন্দের যুক্তি ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব

অপার্থিব

ঈশ্বরে বিশ্বাসের পক্ষে একটা ক্ষতিকারক যুক্তি হল মন্দের (নৈতিক ও প্রাকৃতিক) যুক্তি (argument from evil) যা কিনা বলে যে, জগতে মন্দের উপস্থিতি ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করে, কারণ মন্দের উপস্থিতি পরম করুণাময়তার বিরোধী, আর সর্বকরুণাময়তা ঈশ্বরের একটি সংজ্ঞায়ক গুণ। ধর্মানুসারীরা এই যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দেন যে, মন্দ স্বাধীন ইচ্ছার অবশ্যম্ভাবী ফল। ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী করার ফলেই মন্দের উদ্ভব। মন্দ মানুষের নিজের সৃষ্ট, তার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা। সংজ্ঞা অনুযায়ী ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, পরম করুণাময় এবং সর্বজ্ঞ। এখন সমস্যা হল ঈশ্বর যদি সর্বজ্ঞই হন তাহলে কে আগামীকাল কি করবে তা ঈশ্বরের আজই জানার কথা। কিন্তু তা হবে স্বাধীন ইচ্ছার পরিপন্থী, কারণ, আগামীকাল আমি কী করব সেটা ঈশ্বর বা অন্য যে কারও আজ জানা থাকার মানেই হচ্ছে আমার কাজটা পূর্বনির্ধারিত বা পূর্বনির্দেশিত। কারণ কেউ যদি আগামীকাল একটি কাজ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে, সেই কাজটি ঈশ্বরের জানা কাজটিই হতে হবে, অন্য কোন কাজ নয়। আমি শেষ মুহূর্তে মন পরিবর্তন করে অন্য কোন কাজ করতে পারি না। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছা শেষ মুহূর্তে মন পরিবর্তন করার অধিকার দেয়ারই কথা। কাজেই স্বাধীন ইচ্ছা ও ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা পরস্পরবিরোধী। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা স্বীকার করলে স্বাধীন ইচ্ছা অস্বীকার করতে হয়। সে ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা হল কেউ যদি কোন অপকর্ম করে তাহলে সেটিও পূর্বনির্ধারিত। কিন্তু কার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত? নিশ্চয়ই ঈশ্বর। মানুষের অপকর্ম যদি ঈশ্বর নির্ধারিত হয় তাহলে ঈশ্বর সর্বকরুণাময় নন। আর যদি ঈশ্বর নির্ধারিত না হয় তাহলে অবশ্যই প্রকৃতি নির্ধারিত, সে ক্ষেত্রে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কি না সে প্রশ্ন ওঠে।

এবার ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে মুক্ত ইচ্ছার যুক্তি (free will defense) নিয়ে আলোচনা করা যাক। তার আগে আস্তিকতার বিরুদ্ধে মন্দের যুক্তির সারাংশ বর্ণনা দিয়ে রাখি :

মন্দের যুক্তি :

১. আস্তিকদের দাবি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বকরুণাময় এবং সর্বজ্ঞ।
২. ঈশ্বর যেহেতু সর্বজ্ঞ, সেহেতু ভবিষ্যৎ মন্দ সম্পর্কে তিনি পূর্ব থেকে জ্ঞাত।
৩. ঈশ্বর যেহেতু সর্বকরুণাময়, মন্দ নিবারণ তাঁর অভিপ্রায়।
৪. ঈশ্বর যেহেতু সর্বশক্তিমান মন্দ নিবারণ তাঁর পক্ষে সম্ভব।
৫. ২, ৩, ৪ অনুযায়ী মন্দের উপস্থিতি ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করে।
৬. পৃথিবীতে মন্দ আছে।
৭. ৫ এবং ৬ অনুযায়ী ঈশ্বর (১ এর দাবি অনুযায়ী) অস্বিত্বহীন।

সংশয়বাদী ও নাস্তিকদের উপর্যুক্ত মন্দের যুক্তির বিপক্ষে আস্তিকরা স্বাধীন ইচ্ছার যুক্তি দেন, যার সারাংশ হল :

স্বাধীন ইচ্ছার যুক্তি :

১. ঈশ্বরের নিকট দুটো বিকল্প খেলা আছে : (ক) স্বাধীন ইচ্ছাপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করা (খ) স্বাধীন ইচ্ছাবিহীন মানুষ সৃষ্টি করা।
২. মন্দ কাজে সক্ষম স্বাধীন ইচ্ছাপূর্ণ মানুষ মন্দ কাজে অক্ষম স্বাধীন ইচ্ছাবিহীন মানুষের চেয়েও শ্রেয়।
৩. ঈশ্বর অবশ্যই যা শ্রেয় তাই করেন।
৪. উপরের ২ এবং ৩ এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্দ কাজে সক্ষম স্বাধীন ইচ্ছাপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি ছাড়া ঈশ্বরের কোন বিকল্প নেই।

দুর্ভাগ্যবশত উপরোক্ত স্বাধীন ইচ্ছার যুক্তির কয়েকটি ত্রুটি ধরা পড়ে। প্রথমত, স্বাধীন ইচ্ছার মাধ্যমে মন্দ কাজ করার সক্ষমতা, মন্দ কাজে ইচ্ছাহীন অক্ষমতার চেয়ে ভাল কিছু কি না- এ ব্যাপারটি মোটেও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। যারা মন্দ কাজের দ্বারা উপকৃত হয় শুধু তারাই এতে নির্দ্বিধায় সম্মতি জানাতে পারে। মন্দের শিকার যারা (সংখ্যাগুরু)তারা কখনই এটা মানবেন না। আস্তিকদের আর একটি যুক্তি হল, স্বাধীন ইচ্ছাবিহীন মানুষ, যারা মন্দ কাজ করার বাসনা পূরণে অক্ষম, তারা রোবট সদৃশ।

আস্তিকদের এই যুক্তির বিপক্ষে প্রশ্ন করা যায় যে, স্রেফ ঈশ্বরের আদেশ বা ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে একজন স্বাধীন ইচ্ছাপূর্ণ মানুষ যদি অন্যায় থেকে বিরত থাকে

তাহলে সেও কি একটা রোবট নয়? অথচ সে রকম মানুষই ঈশ্বরের বা আস্তিকদের দৃষ্টিতে পুণ্যবান। কিন্তু মন্দ কাজে অক্ষম স্বাধীন ইচ্ছাবিহীন রোবট কি মন্দ কাজে সক্ষম স্বাধীন ইচ্ছাপূর্ণ রোবটের চেয়ে শ্রেয় (কম বিপজ্জনক) নয়? দ্বিতীয়ত উপরের ২নং যুক্তিকে 'শ্রেয়' বলার অর্থ এই যে আস্তিকরা ঈশ্বরের মনের কথা জানেন। ঈশ্বর কোন ব্যাপারটাকে শ্রেয় মনে করেন তা মানুষের জানার কথা নয়। আস্তিকদের এটা বলা কার্যের পরে কারণ খোঁজার শামিল। মন্দ আছে বলেই তাদের এই যুক্তি। যদি এমন হত যে জগতে কোন মন্দ নেই তাহলে তারা যুক্তি দিতেন যে, ঈশ্বর যেহেতু পরম করুণাময়, তাই মন্দ বলে কিছু নেই!

আর এক আস্তিক দর্শন বলে যে, ভাল বা শুভ'র অর্থবহতার জন্যই মন্দ বা অশুভের প্রয়োজন। মন্দ বা অশুভ ব্যতিরেকে ভালো বা শুভ যেহেতু অর্থহীন, সেহেতু মন্দ বা অশুভ সম্পূর্ণ দূর করা ঈশ্বরের পক্ষেও অসম্ভব এবং যুক্তিহীন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে ঈশ্বর কেন পুণ্য কাজের উপদেশ দেন ও পুণ্য কাজ না করলে শাস্তির ভয় দেখান? স্পষ্টত সবাই যদি শুধু পুণ্য কাজ করে তাহলে একই যুক্তিতে ভালো বা শুভ'র অর্থবহতা থাকে না। কাজেই ঈশ্বরকে কিছু মন্দের নিশ্চয়তা বিধান করতেই হবে। আবার সেই মন্দের জন্য মানুষকেই ঈশ্বর শাস্তি দেবার বিধান দেন। কাজেই একটি অসঙ্গতি থেকেই যাচ্ছে। আস্তিকদের এই যুক্তির আর একটি বিপজ্জনক দিক হল, কেউ কোন অপকর্ম করলে এই বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে যে, অপকর্মটা তার নিজের কারণে নয়, ঈশ্বরের কিছু মন্দের নিশ্চয়তা বিধানই তার অপকর্মের কারণ!

ভালর জন্য কিছু মন্দের প্রয়োজন আবশ্যকীয় হলে প্রশ্ন ওঠে স্বর্গে কেন অনাবিল সুখের প্রতিশ্রুতি? আর একটি প্রশ্ন ওঠে যে, ভাল'র অর্থবহতার জন্য নিরপরাধ শিশু হত্যা, নারী ধর্ষণের মত মন্দের কি প্রয়োজন? আর তাছাড়া সেটা কি সর্বকরুণাময়তার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় কি? আর একটি ত্রুটি হল, স্বাধীন ইচ্ছা মানেই মন্দ করার সম্ভাবনা নিশ্চত করা, আস্তিকদের এটা ধরে নেয়া। কিন্তু আসলে স্বাধীন ইচ্ছার অর্থ হল কয়েকটি বিকল্পের মধ্যে যেকোন একটা বেছে নেয়ার ক্ষমতা। কিন্তু বিকল্প মন্দই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। স্বাধীন ইচ্ছা কয়েকটি ভালো বিকল্পের মধ্যে যেকোন একটা বেছে নেয়ার ক্ষমতাও তো হতে পারে। ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান, সর্বকরুণাময়ই হন তাহলে মন্দ বিকল্পগুলো অপসারণ করে শুধু ভালোগুলো রাখতে পারতেন না কি? চিন্তা করার বিষয়। কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে মন্দ করার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বিকল্পের সংখ্যা সীমিত করলে স্বাধীন ইচ্ছাকেই খর্ব করা হয়। এর উত্তরে বলা যায় যে মন্দ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তো অনেক কিছু করার ক্ষমতা মানুষের নেই, যেমন, যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে উড়ে বেড়ানো, বা নিজেকে অদৃশ্য করা। কাজেই মন্দ করার ক্ষমতা কেড়ে নিলে গুণগত কোন তফাৎ হবে না।

একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত যে স্বাধীন ইচ্ছার যুক্তির দ্বারা মন্দের সঙ্গে ঈশ্বরের গুণাবলীর সামঞ্জস্য প্রমাণে আস্তিকদের চেষ্টায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিন্তু প্রমাণিত হয় না। যেমন আমি যদি যুক্তি দেই যে আমার একশ ফুট উচ্চতা লাফানোর দাবির সঙ্গে আমার ঘণ্টায় একশ মাইল বেগে দৌড়ানোর দাবির কোন বিরোধ নেই, আমার এই যুক্তি সঠিক হলেও এটা প্রমাণিত হয় না যে আমি একশ ফুট উচ্চতা লাফ দিতে পারি বা ঘন্টায় একশ মাইল বেগে দৌড়াতে পারি।

আরেকটা বিবেচ্য বিষয় হল যে মানুষের মন্দ কাজ করার কারণ কিছু বংশাণুজনিত, আর কিছুটা পরিবেশজনিত। যেহেতু এ দুটোর কোনটাই মানুষের আয়ত্তে নয়, সত্যিকার অর্থে মন্দ কাজের দায়িত্ব ঈশ্বর মানুষের গাড়ে চাপাতে পারেন না নীতিগতভাবে।

এতক্ষণ আমরা নৈতিক মন্দের কথাই আলোচনা করেছি, যা মানুষ করতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত মন্দ? মনুষ্যকৃত মন্দ না হয় স্বাধীন ইচ্ছার যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, যদিও তা ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিসের দ্বারা ব্যাখ্যা করবেন আস্তিকরা? প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত মন্দ, ঈশ্বরের সর্বকরুণাময়তার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় কি? আস্তিকরা যুক্তি দেন, এটার দ্বারা ঈশ্বর মানুষকে পরীক্ষা করেন। প্রশ্ন ওঠে কোন মানুষকে? যারা বেঁচে রইল? কিন্তু যারা এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা গেল তারা তো এর আগের কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেঁচে ছিল।

পরীক্ষার কোন সুফল তো তারা পেলো না। আজ যারা বেঁচে রইল তাদের অনেকেই তো ভবিষ্যতের কোন দুর্যোগে মারা যেতে পারে। এ ধরনের পরীক্ষার অর্থ কি তা হলে? আর এক দল আস্তিক বলেন, এগুলো হচ্ছে ঈশ্বরের এক গভীর লীলা খেলা। আমরা যা মন্দ বলে মনে করি তা আসলে ঈশ্বরের বৃহত্তর ভালরই অংশ। আমাদের অজ্ঞতার জন্যই আমরা তা বুঝতে পারি না। যারা এই যুক্তি দেন প্রশ্ন ওঠে তারাই বা ঈশ্বরের এই গভীর বৃহত্তর কারণের কথা জানলেন কেমন করে? উপরন্তু এর প্রত্যুত্তরে এটাও তো ঘুরিয়ে বলা যায় যে আমরা যা ভাল মনে করছি সেটা আসলে ঈশ্বরের বৃহত্তর মন্দেরই অংশ। এই যুক্তি অন্যটার চেয়ে কোন অংশে কম অকাট্য নয়। মুশকিল হল এইরকম যুক্তি ঘটনা ঘটার পরে এর কারণ খোঁজা। যদি জগতে কোন মন্দ না থাকত তাহলেও বলা যেত যে ঈশ্বর দয়ালু সেহেতু মন্দ নেই। কিন্তু মন্দ আছে বলে তারা যুক্তি দেয় যে মন্দ হচ্ছে ঈশ্বরের এক অজ্ঞাত কারণজনিত ভালর অংশ। অর্থাৎ ফলাফল যাইহোক না কেন কার্যের সঙ্গে সঙ্গতি মিলিয়ে কারণ খোঁজা হচ্ছে। কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হচ্ছি যে মন্দের অস্তিত্ব ও স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরের সর্বকরুণাময়তা, সর্বশক্তিমত্তা আর সর্বজ্ঞতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

বিজ্ঞান মনস্কতা ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজনির্মাণ

অজয় রায়

এক. বিজ্ঞানের পথ

কথা উঠেছে বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে। বেশ কয়েক বছর আগে দীর্ঘদিন ধরে 'বিটিভি'র একটি অনুষ্ঠানে উপস্থাপক জোরেশোরে অনুষ্ঠানের প্রস্তাবনায় উচ্চারণ করতেন– তার অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল একটি বিজ্ঞানমনস্ক ও ধর্মনিষ্ঠ সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করা। সৎ উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে। রাজনীতিবিদ আমলা থেকে অনেকেই অহরহ আপ্তবাক্যের মতো উপদেশবাণী বিকিরণ করেন আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক হবার জন্য, অঙ্গীকার করছেন বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ তৈরির। বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ চাই, চাই বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা, চাই বৈজ্ঞানিক পন্থায় দেশের সকল সমস্যার সমাধান, তা সে অর্থনৈতিক সমস্যাই হোক আর সামাজিক সমস্যাই হোক।

কিন্তু 'বিজ্ঞানমনস্কতা', 'বিজ্ঞানচেতনা', 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'– এসব শব্দ উচ্চারণ করে আমরা ঠিক কি বোঝাতে চাই, আমরা ঠিক কি চাই তা উপদেশ প্রদানকারীরা আমাদের মতো অজ্ঞ প্রাকৃতজনার কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরেন না, বিষয়টিকে পরিস্ফুট করেন না। বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ কি ধরনের হবে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, স্পষ্ট নয় বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারটিও। আসলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি ধরণের পদ্ধতি তা কি আমাদের জানা আছে? কিভাবে অগ্রসর হলে বিজ্ঞানসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়া যায় তা কি আমাদের শেখান হয় আমাদের জীবনচর্চায়, আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে, আমাদের পাঠ্যক্রমে, অথবা স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচিতে কি তা প্রতিফলিত?

'বিজ্ঞান' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'বিশেষ জ্ঞান'। কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক 'বিজ্ঞান' শব্দটি আমরা science-এর প্রতিশব্দ হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

আর science হল একট পথ ও প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করি, জ্ঞান সৃষ্টি করি- সত্যে উপনীত হতে পারি। বিজ্ঞানের ভিত হল যুক্তি, যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা আর নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ও তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ। কাজেই বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়তে হলে- এই কারিগরকে করতে হবে বিজ্ঞানচর্চা।

বিজ্ঞানচর্চার যে দু'টি দিক আছে আমরা প্রায়শ তা ভুলে যাই। এর প্রায়োগিক দিকটি সম্পর্কে আমরা অবশ্য সচেতন, কারণ তা আমাদের বস্তুজীবনকে প্রভাবিত করে, আয়েশ এনে দেয়। অন্যদিকটি হল এর দর্শন, যা আমাদের চিন্তা ও চেতনাকে স্বচ্ছ করে তুলতে সহায়ক, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয় যুক্তিনির্ভর– গণিতের মতো প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট। বিজ্ঞানের এই দর্শনের কথা আমাদের মনে থাকে না। অনেকের ধারণা বিজ্ঞান নিখুঁত জ্ঞান দানে সমর্থ। এটি কিন্তু এক অর্থে ঠিক নয়। কারণ জ্ঞানের শেষ নেই; বিজ্ঞানচর্চা এই জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে এক ধাপ থেকে উন্নততর ধাপে উন্নীত করে। এই প্রক্রিয়া অবিরত ধারায় চলতে থাকে। বৈজ্ঞানিক পন্থার সার কথা হল : পর্যবেক্ষণ থেকে বা তত্ত্ব থেকে অনুমান বা অনুসিদ্ধান্ত যাচাই করা হয়। প্রতিটি নিরীক্ষা সম্পর্কে মীমাংসা হওয়ার পর স্থির করা হয় অনুসিদ্ধান্তটি সমর্থিত হল, না বাতিল হল। তারপর প্রথম অনুমানের পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত উপাত্ত নতুন সব অনুমানের উদ্ভাবনে ব্যবহৃত হয়, এইসব নতুন অনুমান আবার আরো সব উত্তরের, সেই সঙ্গে আরো সব প্রশ্নের জন্ম দেয়। অর্থাৎ আমরা যত জানতে পারি, তত জানতে পারি আমরা কী জানি না। যদি নিখুঁত জ্ঞান (পরিশুদ্ধ জ্ঞান) বলতে বোঝায় কোনো বিষয় সম্পর্কে আমরা সম্ভব সব কিছু জানি, তাহলে উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা যা বলা হল তা সেই লক্ষ্য অর্জন করে না।

এভাবে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিশীলতার ফল এবং সমস্যা-সমাধান প্রায়ই নতুন সমস্যা বলে মনে হয়, যদিও সমগ্র ফলাফল সন্তোষজনক হতে পারে। আমরা যখন প্রযুক্তির অগ্রগতি থেকে উদ্ভূত নতুন সব সামাজিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে চাই, তখন এই সম্ভাবনার কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ তৈরির প্রেক্ষাপটে আমাদের আরও একটি কথা স্মরণে রাখা আবশ্যক। মানুষ আজ হঠাৎ করেই এক অনন্ত সম্ভাবনার দ্বারে উপনীত, আর তা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই। আমাদের এই প্রজন্মের আমরা দেখছি মানবজাতি কী বিপুল শক্তির অধিকার অর্জন করেছে। পরমাণু বিভাজনের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রায় অফুরন্ত এক শক্তির উৎস আয়ত্তে এনেছে। কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যকৃৎকৌশল তা গণনা, বিশ্লেষণ, এমন কি ভবিষ্যদ্বাণীর ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি প্রায় সীমাহীন পর্যায়ে উন্নীত করেছে। আর বংশগতিবিদ্যার ক্ষেত্রে সৌভাগ্যবশত

আণবিক জীববিদ্যার প্রয়োগের বদৌলতে মানুষ তার জীবনের উপরও নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে শুরু করেছে। প্রযুক্তিবিদ্যা জ্ঞান ব্যবহারের হাতিয়ার। এই পথেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ ধীরে ধীরে তার পরিবেশের উপর ক্রমশ প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। অন্যদিকে একই সঙ্গে তার মানসিক ও আত্মিক চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছে।

প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে যেমন বোঝায় জ্ঞানের ব্যবহার, তেমনি বিজ্ঞানের চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণার সম্পর্ক জ্ঞানের সাথে। অবশ্য এই শব্দ দু'টি নিয়ে আমাদের মাঝে রয়েছে এক ধরনের অস্পষ্টতা। আর এই অস্পষ্টতা বোধ থেকেই আমরা বিজ্ঞানকে জীবন থেকে আলাদা ভাবি, বিজ্ঞানের ফসলটুকুই চাই, তার জ্ঞান-প্রক্রিয়ার পথকে পরিহার করতে ব্যস্ত।

শেষ বিশ্লেষণে– মানুষের উদ্ভব পদার্থ থেকে। সে তার পরিবেশ 'জানতে' ও 'বুঝতে' শুরু করেছে এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণকারী বিপুল শক্তির রূপও। উপলব্ধি করতে শুরু করেছে জীবনের প্রক্রিয়া। মানুষের মহৎ কীর্তি হল তার জ্ঞান। জ্ঞান মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে, অন্যদিকে অজ্ঞতা তাকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখে, এবং বেঁধে রাখতে চায় কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের জালে। মৌলিক জ্ঞান অর্জনের পথে বিজ্ঞানের অগ্রগতি স্তব্ধ হওয়ার নয় এবং স্তব্ধ হওয়া উচিতও নয়।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের কি একক দার্শনিক ভিত আছে? বিজ্ঞান কি কোনো কিছু জানার জন্য অনন্য পথ অনুসরণ করে? বিজ্ঞান কি কোনো বিষয় সম্পর্কে পরিশুদ্ধ বা পরম জ্ঞানদান করতে পারে? বস্তুবাদী দার্শনিকেরা (যেমন ফ্রেডারিক হার্বার্ট) জ্ঞানের ভিত্তি সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেন তার সারাংশ হল : 'অভিজ্ঞতা' আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি, দর্শনের সব সমস্যার মীমাংসা সম্ভব আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ও ঘটনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তবে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির প্রয়োগে। শোপেনহাওয়ার মনে করতেন যে জ্ঞান মাত্রই প্রত্যক্ষমান। চেতনাপ্রসূত তথ্যাবলী হল আমাদের জ্ঞানের ভিত। এখন দেখা যাক বিজ্ঞান কি পদ্ধতিতে সত্যে উপনীত হতে বা জ্ঞান অর্জন করতে চায়।

প্রকৃতি বিজ্ঞানে বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য সেই সব সাদৃশ্য নিয়ম, সাধারণ নীতি এবং মৌল নীতির সন্ধান করা যেগুলো প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিজ্ঞানী দেখে জ্ঞান হচ্ছে অভিজ্ঞতা অর্থাৎ পরীক্ষালব্ধ চরিত্র। তাই প্রথমে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ পরে সাধারণীকরণ প্রচেষ্টা এসব তথ্য বিশ্লেষণ বিচারবুদ্ধি ধ্যান আর হিসাবের মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যায় প্রকৃতির নিয়মাবলী। তৃতীয় পর্যায়ে যুক্তিবিদ্যার সহায়তায় বিজ্ঞান গড়ে তোলে বিশেষ নিয়মাবলী, যেগুলো পরীক্ষার

সহায়তায় প্রমাণ করা সম্ভব। এরপর এই বিশেষ নিয়মের সাথে সাধারণ নিয়ম। এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে আরোহী পদ্ধতি। ম্যাক্সওয়েল কৃর্তক তাড়িত চৌম্বক ক্ষেত্রের চারটি সমীকরণের প্রতিষ্ঠা– এই পদ্ধতি ব্যবহারের সুন্দরতম উদাহরণ। এর পাশাপাশি অবরোহী যা দার্শনিকদের খুব পছন্দ সেই পদ্ধতিও বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারে প্রযুক্ত হয়েছে সার্থকভাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞানকে প্রায়োগিক স্তর থেকে গাণিতিক যৌক্তিক স্তরে তুলে আনা সম্ভব, অভিজ্ঞতার দ্বারা লালিত বুদ্ধি ও মেধার প্রয়োগে। বিজ্ঞানী অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই হোক অথবা নিজ প্রজ্ঞার দ্বারা চালিত হয়েই হোক বহির্জগতের সাথে কার্যকরণ সম্পর্ক প্রভাবিত একটি গাণিতিক প্রতিকৃতি নির্মাণ করেন। এই গাণিতিক প্রতিকৃতিতে স্থান পায় অবরোহী পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা পরিশুদ্ধ কিছু গাণিতিক প্রতীক ও পরিভাষা।

এই অবরোহী পথই অবলম্বন করেছিলেন নিউটন ও আইনস্টাইনের মতো প্রতিভাধরেরা। আপেক্ষিক তত্ত্ব ও বিশেষ করে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব পদার্থ বিদ্যার অভিজ্ঞতায় নিষিক্ত হয়ে গাণিতিক প্রতিকৃতি থেকে বিকশিত হয়েছে। আইনস্টাইনের মতে– কোনো ভৌত ব্যবস্থার গড়ন পরীক্ষালব্ধ বা কোনো অভিজ্ঞতা প্রসূত উপাত্ত থেকে উদ্ভূত হয় না। এর মূল নীতিসমূহ হচ্ছে 'মানবীয় ধী শক্তির মুক্ত উদ্ভাবনা'। অভিজ্ঞতা হয়তো যুৎসই গাণিতিক ধারণাসমূহকে পেতে সাহায্য করে, কিন্তু ঐসব ধারণা কখনো অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করা যায় না। সৃজনশীল নীতির অস্তিত্ব গণিতেই থাকে। বেকনীয় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের মহৎ কিছু আবিস্কৃত হয় না। প্রকৃতির মৌল নীতি ধরা দেয় না। এই ছিল আইনস্টাইনের বিশ্বাস। এই প্রক্রিয়ায় কেপলার, রিডবার্গ সৃষ্ট হতে পারেন, কিন্তু বোর বা নিউটনের সৃষ্টি সম্ভব নয়। সহজ কথায় বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হল আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশৃঙ্খল সংবেদনসমূহকে একটি যুক্তিনির্ভর ঐক্যবদ্ধ চিন্তাব্যবস্থার সাথে মিলিয়ে নেবার প্রচেষ্টা। অভিজ্ঞতা বহির্লব্ধ, কিন্তু যে তত্ত্বের মাধ্যমে ওদের বুঝবার প্রয়াস তা মনুষ্যমেধায় উদ্ভাবিত। ভৌত ঘটনার প্রকাশ আর তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেবার মাধ্যমেই তত্ত্বের উদ্ভব বা বিকাশ ঘটে, পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত না হলে, ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা না দিতে পারলে তত্ত্ব প্রশ্নাতীত হয় না। নতুন তত্ত্ব এসে পুরানো তত্ত্বকে অপসারণ করতে পারে। এই হল বিজ্ঞানের পথ, বিজ্ঞান কোনো বিষয় সম্পর্কে শেষ বা পরম জ্ঞান দেয় না। এই পরম জ্ঞান অর্জন অসম্ভব। এটিও বিজ্ঞানের আরেকটি অসম্ভবের নীতি। এর সাথে অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে– প্রয়োগধর্মিতা হল বিজ্ঞানের সব চাইতে বড় বিচার্য বিষয়। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে প্রযুক্তিবিদ্যা জ্ঞান ব্যবহারের হাতিয়ার। একথাও বলা প্রয়োজন, মৌলিক প্রাকৃতিক নিয়মগুলো যুক্তিবিন্যাস কিংবা গাণিতিক

হিসাবের সাহায্যে গড়ে তোলা যায় না। মৌলিক প্রাকৃতিক নিয়ম হল আমাদের জ্ঞানের নির্যাস। জ্ঞানের সাধারণকৃত রূপ। প্রাকৃতিক নিয়মকে আবিষ্কার করতে হয়, উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে আসতে হয়। এটি করেন বিজ্ঞানী– তিনি অবরোহী বা আরোহী যে পথই অবলম্বন করুন না কেন। চিন্তাধারার যে শৃঙ্খলা আর সৃজনশীল অনুভূতির সাহায্যে একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী কী ভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করেন তার আলোচনা অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক হবে সন্দেহ নেই।

আর একটি প্রশ্ন সতত উচ্চারিত হয়– বিজ্ঞানে কি সজ্ঞার (intuition) স্থান আছে। অনুপ্রাণিত ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রত্যয়কে যদি সজ্ঞা নামে ডাকা হয় তাহলে তা অবশ্যই আছে। কিন্তু এই অনুমিতির পশ্চাতে থাকে অভিজ্ঞতার এক শক্তিশালী পটভূমি : বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক। মনুষ্য-মস্তিষ্ক বিকাশের উন্নয়ন এমন এক স্তরে এসেছে যে সামাজিক ও উপযোগ্য পটভূমি পেলে উদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণা স্বতঃতই জন্ম নিতে পারে। আইনস্টাইন কর্তৃক আলোর গতির অনপেক্ষতা, সমতুল্যতার নীতি, প্ল্যাঙ্ক কর্তৃক বিকিরণ স্পন্দকের শক্তি স্তরের বিচ্ছিন্নতা বা কোয়ান্টায়নের ধারণা, দ্য-ব্রগলীর তরঙ্গ-অপেক্ষক ধারণা– এসবই অনুপ্রেরণা জাত বা সহজাত ধারণার চমৎকার উদাহরণ। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান উদ্ভাবনের পূর্বেই সত্যেন বোস কর্তৃক কোয়ান্টাম কণিকার সংখ্যায়নিক আচরণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা বোসের অনুপ্রাণিত বা উদ্দীপ্ত অনুমিতির ফসল।

বিজ্ঞানে বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার জ্ঞানতত্ত্বের আর একটি নীতি হল যথাসম্ভব কম সংখ্যক প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে জগৎ-ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া। এই পথের অগ্রপথিক ছিলেন নিউটন, ম্যাক্সওয়েল, আইনস্টাইন, আর আমাদের কালে সালাম-ভাইনবার্গ-গ-াশো এবং হকিং। বিশ্বঘটনাকে জন্ম থেকে পরিণতি একটি একীভূত তত্ত্বে দাঁড় করানোর সাধনায় এরা ব্রতী ছিলেন নিজ নিজ সময়ে।

দুই. যুক্তিহীন সমাজ

উপরের এই আলোচনা থেকে অবশ্য বলা যায় যে, বিজ্ঞানমনস্ক মুক্তচিন্তা সমন্বিত সমাজ গড়তে হলে জ্ঞানচর্চার পথ হবে যুক্তিভিত্তিক, অনুসন্ধিৎসু চেতনা-চিন্তানির্ভর। জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধির চর্চা ব্যতিরেকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, এর অভাব হলে সমাজ হয় পশ্চাৎমুখী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ইবনে রুশদ বহু শতাব্দী আগে জ্ঞানচর্চার এই পথের প্রদর্শক ছিলেন। তিনি সম্ভবত ইসলাম জগতের প্রথম দার্শনিক যিনি মুক্তবুদ্ধি নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে দর্শন থেকেই কেবলমাত্র সত্যের আশা করা যায়। তাই তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানকে ধর্ম থেকে পৃথক করার প্রয়াস পান। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস যে জ্ঞানচর্চার পথে অন্তরায় একথা বলতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসে আবৃত ধর্মবোধ মানুষের

স্বাধীনতা ও অগ্রগতির ধারাকে নস্যাৎ করে– এর ফলে শুধু চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, প্রয়োগ ও তত্ত্বীয়ভাবেও মানবজাতি শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যুক্তির সামর্থ্য ও ক্ষমতাই হল মানুষের জীবনের নির্যাস। যুক্তির পরিচ্ছন্নতা মানুষকে মানুষে পরিণত করে; অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিকে যখন বেশি প্রাদান্য দেয় মানুষ তখনই হয় সত্যিকার অর্থে ধার্মিক। জনগণকে চিন্তা না করতে বলা এবং তাদেরকে বিশ্বাসী বানাবার অর্থ হল তাদেরকে পশুরও নিচের স্তরে নামিয়ে দেয়া। ধর্মবাদীরা তাই যুক্তিকে ভয় পায়। কারণ যুক্তি-আশ্রয়ী চিন্তার প্রসারতা জ্ঞান অর্জনে সহায়ক। তখন মানুষ অলৌকিক, ঐশ্বরিক বা দৈব বলে কোনো ঘটনায় আর বিশ্বাস স্থাপন করতে চায় না, সব ঘটনার পেছনই খুঁজে পায় কার্যকারণ সূত্র, খুঁজে পায় যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ। এমনকি মার্টিন লুথারের মতো মানবতাবাদী মানুষও যুক্তিকে ভয় পেতেন, কারণ যুক্তিকে গ্রহণ করলে ঈশ্বরের অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে আস্থা রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই যুক্তিবাদী দার্শনিক দর্শনচর্চার মাধ্যমে জ্ঞান ও সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিরলস চেষ্টা করেছেন, যার জন্য গ্যালিলিওর বহু পূর্বে তাঁকে মুক্তবুদ্ধি চর্চার জন্য নির্যাতিত হতে হয়েছিল, নিজ বাসভূমি থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল, বিচারের নামে প্রহসন সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁকে তৌবা করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তাঁকেও পরবর্তীকালে গাজ্জালীর অনুসারীরা আরবীয় নামের কারণে তাঁর দর্শন না বুঝেই ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম বানানোর চেষ্টা করেছিল। অথচ ইবনে রুশদ প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। ধর্ম অনপেক্ষ মুক্তবুদ্ধি-আশ্রয়ী 'আরবীয় দর্শন' মোহাম্মদ আল ফারাবী ও ইবনে সিনার মতো মনীষীদের যত্নে ও চর্চায় বিকশিত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে ইমাম গাজ্জালীর চিন্তা ও প্রভাবে তা আরব ও মুসলিম জগৎ থেকে প্রায় নির্বাসিত হয়। পরবর্তীকালে ইবনে রুশদ আবারও এই আঘাতপ্রাপ্ত আরবী দর্শনকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। এর ফলে এই মনীষীদের, যেমন ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, ওমর খৈয়াম, আল-বেরুনী প্রমুখকে পলাতকের জীবনযাপন করতে হয়েছিল, তাঁরা কাফের নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

বস্তুত ইমাম গাজ্জালীর পরপরই ইসলাম জগৎ থেকে মুক্তবুদ্ধির চর্চার, মুক্ত দর্শন চর্চা, বিজ্ঞান-সাধনা নির্বাসিত হয়, যা থেকে ইসলাম জগৎ এখনও মুক্ত হতে পারেনি। ইসলাম জগতের আর একজন ধর্ম-অনপেক্ষ চিন্তাবিদ হলেন সে যুগের মানবতাবাদী দার্শনিক জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম। জ্যামিতি ও বীজগণিতের শাখাতেও তাঁর প্রতিভার স্পর্শ লেগেছে, সেই ব্যক্তিটি ছিলেন মুক্তবুদ্ধির ধারক; তাঁর মাঝে প্রকাশ পেয়েছে যুক্তির উপর নির্ভরতা ও বিচক্ষণতা। একটি চমৎকার আরবী কবিতার মধ্য দিয়ে খৈয়াম-দর্শনের নির্যাস বিধৃত হয়েছে :

যদি মাতালের শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলো

এপিকিউরাস, প্লেটো
অ্যারিস্টটলের দর্শন-শিক্ষালয় হত,
যদি পীর দরবেশের আস্তানা ও মাজারগুলো
গবেষণা প্রতিষ্ঠান হত,
যদি মানুষ ধার্মিকের ধর্মান্ধতার পরিবর্তে
নীতিজ্ঞানের চর্চা করত,
যদি উপসনালয়গুলো সর্ববিদ্যা চর্চাকেন্দ্র
হিসেবে গড়ে উঠত,
ধর্মতত্ত্বের চর্চার পরিবর্তে যদি গণিত-বীজ-
গণিতের উন্নতি সাধন করত,
যুক্তিবিদ্যা যদি সুফিতত্ত্ব, সংস্কার,
কুসংস্কারের জায়গা দখল করত,
ধর্ম যা মানবজাতিকে বিভক্ত করে তা
মানবতার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হত,
পৃথিবী তাহলে বেহেশত হত,
পরপারের বেহেশত বিদায় নিত,
প্রেম-প্রীতি-মুক্তি-আনন্দে জগৎ পরিপূর্ণ হত
নিঃসন্দেহে।

ওমর খৈয়াম বহু বছর আগে যে কথা বলেছিলেন মনে হয় বাংলাদেশ যেন তার প্রেক্ষাপটে বিরাজ করছিল। এতদিন পরেও বলতে ইচ্ছে করে ওমর তুমি আর একবার এসো এই দেশে, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এই দেশে, ফতোয়াবাজদের এই দেশে আজ তোমার বড় প্রয়োজন।

তিন. আমাদের অবস্থান ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

জ্ঞানের একমাত্র উৎস যদি পবিত্র গ্রন্থগুলো হয়, তাহলে সেই সমাজে নেমে আসবে বন্ধ্যাত্ব, সমাজ হবে জড় চেতনা-চিন্তায়, সৃষ্টিশিলতার স্থান দখল করবে কুসংস্কার, মূর্খতা, কূপমণ্ডূকতা আর অজ্ঞানতা। সে সমাজ হবে পশ্চাৎমুখী। আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে কুসংস্কার ও প্রযুক্তিবিদ্যার ফসলকে আত্মস্থ করার পারস্পরিক সহাবস্থান। বিজ্ঞানের যুক্তি চাই না, চাই তার ফসল; পাশে থাকে অন্ধবিশ্বাস আর ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ। এই সমাজেই সম্ভব– ড্রইং রুমে রঙিন টেলিভিশন সেট স্থাপন এবং হিস্টিরিয়া-আক্রান্ত কন্যাকে পীরের চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রেরণ। এ সমাজেই সম্ভব অণুরসায়নবিদের রসায়নচর্চার পাশাপাশি তথাকথিত পীরের পদচুম্বন। এই সমাজেই সম্ভব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পণ্ডিত কর্তৃক লোকায়ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্রে গবেষণাধর্মী পুস্তক প্রণয়ন, আর একই সাথে আটরশীর পীরের দরগায় গিয়ে

তাঁর চেয়ে অনেক কম শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে আশীর্বাদ কামনায় ধর্না দেওয়া। আমাদের সমাজে এই চিত্র তো প্রায়শ দেখছি– তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা একদিকে পুরোনো যুক্তিহীন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাগুলোকে লালন করছে, অন্যদিকে অতি মনোযোগ দিয়ে ডাক্তারি বিদ্যা বা প্রকৌশলী শাস্ত্রে পাঠ নিচ্ছে, ভাল ফল করছে। এই দুই জীবনে সংঘাত নেই, নেই মিথস্ক্রিয়া। এ সমাজেই দেখতে পাই– কোনো মূল্যবান বস্তু হারানো গেলে পুলিশের সাহায্য না নিয়ে ছুটে যাই ফুঁ-পড়া মোল্লার কাছে। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক শ্রেণীকক্ষে মহাকর্ষ তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছেন, সেই অধ্যাপকই বিস্ময়ে স্বামীর পাদপদ্মে আছাড় খেয়ে পড়ছেন, যখন তিনি দেখেন যে তার গুরুদেব খড়ম পায়ে প্রমত্তা মেঘনা পাড়ি দিতে পারেন বিনা ক্লেশে। তাই অবাক হই না যখন দেখি রসায়নশাস্ত্রের এককালের তুখোড় অধ্যাপক প্যারাসাইকোলজির উপর উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হন।

পরামনোবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের নামে, গুরু ও অবতারবাদীরা এবং পীর নামে পরিচিত কিছু ব্যক্তি ধর্মের নামে যথাক্রমে ধর্মতত্ত্ব ও অতীন্দ্রিয়তাকে বিজ্ঞানসম্মত বা আধ্যাত্মিক বলে প্রচার করে চলছেন। পরামনোবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান-প্রদর্শিত পথ অনুসরণের নামে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা, প্লানচেট, জন্মান্তর, জাতিস্মর, টেলিপ্যাথি প্রভৃতির অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য নানা ধরনের কূটকৌশল বা যাদুবিদ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন। অধিকাংশ অলৌকিক প্রতিভাধারী ব্যক্তি এ ধরনের কূটকৌশলের সাহায্য নিয়ে তাঁদের অনুসারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এক শ্রেণীর শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মানুষ নিজ স্বার্থের জন্যই হোক অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক এইসব কার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা দান করে থাকেন।

অথচ ইতিহাস শিক্ষা দিচ্ছে কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামী বিজ্ঞানী চিন্তাবিদ জয়ী হয়েছেন সর্বকালে, পরম নির্যাতন হয়তো তাদের সইতে হয়েছে। শত অত্যাচার আর নির্যাতনে ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ তাঁদের মতবাদ ত্যাগ করেননি। যিরহাম, আল দিমিস্কি মৃত্যুবরণ করেছেন; কিন্তু তাঁদের প্রগতিশীল যুক্তিবাদ বিসর্জন দেননি। ধর্মবিরোধী বলে নিন্দিত ও গোঁড়াপন্থীদের হাতে নিগৃহীত হয়েও মুক্তবুদ্ধির চিন্তা-চেতনা প্রচারণায় থেমে যাননি প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী মোহাম্মদ বিন জাকারিয়া আল-রাজী।

সূর্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীসহ সব গ্রহ– এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে ধারণ ও লালন করার জন্য ও তাঁর সর্বেশ্বরবাদ মত প্রচারের কারণে ইতালীয় বিজ্ঞানী জিয়োর্দানো ব্রুনোকে সহ্য করতে হয়েছে দীর্ঘ আট বছরের নির্যাতনমূলক কারাদণ্ড। ধর্মান্ধ মানুষ, ধর্মযাজকবৃন্দ আর জগদগুরু পোপ ক্ষিপ্ত হলেও ব্রুনো সত্যকে ত্যাগ করেননি। তারপর চরম দণ্ড হিসেবে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র

গ্রন্থবিরোধী মতবাদ লালন করার জন্য তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল। তবুও সত্যই প্রতিষ্ঠিত হল। গ্যালিলিও গ্যালিলি'র কাহিনী আমরা সবাই জানি, তবু পৃথিবী ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে।

ঈশ্বর পুত্রের জন্মের প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে আনাক্সগোরাস চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন, বলেছিলেন চাঁদের কোনো আলো নেই নিজের; চাঁদের ওপর পৃথিবীর ছায়া পড়ার কারণে ঘটে চন্দ্র গ্রহণ। পবিত্র গ্রন্থবিরোধী এই মতবাদ প্রচারের জন্য এই মহান বিজ্ঞানীকে দীর্ঘদিন নিষ্ঠুর নির্যাতন করে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু পবিত্র গ্রন্থের বাণী টেকেনি– প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক সত্যই– চন্দ্রগ্রহণ কোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনা নয়। ষোড়শ শতকে সুইজারল্যান্ডের বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক প্যারাসেলসাস গবেষণার মাধ্যমে দেখলেন যে, রোগের পশ্চাতে রয়েছে শরীরের মধ্যে বাসা বাঁধা বিশেষ বিশেষ ধরনের রোগ জীবাণু। পরজীবী এই জীবাণুদের ধ্বংস করলেই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রোগের পশ্চাতে রয়েছে পাপের ফল বা কোন অজ্ঞাত শক্তি– এটিই ছিল সেইকালে ধর্মবিশ্বাস। তিনি বিচারের সম্মুখীন হলেন ধর্মবিরোধী মত প্রচারের জন্য। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অধ্যাপক পালিয়ে জীবন রক্ষা করলেন। সত্য আজ জয়ী।

ভৌত বিজ্ঞানের মতো জীববিজ্ঞান বা সৃষ্টিবিজ্ঞান গত শতকে উন্নতি করেনি। তাই সৃষ্টিরহস্য নিয়ে মোল্লা-পুরোহিতেরা পবিত্র গ্রন্থগুলোতে উল্লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বের দোহাই দিয়ে প্রাকৃতজনের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করত। স্বর্গ-নরকের কথা তুলে সাধারণ মানুষকে করে তুলত আতঙ্কগ্রস্ত। কিন্তু জীববিজ্ঞানের সাম্প্রতিক কালের অভাবনীয় উন্নতিতে সৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত তত্ত্বে বিশ্বাস রাখা সাধারণ মানুষের পক্ষেও ক্রমেই কষ্টকর হয়ে উঠছে।

সনাতন হিন্দুধর্ম বলে ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা– তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অংশ থেকে জগতে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করেছেন। মানুষও এক শ্রেণীর জীব। খৃস্ট ধর্মমতে সকল প্রকারের জীবের স্রষ্টা হলেন পরম পিতা জিহোবা। তিনি জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করেন পৃথিবীতে। এমনি করেই জিহোবা একদা সৃষ্টি করলেন প্রথম মানব-মানবী দম্পতি। আদম ও ঈভ। আমরা সবাই সেই আদি মানব-মানবী আদম আর ঈভের সন্তান-সন্ততি।

কিন্তু জীববিজ্ঞানের ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত আধুনিক গবেষণা ধর্মগ্রন্থ-উল্লিখিত সৃষ্টি সম্পর্কিত তত্ত্বের উপর বিশ্বাসকে শিথিল করে তুলছে। একথাই বরং প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ক্রমেই যে, কোনো জীবই পরমপিতা ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হয়ে হঠৎ করে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়নি। পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ ঘটেছে কোটি কোটি বছর ধরে দীর্ঘ ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে। এই প্রক্রিয়ারই সার্থক পরিণতি পৃথিবীতে বুদ্ধিদীপ্ত

মানুষের আবির্ভাব।

প্রাণীদের ক্রমবিবর্তনের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস প্রথম তুলে ধরেছিলেন ডারউইন। দীর্ঘ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হল 'The Origin of Species' যার মধ্যে তিনি বিবর্তনের তত্ত্ব প্রস্তাব করলেন ও প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্বকে, মানুষ সৃষ্টির কল্পকাহিনীগুলোর ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দিলেন। আধুনিককালের নানা প্রকারের জীবাশ্ম আবিষ্কার, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও প্রাচীনত্ব নির্ণয়কালের মধ্য দিয়ে জীবাশ্মবিজ্ঞানী, প্রত্নজীববিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের সমন্বিত চেষ্টা ডারউইনের হারানো লিংকসমূহকে জোড়া দেয়ার কাজটি প্রায় সম্পূর্ণ করেছেন। একমাত্র রক্ষণশীল ধর্মান্ধ ব্যক্তি ছাড়া যে কোনো মুক্তচিন্তার অধিকারী নির্মোহ মানুষ বিশ্বাস করেন বিবর্তনবাদে আর মানুষের আবির্ভাব এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই। ডারউইনও তার তত্ত্ব প্রচারের জন্য সমসাময়িক জ্ঞানপাপীদের কাছে সমালোচিত, ধিকৃত হন আর ধর্মান্ধদের হাতে তাকে নিপীড়িত হতে হয়েছে প্রায় মধ্যযুগীয় প্রথায়। বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য তাকে হজম করতে হয়েছে নানা জনের কাছ থেকে– যেমন বিশপ উইলবার বিদ্রূপভাবে কটূক্তি করেছিলেন– 'ডারউইনের পিতামহ কি বানর ছিলেন।' অনেকে বলতেন ডারউইন স্বয়ং ছিলেন দেখতে বানরের মতো, তাই তিনি বলেন মানুষ বানর থেকে জাত হয়েছে। ভাবতে বিস্ময় লাগে ডারউইন বা প্রত্নজীববিজ্ঞানী যারা বিবর্তন তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠার জন্য গবেষণা করেছেন, অক্লান্ত চেষ্টায় সংগৃহীত তথ্যাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন নিরুত্তাপ চিত্তে তাঁদের জ্ঞানের নখের যোগ্য না হয়েও, কোনো গবেষণা না করেও, কোনো জীবাশ্ম না দেখেও, কেবলমাত্র পবিত্র গ্রন্থের সাক্ষ্য মেনে বাংলাদেশী কোন প্রয়াত কবি বাংলার অধ্যাপক গত কয়েক বছর আগে টেলিভিশন অনুষ্ঠানে বিবর্তনবাদকে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস দেখান। কুসংস্কারের আচ্ছন্ন সমাজে সবই সম্ভব।

আমরা এখন জানি ডারউইনের আগে মহাকবি গ্যেটে বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষের মাথার খুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিবর্তনবাদের কথা বলেছিলেন। ডারউইনের বহুকাল আগে ভূতত্ত্ববিদ বাফুন তাঁর ('Natural History') প্রাকৃতিক ইতিহাসে-এ এই মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন যে, বর্তমান কালের মহাদেশ, পর্বতমালা, উপত্যকা প্রভৃতি এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নতুন কিছু সৃষ্টি হবে। অপর একজন ভূতত্ত্ববিদ হিউটন তাঁর পৃথিবী তত্ত্ব গ্রন্থে 'Theory of Earth' এবং গুগমিলার তাঁর 'Testimony of Rocks' গ্রন্থে উভয়েই বাফুনের মতকে সমর্থন দেন দৃঢ়ভাবে। কিন্তু ধর্মপ্রবক্তাদের কাছে বিজ্ঞান বড় নয়, বড় হল পবিত্র গ্রন্থে উদ্ধৃত মত। তাই প্যারিসের ধর্মতত্ত্ব ফ্যাকাল্টি বাফুনের মতবাদকে গির্জা ও ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে 'ফতোয়া' জারি করে, আর বাফুন চার্চের সাথে বিবাদে না গিয়ে প্রাণরক্ষায় নিজের মতবাদকে শিকায় তুলে রেখে পবিত্র গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার

করে নিয়েছিলেন। বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তাবিরোধী ফতোয়াবাজদের উত্তরসুরিরা কিন্তু আজও প্রবলভাবে উপস্থিত।

আধুনিক প্রত্নজীববিজ্ঞানী ও জীবাশ্মবিদদের মতে পৃথিবীতে জীবনের প্রথম বিকাশ ঘটেছিল প্রায় সাড়ে তিনশত কোটি বছর আগে। অর্থাৎ পৃথিবীর জন্মের একশ কোটি বছর পরে। এই আদি জীব ছিল এক কোষ বিশিষ্ট জীবাণুসম প্রাণী, এদের বলা হয় প্রোকারিয়টস (Prokaryots) অনেকটা আধুনিক ব্যাকটেরিয়ার মতো। এই এক কোষবিশিষ্ট প্রাণী থেকেই ধীরে ধীরে জাত হল বহুকোষ বিশিষ্ট প্রাণী বিবর্তনের পথ ধরে। দীর্ঘ পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক প্রতিটি শ্রেণীর প্রাণী এবং মানুষও এর বাইরে নয়। প্রাণী বা জীবনের সৃষ্টির পশ্চাতে ছিল বারটি উপাদান (factor); এর মধ্যে উল্লেখ্য হল– এক ধরনের প্রোটিন অর্থাৎ নিউক্লিয়টাইড (Nucleotide), নিউক্লিক এসিড (Nucleic acid), বিশেষ তাপমাত্রা এবং বিশেষ পরিবেশগত চাপ। এই চার উপাদানের মিলনে একদিন কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে উন্মেষ ঘটেছিল প্রথম প্রাণের অর্থাৎ অজৈব পদার্থ থেকে চৈতন্যময় জৈব পদার্থে উত্তরণ। যার নাম জীবন। ঘটল উল্লম্ফন। কিন্তু এইটুকু জানার মধ্যে জীববিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা থেমে থাকেনি। বংশগতি বিদ্যাচর্চার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন জীবনের রহস্য, তাকে নিয়ন্ত্রণের, পরিবর্তনের চাবি এখন মানুষের হাতে। মানুষ এখন জীবদেহে জিনসংক্রান্ত কর্মসূচির রহস্য উন্মোচন ও পরিবর্তন ঘটানোর অপরিসীম ক্ষমতা অর্জন করেছে, যে কর্মসূচি বস্তুত জীবন সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের ভাবতে অবাক লাগে যে, পৃথিবীর সবধরনের জীবনই অত্যাশ্চর্যভাবে সীমিত কতিপয় রাসায়নিক উপাদানের সংকেত ও কর্মসূচির উপর নির্ভরশীল। এই উপাদানগুলোর সাধারন নাম (জেনোম) : নিউক্লিয়োটাইড, এডেলিন, থাইমিন, সাইটেসিন ও গুয়ানিন (A.T.C.G)। এই চারটি প্রতীকী অক্ষরকে বলা হয় জীবনের বর্ণমালা। কি আশ্চর্য মাত্র এই চারটি অক্ষরের বিন্যাসক্রমের উপর নির্ভর করেই একটি গোলাপ ঝোপ বা একটি ভুট্টা গাছের সাথে একটি জীবাণু, হাস্তি বা মানুষের পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানবদেহের জিনগত কর্মসূচি এই চারটি উপাদানের ৩০০ কোটির সমন্বয়ে গঠিত, যা দেহের লক্ষকোটি কোষের অভ্যন্তরে কুণ্ডলী পাকিয়ে অবস্থানরত বিশাল এক অণুর রূপ নিয়েছে।

জীববিজ্ঞানীরা নিরূপণ করেছেন যে, আণবিক জীববিদ্যার সঙ্গতি থাকলে এই বিপুল বিষয় পাঠের ফল হিসেবে হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত এক একটি খণ্ডের মতো এক হাজার খণ্ড রচনা সম্ভব হত– যার প্রতিটি অক্ষর হল সেই জিন যার সংকেতের উপর নির্ভর করে জীবদেহের মৌল উপাদানগুলো বিন্যস্ত হয়ে থাকে। অতিসংবেদী রাসায়নিক যন্ত্রপাতির সহায়তায়– এই দীর্ঘদেহ কুণ্ডলীর দৈর্ঘ্য বরাবর সজ্জিত

নির্দেশকগুলো সনাক্ত করা যেতে পারে। এগুলোকে মাইল ফলকের সাথে তুলনা করা চলে এবং এদের মধ্যে বিভিন্ন রোগের জিনের অবস্থা নির্ধারণ সম্ভব। এভাবেই নির্ণয় করা সম্ভব যে, কোন ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ জিন বহন করছে কি না, অথবা কোনো শিশু প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে কিনা, যাতে করে সেসব ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। একই পদ্ধতি জটিলতর রোগ যেমন হৃদযন্ত্র বা রক্তপ্রবাহ, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র এমনকি ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আগামী দিনের চিকিৎসাবিজ্ঞান হবে ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞান। তখন রোগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী অধিকতর সুনিশ্চিত হবে, আর তাই রোগ নিরাময় অপেক্ষা রোগ-প্রতিরোধ সহজতর হবে। এমনকি বৃদ্ধকাল পর্যন্ত পূর্ণ ধীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে দীর্ঘ জীবন অর্জনও চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে অসম্ভব নাও হতে পারে। একটি বিষয়ে অবশ্য আমাদের সতর্ক থাকা বিশেষ প্রয়োজন– জীববিজ্ঞানের এই অফুরান সম্ভাবনাময় প্রয়োগের ক্ষণে জিনতত্ত্ববিদের এই অসীম শক্তি অর্জনের ফলে আমাদের এক ধরনের শঙ্কাও জাগে। অধিক ফলনের উদ্দেশ্যে একটি বৃক্ষ বা একটি প্রাণীর নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে পরিবর্তন সংঘটনের সফলতায় জীনবিজ্ঞানীরা প্রশংসিত হয়ে থাকেন, কিন্তু একই সাথে মানুষের মনে ভয় লেগেছে যে, হয়তো এই পদ্ধতির প্রয়োগ একদিন মানুষের ক্ষেত্রেও সম্ভব হতে পারে। পঞ্চাশের দশকে পদার্থবিজ্ঞানীরা যে নৈতিক সঙ্কটে পড়েছিলেন জিনবিজ্ঞনীরা আজ নতুন করে সে সঙ্কটে পড়েছেন– কোথায় টানবেন গবেষণার সীমারেখা। ফলাফলের দিকে তোয়াক্কা না রেখেই তাদের কি গবেষণা চালান ঠিক হবে, অথবা একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা তারা নিজেরাই বেধে নেবেন যা লঙ্ঘন করা হবে নৈতিকভাবে নিষিদ্ধ। অবশ্য জ্ঞানার্জনের কোনো সীমানা থাকতে পারে না, পারা উচিত নয়– এমনকি মানুষের জীনগত বংশগতির জ্ঞান সম্পর্কেও, তবে একথা ঠিক মানব বংশগতির পরিবর্তনের যে কোনো প্রয়াস নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। জিন প্রকৌশলীদের অবশ্য নৈতিকতার সীমায় ও তাদের কর্মতৎপরতার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ অবশ্য প্রযোজ্য। আমাদের অবশ্য একটি বিভেদ রেখা টানা উচিত হবে। কোনো রোগের নিরাময় বা প্রতিষেধকের জন্য রোগীর দেহে সুস্থ জিন স্থাপন কাঙ্ক্ষিত বিষয়; কিন্তু এ কর্ম সম্পাদনে নিযুক্ত প্রকৌশলীকে দায়িত্ববান হতে হবে, তাঁকে সুনিশ্চিত হতে হবে যে, প্রজনন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীর কোনো কোষে যেন জিন স্থাপন না করা হয়। অন্যদিকে প্রজনন কোষে বা নব্য ভ্রূণে জিন প্রতিস্থাপন গর্হিত কাজ, কারণ এর ফলাফল বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে এবং মানব-জীবনের উত্তরাধিকারগত চরিত্রে পরিবর্তন ঘটবে।

মানুষের জিনগত উত্তরাধিকার এমন এক সম্পদ যা সমগ্র বিশ্বমানবতার এখতিয়ারভুক্ত। এ নিয়ে ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া বা একে পরিবর্তিত করা অনুচিত ও

নীতি বিগর্হিত। এখানে কোনো হস্তক্ষেপ বিদ্যমান সামঞ্জস্য, সঙ্গতি ও ভারসাম্যের চমকপ্রদ রূপ নষ্ট করে দেবে। বিবর্তনের মধ্যমণি– এই মানব প্রজাতির সংরক্ষণে শুধু বিজ্ঞানী নয়, সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদদেরও যৌথ দায়িত্ব রয়েছে। আর আমাদের সকলকে এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে আঁতোয়া দ্য সেন্ট কেসুপেরির মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে : 'মানুষ বাস্তবিক একটি সত্য ভুলে গেছে। কিন্তু তুমি– তুমি কখনো তা ভুলো না। তুমি যা আয়ত্তে এনেছ তার দায় সর্বদাই তোমার।'

মানুষ বিজ্ঞানচর্চার দৌলতে এক অনন্ত সম্ভাবনার দ্বারে এসে পৌঁছেছে– একদিকে জড়-জগতের বিশ্বচিত্র অজানা নয়– এই বিশ্ব একদিন সৃষ্টি হয়েছিল, সৃষ্টি হয়েছিল সময়ের ইতিহাস-এ বিপুল মহৎ জগতে সুকঠিন নিশ্চয়তা আপেক্ষিক তত্ত্বের নিয়ম, অন্যদিকে কণাজগতের রহস্যময়তায় আজ মানুষের কাছে ধরা পড়েছে– এ জগতে রয়েছে অনিশ্চয়তার আশ্চর্যময় উপস্থিতি– কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়ম। জীববিজ্ঞান উন্মোচন করেছে সৃষ্টির রহস্য, বংশগতির পুরুষানুক্রমিক ধারাবাহিকতার নিয়ম ও রহস্য। অথচ ভাবতে অবাক লাগে এই মনুষ্যজাতির অঙ্গ হয়েও আমাদের কুপমণ্ডূক সমাজ অন্ধ, যে সমাজে মুক্তবুদ্ধির চর্চা পদে পদে বিঘ্নিত। যে সমাজ তসলিমা নাসরিনের মতো সাধারণ অথচ সাহসী রমণীর বক্তব্যে-লেখায় ভীত, তার বিচার চায়, বিচার চায় মানবতাবাদী কবীর চৌধুরীর, আমাদের কালের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমানের, বেগম রোকেয়ার পর নারীমুক্তির প্রধান শক্তি সেই মাতৃসমা বেগম সুফিয়া কামালকে নিবারণ করতে চেয়েছিল তাঁর কর্মতৎপরতা থেকে, তারা বোমা নিক্ষেপ করে ভয় দেখিয়েছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী উচ্চকণ্ঠ চিন্তাবিদ আহমদ শরীফকে। তারা নিষ্ঠুর চাপাতির আঘাতে হত্যা করতে চেয়েছিল ভাষাবিদ-সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদকে। বিজ্ঞান-অবিশ্বাসী মোহান্ধ সমাজে এই ঘটে।

পবিত্র গ্রন্থসমূহের উপকারিতা ও মানব সমাজে তার অবদান কেউ অস্বীকার করে না– কিন্তু ঐসব গ্রন্থে বিধৃত তথ্য ও সত্যই শেষ সত্য এবং জ্ঞানের পরম উৎস– একথা মেনে নিলে জ্ঞানচর্চার পথ অবরুদ্ধ হয়, সৃষ্টিশিলতার বিনাশ ঘটে। জ্যোতিষ্ক পদার্থবিদ মেঘনাথ সাহা তাঁর চমকপ্রদ তাপ আয়নায়ন তত্ত্ব আবিষ্কার করে বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন– সেই সময় তাঁর ঢাকাইয়া দেশবাসী জনৈক প্রাচীন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি কৌতূহলী হয়ে সাহাকে তার আবিষ্কারের কথা জানতে চেয়েছিলেন। সাহা পরম উৎসাহে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর তত্ত্বের মর্মকথা ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের কথা। সব শুনে পণ্ডিতপ্রবর মন্তব্য করেছিলেন– 'এ আর নতুন কি, এসব তথ্য তো বেদেই আছে।' আমাদের দেশে এখনও কি এ ধরনের পণ্ডিতের কমতি আছে? একজন বিখ্যাত

বিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবী তো অহরহ আবিষ্কার করছেন যে বিজ্ঞান ও দর্শন অনেক পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞানচর্চা ও ঘটনার মধ্য দিয়ে যে বিশাল তথ্য সম্ভার তৈরি হয়েছে– তার, সবই নাকি পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। অতএব আমাদের জ্ঞানচর্চার কি এবং কোন প্রয়োজন আছে– আমাদের কাজ কেবল কোনটি ধর্মসিদ্ধ আর কোনটি ধর্মসিদ্ধ নয় সে সম্পর্কে ফতোয়া দেয়া।

সংস্কারে আচ্ছন্ন আমাদের সমাজকে, মোহান্ধ মানুষকে কূপমণ্ডূকতার কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বিজ্ঞানের আলোতে আনার জন্য যখন মুক্তবুদ্ধির চেতনায় প্রদীপ্ত বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবাদীর সবচাইতে বেশি প্রয়োজন তখন উল্লিখিত শ্রেণীর পণ্ডিত প্রবরগণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তারা প্রগতির চক্রকে উল্টোদিকে ঘোরাতে ব্যস্ত। সংস্কারবাদ মানুষের পক্ষে অলৌকিকবাদের কৌশলকে ব্যাখ্যা করতে না পারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত ডিগ্রিধারী এইসব আত্মগর্বী বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানী এবং কৌশলকে আশ্রয় করে অতীন্দ্রিয়তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া বিজ্ঞানে শিক্ষিত এইসব মানুষই আমাদের সমাজে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ ও মানুষ গড়ার কাজে সবচেয়ে বড় বাধা।

আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত (২০০১) ও ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে পুনর্মুদ্রিত।

ইহজাগতিকতার প্রশ্ন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আরজ আলী মাতুব্বরকে আমরা স্মরণ করবো, অনেককাল ধরে। একটা কারণ তিনি ইহজাগতিক ছিলেন, সেই সময় ও সমাজে যেখানে ইহজাগতিকতার চর্চা ছিল ক্ষীণ। আরেকটি কারণ ইহজাগতিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে তিনি তথাকথিত আধ্যাত্মবাদের বিষয়ে কতগুলো সরল কিন্তু প্রয়োজনীয় এবং আপাত নিরীহ কিন্তু আসলে বিস্ফোরক প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন। প্রশ্নগুলো নতুন নয়, এ প্রশ্ন এমনকি আমাদের সমাজেও লোকের মনে জেগেছে। কিন্তু তিনি যেভাবে সাজিয়ে নিয়ে তাদেরকে জনসমক্ষে উপস্থিত করেছেন তেমন ঘটনা আগে ঘটেনি। জিজ্ঞাসার সাথে যুক্ত হয়েছিল সাহস। এইখানে তিনি অসাধারণ ছিলেন।

১

ইহজাগতিকতা থাকলে পারলৌকিকতাও থাকে, আলো থাকলে যেমন থাকে অন্ধকার, হয়তো বা বলা যাবে মাটির ওপরে আকাশ; কিন্তু ইহজাগতিকতা পারলৌকিকতার অনুগত নয়, অবজ্ঞা না করলেও উদাসীনতা যে দেখায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইহজাগতিকতার ভাবটা এই রকমের যে, পরলোক আছে কিনা জানি না, থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তাকে নিয়ে আমার উৎসাহ নেই; আমার জগৎ ইহজগৎ, সেখানেই আমার আগ্রহ। ইহকাল আছে, ইহকাল ইহজগৎ থেকেও ভিন্ন। কেননা কাল অনেক বিস্তীর্ণ জগতের তুলনায়।

অন্য অনেক কিছুর মত ইহজাগতিকতারও দু'টি দিক রয়েছে। একটি তাত্ত্বিক, একটি প্রায়োগিক। তাত্ত্বিক দিকটি দার্শনিক; প্রায়োগিক দিকটিতেও দার্শনিকতা রয়েছে, কিন্তু সেখানে জোরটা পড়ে জীবনযাপনের ওপরে। মেহনতি মানুষেরা যে-সব সময়ই ইহজাগতিক সেটা নিশ্চয়ই করে বলবার উপায় নই, কেননা প্ররোচনা থাকে আধ্যাত্মিক হবার। ইহজাগতিকতার শত্রুপক্ষ ওই প্ররোচনাটি দিয়ে থাকে,

নিজের স্বার্থে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের সাধারণ প্রবণতাটি হচ্ছে ইহজাগতিক হবার। না হয়ে উপায় নেই। কেননা তাকে তো পরিশ্রম করতে হয়। জগতের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে বাঁচতে হয়, প্রত্যক্ষ জগৎকে অবজ্ঞা করবে এমন সুযোগ তার জন্য খুবই কম।

আধ্যাত্মবাদ ইহজাগতিকতার বিপরীতপক্ষ বটে, কিন্তু ইহজাগতিকতার আসল শত্রু সেখানে নেই, রয়েছে অন্যত্র। আধ্যাত্মবাদ এই শত্রু দ্বারা ব্যবহৃত হয়। আকর্ষণ করে, মোহ গড়ে তোলে। আসল শত্রুটা তাহলে কে? সে হচ্ছে ভয়। সে দুর্বলতা আরজ আলী মাতুব্বরের ছিল না।

ইহজাগতিকতা নাস্তিকতা নয়। ইহজাগতিক হতে হল নাস্তিক হতে হবে এমন কোন দিব্যি নেই; যদিও ইহজাগতিকদের নাস্তিক বলার অভ্যাসটা কোথাও কোথাও রয়েছে। নাস্তিকতার কথাটা বলা হয় ইহজাগতিকদের ঘায়েল করার জন্য। বস্তুত নাস্তিক না হয়ে তো বটেই, এমনকি ধর্মবিশ্বাসী হয়েও ইহজাগতিক হওয়া যায়। ইহজাগতিকতার ইংরেজি হচ্ছে সেকুলারিজম। সেকুলারিজমের ধারণাটি আমরা আধুনিক ইউরোপ থেকে পেয়েছি, যদিও সেকুলারিজম ব্যাপারটা আমাদের এই অঞ্চলে আগেও ছিল, অনেক আগেই আধুনিক ইউরোপে ওই প্রত্যয়টি প্রতিষ্ঠার পেছনে যাঁর ভূমিকা বেশি করে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন ফ্রান্সিস বেকন। বেকন মোটেই নাস্তিক ছিলেন না, নাস্তিকতার বরঞ্চ বিরোধিতাও করেছেন তাঁর কিছু লেখাতে। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ইহজাগতিক ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল ঈশ্বর আছেন, তিনি থাকবেনও কিন্তু ঈশ্বরকে থাকতে দিতে হবে তাঁর নিজের জায়গায়, তাঁকে জাগতিক কাজকর্মের সাথে মিশিয়ে ফেলা চলবে না। ওই মিশিয়ে ফেলাটা ভুল এবং ক্ষতিকর। ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যাপার, আর জগৎ চলে প্রাকৃতিক নিয়মে। জগতের চালিকাশক্তি ধর্মবিশ্বাস নয়, নানা ধরনের দ্বন্দ্ব। বিশ্বাসের যেমন দরকার আছে, তেমনি যুক্তি-বুদ্ধিরও দরকার আছে, কিন্তু তাদের সংমিশ্রিত করে ভেজাল উৎপাদন খুবই অন্যায়। যাকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা বলি, তার মূল ব্যাপারটাও ওটাই; রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম মিশিয়ে না ফেলা।

ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, এই কথাটা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পরই জোরেশোরে বলা হয়েছে। কথাটা সত্য বটে আবার মিথ্যাও বটে। সত্য এই দিকে যে, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নাগরিকদের এই পরামর্শ দেয় না যে, তোমাদেরকে ধর্মহীন হতে হবে; কিন্তু তা বলে এমন কথাও বল না যে, রাষ্ট্র নিজে সকল ধর্মেরই চর্চা করবে কিংবা নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম চর্চায় উৎসাহিত করবে; রাষ্ট্র বরঞ্চ বলবে ধর্মচর্চার ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন আগ্রহ নেই, রাষ্ট্র নিজে একট ধর্মহীন প্রতিষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস নাগরিকদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্রের ওই ধর্মহীনতাকেই কিছুটা নম্রভাবে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষতা। ইহজাগতিকতা হুবহু

বস্তুতান্ত্রিকতা নয়, কিন্তু বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে খুব বেশি দূরে তাও নয়।

জগৎ সত্য। সে অন্তত বাস্তবিক। কিন্তু এই বাস্তবিক সত্যটাকে খাটো করে দিতে চায় ইহজাগতিক শত্রুপক্ষ। তারা ধর্মকে টেনে নিয়ে আসে সামনে। ধর্মবিশ্বাসের পেছনে একটা ভয় থাকে। পরকালের ভয় । অজানাকে ভয়। ওই ভয়টাকেই কাজে লাগানো হয়। ইহজাগতিকতার যারা বিরুদ্ধপক্ষ তারা ওই ভয়টাকেই কাজে লাগায়। তারা নিজেরা অবশ্য ভীতু। ভয় থেকেই ইহজাগতিকতার বিরুদ্ধে তারা কাজ করে। ভয় থাকে পরকালের। কিন্তু তার চেয়েও বড় হয় স্বার্থহানির। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সঙ্গে যাদের জাগতিক স্বার্থ জড়িত, তারা ধর্মকে ব্যবহার করে থাকে নিজেদের শাসন শোষণ নিপীড়ন তথা কায়েমী স্বার্থরক্ষার যে চেষ্টা তার আচ্ছাদন হিসেবে। ঈশ্বরই এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে কেউ বড় হবে কেউ ছোট। এটাই ধর্মের বিধান বলে তারা প্রচার করে। ইহজাগতিকতা ধর্মের আচ্ছাদনটি যদি সরিয়ে নেয় তাহলে কায়েমি স্বার্থওয়ালাদের কদর্য কাজটা উন্মোচিত হয়ে জনসমক্ষে এসে যাবে, এই ভয়ে তারা ইহজাগতিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। দরকার হলে যারা ইহজাগতিক তাদের জব্দ করে। হত্যাও করেছে, ইতিহাসে নজির আছে।

সাধারণ মানুষ যে ধর্মের কাছে যায় তা কেবল ভয়ে নয়, ভরসাতেও। এই জগতে বিচার নেই, পরজগতে তারা বিচার আশা করে। জগতে নির্ভর করা যায় এমন শক্তি নেই, মানুষ তাই পরজগতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কায়েমী স্বার্থের রক্ষক ও তাদের চ্যালাচামুণ্ডারা মানুষের এই ধর্মবাদিতাকেও ব্যবহার করে থাকে নিজেদের কায়েমী স্বার্থে। ইহজাগতিকতার শত্রুপক্ষ মুখে যাই বলুক না কেন, কার্যক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত ইহজাগতিক। বিষয়সচেতন।

ইহজাগতিকতার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের রক্ষকদের দ্বন্দ্বটা খুবই স্বাভাবিক। বঞ্চনাকারীরা বঞ্চিতদের সঙ্গে শত্রুতা করবেই।

কিন্তু পরিহাসের বিষয় এটা যে, বঞ্চনাকারীরা বঞ্চিতদেরকে তাদের পক্ষে নিয়ে নেয়। এই নেবার ক্ষেত্রে ধর্ম খুবই উপকারে আসে তাদের জন্য।

ইহজাগতিকদেরকে ধর্মবিরাধী হিসেবে দাঁড় করানো হয়, বলা হয় এরা জড়বাদী, বলা হয় এরা নাস্তিক। চেষ্টা করা হয় রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলবার। ভারত একটি ইহজাগতিক রাষ্ট্র, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়ে সেখানে মৌলবাদীরা চেষ্টা করছে রাষ্ট্রকে ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করতে। মধ্যপ্রাচ্যে কোন কোন দেশে ধর্ম ও রাষ্ট্র এক হয়ে গেছে। কেবল যে সৌদি আরবে তা নয়, ইসরাইলেও। ইসরাইলেই বরঞ্চ বেশি পরিমাণে ঘটেছে ব্যাপারটা। ওই রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ই ঘটেছে একটি ধর্মীয় মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে, তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার লড়াই লড়ছে যে প্যালেস্টানীয় জনগণ তাদের মধ্যে বরঞ্চ ইসলাম ছাড়াও অন্য

ধর্মের লোক রয়েছে। খ্রিস্টানরা আছে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের দাবিদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের একনিষ্ঠ সমর্থক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট নামে ছোট কিন্তু আস্ফালনে অনেক বড়; মুসলিম মৌলবাদীরা মনে করছে তারা জেহাদে আছে। দু'পক্ষই মৌলবাদী। এবং দুয়ে মিলে মানুষের সভ্যতাকে পেছনের দিকে ঠেলছে। এ সত্য তো ভুলবার উপায় নেই যে, সভ্যতা একটি ইহজাগতিক ব্যাপার, এবং তার অগ্রগতিতে অতীতে ধর্মের একটি প্রগতিশীল ভূমিকাও ছিল, কেননা ধর্ম তখন বিদ্রোহ করেছে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। খ্রিষ্ট ও ইসলাম উভয় ধর্মই এসেছিল নিপীড়িত মানুষের অগ্রাভিযানের অঙ্গীকার নিয়ে। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদীরা উভয় ধর্মকে ব্যবহার করেছে নিজেদের নোংরা স্বার্থে এবং এখন দুই ধর্মের মধ্যে লড়াই বাধাবার তালে আছে। ধর্মের আধ্যাত্মিক স্বার্থে নয়, নিজেদের বস্তুগত স্বার্থে। ফলে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময় থেকে ইহজাগতিকতার যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল তা নতুন করে বিঘ্নিত হচ্ছে।

ইহজাগতিকতার আরও একটি শত্রু রয়েছে। সেটি হল মানুষে মানুষে বৈষম্য। কায়েমী স্বার্থওয়ালারা নিজেদেরকে ধনী করতে গিয়ে অধিকাংশ মানুষকে গরিব করে রাখে। এই গরিব মানুষেরা নির্যাতিত হয়, তারা বিচার পায় না, ভরসা পায় না, তখন তারা ধর্মের কাছে যায়। নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পথ দুটি। একটি গেছে বামে, অন্যটি ডানে; বামপন্থীরা ইহজাগতিক, তারা গণতন্ত্রী; ডানপন্থীদের অধিকাংশই ধর্মীয় মৌলবাদী। বৈষম্যমূলক রাষ্ট্র ইহজাগতিকদের উপর পীড়ন চালায়, ফলে সুবিধা হয় ধর্মীয় মৌলবাদীদের। তারা প্রধান প্রতিবাদকারী হয়ে উঠতে চায়। বিশ্বজুড়ে আজ এই ঘটনাই ঘটছে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ছিল ইহজাগতিক। পুঁজিবাদী বিশ্বও নিজেকে ইহজাগতিক বলে প্রচার করে। কিন্তু দুয়ের মধ্যে মৌলিক ব্যবধান রয়েছে। প্রথম কথা হল এই যে, পুঁজিবাদীরা দারিদ্র্য সৃষ্টি করে; আর দরিদ্র মানুষ বাধ্য হয় ধর্মের কাছে ছুটতে। দ্বিতীয় সত্য এটা যে, পুঁজিবাদীরা ভোগবাদী, দরিদ্র বঞ্চিত মানুষ নিজেদেরকে ভোগ থেকে বঞ্চিত দেখে পরকালে স্বর্গ পাবে এই আশার মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজে। তৃতীয়ত, পুঁজিবাদীরা মৌলবাদীদেরকে সরাসরি উৎসাহিত করে ডানপন্থী হতে; আর ডানদিকে এগুলে মৌলবাদী হতে যে বিলম্ব ঘটে তা নয়।

২

আমাদের এই উপমহাদেশে মানুষজন খুবই আধ্যাত্মিক বলে একটা রটনা আছে। এই রটনা বিশেষভাবে জোরদার হয়েছে ইংরেজ কর্তৃক ভারত দখলের পর থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর পর থেকেই দেখা গেছে ভারতবর্ষীয়রা তাদের ধর্মীয় উত্তরাধিকার নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেছে। একাধিক কারণে এটা ঘটেছে। প্রথমত

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অভিমান তৈরি হয়েছে। নতুন শাসকরা তাকে নানাভাবে পীড়িত করছে, ফলে তার মধ্যে একটা আগ্রহ জন্মেছে দাঁড়াবার জায়গা খুঁজবার। প্রশাসন ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছুই বিদেশীরা দখল করে নিয়েছে, দেশী মানুষ এখন যায় কোথায়? গেছে ধর্মের কাছে। ইংরেজদের মধ্যে মিশনারীদেরকে দেখা যাচ্ছিল, যারা স্থানীয় মানুষদের ধর্মান্তরিত করার উদ্যোগ নিচ্ছিল। সেটাও একটা কারণ নিজেদের ধর্মকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে রাখার পেছনে। উলটো দিকে আবার এটাও সত্য যে, উইলিয়াম জোনস ও ম্যাক্সমূলারের মতো প্রাচ্যবিদেরা প্রাচ্যে যে আধ্যাত্মিক মহত্বের সন্ধান পেয়েছেন, তার প্রচারও স্থানীয় বিদ্বজ্জনকে উৎসাহিত করেছে; তাঁরা আধ্যাত্মবাদের সন্ধানে ধর্মের কাছে চলে গেছেন। রাধাকৃষ্ণণের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরা গর্ব করে বলেছেন যে, ভারতবর্ষ যে সময়ের ধ্বংসলীলা ও ইতিহাসের দুর্ঘটনা সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে তার কারণ রাজনৈতিক বা সামাজিক নয়, কারণ হচ্ছে ভারতবর্ষের গভীর আধ্যাত্মিকতা।

অথচ বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, ভারতীয় চিন্তার ঐতিহ্যে ইহজাগতিকতা তো বটেই, এমনকি বস্তুবাদিতাও খুব বড় সত্য। যে-বেদের আধ্যাত্মিকতার উচ্চকণ্ঠ প্রশংসা করা হয়, তাতে আধ্যাত্মিকতা নয়, ইহজাগতিকতাই প্রধান। বেদে দেবতাদের সঙ্গে মানুষের যে-সম্পর্ক সেটা কেবল ভক্তির নয়, পারস্পরিক আদান প্রদানেরও বটে। গ্রীক দেবদেবীর সঙ্গে সে দেশের মানুষের সম্পর্ক থেকে এটা কিছুটা ভিন্ন রকমের। গ্রীসে দেবতা ও মানুষ পরস্পরের বন্ধুর মতো, যোগাযোগটা বেশ জানাশোনার। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যাপারটা সরাসরি দেয়া নেয়ার। দেবতাদের কাছে মানুষ চায় সম্পদ, সম্পত্তি, নিরাপত্তার মতো জিনিস যা দেবতারা দিতে পারে। প্রতিদানে দেবতারা মানুষের কাছে আশা করে খাদ্য, পানীয়। যেমন ধরা যাক, দেবরাজ ইন্দ্রের কথা। তিনি সোমরসের বিশেষ ভক্ত। তার পূজারীরা ওই রস সরবরাহ করে এবং বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে উপকার প্রত্যাশা করে থাকে।

গ্রীক দার্শনিকেরা দর্শনের চর্চা করতেন জীবন ও জগতের রহস্য বুঝবার জন্য। ভারতীয় দর্শনের বিকাশ ভিন্ন কারণে। কারণটা হচ্ছে দুঃখদুর্দশা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে সূচনায় ভারতবর্ষের দার্শনিকতায় আধ্যাত্মিকতা ছিল না, ছিল যা তা হল প্রবল ইহজাগতিকতা। ইহজগতের প্রয়োজনেই মানুষ দেবদেবীর কৃপা প্রার্থী হয়েছে; কোন তত্ত্বগত প্রয়োজনে নয়। সেজন্য দেখা যায় প্রার্থনায় ঘোড়া ও গরুর কথা আছে। গাভী যখন তার বাছুরদের উদ্দেশ্যে ডাক দেয়, তখন যে ধ্বনি তৈরি হয়, ঋগ্বেদে তার অতি উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে; ওই ধ্বনি মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গীতের মতো মধুর বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে বৃষ্টি, দীর্ঘজীবন, যৌবন, রোগের প্রতিকার, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, সব কিছুর

জন্যই আন্তরিক প্রার্থনা শোনা যায়। বারবার বলা হচ্ছে আমাদের ধন ও পশু বর্ধিত হোক, আমাদের শত্রুর বিনাশ ঘটুক, আমাদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাক। আমাদের কথাই আসছে, আমার কথা না-এসে; যা থেকে বোঝা যায় যে ব্যক্তি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেনি, বিচ্ছিন্ন করার মত অবস্থা তার নয়। তাকে যূথবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়, তার আশেপাশে নিরাপত্তার ভীষণ অভাব, এবং দৈব-নির্ভরতা ভিন্ন তার উপায় নেই। গ্রীক দার্শনিকেরা সুখের অভাবে ছিলেন না, দর্শনের নানা কৌতূহল ও আলোচনা করার মত জাগতিক সুবিধা তারা ভোগ করতেন; বেদের রচয়িতার জীবনে যার অভাব ছিল। বেদের সঙ্গে সঙ্গীতময়তা খুবই সরল, আন্তরিক এবং শিল্পমূল্য উচ্চ পর্যায়ের। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে ওই সঙ্গীতকে টিকাভাষ্যে জর্জরিত ও দুর্বোধ্য করতে চেয়েছে, এবং সেই সঙ্গে শূদ্রের জন্য তার পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

বেদে দেবদেবীর সংখ্যা অনেক, তাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে, আধ্যাত্মিক কারণে নয়, দেবদেবীর স্বার্থে নয়, মানুষের স্বার্থে। প্রকৃতির নানারূপকে দেবদেবীতে পরিণত করা হয়েছে সত্য, কিন্তু তাতে কোন আধ্যাত্মিকতা দেখা দেয়নি। ব্যাপারটা রয়ে গেছে বাস্তবিক এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়। সেখান থেকেই উৎসারিত, এবং সে কারণে অমন স্বাভাবিক ও সুন্দর। আধ্যাত্মিকতার হস্তক্ষেপ ব্রাহ্মণদের অবদান।

এ প্রশ্নটা তো খুবই স্বাভাবিক, এবং সেটা উঠেছেও যে, প্রাচীন ভারত যদি অতই আধ্যাত্মিক হবে, তবে মানব সভ্যতায় সে অমন বড় বড় অবদান যোগ করলো কি করে। সভ্যতা তো সর্বদাই ইহজাগতিক, আর আধ্যাত্মিকতা বাস্তববাদিতার উপর নির্ভরশীল। আধ্যাত্মিকতা বাস্তববাদিতার জন্ম দেয়নি, বরঞ্চ উলটোটাই ঘটেছে। প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য, রসায়ন, গণিত, চিকিৎসা, ভেষজশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, বিশ্ববিদ্যালয় এসব গড়ে উঠলো কিভাবে, মানুষ যদি জগতকে উপেক্ষা করে পরলোকবাদী হয়ে থাকে? পরলোকবাদিতায় গড়ে ওঠা সম্ভব নয়; এবং তা ঘটেওনি। আধ্যাত্মিকতা প্রচারের ফলে আস্কারা পেয়েছে। বাস্তবতা ছিল ভিন্ন প্রকারের।

রাধাকৃষ্ণাণের মতো ভাববাদী দার্শনিকেরা মনে করেন যে, প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে দার্শনিকেরা যে ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে সেই আশাই বাস্তবায়িত হয়েছিল প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায়। কেননা ব্রাহ্মণেরা ছিলেন দার্শনিক এবং তাঁরাই ছিলেন রাষ্ট্র ও সমাজের নির্দেশক। বক্তব্যটি একাংশে সত্য, অপরাংশে নয়। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণেরাই কর্তা হয়েছিলেন। তাঁরাই কর্তৃত্ব করতেন। সমাজে নির্মম শ্রেণী বিভাজন কার্যকর ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরা একদিকে অন্যদিকে শ্রমজীবী অধিকাংশ মানুষ, যারা শূদ্র বলে চিহ্নিত।

ব্রাহ্মণেরা শ্রম করতো না শূদ্রের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বস্তুত ব্রাহ্মণেরা যে কিছুতেই কৃষিকার্যে লিপ্ত হবেন না, এই নির্দেশ শাস্ত্রে বারবার দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে শূদ্রদের কাজই হচ্ছে শ্রম করা। তারা সেজন্যই জন্মেছে। আর ওই যে শ্রেণী বিভাজন, তাকে একটি ধর্মীয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও দিয়ে দেয়া হয়েছিল। যেটা ছিল অনপনেয়। বলা হয়েছিল যে, শূদ্ররা শূদ্র হয়ে জন্মেছে তা এমনি এমনি নয়, আগের জীবনের কর্মদোষে বটে। তাই এ জীবনে তাদেরকে শ্রম করতে হবে। করলে হয়তোবা পরজন্মে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু কেবল শ্রমে কুলাবে না, সেবা করাও চাই। সেবা করতে হবে ব্রাহ্মণকে। সেটাও শূদ্রের বিধিলিপি; আগের জীবনে যে পাপ করেছে তার প্রতিফল। সেবা দিয়েই ওই পাপবন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব, বিচ্যুত হলে পরবর্তী জীবনেও ওই কাজই করতে হবে। শ্রেণীবিভাজন অভিনব কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু প্রাচীন ভারতে আধ্যাত্মবাদী ব্রাহ্মণেরা যা করেছিলেন তা হলো ওই বিভাজনকে ধর্মীয় রূপদান।

প্লেটোর দার্শনিকরা শ্রম করবেন না; শ্রমের দায়িত্ব শ্রমজীবীর। প্লেটোর সমাজে দাস ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, এবং দার্শনিকরা ওই শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে বসে দর্শনের চর্চা করার সুযোগ পেতেন। সেটা ছিল একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। দার্শনিকেরা ওই ব্যবস্থাকে রক্ষা করার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। বিপ্লব ঠেকানো প্লেটো, এ্যারিস্টটল উভয়েরই মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল; রাষ্ট্রকেই তারা প্রধান করেছেন, ব্যক্তিকে নয়। অত করেও এ্যারিস্টটল শাসকদের ক্রোধ থেকে মুক্ত হতে পারেননি, মৃত্যুর পূর্বে তাকে এথেন্স ছেড়ে পালাতে হয়েছিল প্রাণভয়ে। প্লেটো এমন বিপদে পড়েননি, কারণ তিনি কাল্পনিক রাষ্ট্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, বাস্তবিক রাষ্ট্রের সংবিধান তৈরির দায়িত্ব নেননি, এ্যারিস্টটল যেমনটা নিয়েছিলেন।

সাদৃশ্য আছে, কিন্তু গ্রীক দার্শনিকদের সঙ্গে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের পার্থক্যও ছিল মৌলিক। গ্রীক দার্শনিকেরা নতুন নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন, ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল পুরাতন বিদ্যার টিকাভাষ্য ইত্যাদি রচনা করা; যা ছিল জীবন্ত তাকে তারা মন্ত্রে পরিণত করছেন, শব্দ মুখ্য হয়ে উঠেছে বস্তুর তুলনায়। ব্রাহ্মণেরা নিজেদের স্বার্থকে প্রধান করেছেন, গ্রীক দার্শনিকেরা যা করেননি। গ্রীক দার্শনিকদের ভিতর ভাববাদিতা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু বস্তুবাদিতাও ছিল, ছিল ইহজাগতিকতা। ভারতীয় দর্শনেও বস্তুবাদিতা ছিল, কিন্তু ওই দুই উপাদানকে ব্রাহ্মণেরা কখনই গুরুত্বপূর্ণ হতে দেননি, চেষ্টা করেছেন বরঞ্চ অপদস্থ করে দিতে। যাতে করে সাধারণ মানুষ ওইসব বিষয়ে উৎসাহী না হয়, প্রশ্ন না তোলে, অসঙ্গতি দেখে বিদ্রোহ না করে বসে। বিদ্রোহ প্লেটো ও এ্যারিস্টটলও চাননি, কিন্তু তাদের আয়োজনটা ছিল ইহজাগতিক, ব্রাহ্মণেরা ব্যবস্থা করেছেন তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার। ব্রাহ্মণের নিজেরা কিন্তু বেশ ইহজাগতিক ছিলেন, উৎপাদন করতেন না, পূজা-অর্চনার উপর

নির্ভর করতেন, এবং ভোগের ব্যাপারে যে উৎসাহহীন ছিলেন, তাও নয়।

ভারতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিদ্যা অগ্রসর ছিল। ওই জ্ঞান মোটেই আধ্যাত্মিক ছিল না। ছিল পরিপূর্ণরূপে ইহজাগতিক ও বস্তুবাদী।

কিন্তু বিজ্ঞান কেন এগুলো না, চিকিৎসা বিদ্যা কেন পিছিয়ে গেল? গেল ইহজাগতিকতার সাথে ব্রাহ্মণদের শত্রুতার কারণে। শত্রুতাটা ছিল প্রধানত মতাদর্শিক। প্রচার করা হয়েছিল জগৎ মিথ্যা, মায়া। তাই যদি হয়, তাহলে বিজ্ঞান এগুবে কি করে?

বিজ্ঞান তো মায়া নয়, সে তো বস্তুবাদী। চিকিৎসার ক্ষেত্রে একই রকমের ঘটনা ঘটেছে। রোগের নিরাময় দেবতারা করবেন, করবেন পূজা-অর্চনার বিনিময়ে, এবং পূজা-অর্চনা ঘটবে ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতায়, ব্যবস্থাটা ছিল এই রকমের। মন্ত্র অনেক জরুরি ছিল ভেষজ ঔষধের তুলনায়। প্রচারণা ছিল এটাই। মতাদর্শিকভাবে শ্রমকে হেয় জ্ঞান করা হয়েছে। শ্রম হচ্ছে অভিশাপ, শ্রম করবে শূদ্র। সব ধরনের শ্রমকেই ইতর লোকের কাজ বলা হয়েছে। চাষা, কামার, কুমার, ডোম, মেথর কারো শ্রমই মর্যাদাবান নয়। বিজ্ঞানীদের কাজও ছিল মর্যাদাহীন, চিকিৎসকের কাজও তাই। কর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন আদর্শস্থানীয়। লোকে তাদের মত পরশ্রমজীবী হতে চেয়েছে পরিশ্রমজীবী না হয়ে। বিজ্ঞান রূপকথা নয়, সে প্রায়োগিক। বিজ্ঞানকে প্রযাগ করতে পারে তারাই যারা উৎপাদনে যুক্ত; কিন্তু ভারতবর্ষে উৎপাদনে যারা যুক্ত তাদের খাটানো হয়েছে ঘানির বলদ হিসেবে; তারা কি করে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করবে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে নব নব উদ্ভাবনের পথে? প্রয়োজনই উদ্ভাবনের জন্ম দেয়, সে প্রয়োজনটা তৈরি হয়নি। বিজ্ঞানের জায়গায় এসেছে ঈশ্বর নির্ভরতা, পরলোক বড় হয়ে উঠতে চেয়েছে ইহলোককে পিছনে ঠেলে।

আমাদের সংস্কৃতিতে এখনো দেখা যায় যে, বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মৌলবাদী হন; এর প্রধান কারণ ওই বস্তু জগৎবিচ্ছিন্নতা। বিজ্ঞান তাদের কাছে ঐন্দ্রজালিক বস্তুতে পরিণত হয়। সেখানে অংক থাকে, অংক মন্ত্রের মতো ভাববাদী, বস্তুবাদী না হয়ে। মৌলবাদী বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা দেখেন এবং ভাবেন এ সবই একটি অনির্বাচনীয় পরম সত্তার বহিঃপ্রকাশ, সবটাই যে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণের মধ্য দিয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে সেই সাধারণ সত্যটি তাঁরা ভুলে যান।

ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রাচীন ভারতে দার্শনিক অভ্যুত্থান ঘটেছে, যার সামাজিক তাৎপর্য মোটেই সামান্য ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ও বিকাশ খুবই বড় একটি ঘটনা। বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের শাসন অনুশাসন মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তারা নাস্তিক ছিলেন, ঈশ্বর কিংবা সর্গে বিশ্বাস করতেন না; যেটা মস্তবড় ব্যাপার। কিন্তু বৌদ্ধরা তাই বলে যে পুরোপুরি ইহজাগতিক ছিলেন তাও নয়। তাঁরা কর্মফল

ও জন্মচক্র মানতেন। ব্রাহ্মণদের মত মোক্ষ চাইতেন না বটে, কিন্তু নির্বাণ চাইতেন। নির্বাণ হচ্ছে নিভে যাওয়া, নির্বাপিত হওয়া। এই যে নির্বাপিত হতে চাওয়া, এর মধ্যে ইহজগৎবিমুখতা ছিল। জীবনকে তারা দুর্ভোগ হিসেবে দেখতেন এবং জীবনের প্রতি আসক্ত হওয়াটাকে চূড়ান্ত ভ্রম মনে করতেন। তাঁরা নাস্তিক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু জীবনবিমুখও ছিলেন। জীবনবিমুখদের পক্ষে ইহজাগতিক হওয়া কঠিন। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের বিতাড়িত করেছে বটে, কিন্তু বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার হিসবে মানতে অসুবিধাবোধ করেনি।

প্রাচীন ভারতের পুরোপুরি ইহজাগতিকরা চার্বাক নামে পরিচিত। এঁরা একাধারে নাস্তিক, ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী এবং জগতের প্রতি আসক্ত। ভারতীয় দার্শনিক ধারায় এঁরাই ছিলেন সর্বাধিক পরিমাণ বস্তুবাদী। একেবারেই আপোষহীন।

চার্বাকরা চার্বাক নাম কেন পেলেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ আছেন যারা এঁদের অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। কিন্তু চার্বাকরা যে ছিলেন তার বহু প্রমাণ আছে। তবে তাঁদের নিজেদের রচনা পাওয়া যায় না, কারণ ব্রাহ্মণদের ক্রোধ। ব্রাহ্মণরা তাঁদের নাস্তিক, পাষণ্ড, ধূর্ত, কূটতার্কিক, ছেলেমানুষ ইত্যাদি নানান অভিধায় ভূষিত করেছেন, তিরস্কার করার অভিপ্রায়ে। বোঝা যায় খুবই ক্ষিপ্ত ছিলেন। অবজ্ঞা করে জব্দ করা যায়নি, তাই আক্রমণ করা হয়েছে। চার্বাকদের গ্রন্থ নয় কেবল, সম্পত্তি ও জীবন উভয়েই বিপন্ন ছিল বলে ধারণা করার কারণ রয়েছে। চার্বাকদের নামকরণ সম্বন্ধে ঠাট্টাচ্ছলে বলা হয়েছে যে, তারা চারুভাষণ করতো, তাই চার্বাক ছিল। চারুভাষণ অর্থ এ ক্ষেত্রে কটূভাষণই মনে হয়। চার্বাকরা সবকিছুই চর্বণ করতো, অনেকটা ছাগলের মতো, তাই চার্বাক, এমন কথাও বলা হয়েছে। চার্বাকদের আরেক নাক লোকায়ত। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এ নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং তিনি এ লোকায়ত নামকরণ পছন্দ করেন। চার্বাক দর্শন আসলে লোকায়ত দর্শনই। একাধিক অর্থে। এ ছিল লোকদের আয়ত্তে। এই দর্শনে রয়েছে সাধারণ মানুষের ধারণা, জীবন ও জগৎ বিষয়ে। অন্যদিকে আবার সে ছিল ইহজাগতিক। কেবল ইহজাগতিক নয়, পরিপূর্ণরূপে বস্তুবাদী।

চার্বাকরা ব্রাহ্মণদের আধিপত্য মানে না। ব্রাহ্মণদের আধ্যাত্মিকতাকে মনে করে প্রতারণা। ব্রাহ্মণেরা শ্রম করে না, অন্যেরটা খায়, তাই পূজা-অর্চনা প্রথা অনুষ্ঠানকে উচ্চে তুলে ধরে। ওই পথেই তাদের জীবিকা অর্জিত হয়। তারা যে শোষক শ্রেণীর অংশ, এবং শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার কারিগর, এই ধারণাটা সম্ভবত তখনও আসেনি, তাই কেবল প্রতারকই বলা হয়েছে।

চার্বাকরা বৌদ্ধদের মত নাস্তিক বটে, স্বর্গ নরক মানে না; তবে তারা আরও একধাপ অগ্রসর, কেননা কর্মফলকেও তারা মিথ্যা মনে করে। জন্মান্তর নেই।

মৃত্যুর পরে দেহ যখন পুড়ে ছাই হবে তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা আত্মা বলে কিছু নেই। হ্যা চৈতন্য আছে, কিন্তু চৈতন্যর জন্য আত্মার প্রয়োজন নেই। মাটি, আগুন, পানি ও বায়ুর সংমিশ্রণে আমাদের দেহ তৈরি হয় এবং চৈতন্য ওই সংমিশ্রণেরই ফল। পাপ পুণ্য কর্মফল পুনর্জন্ম এসবই ধূর্ত ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যাচার। যা প্রত্যক্ষ শুধু তাই সত্য, এই তাদের বিশ্বাস। শরীর থাকলে যেমন প্রাণ থাকে, তেমনি চৈতন্যও থাকে। সুখ নিজেই মূল্যবান; এবং সেই সুখ ইহকালেই পাওয়া যাবে, পরকালের জন্য অপেক্ষা করাটা মূর্খতা, কেননা তার তো কোন অস্তিত্বই নেই আসলে। দৈহিক আনন্দই ঈপ্সিত। যে জন্য বলা হয় যে, খাও দাও ফূর্তি করো, ধার করে হলেও ঘি কেনো, এটাই তাদের নীতি ছিল। যেন ফূর্তিবাজের দল।

চার্বাকদের বক্তব্যকে এভাবে ফূর্তিবাজি বলে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। কেননা সরাসরি তাদের গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যরা তাদের সম্পর্কে যা বলেছে তা থেকেই তাদের বিষয়ে ধারণা করতে হয়ছে। তাদের বক্তব্যের খণ্ডন পাওয়া যায়, মূল বক্তব্য পাওয়া যায় না। তবে বুঝতে কষ্ট নেই যে, তারা বিদ্রোহী ছিলেন। রাজবিদ্রোহী নয় হয়তো, কিন্তু সমাজবিদ্রোহী অবশ্যই এবং বিদ্রোহে যে প্রবলতা থাকে সেটা সম্ভবত ছিল তাদের মধ্যেও, অথবা হতে পারে যে, তাদের কথাকে অতিশয়োক্তির সাহায্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে, ব্রাহ্মণরাই করেছেন, চার্বাকদের যুক্তিহীন বলে চিহ্নিত করার অভিপ্রায়ে।

এই লোকায়তিকদের অপরাধটা তো সামান্য নয়। এরা বেদ মানে না, এবং শুধু যে না মেনে ক্ষান্ত হয় তা নয়, বলে যে বেদ মিথ্যা, স্ববিরোধী এবং অতিরঞ্জিত। আরো বড় মুশকিল এই যে, এদের কথা সাধারণ লোকে বিশ্বাস করতো। কেননা কথাগুলো সরল। ব্রাহ্মণেরা যে ভণ্ড ও প্রতারক, তারা যে স্মৃতি শ্রুতির ব্যবসা করে এটা তো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, লোকে স্বচক্ষে দেখে।

তাছাড়া সাধারণ মানুষ হিংসুটে, তারা ব্রাহ্মণদের সুখ সহ্য করতে পারে না। চার্বাকরা তাই বিপজ্জনক বৈকি। তারা ব্যক্তির নয়, গোটা ব্যবস্থার সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত। তাই ব্যবস্থাটা একত্রযোগে তাদেরকে পর্যুদস্ত করতে চেয়েছে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে চার্বাক নামে এক রাক্ষসের উল্লেখ রয়েছে। লোকায়তের উল্লেখ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও পাওয়া যাবে। পৌরাণিক উপাখ্যানে বলা হয়েছে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা সুবিধা করতে পারছে না দেখে দেবগুরু বৃহস্পতি এক বুদ্ধি বের করেছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে অসুরদের সঙ্গে মিশে গেছেন এবং তাদেরকে চার্বাক দর্শন অর্থাৎ ফূর্তি করার মতবাদ শিখিয়েছেন। এতে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে। অসুররা শক্তি হারিয়েছে এবং দেবতারা জয়ী হয়েছে। মনে হচ্ছে এখানে দেবতা বলতে ব্রাহ্মণকে বুঝতে হবে, অসুর বলতে বুঝতে হবে শূদ্রকে।

রামায়ণে রাম ভ্রাতা ভরতকে রাজকার্য পরিচালনার বিষয়ে নানাবিধ মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। একটা পরামর্শ ছিল এই যে, ভরত যেন লোকায়ত ব্রাহ্মণদের সেবা না করেন। লোকায়তিকরা ধর্মশাস্ত্র অবজ্ঞা করে, আর অর্থহীন বচসায় লিপ্ত হয়। রাম আদর্শ পুরুষ, তিনি ভদ্র ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু যা বলেছেন তা অত্যন্ত দৃঢ়। চার্বাকরা মূর্খ, তারা বচসাপ্রিয় এবং নাস্তিক। নাস্তিক অর্থ অবিশ্বাসী, চার্বাকরা বেদ-ব্রাহ্মণে বিশ্বাস করে না। তাদের ওই নাস্তিকতার অর্থ দাঁড়ায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যে-বিদ্রোহ কোন মতেই সমর্থনীয় নয়, প্রশ্রয় দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

এসব গেল নেতিবাচক বিরোধিতা। ইহজাগতিকতার বিরুদ্ধে বিকল্প দাঁড় করিয়েও বিরোধিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই বিকল্প হচ্ছে মায়াবাদ। শঙ্করাচার্য যা অত্যন্ত বেগবান উপায়ে প্রচার করেছেন।

ইহজাগতিকতার সঙ্গে শত্রুতা তাই নতুন কিছু নয়। এই শত্রুতা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুবিধাভোগী মানুষেরা করেছে। ব্যক্তিও করেছে। দুই কারণে। একটি হচ্ছে মতাদর্শিক পরিমণ্ডলে আধিপত্য রক্ষার অভিপ্রায়ে। অন্যটি হচ্ছে ব্যক্তিগত ভীতি। ইহকালে তো কোন সুখ নেই, পরকালেও যদি তা না পাওয়া যায় তবে উপায়টা কি? ব্যক্তি তাই পরলোকে সুখ ও সুবিচার প্রাপ্তির আশাটাকে জোরেসোরে আঁকড়ে ধরেছে। ব্যক্তি একটি বিশ্বাসের জগৎ নিজের জন্য তৈরি করে নেয়, সেটা ভেঙ্গে পড়লে সে খুবই বিপদে পড়ে।

৩

চীনের কনফুসিয়াস প্রাচীন বিশ্বের নাগরিক। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মানুষ তিনি। চীনের লোকেরা কথা বলে কম, কনফুসিয়াস বলতেন আরো কম। খুব সংযতভাব ছিল তাঁর। যা বলবার শিষ্যদের বলে গেছেন, এবং বলেছেন অল্প কথায়। সাজানো কথা এবং মন ভোলানো ব্যবহার যাদের অভ্যাস, তারা সদ্গুণসম্পন্ন নয় বলেই তাঁর সন্দেহ। সেজন্য তাঁর বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

মানুষের জীবনকে যে তিনি খুব উচ্চমূল্য দিতেন তা নয়। একদা ঝর্ণাতলায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন সবকিছুই ওই ঝর্ণার মত ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু শব্দমুখর। তবু মানতেই হবে যে, কনফুসিয়াসের সমস্ত চিন্তাই ছিল ইহজাগৎ নিয়ে, পরজগৎ সম্পর্কে তাঁর উপদেশ ছিল খুবই স্পষ্ট। তাঁকে নাস্তিক বললে অন্যায় হবে না। কোন সংগঠিত মতবাদ প্রচার করেননি, তেমন কিছুতে বিশ্বাসও করতেন না। বৌদ্ধদের সঙ্গে তার মিল রয়েছে, কিন্তু দূরত্বটাও সামান্য নয়। জীবন সম্পর্কে বৌদ্ধদের মধ্যে যে রকম বৈরাগ্য ছিল, কনফুসিয়াসের তা ছিল না। তিনি সম্পূর্ণরূপে জীবনবাদী।

নির্বাণ চান না, জীবনকে সুন্দর করতে চান। বস্তুত সুন্দর জীবনই তার লক্ষ্য। কিন্তু আবার স্থূলভাবে ভোগবাদীও নন। সর্বক্ষেত্রে সংযমের সমর্থক। শিষ্যদের বলেছেন, কথা বলবে বুঝে শুনে। যা দেখার নয় তা দেখবে না, যা শোনার নয় তা শুনবে না, যা করার নয় তা করবে না। একেবারেই অপচয়বিমুখ।

কনফুসিয়াসের উপদেশাবলী ইহজাগতিকতায় ভরপুর। একবার তিনি মরণাপন্ন হয়েছিলেন। সঙ্গীরা জিজ্ঞেসা করছিল প্রার্থনা করছেন কি না। অত্যন্ত সংক্ষেপে কনফুসিয়াস বলেছেন, আমি তো দীর্ঘদিন ধরেই প্রার্থনা করছি। বলতে চাইছেন সৎ জীবনযাপনই হচ্ছে প্রার্থনা, এর বাইরে কোন আনুষ্ঠানিকতা অনাবশ্যক। তাঁর জন্য পুরোহিত নেই। ধর্মগৃহ নেই। মন্ত্র অনাবশ্যক। জীবনযাপনকেই নৈতিকভাবে উন্নত করা চাই, সেটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। জিজ্ঞেস করা হয়েছিল পরকাল সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কি। জবাবে বলেছেন, জীবিতদের প্রতি তোমার কর্তব্য কি শেষ করেছ যে তুমি মৃতদের প্রতি কর্তব্যের কথা ভাবছো? বলেছেন আগে জীবনকে বুঝতে হবে, তবেই না মৃত্যুকে বোঝার ব্যাপারে চিন্তা করা যাবে।

কনফুসিয়াসের সব বক্তব্যই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। সে ব্যক্তি রাজা হোক কিংবা সাধারণ মানুষ হোক সদ্গুণকে বিকশিত করা চাই, সম্মান অর্জনই শ্রেয়। সম্মানিত ব্যক্তি নিজের চরিত্রের কথা ভাবে, নিম্নস্তরের ব্যক্তি ভাবে তার পদের কথা। সম্মানিত ব্যক্তি সুবিচার চায় আর নিম্নস্তরের ব্যক্তি চায় করুণা। পদের জন্য লালায়িত হওয়াটা ভুল, পদের যোগ্য হওয়াটা কাম্য। এদিকে ঝুঁকবে না, ওদিকেও ঝুঁকবে না, সদা সৎ পথে চলবে। নীতিবানদের সাথে চলবে, নীতিহীনদের থেকে দূরে থাকবে। সৎ পথ চেনে অথচ সেই পথে চলে না যে ব্যক্তি সে একজন কাপুরুষ। তাকেই পরোপকারী বলা যাবে যে নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে অন্যদের রক্ষা করে, নিজেকে বিকশিত করতে গিয়ে অন্যকে বিকশিত করে।

কনফুসিয়াসের এসব বক্তব্যে গভীর দার্শনিকতা রয়েছে, ইহজাগতিকতাও; কিন্তু এতে দ্বন্দ্বের কথাটা নেই। বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো থাকবে, তাদের মধ্য থেকেই ব্যক্তি বিকশিত হবে, অবনত অবস্থাতেই উন্নতি করবে; এই বক্তব্য প্রকৃত ইহজাগতিকের নয়, ধর্মবাদীর বটে। ইহজাগতিকতাও যে ইহজাগতিকতার সঙ্গে শত্রুতা করতে পারে কনফুসিয়াসের মতবাদ মনে হয় তারই একটি নিদর্শন।

তাঁর মতবাদ অত্যন্ত শক্তিশালী। বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত চীনে কনফুসিয়াস খুবই সম্মানিত ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে চীনে কনফুসিয়াসের সামন্তবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সামন্তবাদের যুগে সামন্তবাদী মনোভাব অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু ওই মনোভাব যখন দর্শনিক প্রত্যয় হয়ে দাঁড়ায় এবং সকল যুগের জন্য স্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে প্রযুক্ত হতে চায় তখনই বিপদ বাধে। চীনে

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই ব্যবস্থা এখন আর শক্তিশালী নেই; দেখা যাচ্ছে এই দুর্বলতার অবকাশে কনফুসীয় মতবাদ আবার প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। মৌলবাদের উত্থানে উদ্বিগ্ন ইউরোপ আমেরিকার বিদ্বান মহল লক্ষ্য করেছেন যে চীনে নানা ধরনের জীবন-বিরোধী মতবাদের সঙ্গে কনফুসিয়াসের মতবাদও জায়গা করে নিচ্ছে। কেবল চীনে নয়, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও।

কনফুসিয়াসের বক্তব্যগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই যে, উচ্চতর বিষয়ে আলোচনা নিম্নস্তরের লোকদের সঙ্গে করা ঠিক নয়, তারা ওসব বুঝবে না। যারা গড়পড়তা নয়, তারাই কেবল দার্শনিক আলোচনার যোগ্য। সাধারণ মানুষের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গিটা তাৎপর্যহীন নয়। এটি প্রাচীন ব্রাহ্মণদেরও ছিল।

৪

গ্রীক দার্শনিকেরাও শ্রেণী আধিপত্যের বিপক্ষে ছিলেন না। তাঁদের দেশে দার্শনিকেরা দর্শন নিয়ে ভাববার সময় ও সুযোগ পেতেন দাস শ্রম থাকার কারণে। দাস ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় দর্শন চর্চাও বিপদগ্রস্ত হয়েছে। সেকালে তত্ত্বজ্ঞান একচেটিয়া বিত্তবানদের অধিকারের মধ্যে ছিল।

ইউরোপের মধ্য যুগেও জ্ঞান সাধারণ মানুষ পায়নি। এবং সব জ্ঞান বাইবেলে আছে এই মত কর্তৃত্ব করেছে। রেনেসাঁসের কালে বড় বড় অর্জন সম্ভব হয়েছে; তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ঈশ্বরবাদিতার জায়গায় মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তিমাত্রই গুরুত্বপূর্ণ এই বোধটি তখন তৈরি হয়েছিল; জ্ঞানে সাধারণ মানুষের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছিল, বিশেষ ভাবে দেশে দেশে মাতৃভাষার চর্চার ভেতর দিয়ে। বাইবেল সাধারণ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এসব ছিল ইহজাগতিকতার সম্প্রসারণ। চিত্রকলার ক্ষেত্রে মানুষ চলে এসেছিল মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে।

কিন্তু একটা সীমা ছিল। ধর্ম যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে তা নয়, তার তৎপরতা ছিল। আর ছিল শ্রেণী। ইহজাগতিকতা যেমন ধর্মের বিভাজন মানতে চায় না, তেমনি শ্রেণী বিভাজন তার পছন্দ নয়, কেননা মানুষকে পাপ-পুণ্যের বিচারে যেমন বিভক্ত করতে সে অসম্মত, তেমনি অনুৎসাহী সে মানুষকে ধন-সম্পত্তির নিরিখে চিহ্নিত করতে, যদিও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে ইহজাগতিকতার যে অনীহা রয়েছে এমন বলা যাবে না। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে কাজ করে তা ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথারের কাজের মধ্যে প্রমাণিত। লুথার ল্যাটিন বাইবেলের জার্মান অনুবাদ করে একট বৈপ্লবিক কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, তার ওই ভাষা ধ্রুপদী জার্মান ভাষাও ছিল না, ছিল সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। কিন্তু তিনিই আবার জার্মানিতে কৃষক বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন। স্ববিরোধিতা নয়, এ হচ্ছে দুই বিপরীত উপাদানের সহ-অবস্থান।

রেনেসাঁসের উজ্জ্বল মানবতাবাদের মধ্যে সবকিছুই যে উচ্চ নৈতিকতাগুণসম্পন্ন ছিল তা কিন্তু নয়। ছিল মেকিয়াভেলীর দৃষ্টিভঙ্গিও। বাস্তববাদী নিকোলো মেকিয়াভেলী রাজার পক্ষে ছিলেন, জনগণের পক্ষে নয়। রাজাকে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন সিংহের মত সাহসী এবং শৃগালের মত ধূর্ত হবার।

দুটোর একটি হলে চলবে না, দুটোই হওয়া চাই, এবং একটি অপরটিকে নাকচ করে দিচ্ছে তা নয়; দুটোই কাজে লাগবে, দুই বাহুর মতো, যখন যেমন, তখন তেমন। মেকিয়াভেলী কনফুসিয়াসের তুলনায় অনেক বেশি ভাষণপ্রিয়, এবং প্রায় আগ্রাসী রূপেই ইহজাগতিক। কিন্তু তিনি আবার ইহজাগতিকতার সঙ্গে শত্রুতাই করেন যখন রাজার পক্ষে দাঁড়ান, বিরোধী হন জনস্বার্থের। রাজস্বার্থ রক্ষার প্রণোদনায় মেকিয়াভেলী ধর্মকেও ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত নন। তিনি মনে করেন বিশ্বাসগুলো ভ্রান্ত হতে পারে, এবং প্রায়শই ভ্রান্ত এটাও ঠিক, তবু রাজার কাজ হবে সেগুলোকে রক্ষা করা। কেননা জনগণ ওগুলোতে আস্থা রাখে। রাজার পক্ষে রাষ্ট্রধর্মের প্রতিপালক হওয়া খুবই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রাজনীতির স্বার্থে মেকিয়াভেলী জেনেশুনে বিজ্ঞান তথা ইহজাগতিকতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ওই ধরনের নিষ্ঠুর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শাসক শ্রেণী এখনও করে যাচ্ছে।

প্রথমে কোপার্নিকাস, পরে গ্যালেলিও সৌরজগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বদলে দিয়েছেন, এবং বিশেষভাবে বিপদে ফেলেছেন ধর্মাশ্রয়ী পুরোহিতদের। বাইবেল বলছে পৃথিবীই হয়েছে কেন্দ্রে, সূর্য তার চারিদিকে অবিশ্রাম ঘুরছে; অথচ ওই জ্যোতির্বিদরা প্রচার করছেন উলটো তত্ত্ব; যাতে করে লোকের ধর্ম বিশ্বাস আঘাতপ্রাপ্ত রয়েছে। কোপার্নিকাসের তেমন বিপদ হয়নি, কিন্তু গ্যালেলিওর প্রাণ সংশয় দেখা দিয়েছিল। দুই কারণে। প্রথমত গ্যালেলিও যে কেবল বাইবেলের ধারণাকেই বিপদগ্রস্ত করেছিলেন, তা নয়। তার লেখা এমনই বিস্তৃত, প্রামাণ্য ও যুক্তিবুদ্ধিভিত্তিক, যে কার্যত তিনি প্রকৃতিবিদ্যা থেকে সব রকমের আধ্যাত্মিকতাকেই নির্বাসনে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। প্রকৃতি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল একটা ঘড়ির মতো, যেটা কারো ইচ্ছায় চলে না, চালু থাকে আপন বৈজ্ঞানিকতায়। দ্বিতীয় ব্যাপার এই যে, গ্যালেলিও ল্যাটিন ভাষায় লেখেননি, তাঁর তত্ত্বকে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন জনবোধ্য ইতালিয়ান ভাষাতে, যা তার মাতৃভাষাও বটে। এতে বিপদ বেড়েছে। আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, জনসাধারণ জেনে ফেলবে যে ধর্মব্যবসায়ীরা এতদিন যা তাদেরকে শিখিয়ে এসেছে তার অন্তত একাংশ ভ্রান্ত, আর তাই যদি হয়, একাংশ যদি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিতই হয় তাহলে অন্য অংশ যে অভ্রান্ত তাই বা বলা যাবে কোন ভরসায়? ফলে ব্যবসা যাবে চলে, অরাজকতা দেখা দেবে, কেউ কাউকে মানবে না। ধর্মীয় বিচারালয় তাই গ্রেফতার

করেছে গ্যালেলিওকে, তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য করেছে এই ঘোষণা দিতে যে তার ধারণা ভুল, এবং তাই তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর তত্ত্ব প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন।

ব্রুনো কিন্তু অতটা সৌভাগ্যবান ছিলেন না। তিনি ধর্মীয় আদালতের হাতে ধরা পড়েছেন এবং তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ব্রুনো মোটেই নাস্তিক ছিলেন না, তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ধর্মযাজক হিসেবেই। কিন্তু সেখানে থাকতে পারেননি। ঘুরে ঘুরে জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন এবং তা প্রচার করেছেন। এই যে প্রচার করাটা ধর্মব্যবসায়ীদের পছন্দ হয়নি। তারা পেছনে লেগেছে। আসলে ব্রুনোর চিন্তাকে সহ্য করা প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ব্রুনোকে তাই প্রাণ দিতে হয়েছে। দেবার চূড়ান্ত কারণ এই যে, তিনিও সক্রেটিসের মতই অনমনীয় ছিলেন, আপোষ করেননি। প্রাণদণ্ডাদেশ শুনে ব্রুনো তাঁর বিচারকদের বলেছিলেন, 'আমার সন্দেহ যে তোমরা যারা এই আদেশ দিচ্ছ তারা অধিক সন্ত্রস্ত আমার চেয়ে, যার ওপর এই আদেশ জারি করা হচ্ছে।' বিচারকরা যে ভয়ের দরুন ওই মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ভয়টা স্বার্থহানির।

ইউরোপে দর্শন চর্চার ইতিহাসের অগ্রগতির স্তরগুলোতে দেখব যে বেকনের ইহজাগতিকতাকে পরবর্তীকালে হবস, লক এবং আরো পরে মার্কস এগিয়ে নিয়ে গেছেন। অপরদিকে ভাববাদিতা এগিয়েছে দেকার্ত, কান্ট ও হেগেলের কাজের ভেতর দিয়ে। কিন্তু বস্তুবাদিতায় আস্থা রেখেও হবস মনে করতেন যে, রাষ্ট্রের স্বার্থের যদি প্রয়োজন হয় তবে রাজা তার সার্বভৌম ক্ষমতা বলে প্রচলিত কুসংস্কারগুলোকে একটি ধর্মমত হিসেবে দাঁড় করাতে পারেন, সে অধিকার তাঁর আছে। আর যে ভলতেয়ার তাঁর যুক্তি-বুদ্ধির জন্য ফরাসী বিপ্লবের স্থপতিদের একজন হিসেবে স্বীকৃত তিনিও বলেছেন যে, চাষীরা যাতে খাজনা দেয় এবং ওপরওয়ালাদের কথা শোনে সে জন্য তাদেরকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে রাখার আবশ্যকতা রয়েছে। অপরদিকে হেগেল তো দর্শনকে পরম সত্তার দিকেই নিয়ে গেছেন এবং প্রকারান্তরে একনায়কত্বের দার্শনিক যৌক্তিকতাও সরবরাহ করেছেন।

৫

ইসলামী দর্শনের যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে মোতাজিলা সম্প্রদায় দ্বারা অনেকগুলো যুক্তিভিত্তিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এঁরা সবাই বিশ্বাসী ছিলেন, যদিও কাউকে কাউকে ধর্মদ্রোহী বলে মনে করা হয়েছে। মোতাজিলাদেরকে মোতাজিলা নামে অভিহিত করার মধ্যেও তাদের প্রতি অবিশ্বাসের চিহ্ন রয়েছে। মোতাজিলা শব্দের অর্থ যিনি বিচ্ছিন্ন হয়েছেন; ওই নামকরণের অর্থ তাই দাঁড়ায়, এঁরা বিচ্ছিন্ন হয়েছেন ধর্মচর্চার মূলধারা থেকে, এবং ধর্ম বিষয়ে নিজেদের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।

মোতাজিলারা গ্রীক দর্শন মনোযোগের সঙ্গে পড়েছেন। এ্যারিস্টটল ছিলেন তাদের জন্য বিশেষ আগ্রহের কেন্দ্র, প্লেটোকেও তারা জানতেন, প্লেটোর সাথে খ্রিস্টান চিন্তার সম্পর্কের ভিতর দিয়ে যে নব্য প্লেটোনিক মতবাদ গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গেও এঁদের যোগাযোগ ছিল। গ্রীক দর্শনকে নতুন ইউরোপে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে মোতাজিলার মাধ্যম হিসেবেও কাজ করেছেন। তাঁদের মনে অনেকগুলো প্রশ্ন জেগেছিল। একটা প্রশ্ন কোরানের অনাদিত্ব নিয়ে। কোরান আল্লাহর সৃষ্টি; তাই কোরান যদি অনাদি হয়, যদি তার আদি না থাকে, তাহলে সৃষ্টি ও স্রষ্টা তো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, একের জায়গায় দুইকে পাওয়া যাচ্ছে, একত্ববাদের জায়গায় দ্বৈতবাদ তৈরি হচ্ছে। তাই তারা বলতে চেয়েছেন যে, কোরান নিত্যকালের নয়, এটি একটি বিশেষ সৃষ্টি এবং সৃষ্টি যেহেতু, তাই তার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। আর ব্যাখ্যা করার মত যে যুক্তি-বুদ্ধি আল্লাহই মানুষকে দিয়েছেন তা, মানুষের পক্ষে তা প্রয়োগ না করা অন্যায়। একইভাবে জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারেও তাদের প্রশ্ন রয়েছে। আল্লাহ চাইলেন তাই জগৎ সৃষ্টি হল, জগতে মানুষ এলো। কিন্তু আল্লাহ চাইলেন কেন, চাইবেন কেন? তিনি তো স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাঁর তো ইচ্ছা করার মতো অসম্পূর্ণতা নেই। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর বহুবিধ গুণ সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আল্লাহর কোন একটি গুণকে আলাদা করে উল্লেখ করা মানেই তিনি যে সর্বগুণ সম্পন্ন সেই সত্যকে অস্বীকার করা। আবার যখন কোন গুণের উল্লেখ করা হয়, তখন ধরে নেয়া হয় নাকি যে, ওই গুণ তার মধ্যে না থাকাও সম্ভব ছিল? যেমন যখন বলা হয় যে, তিনি করুণাময়, তখন ওই বলার পেছনে এই মনোভাব কি প্রকারন্তরে থাকে না যে, তাঁর পক্ষে করুণাময় না হওয়াটাও অসম্ভব ছিল না? কেননা সংজ্ঞা দিতে যাওয়া মানেই হল নেতির সৃষ্টি করা, সীমাবদ্ধতা তৈরি করা, যেমন আলোর কথা অর্থ অন্ধকার বলে একটি বস্তু আছে এটা স্বীকার করে নেয়া। আল্লাহ হচ্ছেন এক ও অভিন্ন, তাই তার বহুগুণ কল্পনা করা এক ধরনের পৌত্তলিকতা বলেই মোতাজিলারা মনে করেন।

মোতাজিলাদের মূল আগ্রহটা ছিল বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তিবুদ্ধির সমন্বয় ঘটানো। যুক্তিবুদ্ধিকেই তারা জ্ঞানের মূল উৎস মনে করতেন এবং তার সাহায্যে বিশ্বাসের যে জগৎ রয়েছে তাকে বিশ্লেষণ করে যুক্তিসিদ্ধ করে নিতে চেয়েছেন। ধর্ম ও জগৎকে আলাদা করার যে ইহজাগতিকতা সেটা আরো পরে এসেছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সময়ে। মোতাজিলারা রেনেসাঁসকে সাহায্য করেছেন, কিন্তু ওই মতাদর্শিক বিশ্বের অধিবাসী ছিলেন না।

তাঁদের চেষ্টাটা বিচ্ছিন্নকরণের ছিল না, ছিল সমন্বয়ের। তাঁরা দেখেছেন যে, এ্যারিস্টটল বলছেন জগৎ অনাদি, কেউ তাকে সৃষ্টি করেনি, সে আপনাপনি তৈরি হয়েছে; অথচ কোরান বলছে যে, আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা, জগতেরও। তাহলে?

সমস্যাটির সমাধান কি? মোতাজিলারা একটি সমাধান বের করেছেন। সেটি এই যে, জগৎ অনাদি বটে, আবার সৃষ্টও বটে। জগৎ অনাদিকাল থেকেই ছিল, কিন্তু মৃত অবস্থায়, আল্লাহ সেই মৃত জগতে গতির সঞ্চার করেছেন, যার ফলে সে প্রাণ পেয়েছে অর্থাৎ সে সৃষ্টি হয়েছে। মোতাজিলারা বলতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেই স্বাধীনতার ফলেই মানুষ কাজ করে, এবং কখনো কখনো নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী থাকে না; তাই আল্লাহ তাকে শাস্তিও দিতে পারেন না। শাস্তি দেওয়াটা হবে আল্লাহর পক্ষে অযৌক্তিক। মোতাজিলারা আল্লাহর দর্শন লাভ সম্ভব বলে মনে করেন না। কেননা আল্লাহ হচ্ছেন নিরাবয়ব, তাঁর পক্ষে কোন নির্দিষ্ট অবয়ব নেয়া সম্ভব নয়।

মোতাজিলাদের প্রশ্নাবলী ও বক্তব্য মূলধারার লোকেরা মোটেই পছন্দ করেনি। সাধারণ লোকও করেনি, কেননা তারা বিশ্বাস করতে পছন্দ করে, জিজ্ঞাসা করা বাদ দিয়ে। আব্বাসীয় শাসনামলে, বিশেষ করে খলিফা আল-মামুনের সময়ে, মোতাজিলারা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। মামুন আইন করে মোতাজিলা মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু সফল হননি। সাধারণ মানুষ মোতাজিলাদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। কিছুটা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের প্রচারের দরুন, কিছুটা যুক্তি ও সংশয়ের চাইতে বিশ্বাসের ব্যাপারে তাদের স্বাভাবিক আগ্রহের কারণে যে দার্শনিকেরা ছিলেন প্রথা সমর্থক, তারাই শেষ পর্যন্ত জয়ী ও স্থায়ী হয়েছেন।

যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা যারা পরিচালিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হচ্ছেন ইবনে সিনা। তিনি কেবল দার্শনিক নন, বিজ্ঞানীও ছিলেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ তিনি নিজের উদ্যোগে তৈরি করেছিলেন। তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে। ইবনে সিনা রচিত 'কানুন' নামের গ্রন্থটি ল্যাটিনে অনূদিত হয়েছিল এবং তা মধ্যযুগের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচিত হতো।

ইবনে সিনা বিশ্বাস ও যুক্তিবুদ্ধির মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেননি, কারণ তাঁর ধারণা সমন্বয় সম্ভব নয়। দর্শনকে তিনি গুরুত্ব দিতেন এবং মনে করতেন যে, দর্শন ধর্মের অধীনে বিকশিত হয়নি, তার বিকাশ ঘটেছে স্বাধীনভাবে। দর্শন জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল; জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে আসে, কিন্তু ওই জ্ঞান পরিপূর্ণ হয় যৌক্তিক বিবেচনার মধ্য দিয়ে। সাধারণ মানুষ শুধু বিচ্ছিন্ন ঘটনাই দেখে, ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগসূত্র দেখতে পায় না, যোগসূত্র আবিষ্কার দর্শনের কাজ। ইবনে সিনা বস্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে প্রাসঙ্গিক মনে করেননি, আল্লাহ সব কিছুর উর্ধ্বে, তিনি আধ্যাত্মিক এবং বস্তুজগতের অনেক ওপরে। আল্লাহ হচ্ছেন একক, তাঁর

ওপর বহুত্ব আরোপ করা অন্যায়। আল্লাহ হচ্ছেন পরিপূর্ণ, তাই অশুভ সাধন তার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে আল্লাহর পরিকল্পিত ব্যাখ্যায় অশুভের স্থান আছে। কেননা জগৎ অনন্ত নয়, সে সীমাবদ্ধ বটে। অশুভের সঙ্গে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু মানুষের জন্য অশুভ প্রয়োজনীয়।

ইবনে সিনার দার্শনিক অবস্থান প্রায় বৈপ্লবিক। তাঁর অনেক বক্তব্য বিজ্ঞানীদের মতো। তিনি মনে করেন মানুষের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান বিশ্বাস নয়, যুক্তিবুদ্ধি।

মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে তার নির্দিষ্ট মত ছিল। তিনি মনে করতেন পুনরুজ্জীবন ঘটবে দেহের নয়, আত্মার। দেহের পুনরুজ্জীবন ঘটলে দেহের কোন রূপটিকে গ্রহণ করা হবে? দুর্ঘটনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যার মৃত্যু ঘটেছে, তার ওই বিকৃত দেহের পুনরুজ্জীবন কি যৌক্তিক হতে পারে? একজনের কোন বয়সের দেহ পুনরায় জীবন লাভ করবে, যৌবনের নাকি বার্ধক্যের? এসব প্রশ্ন তুলে ইবনে সিনা দৈহিক পুনরুজ্জীবনের তত্ত্বকে নাকচ করে দিয়েছেন। ধর্মমতে পুনরুজ্জীবনের তত্ত্বকে তিনি আক্ষরিক অর্থে নেয়ার পক্ষপাতি নন; তাঁর মতে ধর্মগ্রন্থে আসলে আত্মার কথাই বোঝানো হচ্ছে, সাধারণ মানুষের বুঝবার সুবিধার জন্য রূপক ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এমনকি কোরানে যে বেহেস্ত দোজখের বর্ণনা আছে তাকেও তিনি রূপক অর্থেই নেবার পক্ষপাতি।

ইবনে সিনা আপোষ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই এমনকি চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর অবদানকে যারা উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে তাঁরাও তাঁকে বিপথগামী বলতে ছাড়েননি। তিনি মূলধারার অন্তর্গত হতে পারেননি।

সেকালে মূলধারার শক্তিশালী মুখপাত্র ছিলেন গাজ্জালী। যিনি ইবনে সিনার পরে এসেছেন, এবং ইবনে সিনার দার্শনিকতাকে নাকচ করে দিয়েছেন। গাজ্জালী রক্ষণশীল আসরাইতদের একজন, তিনি মোতাজিলারদের মুক্ত-চিন্তার বিরোধী। ইবনে সিনার যুক্তি-বুদ্ধির জায়গায় তিনি ধর্মবিশ্বাসের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। সে ব্যাপারে তার যোগ্যতায় কখন ঘাটতি ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ও সম্মানিত। তদুপরি তার রচনা ছিল শক্তিশালী।

দর্শনে তিনি নানা ধরনের অসঙ্গতি দেখতে পান, এবং সেগুলোকে চিহ্নিত করেছেন। দর্শন থাকতে পারে, কিন্তু থাকবে সে ধর্মশাস্ত্রের অধীনে, ওপরে নয়, স্বাধীনভাবেও নয়।

তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, নীতি শিক্ষাকে কার্যকর করার জন্য দোজখের ভয়কে ফেরত আনা চাই। ফেরত আনার কথাটা উঠেছে এজন্য যে, মোতাজিলাদের দর্শন চর্চার দরুন ওই ভয়টা পেছনে চলে যাচ্ছিল, অন্তত শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে। গাজ্জালী বললেন যে, জীবন যাপনে নৈতিক মূল্যবোধ প্রধান হবে

না যদি না মানুষ শাস্তির ভয় পায়। তাই দোজখের যন্ত্রণাকে জনচিত্তে বাস্তবিক করে তোলা আবশ্যক।

দর্শন নিয়ে সাধারণ মানুষের মাথাব্যথা থাকার বিপক্ষে তিনি। কেননা তাতে তারা বিপথগামী হতে পারে। আর নিম্নস্তর অতিক্রম করে যারা উচ্চস্তরে আরোহণ করতে চায়, তাদের উচিৎ দর্শন চর্চার বিপক্ষে যেগুলো যুক্তি রয়েছে, সেগুলো পাঠ করা এবং সর্বোচ্চ স্তরে যখন কেউ পৌঁছুবে, তখন তার জন্য সম্ভব হবে যুক্তি-বুদ্ধি নয়, বোধির সাহায্যে আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাওয়া, যেখানে আল্লাহর দর্শন লাভ সম্ভব হবে, উজ্জ্বলতার মধ্য দিয়ে। এই স্তরে আত্মা ছায়া নিয়ে ব্যস্ত থাকবে না, চূড়ান্ত বাস্তবতার সম্মুখে চলে আসবে। সেখানে শাস্তির ভয় কিংবা পুরস্কারের আশা আর কাজ করবে না।

গাজ্জালীর পরে ইবনে রুশদ এসেছেন, ইসলামিক দর্শনের জগতে তাঁর অবদানও অনেক বড়। তিনি গাজ্জালীর পক্ষে ছিলেন না, বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। গাজ্জালী একটি বই লিখেছিলেন দর্শনকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে, ইবনে রুশদ বই লিখলেন ওই ধ্বংস প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করার ইচ্ছা থেকে। তিনি বিজ্ঞানে আস্থা রাখেন এবং যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যে রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নতি সম্ভব বলে মানেন। ধর্মের নৈতিক দিকটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ধর্মের বিধিগুলো হচ্ছে আইনের মতো, তাদেরকে মান্য করা জরুরি। তবে প্রকৃত নৈতিকতা অর্জনের পথটা ভিন্ন, সেটি হচ্ছে যুক্তি-বুদ্ধির অনুশীলন।

ইবনে রুশদ জনপ্রিয় হননি। সাধারণ মানুষ তাঁর বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। তবে এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে, তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য মনস্কতা ছিল; তিনি গাজ্জালীপন্থী নন ঠিকই কিন্তু গাজ্জালীর মত তিনিও বলেছেন দর্শন নিয়ে সাধারণ মানুষের চিন্তা করা উচিত নয়। মানুষকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। সর্বোচ্চ স্তরে থাকবে দার্শনিকেরা, দ্বিতীয় স্তরে থাকবে সেইসব যুক্তিবুদ্ধির মানুষেরা অনুশীলনের মাধ্যমে যারা বিশ্বাসে জগৎ থেকে দার্শনিকতার জগতে নিজেদেরকে উত্তীর্ণ করতে পারবেন। তৃতীয় স্তরে সাধারণ মানুষ। এই সাধারণ মানুষের উপর ইবনে রুশদের আস্থা ছিল না। এদেরকে তিনি মনে করতেন আবেগতাড়িত ও যুক্তিবুদ্ধিহীন। ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা এই সাধারণ মানুষকে জানানো অনাবশ্যকই নয়, ক্ষতিকারকও বটে। তাদের জন্যই ক্ষতিকর, কেননা এর দ্বারা তারা শুধু বিচলিত হবে।

৬

তাহলে আমরা কোন সিদ্ধান্ত পৌঁছুবো? সেটা বোধহয় এই যে, ইহজাগতিকতা কখনই নিরাপদ ছিল না। তার প্রধান কারণ ভয়। ভয় ছিল শ্রেণীগত, গোষ্ঠীগত,

সম্প্রদায়গত এমনকি জাতগতও। স্বার্থহানির ভয়। ব্যক্তিও ভয় পায়। তারও স্বার্থ থাকে। ব্যক্তি ইহজাগতিক হতে কুণ্ঠিত হয় আরো একটি বিশেষ কারণে। এটিও ওই ভয়ই। পরকালের ভয়।

ইহজাগতিকতার শত্রু আসলে অনেক। প্রত্যাশা রয়েছে, প্রত্যক্ষে রয়েছে, রয়েছে পরোক্ষে। যে দার্শনিকতা স্থিতাবস্থার সমর্থন করে সে এমনকি ইহজাগতিক হলেও ইহজাগতিকতার সঙ্গে পরোক্ষ শত্রুতাতেই লিপ্ত হয়। এর প্রথম কারণ, মানুষ যখন দেখে সামনে কোন পথ নেই, তখন সে পেছন দিকে মুখ ফেরায়। কেউ পুনরুজ্জীবনবাদী, কেউ বা হয় মাদকাসক্ত।

মাদকাসক্তির নানা রূপ আছে। একটি হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। মানুষ স্বভাবতই অস্থির, সম্মুখযাত্রার উপায় না থাকলে পশ্চাৎগামী হতে বাধ্য। দ্বিতীয় ঘটনা যা ঘটে তা হলো হতাশা। স্থবিরতা হতাশার জন্ম দেয়। মানুষ তখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে অলৌকিকে আস্থা রাখে।

পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়ই ইহজাগতিক। কিন্তু তারা আবার ইহজাগতিকতার সঙ্গে শত্রুতাও করে। শত্রুতার একটি রূপ হচ্ছে দারিদ্র্য সৃষ্টি, দারিদ্র্য সৃষ্টি হয় শোষণ ও বৈষম্যের কারণে। আর দারিদ্র্য মানুষকে ধর্মমুখী করে তোলে, আশ্রয় বিচার আর সান্ত্বনার প্রয়োজনে; ইহজগতে যা তারা পায় না। দ্বিতীয়ত পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীরা সরাসরি ধর্মের পক্ষে বলতে থাকে, যদিও তাদের নিজেদের জীবনে প্রকৃত ধর্মচর্চার লক্ষণ বলতে গেলে দেখাই যায় না।

সাম্রাজ্যবাদীরা কিভাবে ভাববাদিতাকে উৎসাহিত করে তার বাস্তব দৃষ্টান্ত মার্কিন আধিপত্যকে বিশ্বময় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তৎপর দুইজন পুরুষের বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে এদের একজন, জন ফস্টার ডালেস বলেছিলেন যে প্রাচ্য দেশের ধর্মবিশ্বাস কখনোই সাম্যবাদী বস্তুবাদ ও নিরীশ্বরবাদকে মেনে নেবে না, তাই চেষ্টা করতে হবে কমিউনিজম-বিরোধী মতাদর্শের সঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় ধর্মবিশ্বাসের একটি ঐক্য স্থাপনের। অপরজন চেস্টার বাওলস পরামর্শ দিয়েছেন গান্ধীবাদের মতো মতাদর্শকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। কেননা, তাঁর মতে সামরিক বা অর্থনৈতিক সাহায্য নয়, বরঞ্চ গান্ধীবাদের ধারায় কাজ করাটাই হবে প্রাচ্যের জনগণকে সাম্যবাদবিরোধী করার প্রকৃষ্ট পন্থা। (উদ্ধৃত, সতীনাথ চক্রবর্তী, ভাবাদর্শগত সংগ্রাম ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের উত্তরাধিকার, কলকাতা, ১৯৯২)

রাষ্ট্র ও সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ইহজাগতিকতা প্রতিষ্ঠা করা যে কতটা কঠিন বাংলাদেশকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিলে সেটা বুঝতে সুবিধা হবে। বাংলাদেশের

অভ্যুদয় ঘটেছে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। নতুন রাষ্ট্রের হবার কথা ছিল পরিপূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ ও ইহজাগতিক।

সংবিধান যখন রচিত হয় তখন ওই অধিকারই ব্যক্ত করা হয়েছিল। চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির মধ্যে ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে খুব স্বাভাবিক ছিল এই অঙ্গীকার। কিন্তু এর জন্য যে সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি প্রয়োজন দেশে তা ছিল না। রাজনৈতিক প্রস্তুতিও ছিল না।

একাত্তরের যুদ্ধে প্রস্তুতিবিহীন অবস্থাতেই বাঙালিদেরকে যেতে হয়েছে। যুদ্ধের পর যখন সংবিধান তৈরি হলো (১৯৭২ সালে) তখন রাষ্ট্রীয় মূলনীতি চারটির কী তাৎপর্য তা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে স্পষ্ট ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র– এদের প্রতিটির জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল প্রধান শর্ত। কিন্তু সে এসেছে সবার পরে। জিয়াউর রহমানের বিপ্লবের পরে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিশ্চিহ্নই করে দেয়া হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে সমান বেগে প্রথম মূলনীতি হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস'কে।

পরিবর্তনটা পরের ঘটনা। তার আগেও কি ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের? সংবিধান বলছে ছিল না। সংবিধানে উল্লেখ আছে (অনুচ্ছেদ ১২) যে ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়নের জন্য ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার ঘ) কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে। কিন্তু বলা হয়নি যে, ধর্মনিরপেক্ষতা জিনিসটি কি। বলা দরকার ছিল যে, ধর্ম থাকবে নাগরিকদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে, সেখানে রাষ্ট্রের কোন হস্তক্ষেপ যেমন ঘটবে না, তেমনি রাষ্ট্রের কোন নিজস্ব ধর্ম থাকবে না, রাষ্ট্র হবে ধর্মহীন। রাষ্ট্রের ধর্মহীনতার এই ব্যাপারটি রাজনৈতিক নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষতার উপরে-উদ্ধৃত সাংবিধানিক সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার' বিলোপ করা হবে; বললে ভাল হতো যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার মাত্রেই অপব্যবহার; তাই অপব্যবহার নয়, ধর্মের সবরকম রাজনৈতিক ব্যবহারই বিলুপ্ত করা হবে।

পাকিস্তানি কারাগার থেকে ঢাকায় ফিরে এসে রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করেছিলেন তাৎপর্যহীন নয়। ওই বছরই ৭ জুন তারিখের বক্তৃতায়

মুজিব রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'বাংলাদেশ হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলানের ধর্ম পালন করবে, হিন্দু হিন্দুর ধর্ম পালন করবে। খ্রিস্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নেই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে।' কথার সুরে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভাব রয়েছে এবং প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারটি মোটেই আসছে না।

মুজিবের পরে জিয়াউর রহমান যখন রাষ্ট্রক্ষমতা পেলেন, তখন তিনি এ ব্যাপারে কোন দোদুল্যমানতাই প্রকাশ করেননি, ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরাসরি নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। এরশাদ এসে ঘটনাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তিনি রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন করেছেন। আর আজ এমন অবস্থা হয়েছে যে, আমেরিকানরা আমাদের রাষ্ট্রকে নরমপন্থী মুসলিম রাষ্ট্র বলায় রাজনৈতিক বড় নেতৃত্ব কোনো প্রতিবাদ করছে না, বরঞ্চ খুশি হচ্ছে এই কথা ভেবে যে, তাও যা হোক চরমপন্থী বলেনি।

ধর্মকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এনেছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগও এনেছে, দেশের জনগণ কিন্তু বরাবরই ধর্মনিরপেক্ষ। তারা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল সেটা পারলৌকিক কারণে নয়, ইহজাগতিক মুক্তি পাবে এই আশাতেই। একাত্তরে তারা যুদ্ধ করেছে ইহজাগতিকতার পক্ষেই। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার শাসক শ্রেণী করেছে এবং সেই রাজনীতি তাঁরা জনগণের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে।

জনগণকে ইহজাগতিকতায় উদ্বুদ্ধ করার কাজ অতীতের শাসকেরা করেননি, এখনকার শাসকেরাও করছেন না। কারণটা আর কিছু নয়, ভয়। সাধারণ মানুষ দার্শনিকতায় শিক্ষিত হোক, এটা গ্রীক দার্শনিকেরা চাননি, ধর্মব্যবসায়ীরা চায়নি, ইবনে সিনার মত বিপ্লবী চিন্তাবিদ পর্যন্ত চাননি। কিন্তু এই চর্চা তাঁদেরকে চাইতে হবে যাঁরা সত্যি সত্যি ইহজাগতিকতা চান।

কেননা জনগণকে সঙ্গে না পেলে রাষ্ট্র বদলাবে না, সমাজ তো অবশ্যই বদলাবে না। আর রাষ্ট্র ও সমাজ না বদলালে, অর্থাৎ তারা শত্রুতা করলে, ইহজাগতিকতা এগোতে পারবে না, যেমন আজকের বিশ্ব অত্যন্ত বস্তুবাদী হওয়া সত্ত্বেও ইহজাগতিক হচ্ছে না, ধর্ম নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, ধর্মীয় মৌলবাদ নানাক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

বিএনপি বলে তাদের প্রতিষ্ঠাতা মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, কিন্তু তারা সরকার গঠন করেছে ধর্মীয় মৌলবাদী একাধিক দলকে সঙ্গে নিয়ে; ওদিকে আওয়ামী লীগ

শোনা যাচ্ছে আরো ভোটের আশায় নিজেদের গঠনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে ক্ষীণমান ও প্রায় অর্থহীন অসাম্প্রদায়িকতাকে বসাবে।

বস্তুত ইহজাগতিকতার পক্ষে দাঁড়াতে হবে তাঁদেরকেই যাঁরা যথার্থ গণতন্ত্র ও সমাজ প্রগতিতে বিশ্বাস করে। আরজ আলী মাতুব্বর যেমন দাঁড়িয়েছিলেন, একাকী। আরজ আলী মাতুব্বর কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, আমাদের জন্য তিনি অনুপ্রেরণা, এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক বক্তৃতা। ঈষৎ পরিবর্তিত

আদর্শবাদ ও মানুষের সংকট

গোলাম মুরশিদ

অন্য পাঁচটা জন্তু থেকে মানুষ সম্ভবত দুটি জায়গাতেই সবচেয়ে ভিন্ন– শিক্ষায় এবং আদর্শে। মানুষ কেবল শিক্ষিত নয়, সেই শিক্ষাকে সে নানা রকমের মাধ্যম দিয়ে আয়ত্ত করার, ধরে রাখার এবং এগিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। অন্য জন্তুদের জ্ঞান অথবা বুদ্ধি নেই, তা নয়। কিন্তু তারা শিক্ষাকে এমন আনুষ্ঠানিক এবং পদ্ধতিগত চেহারা দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে তাই জন্তুদের থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে পারা যায় না। তবে শিক্ষার চেয়েও জন্তুদের সঙ্গে মানুষের বড় পার্থক্য আদর্শের। কারণ জন্তুদের আদর্শ আছে– অন্তত এমন কথা কেউ বলেননি।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে এবং আর পাঁচটা বস্তু এবং ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করে মানুষ একটা উন্নততর এবং শ্রেয়তর অবস্থান নিতে চেষ্টা করে। কতগুলো মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে জীবনাচরণের একটা আদর্শ গড়ে তোলে। সেই আদর্শ একটা বিশেষ সমাজ অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপ্ত হতে পারে। এমনকি তেমন প্রেরণামূলক আদর্শ হলে তা একটা দেশ অথবা কতগুলো দেশের লোকের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই আদর্শ সমষ্টিগত আদর্শ। এই আদর্শ একটা সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে বন্ধনের সূত্র হিসেবে কাজ করে এবং তার ভিত্তিতেই সেই সমাজ টিকে থাকে। আবার কোন কোন লোকের নিজস্ব আদর্শও থাকে, যে-আদর্শ যে-সমাজে সে বাস করে সে সমাজের সামগ্রিক আদর্শ থেকে কমবেশি ভিন্ন। কিন্তু কোনো আদর্শই অবিচল অথবা প্রশ্নাতীত নয়। অনেক সময়ে সে বিকৃত হয়ে সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়। তখন প্রয়োজন দেখা দেয় সংস্কারের। এভাবে কালে কালে তার বিবর্তন হয়। এক-এক সমাজে তার চেহারা বদলে যায়। এক-এক ব্যক্তি তার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করে। ফলে নতুন আদর্শ গড়ে ওঠে। পুরোনো আদর্শের সঙ্গে তার সংঘাত শুরু হয়। সভ্যতার ইতিহাস আদর্শের এই ভাঙা গড়ারই ইতিহাস।

আদর্শের ভেতরে একটা অন্তর্নিহিত বিরোধ রয়েছে। সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে-আদর্শের জন্ম, সেই আদর্শই আবার মানুষকে অন্ধ করে দেয়। সে তখন তার আদর্শের বাইরে যা আছে, তাকে অস্বীকার করতে অথবা নিম্নতর বলে বিবেচনা করতে শুরু করে। আদর্শায়িত দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময়েই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি। উৎসাহী আদর্শবাদ একই কারণে উগ্র,এমনকি, সহিংস আদর্শে পরিণত হতে পারে। ভিন্ন আদর্শের দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকানোর উদারতা তখন লোপ পাওয়া সম্ভব।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিরন্তর নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে আদর্শ গড়ে তুললেও, মানুষ আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ আদর্শবাদ মানুষকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে। যে-আদর্শ মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে, সেই আদর্শই আবার মানুষে মানুষে বিরোধিতা সৃষ্টি করে। এই বিরোধিতা এমন চরম রূপ নিতে পারে যে, একটি গোষ্ঠীর মানুষ আদর্শের নামে হিংস্র জন্তুর মতোই অন্য একটা গোষ্ঠীর মানুষকে ধ্বংস করতে পারে। রোয়ান্ডার জনগণ হুটু অর টুটুসি, এই দুটি বর্ণ গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কেবল অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক অবদমন নয়, বর্ণবাদের আদর্শ এ গোষ্ঠী দুটির মধ্যে এমন পারস্পরিক বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছিলো যে, মাত্র দু' সপ্তাহের মধ্যে হুটু সম্প্রদায় টুটুস সম্প্রদায়ের পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছিলো।[১] ১৯১৫ সালে তুরস্ক গণহত্যার যে-আদর্শ দেখিয়েছিল[২] সেই আদর্শের পথ ধরে গত প্রায় নব্বই বছরে অনেক গণহত্যাই পৃথিবীতে হয়েছে। কিন্তু দ্রুততা এবং হিংস্রতার দিক দিয়ে রোয়ান্ডার গণহত্যা সম্ভবত সবাইকে হার মানিয়েছিলো। যে-মানুষ মুগ্ধদৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখে, যে-মানুষ অলৌকিক শক্তির কথা চিন্তা করে তার মধ্য দিয়ে নিজের অলৌকিকত্বের আদর্শায়িত রূপ দেখতে পায়, যে-মানুষ কবিতা লেখে, গান করে এবং যে-মানুষ ও মানুষী প্রেমের খেলায় বিভোর হয়ে নশ্বর পৃথিবীতেই 'স্বর্গ' রচনা করে, সেই মানুষই আদর্শের খাতিরে হিংস্রতায় সমস্ত জন্তুকে হারিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া, আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্যেও মানুষ অনেক ক্ষেত্রে এমন পন্থা অবলম্বন করে যে, লক্ষ্য উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সেই পন্থা সমর্থনের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বস্তুত আদর্শ তেমন অবস্থাতে হতে পারে রীতি মতো মানবতার পরিপন্থী। এ রকমের কয়েকটি শক্তিশালী আদর্শ হলো ধর্ম, জাতীয়তা, বর্ণবাদ এবং রাজনৈতিক মতবাদ। এর মধ্যে যে-আদর্শ কমবেশি সব মানুষকে প্রভাবিত করেছে, তা হলো ধর্ম।

ধর্মীয় আদর্শবাদ

ধর্ম কথাটার সৃষ্টি ধৃ ধাতু থেকে। যাকে ধারণ করে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে তাই ধর্ম। মানুষের যা স্বভাব এবং প্রকৃতি তাই মানুষের ধর্ম। কিন্তু এই ধর্ম এবং যাকে 'রিলিজিয়ন' বলে সেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম অভিন্ন নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মানুষের উদ্ভাবিত একটি সমষ্টিগত আদর্শ। সেই ধর্মের একটা মস্ত কাজ হলো মানুষকে একটা প্রচলিত মূল্যবোধের আওতার মধ্যে নিয়ে আসা এবং মূল্যবোধের পরিধির মধ্যে তাকে ধরে রাখা। সেই মূল্যবোধ অনুযায়ী একটা বিশেষ সমাজ যাকে পাপ অথবা অন্যায় বলে গণ্য করে, ধর্ম সেই সেই পাপ থেকে সেই সমাজের সদস্যদের বিরত রাখে এবং সেই মূল্যবোধ অনুযায়ী যা ভালো অথবা পুণ্য বলে বিবেচিত, সেই কাজে তাদের উৎসাহিত করে। শুধু তাই নয়, জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে এবং প্রাত্যহিক জীবনের উর্ধ্বে জীবনের একটা গভীরতর তাৎপর্য খুঁজতেও ধর্ম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তার অনুসারীদের ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক এবং গোষ্ঠীগত সীমানাকে অতিক্রম করে ঐক্যবদ্ধ করতেও সহায়তা করে। যেমন অতীতে বৌদ্ধধর্ম ইন্দোনেশিয়া থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলো। উত্তরে চীন এবং সুদূর উত্তর-পুবে জাপান পর্যন্ত পরে সেই ঐক্যের পরিধিতে ধরা দিয়েছিলো। খ্রিস্টীয় ধর্ম নানা দেশের নানাভাষী নানাবর্ণের মানুষকে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়ছে। প্রচারিত হওয়ার কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম ধর্মও মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার নানা দেশকে এক পতাকার তলে নিয়ে এসোছিলো। তার চেয়েও বড় কথা, আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকেও সামাজিক সুবিচার এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শ দিয়ে আকৃষ্ট করেছিলো। আর সাম্প্রতিককালে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বোধ আরও বৃহত্তর এলাকার পরস্পরবিরোধী স্বার্থের জালে বন্দি বিচিত্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নানা দেশের জনগণকে এক ধরনের প্যান-ইসলামী বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।* দেশের রাজনৈতিক সীমানাকে অতিক্রম করে সে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের মধ্যে একটা অভিন্ন আত্মপরিচয়ের জন্ম দিয়েছে। কেবল ঐক্যবোধের লালন নয়, ধর্ম সমষ্টিগত মঙ্গলেও একটা মানবগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করতে পারে।

অন্যদিকে, ধর্ম আবার বিধর্মীদের সঙ্গে, অর্থাৎ ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে বিভেদের দেওয়াল তুলে দিতে পারে। তার ফলে, যে-ধর্ম অন্য মানুষকে ভালোবাসার কথা বলে, সেই ধর্মই অন্য একজন মানুষের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে মানব সমাজের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করতে পারে। একই সমাজ এবং দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাঞ্ছিত এবং

*ইসলামী উম্মাহ্ এই ধারণারই ফসল– সম্পাদক মণ্ডলী

শ্রেয়, তাকেও বিচ্ছিন্ন অথবা বিপন্ন করতে পারে। এমন কি, পারে হানাহানির সৃষ্টি করতে। যিশু খ্রিস্ট প্রেমর বাণী প্রচার করলেও এবং হজরত মোহাম্মদ তার ধর্মের নাম শান্তি রাখলেও, ধর্মের নামে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বহু শতাব্দীর। এখনো উভয় ধর্মের অনুসারীরা একে অন্যকে সন্দেহের চোখে দেখে। আর মুসলমান এবং ইহুদীদের চরম বিরোধ এখনো বর্তমান। হিন্দু এবং মুসলমানের নিত্য কলহ চলছে উপমহাদেশে। এমন কি সাম্প্রতিককালে ভারতে হিন্দু আর খ্রিস্টানদের মধ্যে তীব্র হানাহানি দেখা দিয়েছে। ভারতে খ্রিস্টান শিশুদের গাড়িতে বন্দি করে পুড়িয়ে মারতে অথবা ঘুমন্ত ধর্মযাজককে মেরে ফেলতে কট্টর জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের বিবেককে আটকায়নি। পড়শি দেশ পাকিস্তানে গির্জার ওপর আক্রমণ করে উপাসনারত খ্রিস্টানদের মেরে ফেলতে বিবেকে বাধেনি শান্তি র ধর্মের অনুসারী মুসলমানদের। এমনকি, সে দেশে এক সম্প্রদায়ের মুসলমানের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের মুসলমানের নির্মম হানাহানি দেখা দিয়েছে।

ধর্মের নামে মানুষ যে কিভাবে পশুর চেয়েও অধম হতে পারে, তার অতি-সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে গুজরাটে। সে রাজ্যে নারী এবং শিশুসহ হিন্দুদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে মুসলমান দুস্কৃতকারীদের দ্বিধা হয়নি, অথবা হিন্দু ঘাতকদের আটকায়নি শিশু, নারী এবং বৃদ্ধসহ শত শত মুসলমানকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে। সত্যি বলতে কি, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ থেকে যে ঘৃণাবোধের জন্ম, তা এই খুনিদের মনুষ্যত্ব লোপ করে দিয়ে জন্তুর চেয়েও অধম জন্তুতে পরিণত করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিধর্মী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর ওপর অত্যাচার আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৪ সালে হিন্দু এবং শিখদের দাঙ্গায় তিন হাজারেরও বেশি শিখ নিহত হয়েছিলো। আর নাগাল্যান্ডে নিহত খ্রিস্টানের সংখ্যা, অনেকের মতে, তিন লাখ।

ভারতের মতো অতি সাম্প্রতিককালে এশিয়া এবং আফ্রিকার অন্য বহু দেশেও ধর্মীয় সহনশীলতার অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে এই মনোভাব লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলমানরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ করে খ্রিস্টান এবং ইহুদীদের শত্রু চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে, বলতে গেলে, যুদ্ধ শুরু করেছে। পুবে ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনস থেকে শুরু করে পশ্চিমে সুদান এবং নাইজেরিয়া পর্যন্ত বহু দেশেই খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের হানাহানি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে মুসলমান মৌলবাদীরা মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে উগ্রবাদের, এমন কি সন্ত্রাসের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। ফলে, কিছুকাল আগ পর্যন্ত পশ্চিমা জগৎ কমিউনিজমকে যেমন তাদের শত্রু বলে গণ্য করতো, তেমনি এখন ইসলামকেও সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। অনেকে তাকে সভ্যতা এবং আধুনিকতার শত্রু বলেও শনাক্ত করছে। যে-

ধর্ম সামাজিক সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়, সেই ধর্মীয় উন্মত্ততায় মনুষ্যত্ব এখন বিপন্ন। কিন্তু কি আশ্চর্য, এই ঘোর উন্মত্ততাকে এই ধর্মবাজরা ধর্মযুদ্ধ বলে গণ্য করছে। এবং ধর্মের নামে মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে তারা অন্য মানুষকে, এমনকি নিরপরাধ মানুষকে পাইকারিভাবে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করছে না। পাপ বোধ করা দূরে থাক, তারা বরং মনে করে যে, এসব অমানুষিক বর্বর নৃশংসতা দিয়ে তারা পুণ্য অর্জন করছে।

বস্তুত ধর্মের নামে কেবল অন্য ধর্মের অনুসারীদের ওপর অত্যাচার চলছে তাই নয়, ধর্মের নামে স্বধর্মীদের ওপর অত্যাচার করার দৃষ্টান্তও দেখতে পাচ্ছি ভুরি-ভুরি। উত্তর আয়ারল্যান্ডের খ্রিস্টানে খ্রিস্টানে হানাহানি চলছে দীর্ঘকাল ধরে। এমনকি, অতি সম্প্রতি এ রকমের নজির সৃষ্টি করেছে পাকিস্তানের উগ্রপন্থী জেহাদীরা আর আফগানিস্তানের কট্টর ইসলামী শাসকরা।* পাকিস্তানের সিপাহী সাবারা কখনো কাদিয়ানীদের ওপর, কখনো শিয়াদের ওপর যেভাবে আক্রমণ চালিয়েছে, তাতে এই হামলার প্রতি ধর্মের অনুমোদন অছে, এ কথা বললে ধর্মের অপমান করা হয়। ধর্মের জোশে উন্মাদ হয়ে অন্য সম্প্রদায়ের মসজিদের ওপর গুলি চালাতে অথবা বোমাবাজি করতেও এরা কুণ্ঠিত হয়নি।

অপরপক্ষে আফগানিস্তানে ধর্মের নামে তালেবানরা সমস্ত শিক্ষা এবং মৌলিক অধিকার থেকে নিজেদের দেশের অর্ধেক মানুষ অর্থাৎ নারীদের বঞ্চিত করেছিলো। উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নিজেরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলেও, সাধারণ মানুষের জন্যে সে দেশে তারা টেলিভিশন পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছিলো। যে গানকে পৃথিবীর বেশির ভাগ ধর্মেই মনে করা হয় উপাসনার একটা অঙ্গ হিসেবে, যে গান শোকে-দুঃখে, আনন্দ-উৎসবে, প্রেমে-বিরহে, আমাদের মনে এই পৃথিবীতেই অপার্থিব অনুভূতি দিতে পারে, সেই গান শোনাও নিষিদ্ধ ছিলো আফগানিস্তানে। এমনকি পুরুষ হলে দাড়ি গজানো ছিল বাধ্যতামূলক। সেই দাড়ি ঠিকমতো লম্বা হচ্ছে কি না, তাও মেপে দেখার লোক ছিলো। কিন্তু দেশের অসংখ্য গরিবদের দু'বেলা খাবার জুটছে কি না, তা দেখার মতো লোক ছিল না। ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করার নমুনা স্তালিন এবং পল পটও সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু অত্যাচারী শাসনের মাধ্যমে ঘড়ির কাঁটা পিছিয় দেয়ার এমন নমুনা তালেবানরা স্থাপন করেছিলো, যার কোনো তুলনা নই। স্তালিন এবং পল পট তাদের ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার পেছনে যুক্তি দিয়েছিলেন মানব-কল্যাণের; আর তালেবানরা এ সবই করেছিলো বাহ্যত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নামে, কিন্তু মূলত নিজেদের ক্ষমতাকে স্থায়ী করার উদ্দেশে।

ধর্মের দোহাই দিয়ে তালেবানরা যা করেছে, তাকে অবশ্য কোনো মতেই

* তালেবানি শাসনের অবসানে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে– সম্পাদক মণ্ডলী।

একক বা অভূতপূর্ব বলা যায় না। এর আগেও স্বার্থবাদী মহল অসংখ্যবার ধর্মের নাম দিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করেছে, মানুষের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। দৃষ্টান্তের জন্যে দূরে যাওয়ার দরকার নেই। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ধর্মের দোহাই দিয়ে, কিন্তু আসলে নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসনকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে, তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের লাখ লাখ লোককে হত্যা করেছিলো। ধর্ষণ করেছিলো লাখ লাখ মহিলাকে। পুড়িয়ে দিয়েছিলো অসংখ্য বাড়িঘর। আর পরের সম্পত্তি লুণ্ঠনের ঘটনা কতো ঘটেছিলো তার কোন হিসেব নেই। একজন লেখকের মতে, পাকিস্তানের সৈন্যরা যে, নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে অমন পশুর মতো অত্যাচার করতে পেরেছিলো, তার একটা কারণ, তাদের বোঝানো হয়েছিলো যে, ধর্মের নামে তারা যা করবে, তাতে বিজয়ী হলে তারা স্বর্গে যাবে, এমন কি মৃত্যু হলেও তারা স্বার্গে যাবে। তাছাড়া যে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করছে, তাদের নারী এবং সম্পত্তির ওপরও তাদের অধিকার ধর্মসম্মত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিধর্মী বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছিলো, তারা কেবল হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা খ্রিস্টান ছিল না, বেশিরভাগই ছিল মুসলমান।

বস্তুত, অনেক সংগঠিত ধর্মীয় গোষ্ঠীই মনুষ্যত্বের চেয়ে বেশি ঝোঁক দেয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি, প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতি। সত্যি বলতে কি, এ রকমের বহু সংগঠিত ধর্মই ঈশ্বরে মানুষের বিশ্বাস অথবা আধ্যাত্মিকতার প্রতি তার প্রেম জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে না। এমন কি ধর্মগ্রন্থের মূল বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাও জাগিয়ে তোলে না। বরং ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা, জড় বিধান, আচার-ব্রত ইত্যাদিকে সুদৃঢ় করে তোলে। এবং তার ফলে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে গড়ে ওঠে এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিভেদের দেয়াল। জাতি-পাতি, ছোঁয়া-ছুঁয়ি, দাড়ি-টীকির ব্যবধান তৈরি হয়। বস্তুত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ ধর্মীয় বিধানের প্রতি যতোটা আনুগত্য দেখায়, মানবিক গুণাবলীর অথবা মানব-কল্যাণের প্রতি ততোটা প্রীতি প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করে না। মানবিকতার প্রতি তার আনুগত্য বড়জোর ওষ্ঠ-গভীর। সততা, সত্যবাদিতা, পরোপকার, ন্যায়নিষ্ঠা, সেবা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণাবলীর চেয়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনকেই সে বেশি শ্রেয় বলে গণ্য করে।

সম্প্রতি আলজেরিয়ার চরম ডানপন্থী একটি জঙ্গিবাদী দল তরুণদের দলভুক্ত করার উদ্দেশে একটি প্রচারমূলক ভিডিও প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, সৃষ্টিকর্তার নামে খুন করো। যতক্ষণ না তুমি নিজে নিহত হচ্ছো ততোক্ষণ খুন করো। তুমি যদি এভাবে নিহত হও, তা হলে সৃষ্টিকর্তা তোমার ওপর খুশি হবেন এবং চিরকালের জন্যে তোমার জায়গা হবে স্বর্গে। (যে-স্বর্গে খাদ্য এবং সুন্দরী নারীর সীমাহীন সরবরাহ থাকবে।) অন্য ধর্মের অনুসারীদের উল্লেখ করে এই ভিডিওতে বলা হয়েছে যে, তারা যা করছে, তা সৃষ্টিকর্তার নামে করছে না, করছে

শয়তানের নামে। যে বাণী এই ভিডিওতে প্রচার করা হয়েছে, তাকে নিতান্ত সংকীর্ণ এবং বিভেদমূলক না বলে অন্য কিছু বলা যায় না। এই ভিডিওতে যেভাবে সৃষ্টিকর্তা এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের চিহ্নিত করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাসীদের এমনটা মনে হতে পারে যে, এই ধর্মের অনুসারীদের যে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করছেন, অন্য মানুষদের সেই একই সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেননি। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তাও সাম্প্রদায়িক। তাছাড়া এই ভিডিওতে যেভাবে নিজের এবং অন্যদের জীবনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে জীবন বিসর্জনকে উৎসাহিত এবং গৌরবান্বিত করা হয়েছে, তা উচ্চ আদর্শের দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না।

বস্তুত গোড়াতে ধর্মের যে ভূমিকা ছিল এখন মানবসমাজে ধর্ম সেই ভূমিকা পালন করছে কি না, অথবা পালন করতে পারছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ ধর্ম এখন অনেক ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিকতার বাহন নয়। ধর্ম এখন অনেকের কাছে ক্ষমতা লাভের একটা হাতিয়ার। ধর্মপ্রচারকদের উদ্দেশ্য গোড়াতেই যাই থাক না কেন, ধর্মের নামে এখন যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা অন্য পাঁচটা মতবাদের মতোই ধর্মের নাম ভাঙিয়ে নিজেরা ফায়দা লুটতে চান। নিজেদের শক্তিকে স্থায়ী করতে চান। মার্কসবাদকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা দখল করার সময়ে অথব ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা থেকে কোনো কোনো কমিউনিস্ট নেতা যেমন অসংখ্য লোককে মেরে ফেলতে অথবা তাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের সরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হননি, ধর্মের নেতৃত্ব যারা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন, তারাও তেমনি অগণিত মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধা করেননি অথবা দ্বিধা করছেন না।

সত্যের জন্যে যদি কেউ নিজের জীবন বিসর্জন দেয়, সেটাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু ধর্মের নাম ভাঙিয়ে ক্ষমতা দখলের অথবা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যে কেউ জীবন দিলে তাকে ধর্মযুদ্ধ বলা সঙ্গত নয়। অথবা সেই যুদ্ধের নাম করে অন্যের জীবনহানি করলে তকে জঘন্যতম হত্যা না বলে অন্য কিছু বলা যায় না। বিপ্লবপরবর্তীকালে ইরানে যেসব হানাহানি হয়েছিলো, তা ধর্মীয় নেতার উস্কানিতেই হয়েছিলো। এবং তাকে অধর্ম ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় কি? তেমনি, বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের ওপর আক্রমণ করে শিশু এবং বৃদ্ধসহ হাজার হাজার নিরপরাধ নরনারীর প্রাণহানি করার মধ্যে কোনো বীরত্ব ছিলো বলে মনে করা শক্ত, তাতে তার পক্ষে ধর্মীয় অথবা জাতীয়তাবাদী যুক্তি যাই দেয়া হোকনা কেন। বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের ওপর দুটি বিমান বিধস্ত করে যে বীরপুঙ্গবরা 'শহীদ' হয়েছিলো, তাদের একজন নেতা লিখে রেখে গেছে, কিভাবে আঘাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নিজের বুক উঁচু করে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু সেই দু'টি বিমানের একটিতে ছিলো স্কটল্যান্ডের একটি কম বয়সী মা এবং তার

আড়াই বছরের ছেলে। ধাক্কা লাগার আগের মুহূর্তে তারা কি বলবে, এই বীরপুঙ্গব তা লিখে রেখে যায়নি।

খুব সম্ভব মহাকাব্যের কল্পিত নায়ক রাম। এই মহাকাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী তার জন্মস্থান অযোধ্যায়, যদিও সেই বর্ণনা থেকে তার জন্মের জায়গাটিকে একেবারে সুনির্দিষ্ট করে কয়েক শ গজের মধ্যে চিহ্নিত করা যায় কি না, তা নিয়ে অবশ্যই বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কেবল সেই জায়গাটি খুঁজে বের করেনি, বরং তারা সেখানে চারশ বছরের পুরোনো একটি মসজিদও আবিষ্কার করেছে। দেবতার জন্মস্থানের ওপর বিধর্মীদের ভজনালয় থাকতে দেয়া আর যাইহোক কোনো উৎসাহী ধর্মাবলম্বীর পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। সুতরাং বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার দাবি একটা রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে একে কেন্দ্র করে একটা কট্টর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও গড়ে ওঠে। অতঃপর দুর্বল নরসীমা রাওয়ের শাসনামলে, ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে, অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে নিষ্ক্রিয় নিরাপত্তা বাহিনীর চোখের সামনে অত্যুৎসাহীরা বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেললো।[৩] মসজিদটি ইট-পাথর-চুন-সুরকি দিয়ে তৈরি। ভেঙে ফেলার ৪৩ বছর আগে থেকে সেখানে উপাসনাও হয়নি। সুতরাং সেই মসজিদ ভেঙে ফেললে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আহত হতে পারেন। কিন্তু সে ঘটনা কেয়ামত অথবা প্রলয়ের মতো গুরুতর ঘটনা নয়। তবু সেই ঘটনার অব্যবহিত পরে যে দাঙ্গা শুরু হয়, তাতে ভারতেরই তিন হাজার লোক নিহত হয়েছিলো। এবং এ দাঙ্গা কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বাবরি মসজিদ থেকে শত শত মাইল দূরে বাংলাদেশেও তার ঢেউ এসে লেগেছিলো। বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের মন্দির তো পোড়ানো হয়ই, এমন কি হিন্দুদের ওপর শুরু হয় নানা ধরনের নির্যাতন। ভোলার মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলের হিন্দুরা বাবরি মসজিদ ভাঙার সঙ্গে প্রত্যক্ষ তো দূরের কথা, পরোক্ষভাবেও যুক্ত ছিলো না। কিন্তু তারাও এই দাঙ্গার শিকারে পরিণত হয়। তাদের ঘরবাড়ি পোড়ানো হয়। সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। এমন কি, ধর্ষিতা হয় তাদের ঘরের মহিলারা। এবং বাবরি মসজিদের বিতর্ক এখানেই থেমে যায়নি। তার জের চলতে থাকে বছরের পর বছর। এর ফলে সমগ্র উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী বিপন্ন হয়। তার চেয়েও খারাপ, এ ঘটনা বহু ধর্মভীরু মানুষকে সম্ভবত চিরদিনের জন্যে ধর্মান্ধ করে দেয়। সবেচেয়ে খারাপ, এ ঘটনার ফলে ডানপন্থী রাজনীতি রাতারাতি জোরদার হয়। সত্যি বলতে কি, এ ঘটনা না ঘটলে কংগ্রেসের নপুংষকতা সত্ত্বেও ভারতে ডানপন্থী বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারতো কি না সন্দেহ করি। একবার ক্ষমতায় আসার পর সেই ক্ষমতাকে আঁকড়ে রাখার উদ্দেশে বিজেপি কোমর বেধে সেই ধর্মের নামই ব্যবহার করতে শুরু করে। একদিকে, তারা– বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিবসেনা এবং আর এস এসকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু

জাতীয়তাবাদকে যদ্দুর সম্ভব প্রবল করে তোলে। অন্যদিকে ভারতের উদার ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানকে পর্যন্ত বদলে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। আরও শোচনীয়, তারা কিছু তথাকথিত চরিত্রহীন বুদ্ধিজীবীর সহায়তায় নতুন করে ইতিহাস লেখার অর্থাৎ বিকৃত করে ইতিহাস রচনার কাজ আরম্ভ করে।

বাবরি মসজিদ ভেঙে সেখানে রামমন্দির নির্মাণের জাতীয়তাবাদী উদ্যোগের সর্বসাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়া ঘটে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। নতুন করে রামমন্দির নির্মাণের কর্মসূচি নিয়ে সক্রিয় ধর্মান্ধরা অযোধ্যায় গিয়ে করসেবার মাধ্যমে এই মন্দির নির্মাণে সহায়তা করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তারা যখন ট্রেনে করে অযোধ্যায় যাচ্ছিলো, তখন গুজরাটের একদল ধর্মান্ধ মুসলমান এই ট্রেনে আগুন লাগিয়ে ৫৮ জন হিন্দুকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। তাদের মধ্যে নারী এবং শিশুও ছিল। দু'দিনের মধ্যে তার যে প্রতিক্রিয়া হয় দোসরা মার্চের (২০০২) গার্ডিয়ান পত্রিকায় লিউক হার্ডিং-এর লেখা প্রতিবেদনে তার সামান্য পরিচয় মেলে :

'অপরাহ্নে ক্রুদ্ধ জনতা আহসান জাফরির বাড়ির আঙিনায় ঢুকে পড়ে। তারা তার দোতলা বাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে কেরোসিন ঢেলে দেয়। লোকসভার এই সাবেক মুসলিম সদস্য কংগ্রেস দলের হয়ে উল্লেখযোগ্য সেবা করেছিলেন। তিনি সাহায্য চাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নিরুপায় হয়ে তিনি টেলিফোনে যে সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন, পুলিশ তাতে কোনো সাড়া দেয়নি। তারপর আত্মরক্ষা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে মি. জাফরি যখন তার পিস্তল দিয়ে শূন্যে ফাঁকা আওয়াজ করেন, তখন হাজার দশেক লোকের সেই হিন্দু জনতা তার বাড়ির ওপর আক্রমণ করে তাকে টেনে রাস্তায় নামায়।

তার মাথার ওপর প্যারাফিন ঢেলে দিয়ে তার শরীরে যখন আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়, তার আগেই তিনি নিহত হয়েছিলেন কি না, সে সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত নয়। জনতা তার শ্যালক, শ্যালকের স্ত্রী এবং তাদের দুটি ছোটো ছেলেকেও বাড়ি থেকে টেনে বের করে পুড়িয়ে মারে।

আহমেদাবাদের চমনপুরায় মুসলমানদের একটি ছোট এলাকার চারদিকে বিরাট সংখ্যক হিন্দুদের বসবাস। গতকাল সেই চমনপুরা নরকের চেহারা নিয়েছিলো মি. জাফরির বাড়ির বাইরে একটি চিতায় ছিলো পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া ছোট্ট একটি হাত, তখনও মুষ্ঠিবদ্ধ। জাফরির নাম-ফলকটি পড়ে ছিলো এক গাদা আধপোড়া বই আর মানুষের চুলের পাশে। গুলবাগ হাউসিং সোসাইটির সবার ভাগ্যই হয়েছিলো মি জাফরির মতো। তাদের পোড়া বাড়ির বাইরে হিন্দু জনতা এসে গতকাল ভিড় করেছিলো। সেখানে বেশিকিছু দেখার ছিলো না। বাইসাইকেলের চাকা আর গদির সঙ্গে পেঁচিয়ে পড়ে ছিলো মানুষের বেঁকে যাওয়া মেরুদণ্ড। নগরের হিন্দু পুলিশ বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার দরুণই এই হত্যাযজ্ঞ সম্ভব হয়েছিলো। হিন্দু জনতা মুসলিম এলাকায় যে ধ্বংসলীলায়

> মেতে উঠেছিলো পুলিশ নির্বিকার দর্শকের মতো তা কেবল প্রত্যক্ষ করেছিলো। 'আমাদের মেরে ফেলছে! দোহাই আপনাদের, আমাদের এই নরক থেকে রক্ষা করুন!' মিনতি করে বলেছিলো দিশু বানাশেক নামে একজন মুসলমান। 'ওরা আমাদের ওপর গুলি করছে। আমাদের মেয়েদের কয়েকজনকে এরই মধ্যে ওরা ধর্ষণ করেছে। দোহাই, আপনারা আমাদের সাহায্য করুন।'

পরবর্তী ক'দিনের মধ্যে এতো মুসলমান পুড়িয়ে হত্যা করা হয় যে, কেবল ৫৮ জন হিন্দুকে পুড়িয়ে মারার প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা থাকলে, সে সাধ বহু আগেই মিটে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু মুসলমান পোড়ানোর তৎপরতা চলতেই থাকে বিশেষ করে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুমোদনে। তার নাম নরেন্দ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নর না হয়ে অন্য কিছু হলেই বেশি মানানসই হতো। সে যাই হোক, যে স্বল্পসংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তা দাঙ্গা দমনের জন্যে উদ্যোগ নেন, তাদের চাকরি চলে যাওয়া ছাড়া, পুলিশ বাহিনীর আর কোনো অসুবিধেয় পড়তে হয়নি, অথবা গুজরাটে তাদের সমালোচনাও হয়নি। এক মাসের মধ্যে মৃতের সংখ্যা দু' হাজারে পৌঁছলেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী নিজের নাম সার্থক করে ধৈর্যে অটল থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী মোদীর ওপর তার আস্থাও অটল থাকে। দাঙ্গা শুরু হওয়ার পাঁচ সপ্তাহ পরে বাজপেয়ী প্রথম সরেজমিনে দাঙ্গাপীড়িত এলাকা দেখতে বের হন। অনেকে বলেন যে, দাঙ্গার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রাখা ছাড়া, তার কোনো উপায় ছিলো না। কারণ, এই দাঙ্গা শুরু হওয়ার ঠিক আগে যে-চারটি রাজ্যে বিধান সভার নির্বাচন হয়েছিল, তাতে বিজেপি ভালো ফল করতে পারেনি। রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদের মতে, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্লাবিত দেশে এই দাঙ্গা বিজেপির ভাগ্য ফেরাবে বলে মনে করা হচ্ছিলো।

১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ও বাংলাদেশে এবং তার দশ বছর পরে এবারে ভারতে যেসব অমানুষিক ঘটনা ঘটেছে, সবই ঘটেছে ধর্মের নামে। ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষের কীর্তি এসব। এসব হত্যাযজ্ঞে যারা মেতে উঠেছিলো, তাদের একদল উন্মত্ত হয়েছিলো একটি অব্যবহৃত মসজিদের নামে। অন্য দল মেতে ওঠে এক কল্পিত দেবতার তথাকথিত জন্মস্থানের নামে। অথচ একটি ধর্মীয় ভবন কি একটি মানুষের থেকে বেশি পবিত্র? একটি মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান? অন্তত বাঙালি কবি তা বলেননি। উদাত্ত কণ্ঠে চরম ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন : 'জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়/ ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।'

বাবরি মসজিদের প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে, ১৯৬৩ সালের আর-একটি ভয়াবহ ঘটনার কথা। ঐ বছরের শেষে কাশ্মীরের একটি মসজিদ থেকে ইসলাম ধর্মপ্রবর্তকের পবিত্র কেশ চুরি হয় অথবা খোয়া যায়। সে কেশের ঐতিহাসিক মূল্য

নিশ্চয় ছিলো। চুরি হওয়ার ঘটনাও নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এই চুরিকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতের মুসলমানরা কোনো কোনো জায়গায় নিরপরাধ হিন্দুদের হত্যা করতে শুরু করে। এই রক্তপাতের প্রতিক্রিয়ায় জব্বলপুরসহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন জাযগায় আরম্ভ হয় হিন্দু-মুসলমানের নজিরবিহীন দাঙ্গা। আবার, উত্তর ভারতের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় যে-দাঙ্গা শুরু হয়, তাও ছিলো নজিরবিহীন। ১৯৫০ সালেও পূর্ব পাকিস্তানের যেসব জায়গায় দাঙ্গা হয়নি, তেমন অনেক জায়গাতেও সেবারে দাঙ্গা হয়েছিলো। সেবারে জয়দেবপুর এবং কাওরাইদের মধ্যে ট্রেন থেকে নামিয়ে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে যেভাবে বহু হিন্দুকে খুন করা হয়, তা সত্যি সত্যি রোমহর্ষক। অথচ যে-হিন্দুদের হত্যা করা হয়, তারা কেউ এই কেশ চুরির জন্য দায়ী ছিলো না। এমন কি, এই কেশ চুরির কথা তাদের অনেকে শোনেও নি। নিরপরাধ লোকদের প্রতিশোধমূলক হত্যা করার ঘটনাকে কোন ধর্মের দোহাই দিয়ে যুক্তিযুক্ত বলা যায়, আমার জানা নেই। অন্তত ইসলাম ধর্ম অনুসারে তো নয়ই। পাছে তার কবর পূজা শুরু হয়, সে জন্যে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক তার কবরের ওপর কোনো আচ্ছাদন নির্মাণ করতে নিষেধ করেছিলেন। সেই ধর্মপ্রবর্তকের কেশের প্রতি মুসলমানরা যে সম্মান দেখাচ্ছিলেন, তাকে পরোক্ষ মূর্তিপূজা ছাড়া নিতান্ত অধর্মই বলতে হয়। কেশ যারই হোক, তা কোন মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান নয়। অথবা সেই কেশের পূজাও কোনো যুক্তিপূর্ণ অথবা ধার্মিক মানুষ সমর্থন করতে পারে না।

মৌলবাদ

সাম্প্রতিক কালে ধর্ম নিয়ে যে-অতিরিক্ত উৎসাহ দেখা দিয়েছে, তা অবশ্য ভারতীয় উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বের বহু জায়গাতেই তা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এই ধর্মীয় উৎসাহ মিলে সোনায়-সোহাগার মতো কাজ করছে। এর ফলে জাতীয়তাবাদ যেমন তীব্র হয়ে উঠেছে, ধর্মের প্রতি উৎসাহও তেমনি বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতো চারদিক সয়লাব করে ফেলেছে। বস্তুত এই দুই মনোভাব সোনায় সোহাগার মতো একে অন্যের পোষকতা করেছে। ধর্ম যদি কারো ব্যক্তিজীবনে, এমন কি সমাজ-জীবনে, আধ্যাত্মিকতার বাহন হয়ে দেখা দেয়, তা থেকে কোনো অমঙ্গল সূচিত হতে পারে না; বরং তা থেকে মঙ্গলই দেখা দিতে পারে। কিন্তু ধর্মের নামে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, তা আসলে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ একটি প্রবল মনোভাব, ধর্মীয় চেতনাও প্রবল মনোভাব। এই দুই মনোভাবের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে একটি তীব্র প্যাশন। এবং সেই প্যাশন জাতীয়তাবাদকে একটা জঙ্গি চেহরা দিয়েছে আর

ধর্মকে দিয়েছে মৌলবাদী লেবাস।

এই মনোভাব উদারনীতি এবং গণতান্ত্রিক সহনশীলতাকে বিনষ্ট করেছে। এর ফলে কেবল দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ অথবা জাতির মধ্যে নয়, একই দেশের এবং একই সমাজের মধ্যেও বিরোধিতা দেখা দিয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে যে বিশ্ব এখন একেবার ছোট হয়ে এসেছে, যে বিশ্বের মানুষ এখন মোকাবেলার বদলে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল, সেই বিশ্বের সঙ্গে এই জঙ্গি জাতীয়তার কোনো সঙ্গতি নেই। বর্তমান কালে খুব কম দেশই আছে যে দেশের সমাজ বহু-বাচনিক নয়। পুরো দেশ এক ধর্মের, এক মতের অনুসারী, এটা এখন কল্পনা করা শক্ত। সুতরাং সেই বহু-বাচনিক সমাজে অথবা দেশে জঙ্গি জাতীয়তাবাদ অনিবার্যভাবে হানাহানির জন্ম দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নাইজেরিয়া অথবা সুদানের দিকে তাকালে দেখতে পাবো, সে দেশে ধর্মনিরপেক্ষ আইন থাকবে, নাকি ইসলামী আইন থাকবে, তা নিয়ে রীতিমতো দাঙ্গা হয়েছে। চুরি করলে হাত কেটে ফেলা হবে, এ রকমের আইন আধুনিক বিশ্বের উপযোগী কি না, অথবা চোরের হাত কেটে ফেললে স্থায়ীভাবে সেই চোর এবং সমাজের সমস্যার সমাধান না হয়ে একটা স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে কি না, সে বিতর্কে না গিয়েও এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে, দেশে একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায় থাকলে, সে দেশে কোনো একটা ধর্মীয় আইন চালু করা সঙ্গত নয় অথবা বাঞ্ছিতও নয়। উদারনীতি অথবা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দিয়ে সেটা সমর্থন করা যায় না। এবং যায় না বলেই সুদানে এবং নাইজেরিয়ায়, বিশেষ করে নাইজেরিয়ায় ব্যাপক দাঙ্গায় বহু লোক নিহত হয়েছে এবং হবে।

জঙ্গী জাতীয়তাবাদের বিকাশের ফলে আরও একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যাকে বলা যায়, ধর্মের মৌলবাদী ব্যাখ্যা এবং অনুসরণ। গোড়াতে ধর্মের যে আদর্শ ছিলো, অথবা ধর্মগ্রন্থে যেসব বিধান লেখা আছে, সেখানে ফিরে যাওয়ার সক্রিয় আদর্শকে বলে মৌলবাদ। মৌলবাদ পৃথিবীর হালতম হুজুগে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে সবচেয়ে উন্নত এবং সবচেয়ে ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে বিজ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা গরিব দেশ আফগানিস্তান পর্যন্ত পৃথিবীর বহু দেশেই মৌলবাদের জোয়ার এসেছে। দরিদ্র, বঞ্চিত অথবা নির্যাতিত দেশে জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকে ধর্মীয় মৌলবাদ উৎসাহিত হতে পারে; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রক্ষণশীলতার যে জোয়ার দেখা দিয়েছে, দেশের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে খামারের মালিক পর্যন্ত সাধারণ মানুষ যেভাবে ঈশ্বর নয়, বরং ঈশ্বরের পুত্রকে নিয়ে মেতে উঠেছেন, তা দেখলে আন্তরিকভাবে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এই জনগোষ্ঠী অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং অন্ধবিশ্বাসের মধ্য যেভাবে আপোষ করতে পেরেছে, তাও একান্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। যদিও একথা ঠিক যে, মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই মৌলবাদ দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। বছরে বছরে নায়াগ্রা সম্মেলনে মৌলবাদী মনোভাব জোরালো হয় এবং প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরে ১৯১৯ সালের মহাসম্মেলনে মৌলবাদ মার্কিন সমাজের পাকাপোক্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়।[৪] কিন্তু তারপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এবং উদার চিন্তারও বিকাশ কম হয়নি। যা নতুন বলে মনে হচ্ছে, তা হলো যে মৌলবাদ এক সময়ে কতোগুলো ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা এখন বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অন্যদের প্রতি অসহিষ্ণুতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। খ্রিস্টানদের মধ্যে নতুন নতুন সম্প্রদায় যেভাবে তৈরি হচ্ছে, তাও এই মৌলবাদী মনোভাব থেকেই। সংস্কার ও অগ্রগতির দিকে না গিয়ে খ্রিস্টানরা এখন প্রতিযেগিতায় নেমেছে, কে কতোটা মূল এবং অতীতের পথে ফিরে যেতে পারে। নয়তো প্রাণরক্ষার খাতিরেও অন্যের রক্ত দিয়ে চিকিৎসা করায় কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়। অথবা আপত্তি থাকা উচিত নয় পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা মেনে নিতে।

খ্রিস্টীয় মৌলবাদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মীয় মৌলবাদও এখন মড়কের মতো বিশ্বকে গ্রাস করছে। এখন আর মার্কিন মুলুকে সীমাবদ্ধ নয়, মৌলবাদ এশিয়ার পূর্ব উপকূল থেকে আফ্রিকা এবং ইউরোপের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিশাল ভূভাগে ছড়িয়ে পড়ছে। ইসলামী মৌলবাদ, ইহুদী মৌলবাদ, এমন কি যা অবিশ্বাস্য এবং তত্ত্বত অসম্ভব– হিন্দু মৌলবাদ তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। এই মৌলবাদের কতোটা ধর্মীয় মৌলবাদ, কতোটা জঙ্গী জাতীয়তাবাদ, তা অবশ্য সঠিকভাবে বলা শক্ত। কিন্তু এর মূলে যাই থাক না কেন, এরা অনেক ক্ষেত্রে একে অন্যের এলাকায়ং উপচে পড়ছে। ইন্দোনেশিয়ায় সংখ্যালঘু চীনাদের ওপর মুসলমানদের সাম্প্রতিক নির্যাতন হিংস্রতা এবং নির্মমতার দিক দিয়ে রীতিমতো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।[৫] পূর্ব তিমুরে তাদের শিকারে পরিণত হয় সংখ্যালঘু অসংখ্য খ্রিস্টান। মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালেই আমাদের বক্তব্য বোঝা যাবে। বিশেষ করে ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ মৌলবাদ এবং কট্টর জাতীয়তাবাদকে একাকার করে ফেলে। ইহুদীরা একাধারে উচ্চশিক্ষিত, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অধিকারী এবং অন্ধবিশ্বাসে জর্জরিত। সে দেশের রাজনীতি এবং সমাজ যেভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত, তার তুলনা কমই মেলে। তদুপরি, প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোর প্রতি তাদের মনোভাব অসম্ভব যুদ্ধংদেহী। মাত্র ষাট বছর আগেই ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের জন্যে লাখ লাখ ইহুদী নাৎসিদের শিকারে পরিণত হয়েছিলো। সংখ্যালঘু হিসেবে পীড়িত হলে যে যন্ত্রণা কিভাবে দগ্ধ করে, সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সেই ইহুদীরাই এখন রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে ভয়ানক সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে গৃহহীন অত্যন্ত দরিদ্র ফিলিস্তিনিদের নির্মম হাতে নিপীড়ন

করতে একটুও দ্বিধাবোধ করছে না। বরং এই সন্ত্রাসী তৎপরতায় তারা অনুপ্রেরণা পাচ্ছে তাদের ধর্ম থেকে।

ইহুদীদের হাতে যারা নির্যাতিত, সেই মুসলমানরা প্রযুক্তিতে ইহুদীদের মতো অগ্রসর নয়, ঠিকই। কিন্তু তাই বলে ইসলামী মৌলবাদ ইহুদী মৌলবাদের চেয়ে দুর্বল নয়। বরং সম্ভবত তার চেয়েও বেশি জঙ্গি। তা না হলে নিজেদের জীবনের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা এবং মূল্য না দেখিয়ে, শত শত মুসলিম তরুণ সম্প্রতি অন্যদের জীবননাশের যে ধ্বংসলীলায় মত্ত হয়েছে, তা হতে পারতো না। আত্মঘাতী বোমা-হামলাকারী তার বন্ধুদের নির্দেশ দিয়ে যেতে পারতো না যে, তারা যেন তিন দিন পরে তার বাড়িতে গিয়ে ফুর্তি করে এবং সেই সঙ্গে মিষ্টি খেয়ে আসে, কারণ সেদিন বেহেস্তে তার বিয়ে হবে। মৌলবাদে বিশ্বাস আছে বলেই ফিলিস্তিনী মা চুমু খেয়ে হাসিমুখে তার একুশ বছর বয়সী আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী পুত্রকে চিরবিদায় দিতে পারেন এবং পুত্রও হাসিমুখে মাকে চুমু খেয়ে চিরবিদায় নিতে পারে। ১৬ জুন (২০০২) তারিখে মাতা পুত্রের এই বিদায়ের যে দৃশ্যটি ভিডিওতে ধরা পড়েছে, তা থেকে দেখা যায়, মা অথবা ছেলের মুখের একটি পেশীও আসন্ন চরম ঘটনার কথা ভেবে কুঞ্চিত হয়নি। মৌলবাদে অন্ধ বিশ্বাসের জন্যেই এই বিদায়ের অল্প পরে নাঈমা যখন খবর পান যে, তার পুত্র মাহমুদ আত্মঘাতী হামলায় নিহত হয়েছে, তখন তিনি বলতে পারলেন যে, সেটি তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। তার পাড়া প্রতিবেশীরা তার পুত্রকে শহীদ এবং তাকে শহীদ জননী বলে গৌরবান্বিত করতে পারলেন। এই একই চেতনা থেকে ফিলিস্তিনি পিতামাতা শিশুপুত্রকে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর সাজে সজ্জিত করে তার ছবি তুলতে পারেন। বলা বাহুল্য, ফিলিস্তানে ইসরাইল যে নির্মম এবং নজিরবিহীন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে এবং অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনিরা যে দারিদ্র্য, নিপীড়ন এবং হতাশার মধ্য কোনোক্রমে বেঁচে আছেন, তার ফলে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের উত্থান হতেই পারে। এবং সেই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ আত্মবিসর্জনেও এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই আত্মবিসর্জনে সত্যকার সাহস এবং ইন্ধন জোগাচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদ। পরকালের অনন্ত সুখের আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে বলেই এই তরুণ তরুণীরা তাদের সমস্ত জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে।

আসলে এখানে উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় মৌলবাদ একাকার হয়ে গেছে। একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। আল-কাইদার সামরিক প্রশিক্ষণের একটি ভিডিও দেখেছিলাম, যাতে ফৌজী উর্দি-পরা তরুণদের এক হাতে কালাশনিকফ রাইফেল অন্য হাতে কোরান নিয়ে মার্চ করার ছবি ছিলো। যে ইসলাম ধর্মে সাম্য এবং মৈত্রীর আদর্শের প্রতি এতো শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে, যে

ধর্মে জোর-জবরদস্তি নেই বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যে ধর্মে বলা হয়েছে 'তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার', যে-ধর্মের নামই শান্তির ধর্ম, আমার বিবেচনায় এই মার্চের দৃশ্য সেই ধর্মের সত্যিকার অবমাননা।

এমন কি, যে-হিন্দু ধর্মের কোনো বিশেষ ধর্মগ্রন্থ নেই, কোনো বিশেষ প্রবর্তক নেই, যে-হিন্দু ধর্ম শত শত বছর ধরে শক-হুন দল, মোগল-পাঠানকে নিজের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে, সমন্বিত হতে দ্বিধা করেনি, সেই হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা পর্যন্ত মৌলবাদী অথবা, নিদেন পক্ষে, ধর্মীয় জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। যে-ভারত গোড়া থেকে একটা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছিলো, সেই ভারত এখন অন্য মানুষের অধিকারের প্রতি কদলী দেখিয়ে কট্টর জাতীয়তাবাদের গৈরিক পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। শিবসেনা, আরএসএস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহায়তায় ডানপন্থী বিজেপি এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।* ভারতে এই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বিজয় পড়শি দেশগুলোর ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ার ফসল কিনা, তা নিয়ে পণ্ডিতরা বিতর্ক করতে পারেন। কিন্তু এ যে ভারতের বহু শতাব্দীর উদারপন্থার পরাজয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ নেই।

উত্তর আয়ারল্যান্ডে দেখতে পাই বছরের পর বছর ধরে চলছে অতি রক্ষণশীল ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল খ্রিস্টানদের হানাহানি। ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের এ রকমের হানাহানির দৃষ্টান্ত কেবল উত্তর আয়ারল্যান্ডই প্রথম স্থাপন করলো, তা নয়। সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রোটেস্ট্যান্টদের যে যুদ্ধ শুরু হয়, তা জার্মানি এবং অস্ট্রিয়াসহ বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তিন দশক ধরে সে যুদ্ধ চলে এবং বলা হয় যে, তাতে এক কোটিরও বেশি লোক নিহত হয়েছিলো। কিন্তু তার পর তিনশ বছর চলে গেছে এবং জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পৃথিবী এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও, বিংশ শতাব্দীর শেষে এবং একবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে উত্তর আয়ারল্যান্ডে যে হানাহানি চলছে, তা কেবল রাজনীতি অথবা জাতীয়তাবাদের কারণে নয়। ধর্মান্ধতাও অনেকটাই জড়িয়ে আছে তার সঙ্গে। বস্তুত ধর্মান্ধতা এমন আষ্ঠেপৃষ্ঠে এই দেশের দুই সম্প্রদায়কে আচ্ছন্ন করেছে যে, এই দেশের এক সম্প্রদায়ের তরুণের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের তরুণীর প্রেম এবং বিবাহকে পর্যন্ত এই দেশের মৌলবাদী নাগরিকরা মেনে নিতে পারছে না। এ রকমের একাধিক তরুণ-তরুণীকে খুন করে তারা নিজেদের 'ধর্মীয় দায়িত্ব' পালন করেছে। বলা বাহুল্য, একমাত্র ধর্মান্ধতাই এমন বর্বরোচিত কাজে মানুষকে উৎসাহিত করতে পারে। পিতার বন্ধুর হাতে ধর্ষিত হওয়া একটি ষোলো-সতেরো বছর বয়সী মেয়ে যখন সে

*কিছুদিন আগে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে – সম্পাদক মণ্ডলী

দেশে গর্ভপাত করতে চায়, তখনও তার অনুমতি মেলে না। স্বাস্থ্যগত কারণে গর্ভপাতও সেখানে বেআইনি। অনিবার্য কারণে গর্ভপাত করা যাবে কি না, তা নিয়ে সে দেশে যখন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, তখনো সে দেশের বেশির ভাগ লোক গর্ভপাতের বিরুদ্ধে রায় দেয়। ২০০২ সালের ইস্টার উপলক্ষে লন্ডনের অদূরে রেডিং শহরে একটি ধর্মপ্রচারক গোষ্ঠী একটি লোককে নেংটি পরিয়ে দিয়ে ক্রুশে তুলে যিশু খ্রিস্টের রক্তাক্ত সমাপ্তির পুনরাভিনয় করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিককালে বহু খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক প্রকাশ্য সভায় যিশু খ্রিস্টের নামে দুরারোগ্য রোগ ভালো করে দেয়ার অভিনয় করেছে এবং করে চলছে। ধর্মের নাম ভাঙিয়ে যারা লাভবান হতে চায়, তাদের পক্ষে এটা অসম্ভব নয়। এবং এটা দেখে একবিংশ শতাব্দীতে অবাক না হয়ে পারা যায় না। কিন্তু যারা সত্যি সত্যি এই বুজরুকিতে বিশ্বাস করে, তাদের দেখে আরও বেশি বিস্মিত হতে হয়। ভারতে সাধু-সন্তদের এবং বাংলাদেশে পীরদের প্রতি ইদানীং যেভাবে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস বাড়ছে, তাতেও বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। শিক্ষিত লোকেরা সাম্প্রতিককালে এক-একজন সাধুর প্রতি যেরকম বিশ্বাস স্থাপন করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তেমন আন্তরিক বিশ্বাস স্বয়ং ঈশ্বরের ওপর স্থাপন করতে পারলে বহু আগেই হয়তো তাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হতো। এবং এই অন্ধ বিশ্বাস কেবল পূর্ব দেশে সীমাবদ্ধ নেই। সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারত থেকে যাওয়া রজনীশের মতো সাধুরা গিয়ে আত্মপরিচয়ের সংকটে কাতর শিক্ষিত লোকদের রহস্যময় ধর্মে অথবা বিভিন্ন যৌনাচার সম্বলিত ধর্মে দীক্ষা দিয়ে বহু অহিন্দুকে দিয়ে যেসব অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য কাজ করাচ্ছে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশে একজন ধর্মান্ধ পিতা এ রকমের একটি অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। সে কোরবানি উপলক্ষে গরু অথবা ছাগল কোরবানির প্রচলিত রীতিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি, বরং ভক্তি এবং আত্মত্যাগের মডেল তৈরি করার উদ্দেশে সে নাকি তার শিশু পুত্রের গলা কেটে কোরবানি দিয়েছে। ধর্মের নামে এই বর্বরতা হঠাৎ একদিনে আসেনি। আমার ধারণা, গত তিন দশক ধরে সৌদি আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কোন কোন দেশের পেট্রো-ডলারের সহায়তায় বাংলাদেশসহ এশিয়া এবং আফ্রিকার বহু দেশেই ধর্ম প্রচার তথা তবলীগের যে কাজ চলছে, অংশত তা ধর্মের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য এবং সেই সঙ্গে ধর্মের নামে অযৌক্তিক সংস্কারে বিশ্বাস বদ্ধমূল করেছে। এ ছাড়া, সারা পৃথিবীতে গত কয়েক দশক ধরে যে ধর্মীয় জাতীয়তার উত্থান লক্ষ্য করি, তাও হয়তো এ রকমের উন্মত্ততা উস্কে দিয়েছে। কিন্তু উন্মত্ততা যতোই বৃদ্ধি পাক, এ কথা না বলে উপায় নেই যে, এ হলো গোটা মানব সংসারকে বহু শতাব্দী পেছনে নিয়ে যাওয়ার অবাস্তব এবং দুর্ভাগ্যজনক প্রয়াস।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্যে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই এক যোগে কাজ করেছিলেন। সত্যি বলতে কি, ত্যাগ স্বীকার এবং ক্ষতির কথা বললেই হিন্দুদেরই তখন বেশি মূল্য দিতে হয়েছিলো। কিন্তু এখন সেই হিন্দুরা বাংলাদেশে কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছেন। ৭১ সালে হিন্দুসহ অগণিত মানুষ প্রাণ দিয়েছিলেন এক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্যে, এখন সংবিধান অনুযায়ী সে দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হলো ইসলাম। কোনো ধার্মিক ব্যক্তি সংবিধানের এই সংশোধন করেননি, এই সংশোধন করেছিলেন এমন একজন ফৌজী একনায়ক, নারী এবং কারণ বারিতে যার উদারতা এবং আসক্তি প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ধরে নিচ্ছি, পুণ্য অর্জনের মহৎ সংকল্প থেকে তিনি সংবিধানের এই পরিবর্তন আনেননি। এনেছিলেন নিজের গদি পাকা করার জন্যে। এই পরিবর্তন পাকা হবারও আগে যিনি এই পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন, তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্যে রীতিমতো যুদ্ধ অংশ নিয়েছিলেন এবং বীর-উত্তম বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনিও ধর্মের প্রেমে মাশুক হয়ে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান পরিবর্তন করেননি, অথবা বাঙালিদের বাংলাদেশীতে পরিণত করেননি, তিনিও করেছিলেন স্রেফ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্য নিয়ে।* সত্যি বলতে কি, উপমহাদেশে এবং বহির্বিশ্বে ধর্মের নাম ভাঙানো রাজনীতির এখন জয়জয়কার। এই রাজনীতিই আবার ধর্মকে মৌলবাদী হতে সাহায্য করছে।

মৌলবাদের একটা বড় লক্ষণ নারী প্রগতির বিরোধিতা করা। নারীদের ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখা, উচ্চ শিক্ষা না দেয়া, চাকরি করতে বাধা দেয়া, এমনকি, তাদের রক্ষণশীল পোশাক-আশাক পরতে উৎসাহিত করা মৌলবাদী মানসিকতারই প্রমাণ দেয়। এ সংজ্ঞা অনুসারেও বাংলাদেশ মৌলবাদের পথে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে দু-দু'জন মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেও, নারীদের ওপর নির্যাতনের বহু নজির সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ফতোয়া দিয়ে নারী নির্যাতনের যে দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে মৌলবাদ প্রসারেরই লক্ষণ। গত এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশে একাধিক নারীকে অংশত মাটির মধ্যে পুতে তাদের গায়ে ইটপাটকেল ছুঁড়ে হত্যা করার অথবা শাস্তি দেয়ার যে ঘটনা ঘটেছে, তার অনুরূপ ঘটনা পাকিস্তানি আমলেও কোনো দিন ঘটেনি। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের যতো বোরকা-পরা অথবা মাথায় ঘোমটা-পরা ছাত্রী দেখা যায়, পাকিস্তানি আমলে তার এক ভাগও দেখা যায়নি। সত্যি বলতে কি, কেবল বাংলাদেশে নয়, গোটা

* এই জেনারেল ক্ষমতার দর্পে বাংলাদেশের সেক্যুলার সংবিধানের চরিত্র হণন করে সংবিধানের ললাটে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বসিয়েছেন এবং সংবিধানের চার মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অপসারণ করেন। – সম্পাদক মণ্ডলী।

মুসলিম বিশ্বে নারীদের পিছিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এটা নিঃসন্দেহে মৌলবাদের স্রোতে উজান পথে যাওয়ার অভ্রান্ত উদাহরণ।

অথচ স্ববিরোধ মৌলবাদের ভেতরেই নিহিত আছে। একদিকে বিশ্ব যখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির পথ ধরে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন মৌলবাদ মানুষকে পেছনের দিকে টানছে। এ হচ্ছে সময়ের অগ্রগতিকে অস্বীকার করার অথবা সামাজিক মূল্যবোধ এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বের বিরুদ্ধে যাওয়ার অসম্ভব প্রয়াস। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইসলামী মৌলবাদের কথা বলা যায়। ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিলো দেড় হাজার বছর আগে। প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে সাম্প্রতিক এবং তার বিধি-বিধান সুলিখিত। ওয়েল ডকুমেন্টেড বলে সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কারের পথে অগ্রসর হতে সে নারাজ। সংস্কারের কথা বলায়, অথবা কিঞ্চিৎ ভিন্ন পথে চলায়, বহু শতাব্দী আগে মোতাজিলাদের নির্মম শাস্তি পেতে হয়েছিলো। সুফীদেরও ভালো চোখে দেখা হয়নি। সত্যি বলতে কি, মুসলমানরা ধর্ম নিয়ে বিতর্কও পছন্দ করেননি। আধুনিককালে এসে পশ্চিমা চাপের মুখে মুসলমানরাও হয় পশ্চিমা প্রভাবকে স্বীকার করে নিতে পারতেন– নয়তো তারা ইসলামের প্রাচীরগুলোকে শক্ত করে নিজেদের পশ্চিমা প্রভাবের হাত থেকে আড়াল করে রাখতে পারতেন। এই দ্বিতীয় পন্থাকেই অনেকে শ্রেয় বলে বিবেচনা করে ধর্মের মূলে ফিরে যাওয়ার মৌলবাদী আন্দোলন শুরু করেছেন।

এখানেই উপ্ত রয়েছে স্ববিরোধের বীজ। কারণ, ধর্মকে অনুসরণের যেসব বিধি ব্যবস্থা ধর্মগ্রন্থে আছে, তা অবিকৃতভাবে পালন করা এই পরিবর্তিত পৃথিবীতে সম্ভব কি না, তাই অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন। ব্যবহারিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে পারিপার্শ্বিক পৃথিবীকে অথবা অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে ইসলামী আইনের অথবা আদর্শের অনেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য নেই। তাই ইসলামী দেশগুলোকে তা স্বীকার করে নিতে হয়। ইসলামী আইন অনুসারে সুদ অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইসলামী দেশগুলোও সুদভিত্তিক বিশ্বের তাবৎ ব্যাংকের সঙ্গে কাজ কারবার করছে। করতে বাধ্য হচ্ছে। ইউরোপীয় দেশগুলোতে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। সেখানে যে মুসলমানরা বাস করে, তারা ইচ্ছে করলেও কোরানের দোহাই দিয়ে একাধিক বিয়ে করতে পারে না। দাসত্ব প্রথা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই নিষিদ্ধ। ধনী মুসলমানরা ইচ্ছা করলেও তাদের দেশে কি বিদেশে দাস অথবা দাসী রাখতে পারে না। এমন কি, ইসলামী মৌলবাদকে বাস্তবায়িত করার জন্যে যারা সক্রিয়, তারাও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সমাজের কোনো কোনো আধুনিক চিন্তা এবং আন্তর্জাতিক আইন অস্বীকার করতে পারছে না। বরং ধর্ম পালনের সঙ্গে জড়িত বহু জিনিসই, যেমন ধরা যাক, মাইক্রোফোন, আধুনিক বিজ্ঞানেরই আবিষ্কার। তাও তাদের মেনে নিতে হচ্ছে।

কেবল ধর্ম পালনের জন্যে নয়, জঙ্গি জাতীয়তাবাদকে বাস্তবায়িত করার জন্যে তারা যেসব মারণাস্ত্র ব্যবহার করছে, তাও আধুনিক প্রযুক্তিরই ফসল। রোগে এবং ভোগে তারা যেসব উপাদান ব্যবহার করছে, সেসব তৈরি হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান দিয়ে। কিন্তু মৌলবাদীরা এসব সত্ত্বেও সংস্কারবাদীদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে। কূপমণ্ডূকের মতো তারা যে কেবল নিজেদের একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায়, তাই নয়, তারা অন্যদেরও রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে বন্দি রাখতে চায়।

সংস্কারের প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। রামমোহন রায় যে মননশীল একেশ্বরবাদ প্রচার করেছিলেন জীবনের একটি পালনীয় আদর্শ হিসেবে, আচার-অনুষ্ঠান-পার্বন যুক্ত করে দেবেন্দ্রনাথ তাকেই একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের চেহরা দিতে চেয়েছিলেন। এমন কি, অনুসারীদের তিনি একটি ধর্মগ্রন্থও উপহার দিয়েছিলেন। সেই ধর্মগ্রন্থের ভিত্তি হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছিলেন বেদ এবং উপনিষদকে। কিন্তু বেদের সবকিছু অভ্রান্ত কি না, সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। সে জন্যে চারজন পণ্ডিতকে তিনি কাশীতে পাঠিয়েছিলেন বেদ অধ্যয়ন করে তার অভ্রান্ততা সম্পর্কে তাকে পরামর্শ দেয়ার জন্যে। এই পণ্ডিতরা যখন জানালেন যে, বেদ অভ্রান্ত নয়, তখন দেবেন্দ্রনাথ বেদ এবং উপনিষদের সেই সব শ্লোকই তার সংকলিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে গ্রহণ করেন, যেগুলোকে তার কাছে অভ্রান্ত মনে হয়েছিলো। এমন কি, তিনি কোথাও কোথাও নিজে সেই শ্লোক পরিবর্তনও করেন। মার্টিন লুথার মনে করেছিলেন যে, ল্যাটিনের দুর্বোধ্য রহস্য থেকে ধর্মকে মুক্তি দিতে পারলে লোকেরা ধর্মকে নিজের করে নিতে পারবে। তিনি তাই বাইবেলের অনুবাদ করেছিলেন দেশীয় ভাষায়। অপর পক্ষে, পোপের মনে হয়েছিলো, লুথারের এই অপপ্রয়াসের ফলে চার্চের প্রতি মানুষের অন্ধ আনুগত্য হ্রাস পাবে। তিনি তাই লুথারকে খ্রিস্টীয় চার্চ থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। লুথার অথবা দেবেন্দ্রনাথের সংস্কারের আদর্শ সবার কাছে পালনীয় দৃষ্টান্ত মনে নাও হতে পারে। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়ে যেতে না পারলে, উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সম্ভব স্ববিরোধের শিকার হওয়া।

অনেকগুলো ইসলামী দেশ প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও এখনো উন্নত দেশগুলোর তুলনায় জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পিছিয়ে রয়েছে। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে তাদের বারবার হাত পাততে হয় পাশ্চাত্যের কাছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ শিক্ষায় তাদের অনগ্রসরতা। কিন্তু এ শুধু শিক্ষার অনগ্রসরতার ফল নয়, এর পেছনে রয়েছে একটি আপোসহীন পশ্চাৎমুখী মনোভাব। যে মনোভাব জীবন এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে এগিয়ে যেতে দেয় না।

বস্তুত, কেবল ইসলামী মৌলবাদ নয়, তাবৎ মৌলবাদের চেহারাই কমবেশি

এক। মৌলবাদ মাত্রই আপোসহীন, অসহিষ্ণু এবং ধর্মের মূল স্পিরিটের বিরোধী। যে-ধর্ম গোড়াতে নিজেকে এবং অন্যকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে, সেই ধর্মই এখন অন্যকে হত্যা করার প্রেরণা জোগাচ্ছে। যে-ধর্ম গোড়াতে নিজেকে এবং বিশ্বকে জানার জন্য উৎসাহ দিয়েছে, এখন ধর্মগ্রন্থের দোহাই দিয়ে সেই ধর্মই মুক্তদৃষ্টি এবং মুক্তবুদ্ধির ওপর কালো ঘেরাটোপ দিয়ে অজ্ঞানতা এবং অন্ধবিশ্বাসকে মজবুত করার নির্দেশ দিচ্ছে। জড় বিধানের দোহাই দিয়ে ধর্ম এখন ব্যাহত করছে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা এবং আধ্যাত্মিকতার বিকাশ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং মননশীল বিতর্ককেও সে বাধা দিচ্ছে। সৎ এবং শুভ ধর্মচর্চার মাধ্যমে সমাজ যে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারতো, মৌলবাদ সেই প্রশস্ত এবং কল্যাণের পথকে এখন রুদ্ধ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তাই মৌলবাদকে রুখে দাঁড়ানো দরকার।

জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কসবাদ

আধ্যাত্মিকতার বাইরেও ধর্মের একটা ভূমিকা আছে। সেই ধর্ম মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, সামাজিক কর্মকাণ্ড, এমন কি, রাষ্ট্রীয় নীতিমালাকেও প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদকে বিশেষ খাতে পরিচালিত করে উস্কে দিতে পার জঙ্গি জাতীয়তাবাদ। বয়সে নবীন হলেও জাতীয়তাবাদ আধুনিক বিশ্বের একটা প্রধান চালিকা শক্তি এবং এখন সেও একটা ধর্মে পরিণত হয়েছে। বস্তুত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে ধর্মের চেয়েও প্রবল প্যাশনের রূপ নিয়েছে। যে-অর্থে এখন দেশাত্মবোধক কথাটাকে ব্যবহার করা হয়, তার সঙ্গে জাতীয়তাবাদের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত দেশের প্রতি মানুষের যা ছিলো, সেটাকে দেশের প্রতি সাধারণ ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনো নামে চিহ্নিত করা যেতো না। অন্তত তার সঙ্গে আজকের উগ্র এবং প্রবল জাতীয়তাবাদের কোনো তুলনা চলে না। একটা বিশেষ ভাষাভাষী সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক এবং ধর্মীয় অনুষঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে জাতীয়তাবাদের যে ধারণা গড়ে উঠেছে, তার বয়স দেড়শ' দু'শ' বছরের বেশি নয়। এবং এ প্রক্রিয়া শুরু হয় পশ্চিমা দেশগুলোতে।

এখন জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোঝায়, সে ধারণা ভারতীয় সমাজে একেবারে নতুন। সে কারণে এ ধারণা বোঝানোর মতো কোনো শব্দ ভারতীয় ভাষাসমূহে কোনো কালেই ছিলো না। জাতীয়তাবাদ শব্দটা একটা অনুবাদমূলক শব্দ, আধুনিক আমদানি। বাংলা ভাষায় জাতি বললে প্রধানত ধর্মীয় সম্প্রদায় বোঝাতো। এখনো কেউ কেউ সেই অর্থে জাতি শব্দটা ব্যবহার করে। এমন কি, জাতি বললে বর্ণভেদ অর্থে সামাজিক সম্প্রদায়ও বোঝায়। লিঙ্গভেদ করতেও জাতি শব্দ ব্যবহার করা

হয়। বংশ অর্থেও। ১৯৩০ এর দশকে প্রকাশিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধানেও জাতীয়তাবাদ দূরে থাক, জাতীয়তা শব্দও নেই। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপানের নব্য- জাতীয়তাবাদকে পাশ্চাত্যের অনুকরণ বলে নিন্দা করেন। কিন্তু তাকে জাতীয়তাবাদ নামে আখ্যায়িত করেননি। এর অল্পকাল পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি যেসব বক্তৃতা দেন, তার একটির নাম দেন 'দ্য কাল্ট অব ন্যাশনালইজম।' কিন্তু তার বহু বছর পরেও তিনি ন্যাশনালইজম শব্দের বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করেননি। এমন কি, গত পঞ্চাশ বছরেও এই ধারণা সম্পর্কে যারা লিখেছেন, সেই লেখকদের রচনায় এ শব্দের ব্যবহার নিয়ে কিছু অস্থিরতা দেখতে পাই। প্রথম দিকে জাতীয়তাবাদের বদলে অনেকেই লিখতেন জাতীয়তাবোধ অথবা স্বাজাত্যবোধ।

জাতীয়তাবাদ সবচেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিলো ইউরোপের কয়েকটি দেশে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইংলন্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, স্পেন এবং পর্তুগাল অন্যান্য মহাদেশের বিরাট ভূ-ভাগে উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে। ইউরোপে জার্মানি এবং ইটালি এবং এশিয়ায় জাপান যখন বুঝতে পারলো যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের এই প্রতিযোগিতায় তারা পিছিয়ে পড়েছে এবং তাদের তৈরি শিল্পজাত মালামালের জন্যে অনুকূল বাজার অত্যাবশ্যক, তখন তাদের জন্যে বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এই পরিবেশেই তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা হয়ে। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় এভাবেই ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতা হারিয়ে ফেলে। তার বদলে জাতীয়তাবাদ একটা রক্ষণশীল ও আঞ্চলিক চরিত্র লাভ করে এবং তার পরিণতি লক্ষ্য করি প্রথম মহাযুদ্ধে। নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলার মনোভাব থেকেই জাপান কোরিয়াকে গ্রাস করেছিল। হামলা চালিয়েছিল চীনের ওপর। ১৯১৬ সালে জাপান সফরের সময় রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও বলেন যে, ভারতের দিকেও জাপানের লুব্ধ দৃষ্টি রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান তার এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে প্রমাণ করেছিল। বস্তুত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধ দিয়ে উপনিবেশ বিস্তারের বখেড়া মেটানো যায়নি বলে। জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রশ্ন থেকে বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়ায়ও এই একই ধরনের অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল।

উপনিবেশ গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা ছাড়া, ইওহান হের্ডারের মতে, অন্যের শাসনাধীন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীও জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে, নির্যাতিত একটি বিশেষ বর্ণের অথবা সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের পক্ষে জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। এভাবেও জার্মানিসহ ইউরোপের কোনো কোনো দেশে জাতীয়তাবাদ দানা বেধেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক আগে রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও, অথবা হয়তো কবি হওয়ার জন্যেই, জাতীয়তাবাদের একদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আগ্রাসী চেহারা, অন্যদিকে দেশের ভেতরে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভাজনের মনোভাব লক্ষ্য করেছিলেন। সে কারণে সোচ্চার কণ্ঠে তিনি একে নিন্দা জানিয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, জাতীয়তাবাদের আনুগত্য উদার আন্তর্জাতিকতা অথবা মানবতার কাছে নয়, তার অন্ধ আনুগত্য দেশের কাছে। কিন্তু 'মাই কান্ট্রি, রাইট অর রং'- এই আদর্শকে কোনো উদারমনা, যুক্তিবাদী, মানবপ্রেমিকের পক্ষেই মেনে নেয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথও মানতে পারেননি।

জাতীয়তাবাদ এমন স্বার্থপরতার জন্ম দেয় যে, তার ফলে একটা আন্তর্জাতিক ধারণাও সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থে পরিণত হতে পারে। এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো রুশ কমিউনিজম। কমিউনিজম সকল রাষ্ট্রীয় সীমান্ত অতিক্রম করে বিশ্বের সকল শ্রমিকদের একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলো। সংজ্ঞা অনুসারেই তার চরিত্র আন্তর্জাতিক। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য করি প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝখানে সেই কমিউনিজম স্তালিন-শাসিত রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থরক্ষার কারণে জাতীয়তাবাদী চরিত্র লাভ করে। তার আমলে তাই কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। বাইরে তার চেহারা ছিলো কমিউনিজম অথবা সাম্যবাদ বিস্তারের। কিন্তু ভেতরে তা রুশ অর্থনীতির অবকাঠামো, বাজার সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক প্রভাব বিস্তার ছাড়া তেমন কিছু ছিল না।

অপরপক্ষে কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য বিস্তারের দ্রুত প্রক্রিয়া দেখে পশ্চিমা পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে একযোগে কমিউনিজম সম্প্রসারণ রুখে দাঁড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এভাবেই বিশ্বের বৃহত্তম মহাসাগর পার হয়ে কোরিয়া এবং ভিয়েতনামে এসে দীর্ঘ রক্তাক্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবাধ অর্থনীতি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে বছরের পর বছর ভিয়েতনামে গণহত্যা চালিয়েছে। উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিবর্গ মাইল জায়গার ওপর গড়ে ৭০ টনের বেশি বোমা ফেলেছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্য ভাষায় বললে, মাথাপিছু প্রতিটি লোকের জন্যে ৫০০ পাউন্ড বোমা। এমনকি গাছপালা ধ্বংসের রাসায়নিকও ছড়িয়ে দিয়েছিলো দেশের অনেক জায়গায়।[৬] বস্তুত, তার অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের হামলা থেকে নিরপরাধ শিশু, বৃদ্ধ অথবা নারী কেউই রক্ষা পায়নি। অসংখ্য নারী মার্কিন সৈন্যদের ধর্ষণের শিকারে পরিণত হয়েছিলো। গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে মার্কিন সৈন্যরা যে অসংখ্য হামলা চালিয়েছিলো, তার বেশির ভাগ হামলার শিকার হয় বেসামরিক লোকেরা। মাই লাই-এর[৭] মতো বর্বর অত্যাচারও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিজমবিরোধী মুক্তবিশ্বের আদর্শ নিয়ে যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলো।[৮] নিউজউইক পত্রিকার

এক সংবাদদাতা, যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ইউরোপে কাজ করেছিলেন, তার মতে নাৎসিরা ইহুদীদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছিলো, ভিয়েতনামে মার্কিন নির্যাতন তাকে হার মানিয়েছিলো। আসলে কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য এসে তার বাজার দখল করুক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা চায়নি। এবং চায়নি, আন্তর্জাতিক সমাজে তার সর্বোচ্চ প্রভাবে কেউ ভাগ বসাক। যে আদর্শ অনুসারে বড় মাছগুলো ছোটো মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে, সেই আদর্শ অনুসারে কমিউনিজমের সঙ্গে পুঁজিবাদের লড়াই ছিলো অবশ্যম্ভাবী। বিংশ শতাব্দীর শেষে এবং একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন যে নব্য বিশ্বধারার কথা বলছে অথবা মধ্যপ্রাচ্যে মধ্যস্থতার নামে যা করছে, সেও সভ্যতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার পোষকতা করার জন্যে নয়। বরং তার আসল উদ্দেশ্য হলো নিজের জাতীয় স্বার্থ বিস্তারের প্রক্রিয়াকে নিরঙ্কুশ করা। একটা সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈদেশিক সাহায্যের নামে ভিক্ষা দিয়ে দরিদ্র দেশগুলোয় তার প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করতো। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে কোনো প্রতিপক্ষ পরাশক্তি না থাকায়, সে ভিক্ষা দেওয়াও বন্ধ করেছে। উল্টো, সবার ওপরই সে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় ছড়ি ঘোরাচ্ছে। এক সময়ে স্যাম চাচা নামে সে পরিচিত থাকলেও এখন সে নিঃসন্দেহে সারা পৃথিবীর স্বাধিকারপ্রমত্ত জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

বিশ শতকের জাতীয়তাবাদ, বস্তুত কেবল দেশের প্রতি ভালোবাসা নয়; এ হলো দেশের অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক স্বার্থরক্ষা করার জন্যে অন্ধভাবে নিজের দেশকে সমর্থন করার মানসিকতা। এবং সেই মানসিকতাকে সজ্ঞানে এবং সক্রিয়ভাবে উস্কে দেয়ার প্রবণতা। এর সঙ্গে শুধু একটা দেশ, জাতি অথবা সম্প্রদায়ের প্রতি ভালোবাসা নয়, ভিন্ন একটা দেশ, জাতি এবং সম্প্রদায়ের প্রতি সংঘর্ষের মনোভাব বর্তমান। এই মনোভাব থেকেই জার্মানি অতো বড় একটা যুদ্ধের সূচনা করতে পেরেছিলো অথবা ষাট লাখ ইহুদীকে মেরে ফেলতে পেরেছিলো।[৯] জাপান নানকিং এর ধর্ষণ-সহ[১০] অসংখ্য জায়গায় অকল্পনীয় নিপীড়ন করতে পেরেছিলো এবং পেরেছিলো যুদ্ধবন্দিদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালাতে।[১১] তাদের যুদ্ধের পেছনে যে-মনোভাব ক্রিয়াশীল ছিলো, তাকে তারা যে নামই দিক না কেন অথবা যেভাবেই যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করুক না কেন, তার চেহারা যে একান্ত অমানবিক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তারা যখন তাদের এই অমানুষিক অভিযান শুরু করার প্রাক্কালে মন্দিরে গিয়ে অহিংসার প্রতীক বুদ্ধের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে, তখন তার মধ্যে এক অদ্ভুত স্ববিরোধ লক্ষ্য করা যায়। এই হাস্যকর এবং শোচনীয় স্ববিরোধকে উপহাস এবং ভর্ৎসনা করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

গর্জিয়া প্রার্থনা করে/ আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয় বন্ধন করি দিবে ছিন্ন,/ গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন,...
বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে/দয়াময় বুদ্ধের কাছে

কেবল জাতীয়তাবাদের নামে নয়, ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত অথবা স্থায়ী করার চেষ্টা থেকেও রাষ্ট্রযন্ত্রও অনেক ক্ষেত্রে মানবতাবিরোধী প্রবল ভূমিকা পালন করে। হিটলারের জার্মানি থেকে শুরু করে স্তালিনের রাশিয়া, আফ্রিকানদের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু করে হুটুদের রোয়ান্ডা, শ্যারনের ইসরাইল থেকে শুরু করে কারাজিচের বসনিয়া, ইয়াহিয়ার পাকিস্তান থেকে শুরু করে তালেবানের আফগানিস্তান, মাও-এর চীন থেকে পলপটের ক্যাম্পুচিয়া পর্যন্ত ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্রের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের। এসব দেশে কখন কোন একনায়কের কারণে, কখন কোন আদর্শের নামে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার পর্যন্ত খর্ব হয়। মানবতা তখন পিষ্ট হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের তলায়।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও গত এক শতাব্দীতে এই রাষ্ট্রযন্ত্র ক্রমাগত একটা বিশাল দৈত্যের মতো প্রবল হয়ে উঠেছে। তার সামনে মানুষের সাধারণ অধিকারগুলো, এমন কি বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত, মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। মানুষের জীবন অথবা অধিকারের চেয়েও রাষ্ট্র বেশি গুরুত্ব দিয়েছে তার নিজের অস্তিত্ব অথবা আধিপত্যের প্রতি। হিটলার, মুসোলিনি, স্তালিন, মাও, পলপট, বোথা, খোমেনি, সাদ্দাম, কারাজিচ, শ্যারন প্রমুখ বহু নেতার কথাই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, যাদের অধীনে রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় আদর্শই মানুষের চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে গণ্য হয়েছে।

মানুষের প্রতি একান্ত অশ্রদ্ধা থেকেই রণকৌশল পর্যন্ত পাল্টে গেছে। গত একশ বছরে যেসব যুদ্ধ হয়েছে, তা থেকে এটা সহজেই প্রমাণিত হয়। বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বেসামরিক মানুষ সামরিক হামলার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধে মৃতদের শতকরা ৫১ ভাগ ছিলো সাধারণ মানুষ।[১২] কিন্তু দু'দশক পরে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, ততদিনে যুদ্ধবাজ নেতাদের মনোভাব অনেকটা বদলে যায়। তার ফলে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক সাধারণ মানুষ সামরিক লক্ষ্যে পরিণত হয়। হিটলারের জার্মানিকে কাবু করার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের বিমান বাহিনীর প্রধান যখন মরিয়া হয়ে একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেন তখন বেছে নেন ড্রেজডেনকে।[১৩] কারণ সেখানে বেসামরিক লক্ষবস্তু ছিলো অনেক বেশি। সেনাপতি এই বলে তার হামলার পক্ষে যুক্তি দেন যে, বেসামরিক জনগণ বেশি নিহত না হলে দেশের নৈতিক মনোবল ভেঙে পড়ে না। মিত্র বাহিনীর এই ধরনের যুদ্ধাপরাধকে গণহত্যা না বলে রণকৌশলগত বোমাবর্ষণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই একই মানসিকতা থেকে জাপানের হিরোশিমা এবং

নাগাসাকির ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমার হামলা চালিয়েছিলো।[১৪] এই পরিবর্তিত রণকৌশলের ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত সাধারণ মানুষের অনুপাত অনেক বৃদ্ধি পায়। বস্তুত এই যুদ্ধে নিহতদের তিন ভাগের দু'ভাগই ছিলো সাধারণ মানুষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সাধারণ মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার অপরাধে জার্মানি এবং জাপানের স্বল্পসংখ্যক লোকের বিচার হয়েছিলো।[১৫] কিন্তু মানবতার বিরুদ্ধে এই ধরনের অপরাধ করা সত্ত্বেও মিত্র বাহিনীর যে কর্মকর্তা অথবা সৈন্যরা সাধারণ মানুষ হত্যার জন্যে দায়ী ছিলো, তাদের কোনো বিচার হয়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। ১৯৭০ এর দশক থেকে বিভিন্ন যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে, এক পরিসংখ্যান অনুসারে, তাদের শতকরা ৮০ ভাগই বেসামরিক জনগণ।[১৬] বাংলাদেশের যুদ্ধও এর একটি জ্বলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। পাকিস্তানি সেনানেতৃত্ব বিশেষভাবে বেসামরিক জনগণকে তাদের লক্ষ্যবস্তু বলে বিবেচনা করেছিলো। যুদ্ধের সঙ্গে ধর্ষণের ঘটনা সব দেশেই কমবেশি ঘটে। কিন্তু বাংলাদেশের যুদ্ধে এ অনুপাত ছিলো অনেক বেশি। সুনির্দিষ্ট অথবা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া কঠিন, কিন্তু চার লাখ নারীকে এ সময়ে ধর্ষণ করা হয়েছিলো বলে দাবি করা হয়। এছাড়া এই যুদ্ধের অংশস্বরূপ পাকিস্তানি সৈন্যরা সম্পত্তি লুণ্ঠনের এবং বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়ার অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধের শেষে যুদ্ধাপরাধীদের কোনো বিচার অনুষ্ঠিত হয়নি। ভারত দরাজ হাতে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিলো স্বাধীনতার যুদ্ধে, কিন্তু যুদ্ধশেষে নিজের জাতীয় স্বার্থে পাকিস্তানের সঙ্গে আপোস করে সমস্ত যুদ্ধাপরাধীকে বেকসুর ছেড়ে দেয়।[১৭]

মোট কথা, বিশ শতকে বেসামরিক জনগণ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় রাষ্ট্রযন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছে। একটি হিসেবে দেখা যায় যে, বিশ শতকে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের কারণে বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম এবং নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর নারী শিশু বৃদ্ধসহ মোট ছ কোটি লোক নিহত হয়েছে। ভিন্ন ধর্মের অনুসারী এবং ভিন্ন ভাষাভাষী বলে তুরস্ক প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক পরে দশ লাখেরও বেশি আর্মেনীয়কে হত্যা করেছিলো। এই ঘটনা আর্মেনীয় গণহত্যা নামে পরিচিত হয়েছে। নাৎসি জার্মানি এবং তাদের মিত্রদের হাতে ষাট লাখ ইহুদিসহ প্রায় এক কোটি লোক নিহত হয়।[১৮] নাইজেরিয়ায় নিহত হয়েছিলো হাউসা, ইবো এবং ওগোনি গোষ্ঠীর হাজার হাজার মানুষ। সাম্প্রতিককালে সাদ্দাম হোসেনের হাতে হাজার হাজার কুর্দী এবং শিয়া মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে। নির্যাতিত হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। আবার পশ্চিমা দেশগুলো যখন ইরাকের ওপর হামলা চালায় তখন হাজার হাজার নিরপরাধ ইরাকী নিহত হয়। সে দেশের ওপর যে সাড়ে ৮৮ হাজার টন বোমা ফেলা হয়েছে, তার

শতকরা ৭০ ভাগই লক্ষবস্তুকে আঘাত না করে অন্যত্র পড়েছে। তার ফলে সামরিক লক্ষবস্তুর ক্ষতি না হয়ে ক্ষতি হয় অসামরিক ধনসম্পত্তির।[১৯] বসনিয়ায় কারাজিচ এবং তার সেনাপতি রাকতো মেলাডিক স্তাডিজের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে হাজার হাজাল মুসলমান নিহত হয়েছিলো। বিশেষ করে সেব্রানিচার[২০] দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বসনিয়ার শাসকরা বেছে বেছে বেসামরিক লক্ষবস্তু নির্ধারণ করে সন্ত্রাস এবং পাইকারি হত্যার মাধ্যমে নৃতাত্ত্বিক শুদ্ধি অভিযান চালিয়েছিলো। কারাজিচ এবং তার সেনাপতি রাকতো মেলাডিক স্তাডিজের উদ্দেশ্য ছিলো সুপরিকল্পিতভাবে বহুজাতিক বসনিয়া থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করে এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করা যেখানে কেবল সার্বরাই থাকবে। ক্রোয়াটদের তারা আগেই বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছিলো।

দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তদুপরি বিংশ শতাব্দীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও শিক্ষার সম্প্রসার এবং জাতিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে দেশ এবং জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এই শতাব্দীতে কেবল ভালোবাসা নয়, দেশ এবং জাতির প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা অন্ধ আনুগত্য দেখা দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে এই আনুগত্য এমন প্রবল হয়ে দেখা দেয় যে, আঠারো এবং উনিশ শতক ধরে যে যুক্তিবাদ এবং উদারতা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশস্ত করেছিলো, তার অনেকটাই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। কোনো কোনো আদর্শবাদী মানুষ এর সমালোচনা না করে পারেননি। যেমন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তার কবিতা এবং গানে বার বার দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু পাশ্চাত্যে যে অন্ধ দেশপ্রেম দেখা দিয়েছিলো, তিনি তার প্রশংসা করতে পারেননি। বরং তার নিন্দা করেছিলেন। যিনি বলেছিলেন : দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে, যিনি লিখেছিলেন : দেশে দেশে মোর ঘর আছে, তার পক্ষে স্বার্থান্ধ দেশাত্মবোধের প্রশংসা করা সম্ভব ছিলো না। আর সম্ভব ছিলা না বলেই, জাতীয়তাবাদী দেশগুলোতে রাতারাতি রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ১৯১২/১৩ সালে পাশ্চাত্যে অতো উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিলো, সেই রবীন্দ্রনাথ যখন ন্যাশনালাইজমের সমালোচনা করে বক্তৃতা করেন, তখন জাপান থেকে আমেরিকা পর্যন্ত সমগ্র উন্নত বিশ্ব তাকে প্রত্যাখ্যান করে।[২১] এখানেও দেখতে পাই, জাতীয়তাবাদের চোখে মানুষের চেয়ে অথবা মানবতার চেয়ে দেশের প্রতি নির্বিচার ভালোবাসার আদর্শই বড়ো।

স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেম আরও অন্ধ এবং উগ্র হতে পারে। দেশকে স্বাধীন করার জন্যে তখন আদর্শ নয়, ভালোমন্দ যেকোনো পন্থাকেই যুক্তিপূর্ণ বলে গণ্য হয়। 'মারি অরি, পারি যে কৌশলে।' একটা পন্থা যুক্তিপূর্ণ অথবা শ্রেয় কি

না, তা বিবেচনা না করে তখন বরং লক্ষ্য দিয়ে অন্যায্য পন্থাকেও ন্যায্য বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আদর্শবাদীর চোখ তাকে গ্রহণযোগ্য মনে নাও করতে পারে। বিশ শতকের গোড়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে এমনি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো। একদিকে সাধারণ লোকেরা যেমন রাজনীতি সচেতন হয়ে পড়ছিলেন, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক সরকার সেই সচেতনতার মুখে এমন এক একটা পদক্ষেপ নিচ্ছিলো, যা সেই সচেতনতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিলো। এই পরিস্থিতিতে সরকার যখন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তা কেবল রাজনীতিকদের নয়, শিক্ষিত দেশপ্রেমিকদেরও বিচলিত করেছিলো। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে অনেকগুলো গান লেখেন এবং রাখি বন্ধনের মতো অহিংস আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। অপর পক্ষে মোটামুটি একই সময়ে যুগান্তর এবং অনুশীলন দলের মতো রাজনৈতিক গোষ্ঠী সন্ত্রাসের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন্যের জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। ক্ষুদিরাম বসু, বাঘা যতীন, গোপীনাথ সাহা প্রমুখ[২২] এই পরিবেশেই জাতীয় বীরে পরিণত হন। বঙ্গদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন অংশের রাজনীতি সচেতন শিক্ষিত লোকেরা এদের আত্মত্যাগের প্রশংসা করেছিলেন। তারা যে সহিংস ও সন্ত্রাসী পথ বেছে নিয়েছিলেন, সমগ্র জাতি তাতে অন্যায় কিছুই দেখতে পায়নি। বরং তাকে গৌরবান্বিত করেছিলেন। কিন্তু আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথ এর অমানবিক দিকটি লক্ষ্য করে এদের আন্দোলনের পন্থাকে অনুমোদন করতে পারেননি, প্রশংসা করা দূরে থাক। কারণ তার কাছে স্বাধীনতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আন্দোলনকারীরা কোন পন্থা অবলম্বন করছেন, তাও গুরুত্বপূর্ণ– হয়তো সমান গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত তার কাছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের চেয়ে মানবতা এবং শ্রেয়তা আরও বড়। তখনকার রাজনীতিতে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ গোড়াতে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, রাজনীতিকরা একদিকে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা বলছেন, অন্যদিকে মুসলমানদের সঙ্গে এক ঘরে বসে জাত যাওয়ার ভয়ে জল খেতে পারছেন না, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যেতে কুণ্ঠিত হননি। পরবর্তী সময়ে গান্ধীজীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হলেও, যখনই গান্ধীজীর পদক্ষেপ মানবতাকে উপেক্ষা করে কেবল রাজনৈতিক পন্থায় পরিণত হয়েছে, তখনই রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, এ প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে, মুক্তিসংগ্রাম জাতির জন্যে অবিমিশ্র প্রশংসার বস্তু হলেও এবং সেই সংগ্রামে যারা জীবন দেয়, তারা সেই জাতির চোখে শহীদ হলেও, এ সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিবেক-বিবেচনা পুরোপুরি বর্জন করা কি সঠিক? দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা বাঙালিরা আমাদের প্রিয় এবং গৌরবের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা উল্লেখ করতে পারি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে

যারা যোগ দিয়েছিলেন, বিশেষ করে যারা আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীন করেছিলেন, তারা আমাদের কাছে অসামান্য শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম। তাদের আত্মত্যাগের ফলেই আজ আমরা একটি স্বাধীন এবং আমাদের জীবনের মান এখন আগের তুলনায় উন্নত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই জিজ্ঞেস করা যায় যে, তারা যা কিছু করেছেন, সবই কি সমর্থনযোগ্য? তেমনি ফিলিস্তিনি তরুণ-তরুণীরা আত্মত্যাগের মাধ্যমে ইসরাইলী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তারা নিশ্চয় ফিলিস্তিনিদের চোখে শহীদ। কিন্তু ইসরাইলের যে সাধারণ নরনারী, শিশু এবং বৃদ্ধকে তারা হত্যা করছে, তাদের অপরাধ কোথায়? গত দু'দশক ধরে তামিল টাইগার গেরিলাদের বোমা হামলায় যে শত শত সিংহলী বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়, তাদেরই বা অপরাধ কোথায়? তারা কি আক্রমণের সঙ্গত লক্ষ্য বলে বিবেচিত হতে পারে? আমার ধারণা, মুক্তিসংগ্রাম এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য বিরাট নয়, বরং এদের মধ্যে যে ভেদরেখা তা নিতান্তই সূক্ষ্ম। মুক্তিযোদ্ধারা যদি শত্রুর সামরিক লক্ষবস্তুর ওপর আক্রমণ চালায়, তা হলে তা অবশ্যই যুক্তিপূর্ণ লক্ষ্য বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু অসামরিক লক্ষ্যই আক্রমণের অযোগ্য বলে গণ্য হওয়া উচিত।

একই সংজ্ঞা অনুযায়ী মানবকল্যাণের নামে যখন রাজনৈতিক বিপ্লব শুরু হয় এবং নিরপরাধ লোকেরা তার শিকারে পরিণত হয়, তখন তাকে মানবতাবিরোধী না বলে পারা যায় না। বড় কোনো বিপ্লবের আগে সে সমাজে সাধারণত মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েন দেখা দেয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ কিছু মানুষ যখন বৃহত্তর মঙ্গলের নামে অন্য মানুষকে হত্যা করতে শুরু করে, তখন সেখানে কমবেশি অতিরেক দেখা দেয়াই স্বাভাবিক। অতীতের দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করে ঐতিহাসিকে ক্রেইন ব্রিন্টন বিপ্লবপরবর্তী পর্যায়গুলোর বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখেছেন যে, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে একটি সরকার উৎখাত হওয়ার পর সাময়িকভাবে আদর্শবাদ তুঙ্গে ওঠে। কিন্তু দেশ চালানোর বাস্তবতার মুখে সেই আদর্শবাদ ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। তখন ক্ষমতা দখলের জন্যে বিভিন্ন উপদলের মধ্যে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। এই পরিবেশেই গৃহযুদ্ধ এবং হানাহানি শুরু হয়। সেজন্যে সমস্ত বিপ্লবের পরই অনাবশ্যক সন্ত্রাস এবং রক্তপাত প্রায় অবশ্যম্ভাবী। যেমন ফরাসি বিপ্লবকে কেন্দ্র করে প্রভূত রক্তপাত হয়েছিলো। এমন কি সাম্প্রতিক ইরানী বিপ্লবের পরও বহু নিরপরাধ লোক উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রতিশোধ এবং ক্ষমতা দখলের রাজনীতির শিকারে পরিণত হয়। বস্তুত বিপ্লব বস্তুটাই এ জন্যে মানবতাবাদীর চোখে সন্দেহের বিষয়, যদিও মিল্টন থেকে কান্ট এবং হেগেল পর্যন্ত সবাই একে বৃহত্তর কল্যাণের দোহাই দিয়ে সমর্থন করেছিলেন। জন মিল্টন মনে করেছিলেন যে, বিপ্লব সমাজের সুপ্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ দিতে

পারে। অপর পক্ষে ইমানুয়েল কান্ট বিপ্লবের পক্ষে এই বলে মত দিয়েছিলেন যে, বিপ্লবের শক্তি মানব সভ্যতাকে এগিয়ে দিতে পারে। বিপ্লবের পরে অনেক ত্যাগ এবং ভোগান্তি হতে পারে, তিনি তাও লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু তার দৃষ্টিতে বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যে সেই ত্যাগ স্বীকার না করে উপায় নেই। হেগেলের দৃষ্টিতে বিপ্লব কেবল প্রয়োজনীয় নয়, এটা হলো মানুষের সত্যিকার সম্ভাবনা বিকাশের প্রকৃষ্ট পন্থা।

মার্কিন বিপ্লব হয়েছিলো দেশকে স্বাধীন করার মহৎ লক্ষ্য থেকে। আর ফরাসি বিপ্লবের পেছনে সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের যে আদর্শগুলো ক্রিয়াশীল ছিলো, নিঃসন্দেহে সেগুলো মহৎ এবং অনুকরণযোগ্য। মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখি, এই দুই বিপ্লবকে কেন্দ্র করে প্রচুর রক্তপাত ঘটেছিলো। বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবের পর দীর্ঘদিন চলেছিলো সন্ত্রাসের রাজত্ব। কোনো যুক্তি দিয়েই এই সন্ত্রাসের পক্ষে সাফাই গাওয়া কঠিন। রাজা অথবা সামন্ত শ্রেণীর লোকেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে, তাদের শোষণ করেছে, এ কথা ঠিকই; কিন্তু এই যুক্তি দেখিয়ে রাজপরিবারের অথবা সামন্ত পরিবারর নারী শিশুসহ অন্যান্য সদস্যদের পাইকারিভাবে গিলোটিন করার ঘটনাকে সমর্থন করা যায় না। তেমনি বলশেভিক বিপ্লবের পরও রাশিয়ায় কেবল জারের পরিবারের ওপর নয়, নিরপরাধ বহু লোকের ওপর একই ধরনের অত্যাচার করা হয়েছিলো। সেই সমান নিন্দার বিষয়।

ইরানের বিপ্লবের পেছনে অন্যতম লক্ষ্য ছিলো অত্যাচারী শাহের রাজতন্ত্রকে উৎখাত করা। সে বিপ্লবের প্রধান অনুপ্রেরণা ছিলেন ধর্মীয় নেতা রুহোল্লাহ খোমেনি। তারই নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালের পয়লা এপ্রিল ইরানের জনগণ রাজতন্ত্র উৎখাত করে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পত্তন করে। কিন্তু কার্যকালে প্রজাতন্ত্র নয়, ইরানে প্রতিষ্ঠিত হলো ধর্মীয় একনায়কত্ব। শাহের নির্যাতন সত্ত্বেও যে ইরান আধুনিকতার পথে এগিয়ে যাচ্ছিলো, সেই ইরান মোল্লাতন্ত্রের অধীনে সামনের দিকে না এগিয়ে দ্রুতগতিতে পেছনের দিকে ছুটতে শুরু করলো। মৌলবাদীদের প্রথম কোপই পড়লো মহিলাদের ওপর। যে ইরানে নারীদের অনেকেই লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হচ্ছিলো, মৌলবাদী ইসলামী বিধান অনুযায়ী সেই মেয়েদের রাতারাতি পর্দার অন্তরালে চলে যেতে হলো। ঘরের বাইরে মেয়েদের নানা ধরনের কার্যকলাপ তো বন্ধ হলোই, এমন কি, নিম্নতম পর্যায় থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়াও ব্যাহত হলো। তারপর শুরু হলো মোল্লাদের সঙ্গে শাসকদের বিরোধ। এমনকি মোল্লাদের নানা উপদলের মধ্যেও অন্তর্বিরোধ দেখা দিল। রক্তারক্তি আর বোমাবাজির মধ্যে দেশের বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই পালিয়ে গেলেন পশ্চিমা দেশগুলোতে। এবং গোটা দেশ এত পিছিয়ে গেল যে, ইসলামী বিপ্লব শুরু

হওয়ার সময়ে দেশের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্যের যে অবস্থা ছিল, দু দশক পরেও সে সেখানে ফিরে যেতে পারেনি। এগিয়েছে কেবল উগ্রবাদ এবং যুদ্ধ। একই আদলে পরবর্তীকালে আফগানিস্তানের তালেবানতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তালেবান-আশ্রিত আলকায়দা বাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলা না-চালালে, আফগানিস্তানের নারীরা, মানুষরা কবে নিপীড়নযন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতো কে জানে! সত্যি বলতে কি, এই দুই ধর্মীয় এক নায়কতন্ত্রই নির্মম হাতে মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে। তবে কেবল এই দুই বিপ্লব নয়, প্রতিটি বিপ্লব এবং উপ বিপ্লবের পরই প্রতিশোধমূলক হত্যা এবং নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। বিপ্লবের নামে অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ব শত্রুতার শোধ নেয়া হয়। এর সঙ্গে মানুষের কল্যাণের কোনো যোগাযোগ নেই।

মানব সভ্যতার ইতিহাস যারা রচনা করেছেন, অথবা সেই ইতিহাসের যারা উল্লেখযোগ্য এবং মৌলিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাদের একজন কার্ল মার্কস, বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছিলেন যে, প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে মানুষ লড়াই করে প্রথমত নিজে বেঁচে থাকার জন্যে। কিন্তু তার এই লড়াইয়ের ফলে কেবল সেই বেঁচে থাকে না, তা থেকে অন্যরাও লাভবান হয়। বিশেষ করে উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হবার পর থেকে মানুষ নিজের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি উৎপাদন করছে। এবং সেই বাড়তি উৎপাদন দিয়ে অন্যরাও লাভবান হচ্ছে। কিন্তু সেই উদ্বৃত্ত উৎপাদন দিয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে যাদের পুঁজি আছে এমন স্বল্পসংখ্যক মানুষ। অন্যের পরিশ্রমে তারা বেঁচে থাকে। কেবল তাই নয়, যে মানুষ সত্যি সত্যি ঘাম ঝরিয়ে উৎপাদন করে, তার চেয়েও ভালোভাবে বেঁচে থাকে। মার্কসের চোখে এটা ন্যায্য নয়। হেগেলের আদর্শ ধরে তিনি তাই মনে করেন যে, এক সময়ে এই শ্রমজীবী মানুষরা সচেতন হয়ে উঠলে তাদের শোষণ বন্ধ হবে এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কায়েম হবে একটা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা।

এই সমাজ ব্যবস্থা কি প্রক্রিয়ায় কায়েম হবে, কারা এর নেতৃত্ব দেবে, তার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা অবশ্য মার্কসে নেই। মার্কসের মৃত্যুর পর লেনিন সেই উপায় বাতলে দেন। তার মতে, স্বল্পশিক্ষিত শ্রমিকরা এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে না, এই নেতৃত্ব দিতে পারে শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটা সংগঠিত দল। একটা কমিউনিস্ট পার্টি। কারণ তার মতে, অসংগঠিত সর্বহারারা বিপ্লবে জয়ী হতে পারবে না। কিন্তু লেনিনও শহরের শিল্পকর্মীদের দিয়ে বিপ্লব ঘটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। গ্রামের অসংখ্য চাষীদের এই বিপ্লব সম্পর্কে সচেতন করার অথবা বিপ্লবের কাজে তাদের ব্যবহার করার পরিকল্পনা তিনি করেননি। সেই কাজ করেছিলেন মাও। তিনি অসংখ্য নীরব চাষীকে বিপ্লবের প্রতি সচেতন করে তুলেছিলেন এবং বিপ্লবে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মার্কসের শোষণহীন আদর্শ সমাজ গঠন করার তত্ত্ব লেনিনসহ অনেককেই উদ্বুদ্ধ করেছে। এ রকমের শোষণহীন সমাজ গঠিত হলে সেটা আদর্শ বলেও অবশ্যই বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, আদর্শ সমাজ গঠন নয়, অনেকের কাছে মার্কসবাদ ক্ষমতা দখলের এবং সেই ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার। যারা একবার এই আদর্শ দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে, তারা মানব কল্যাণের বদলে সেই ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার কথাই বেশি ভেবেছেন। মার্কসবাদ তখন মানব কল্যাণের আদর্শ না হয়ে একটা ডগমায় পরিণত হয়েছে। মার্কসবাদকে বাস্তবায়িত করার হাতিয়ার হিসেবে লেনিন পার্টির কথা বলেছিলেন। কিন্তু মানুষের চেয়ে পার্টিকে তিনি বড় করে দেখেছিলেন কি না সন্দেহ করি।

অপর পক্ষে লেনিনের মৃত্যুর পর ১৯২৪ সালে যোসেফ স্তালিন যখন ক্ষমতা লাভ করেন, তখন তিনি মানবকল্যাণের বদলে পার্টিকেই সর্বোচ্চ আসনে বসান। তার বিবেচনায় মানুষের জন্যে পার্টি নয়, পার্টির জন্যে মানুষ। মানব কল্যাণের নামে মার্কসবাদের নামে তিনি তাই অসংখ্য লোককে সরিয়ে দিতে অথবা খতম করতে দ্বিধা করেননি। শ্রম-শিবিরে পাঠিয়ে অত্যাচার করতে কুণ্ঠিত হননি। এমন কি, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে ইউক্রেনের প্রায় পনেরো লাখ মানুষকে অনাহারে মারার পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন তিনি ঠাণ্ডা মাথায়। তাতে বিবেকের কোনো দংশন তিনি অনুভব করেননি। তিনি যে কাল্ট ফিগারে পরিণত হন, সেখানে তিনি সর্বশক্তিমান একজন ধর্মপ্রবর্তকের মতো। তিনি কমিউনিজম এবং পার্টির যে ব্যাখ্যা দিতেন, সেটাই ছিলো গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ ব্যাখ্যা।[২৩]

কয়েক দশক পরে মাও জে দোংও একই রকমের কাল্ট ফিগারে পরিণত হন। চীনের কমিউনিস্ট দলে তার বাক্যই বেদবাক্যে পরিণত হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাখ্যা ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। শ্রমিক এবং চাষীদের সমর্থন নিয়ে তিনি যে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, দু'দশকের মধ্যে সেই ব্যবস্থার ভেতর থেকেই শিক্ষিত একটি এলিট শ্রেণী ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। পার্টি, রাষ্ট্রযন্ত্র এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় সর্বত্র এই শ্রেণীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তখন তাদের সরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে কমিউনিজমের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে মাও একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেন।[২৪] এর নাম সাংস্কৃতিক বিপ্লব হলেও, এটি ছিলো আসলে একটি নির্মম অমানুষিক বিপ্লব। বিশেষ করে শিক্ষিত এলিট শ্রেণীর ওপর লাল প্রহরীদের যে ধরনের নির্যাতন শুরু হয়, তা ইহুদীদের ওপর ১৯৩০ এর দশকে নাৎসিদের নির্যাতনে কথা মনে করিয়ে দেয়। কেবল ৪০-এর দশকের গোড়ায় নাৎসীরা যে ইহুদী নিধনযজ্ঞ আরম্ভ করে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে তার পুনরাবৃত্তি হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্য আর পাঁচটি বিপ্লবের মতোই এ বিপ্লবও

ছিলো মানবতাবিরোধী। যে আদর্শের দোহাই দেয়া হোক না কেন, এটা ছিলো আসলে মাও-এর রাজনৈতিক প্রভাব এবং ক্ষমতাকে পোক্ত করার পন্থা। তার সঙ্গে মানবকল্যাণের কোনো যোগাযোগ ছিলো না।

মাও জে দোং-ই এ ব্যাপারে সর্বশেষ নন। মার্কসীয় মানবকল্যাণের নামে এবং চাষীভিত্তিক কমিউনিস্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলার নামে পাইকারিভাবে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করার সর্বসাম্প্রতিক নজির তৈরি করেন পলপট। হয়তো সজ্ঞানেই স্তালিনের শ্রম-শিবিরের আদর্শ তিনি অনুকরণ করেছিলেন, হয়তো ভেবে থাকবেন যে, সেই বাধ্যতামূলক শ্রমের মধ্য দিয়ে দেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে, মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে, সেই সঙ্গে তিনিও স্থায়ীভাবে থাকতে পারবেন ক্ষমতার মঞ্চে। কিন্তু তার আদর্শ যাই হোক না কেন, স্তালিনের তুলনায় তিনি ছিলেন অনেক নির্মম। স্তালিন পনেরো-বিশ লাখ মানুষকে হত্যা করতে প্রায় তিরিশ বছর সময় নিয়েছিলেন; অপর পক্ষে, খেমার রুঝ মাত্র চার বছরের মধ্যে খতম করেছিলেন লাখ বিশেক লোক। কেবল বাধ্যতামূলক শ্রম দিয়ে তারা এই অসাধ্য সাধন করেননি, নির্যাতন এবং বেআইনি প্রাণদণ্ডকেও তারা ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। পল পটও আদর্শবাদের কথা বলেছিলেন, কিন্তু তার চোখে মানুষের মঙ্গলের জন্যে আদর্শ নয়, বরং আদর্শের জন্যেই মানুষ। সুতরাং সেই অন্ধ আদর্শের স্টীম রোলারের তলায় মানুষ পিষ্ট হয়ে গেলে সেটাকে তার কাছে অসঙ্গত মনে হয় না।

মাওবাদের আদর্শ দিয়ে উদ্বুদ্ধ নকশাল আন্দোলনও(২৫) সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু কার্যকালে কেবল সম্পন্ন চাষী এবং জোতদারসহ অল্প কিছু লোককে খতম করা ছাড়া তেমন কোনো মানবকল্যাণ তারা করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তাদের আন্দোলন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

বস্তুত মার্কসের আদর্শ যাই হোক না কেন, বলশেভিক বিপ্লব থেকে আরম্ভ করে আশি বছরের চেয়েও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নেতার অধীনে যে তথাকথিত মার্কসবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে আদর্শ মানবতার নয়, বরং সে আদর্শ বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামগ্রিকভাবে মৌলিক অধিকার হরণ এবং নির্যাতনের মাধ্যমে একটি নিষ্ঠুর রাষ্ট্রযন্ত্র স্থাপনের। গোড়াতে মার্কস যে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কমিউনিস্ট সরকারগুলো তাও পালন করতে পারেনি। এসব দেশে সাধারণ মানুষের শ্রমের বিনিময়ে সরাসরি সুবিধাভোগী কিছু ব্যক্তি হয়তো লাভবান হয়নি, কিন্তু লাভবান হয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র। কমিউনিস্ট দেশগুলো মানুষের সাম্য স্থাপনের কোনো নজিরও তৈরি করেনি। উল্টো চীনসহ কমিউনিস্ট দেশগুলোতে নগর এবং গ্রামের মানুষ, পার্টির কর্মী এবং সাধারণ মানুষ, আমলা এবং সাধারণ শ্রমিকের মধ্যে যথেষ্ট অর্থনৈতিক পার্থক্যই

গড়ে উঠেছে। স্বীকার করতে হবে, এসব দেশে এক ধরনের আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু সে আদর্শবাদ মানবতাবর্জিত। মানুষের মঙ্গল, এমনকি খোদ মানুষ সে আদর্শবাদের চোখে গৌণ মাত্র। বরং মনে হয়, মার্কসবাদকে কাজে লাগিয়ে যে গোষ্ঠীগুলো ক্ষমতায় এসেছে, তারা সেই ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করে রাখার উৎকৃষ্ট উপায় হিসেবেই একে ব্যবহার করেছে।

আসলে মানবকল্যাণের কথা ভেবে যুগে যুগে দার্শনিক এবং মহাপুরুষরা যেসব আদর্শের ধারণা গড়ে তুলেছিলেন, সে সব আদর্শের অনেকগুলো এখন কেবল তত্ত্বগতভাবেই বেঁচে আছে। এসব দার্শনিক এবং মহাপুরুষদের প্রচারিত আদর্শের নাম ভাঙিয়ে এখন যারা করে খাচ্ছে, তাদের কাছে মানবকল্যাণ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাদের নিজেদের গুরুত্ব। তাদের ফয়দা। যে আদর্শ দিয়ে মানুষ সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠেছিলো, সেই আদর্শই এখন প্রধানত ধর্মপ্রচারক এবং রাজনীতিকের হাতে পারমাণবিক বোমার চেয়েও ভয়ানক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। পারমাণবিক বোমা দিয়ে লাখ লাখ মানুষকে মারা সম্ভব, কিন্তু মানুষ্যত্বকে মারা যায় না। অপর পক্ষে বিকৃত আদর্শের হাতিয়ার দিয়ে মনুষ্যত্বকে মুছে ফেলে মানুষকে জন্তুতে পরিণত করা সম্ভব।

বর্তমান বিশ্বে আদর্শ-বিকৃতির দরুণ মানুষ এবং সভ্যতা যে নজিরবিহীন সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কোনো উপায় আছে কি? অন্তত সহজ কোনো উপায় নেই– এটা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। দার্শনিক এবং মহাপুরুষেরা একদিন মানুষকে ভালোবাসার এবং মানবকল্যাণের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই আদর্শ মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারলেই সেটা সম্ভব হতে পারে। তার জন্যে প্রথমেই বিশ্বাস করতে হবে : সবার উপরে মানুষ সত্য; বিশ্বাস করতে হবে : মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই– দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম– কোনো কিছুই মানুষের চেয়ে বড়ো নয়। কিন্তু বিভিন্ন ডগমা দিয়ে গত এক শতাব্দী ধরে আমাদের যে-রকম মগজ ধোলাই হয়েছে, তাতে কট্টরপন্থা ত্যাগ করে উদারতা, যুক্তিবাদ এবং নৈতিকতার আদর্শে আবার দীক্ষা দেয়া এক প্রকার অসম্ভব।

প্রাসঙ্গিকী

১. ১৯৯৪ সালের ৬ এপ্রিল থেকে শুরু করে পরবর্তী দু'সপ্তাহের মধ্যে রোয়ান্ডায় এক অভূতপূর্ব গণহত্যা অনুষ্ঠিত হয়। অভূতপূর্ব এ জন্যে যে, এর আগে অন্য কোনো গণহত্যায় এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতো বেশি লোক নিহত হয়নি। এমন কি, হিটলারের নাৎসি জার্মানী তার গ্যাস-চেম্বারসহ মানুষ মারার নানা রকমের আধুনিক ব্যবস্থা নির্মাণ সত্ত্বেও এতো লোককে এমন তড়িৎ গতিতে মেরে ফেলতে পারেনি। রোয়ান্ডায় হুটুদের সংখ্যা টুটসিদের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু সংখ্যালঘু হলেও বহু বছর ধরে টুটসিরা ছিলো শাসক সম্প্রদায়। ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাদের ছিলো আধিপত্য। তবে ১৯৯৪ সালে ক্ষমতায় ছিলো একটি হুটু সরকার। টুটসি নিধনে কেবল সরকার নয়, রোয়ান্ডার খ্রিস্টীয় চার্চের কর্মকর্তারাও কেউ কেউ সহায়তা করেছিলেন। গণহত্যার বছরখানেক পরে যুদ্ধাপরাধের যে আন্তর্জাতিক বিচার অনুষ্ঠিত হয়, তাতে এই ধর্মযাজকদেরও কেউ কেউ বিচারের সম্মুখীন হন। শিশু, নারী এবং বৃদ্ধসহ টুটসিদের ওপর পাইকারিভাবে যে ঝটিকা আক্রমণ শুরু হয়, তাতে প্রথম দু'সপ্তাহে অন্তত পাঁচ লাখ লোক নিহত হয়েছিলো বলে মনে করা হয়। এই পাইকারি হত্যাকাণ্ডে বাধা দেয়ায় এক হাজারের বেশি হুটুও নিহত হয়েছিলো।

২. তুরস্কে ভিন্ন ভাষাভাষী এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী আর্মেনীয়দের সংখ্যা ছিলো প্রায় ২০ লাখ। তুরস্কের তথাকথিত 'ইয়ং টার্কস পার্টি' এই জনগোষ্ঠীকে অবিশ্বাসের চোখে দেখেছিলো এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী মনে করেছিলো। এদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অনেকটা নাৎসিরা যেমন ইহুদীদের দেখেছিলো, তেমন। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক পরে এই দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এদের খতম করার এবং দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যারা এই সিদ্ধান্ত নেন, তাদের মধ্যে ছিলেন মহামেদ পাশা, ইসমাইল আনোয়ার পাশা এবং আহমেদ জামাল পাশা। ১৯১৫ সালের ২৪ এপ্রিল তারিখে ইস্তাম্বুলে (তখনকার কনস্ট্যান্টিনোপল) বসবাসকারী আর্মেনীয় সম্প্রদায়ের সবচেয়ে সুপরিচিত বুদ্ধিজীবী এবং নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে তিন শ' লোককে একত্রিত করে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়। সেই একই দিনে আরও পাঁচ হাজার আর্মেনীয়কে ইস্তাম্বুলের রাস্তায় খুন করা হয়। এর পর বাকি আর্মেনীয়দের বলা হয় যে, তাদের অন্যত্র পাঠানো হবে। কিন্তু আসলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় দেশের পুব অঞ্চলের মরুভূমিতে পাঠিয়ে তাদের অনাহারে মেরে ফেলার। দীর্ঘ যাত্রা পথেই হাজার হাজার আর্মেনীয় না খেয়ে এবং তাদের প্রহরীদের নির্যাতনে মারা যায়। পরবর্তী বছর খানেকেরও বেশি সময় ধরে এই গণহত্যা চলতে থাকে। তবে তুরস্কের পক্ষে একমাত্র ভালো যা বলা যায়, তা হলো পরবর্তী সময়ে ফরিদ পাশার সরকার এই গণহত্যাকারীদের বিচার করে এবং প্রধান নেতাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে।

৩. বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার ঘটনা অন্তত দুটি কারণে দুর্ভাগ্যজনক। প্রথমত চারশ' বছরের পুরোনো একটা মসজিদের আর কিছু না থাকলেও অন্তত স্থাপত্যের দিক দিয়ে একটা ঐতিহাসিক মূল্য ছিলো। দ্বিতীয়ত, বাবর ছিলেন বিশেষ করে পরধর্মের প্রতি সহনশীল। তার নামের সঙ্গে জড়িত একটা মসজিদ জঙ্গি আদর্শবাজরা ভেঙে ফেললো, এটা পরধর্মের প্রতি সহনশীলতার প্রমাণ দেয় না।

৪. এখন বাংলায় মৌলবাদ বললে বিশেষ করে ইসলামী মৌলবাদ বোঝালেও, মৌলবাদ শব্দটি এসেছে খ্রিস্টানদের কাছ থেকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইভ্যানজেলিকল গোষ্ঠীগুলো, যাদের অনেকটা বর্তমান ইসলামী তাবলীগী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে তুলনা করা যায়, সেই গোষ্ঠীগুলো এই আন্দোলন শুরু করে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এরা অনেকে বিধাতার বিধান এই যুক্তিতে আফ্রিকা থেকে আনা কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্ব প্রথাকে সমর্থন জানাতো।

৫. ইন্দোনেশিয়ায় চীনারা সংখ্যায় খুব কম হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের প্রভাব ছিলো অনেক বেশি। ইন্দোনেশীয় রুপির দাম রাতারাতি পড়ে যাওয়ার পর দেশের অর্থনীতিতে যে ঢল নামে এবং তাকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, তার শিকারে পরিণত হয় চীনারা। সম্পত্তি লুণ্ঠন, সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ, হত্যা এবং নারীদের ধর্ষণসহ দাঙ্গার সনাতন উপায়গুলো সংখ্যাগুরু মুসলমানরা দক্ষতা এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রয়োগ করে। পর্তুগীজরা পূর্ব তিমুর ছেড়ে যাওয়ার পর প্রধানত খ্রিস্টান অধ্যুষিত এই দ্বীপে ইন্দোনেশিয়া দুদশক ধরে যে নির্যাতন চালায়, তাতে অন্তত দু' লাখ লোক নিহত হয়েছিলো। সুকর্ণের পতনের সময়ে এই দেশে কমিউনিস্টদের ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়, তাও এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে।

৬. নোয়াম চমস্কির চমৎকার একটি লেখা আছে ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন নির্যাতনের। এটি প্রকাশিত হয় বার্ট্রান্ড রাসেলের ভিয়েতনাম যুদ্ধপরাধ ট্রাইবিউনালের প্রতিবেদনের ভূমিকা হিসেবে। এই একই বইয়ে রাসেল এবং জঁ পল সার্ত্রর দুটি প্রবন্ধেও অনেক তথ্য এবং তত্ত্ব আছে।

৭. ১৯৬৮ সালের ১৬ মার্চ সকাল সাড়ে সাতটায় মার্কিন সৈন্যদের একটি দল দক্ষিণ চীন সাগরের উপকূলের একটি ছোট্টো গ্রাম– মাই লাইতে প্রবেশ করে এবং গ্রামের নিরস্ত্র সাধারণ লোকের ওপর হামলা চালিয়ে নারী, শিশু এবং বৃদ্ধসহ ৩৪৭ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। এই গ্রামের ওপর নির্যাতন এত পাশবিক ছিলো যে, হিউ টমসনসহ কয়েকজন মার্কিন সৈন্য গ্রামবাসীদের বাঁচানোর জন্যে অন্য মার্কিন সৈন্যদের ওপর অস্ত্র উঁচিয়ে রুখে দাঁড়ায়। এবং তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন পরে এই তথ্য প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু প্রায় এক বছরের আগে পর্যন্ত এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা মার্কিন জনগণ জানতে পারেনি। এই ঘটনার কথা ব্যাপকভাবে প্রকাশের পর উইলিয়াম ক্যালি নামে একজন সেনা কর্মকর্তার বিচার এবং কারাদণ্ড হয়, যদিও

কয়েক বছর পরে রিচার্ড নিক্সন তাকে ক্ষমা করেন। এই ঘটনার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের মনোভাব ভিয়েতনামে লড়াই চালানোর বিরুদ্ধে চলে যায়। এই প্রতিকূল জনমত তৈরি হওয়ার পেছনে আরও কারণ ছিলো, কিন্তু এই একটা প্রধান কারণ হলো মাই লাই-এর ঘটনার ব্যাপক প্রচার। এর কয়েক বছর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধের জন্যে আনুমানিক ব্যয় হয়েছিলো ২০ হাজার কোটি ডলার। গোটা বিশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবতার সেবামূলক কাজে এতো অর্থ ব্যয় করেছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু হাজার হাজার লোক প্রাণের বিনিময়ে নিজেদের কমিউনিস্টবিরোধী আদর্শবাদকে রক্ষা করতে গিয়ে এমন দরাজ হাতে ব্যয় করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

৮. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে সে দেশের এবং আন্তর্জাতিক সমাজ অনেকেই নিন্দা জানিয়েছিলেন। এমন কি, ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে যুদ্ধাপরাধ করেছিলো, বার্ট্রান্ড রাসেল এবং আরও কিছু বিখ্যাত ব্যক্তি তার বিচারের জন্যে স্টকহোমে একটি বেসরকারি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বস্তুত এর পরেও অন্যান্য এলাকার মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার কতোগুলো দেশে তার হস্তক্ষেপের নীতি অব্যাহত থাকে। মুক্তবিশ্বের আদর্শের কথা কপচালেও বারবার সে প্রমাণ করে যে, তার কাছে জাতীয় স্বার্থই সবচেয়ে মূল্যবান। তার জন্যে কখন কখন নির্লজ্জভাবে দ্বৈতমানদণ্ড অনুসরণ করতে তার মোটেই আটকায়নি।

৯. উপনিবেশ বিস্তারের প্রতিযোগিতায় ইউরোপের অন্যান্য জাতির তুলনায় জার্মানি পিছিয়ে থাকায় সে দেশে যে তীব্র ক্ষোভ ছিলো, ক্ষমতায় এসে হিটলার সেই ক্ষোভকেই প্রবল জাতীয়তাবাদে পরিণত করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ জাতীয়তাবাদ কেবল অন্য দেশের বিরুদ্ধে নির্দেশিত ছিলো না, নিজের দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে সফল ইহুদীদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়েছিলো। ১৯৩৩ সালে চ্যান্সেলর নির্বাচিত হওয়ার এক মাস পরেই হিটলার ইহুদী বিরোধী নীতিমালা গ্রহণ করেন। তখন থেকেই ইহুদীদের ওপর পদ্ধতিগতভাবে বিবিধ নির্যাতন শুরু হয়। (১৮ সংখ্যক নোট দ্রষ্টব্য।) হিটলারের মতো নির্মম একনায়ক এবং মানবতাবিরোধী ইতিহাসে বিরল। (আশ্চর্যের বিষয়, সম্প্রতি বাংলাদেশের এক 'ঐতিহাসিক' হিটলারের প্রশস্তিমূলক একটি লেখা লেখেন এবং তা বাঙালি ছাত্রদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়।)

১০. ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে তীব্র প্রতিরোধের মুখে সাংহাইতে চীনা সৈন্যদের হারিয়ে দেয়ার পর ১৩ই ডিসেম্বর ৫০ হাজার বিজয়ী জাপানি সৈন্য চীনের রাজধানী নানকিং-এ প্রবেশ করে। তারা এই শহরে ঢোকে সবাইকে হত্যা, সবকিছু লুট করা এবং পুড়িয়ে দেয়ার নীতি নিয়ে। প্রিন্স আসাক ইয়াসুহিকোর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পরবর্তী ছ থেকে সাত সপ্তাহ জাপানি সৈন্যরা এই শহরে এক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তখন এই শহরে প্রায় ছ লাখ লোক বাস করতো। তাদের অর্ধেককেই জাপানিরা নিহত করে।

হত্যা করার জন্যে তারা যেসব পন্থা অবলম্বন করে, তার মধ্যে ছিলো গুলি করা, পেট কাটা, হৃৎপিণ্ড বের করে ফেলা, মুণ্ডচ্ছেদ করা আগুনে পুড়িয়ে মারা, জ্যান্ত মাটিতে পুতে মারা, মুগুর দিয়ে পিটিয়ে মারা ইত্যাদি। তা ছাড়া জ্যান্ত মানুষকে জাপানি সৈন্যরা গুলি চালানোর লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করতো। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে নেয়া, জিভের সঙ্গে বড়শি লাগিয়ে ঝুলিয়ে হত্যা করা, কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুতে কুকুর দিয়ে কামড়িয়ে হত্যা ইত্যাদি যতো রকমের অত্যাচার করার কথা জাপানিরা তাদের উর্বর মস্তিষ্ক দিয়ে ভাবতে পেরেছিলো, তার সবই কাজে লাগানো হয়। তখন সৈন্যরা আর একটা খেলায় মেতেছিলো, সে হলো : কে কজনকে হত্যা করতে পারল, তার প্রতিযোগিতা করা। এই প্রতিযোগিতায় কে কতো স্কোর করলো সে খবর প্রকাশিত হতো আশাহি শিম্বুনের মতো জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়। ধর্ষণ ছিলো মেয়েদের ওপর অত্যাচারের একেবারে নগণ্য ঘটনা। অনেক সময়েই তারা মেয়েদের স্তন টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতো, তাদের দেয়ালের সঙ্গে পেরেক দিয়ে গেঁথে দিতো, পিতাদের বাধ্য করতো কন্যাদের ধর্ষণ করতে, ছেলেদের বাধ্য করতো মায়েদের ধর্ষণ করতে, এবং পরিবারের অন্যদের বাধ্য করত এই বীভৎস দৃশ্য দেখতে। সত্যি বলতে কি, জাপানিরা ধর্ষণ এবং নির্যাতনের নানা রকমের খেলা বের করেছিলো এবং হত্যাকেও পরিণত করেছিলো এক রকমের খেলায়। ধর্ষণ বোধহয় সব দেশের সৈন্যরাই কমবেশি করে, কিন্তু জাপানিদের এ ব্যাপারে কোনো সীমা পরিসীমা ছিলো না। কোরিয়া এবং চীনের মহিলাদের শিবিরে বন্দি রেখে তারা মাসের পর মাস সারা দিন ধরে লাইন দিয়ে ধর্ষণ করতো। এখন এ রকমের মহিলাদের বলা হচ্ছে 'কমফোর্ট উইমিন'। এ রকমের মহিলারা যারা বেঁচে গেছে, তারা অনেকে সম্প্রতি জাপানিদের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা এনেছে।

১১. যুদ্ধবন্দির ওপর অত্যাচার কমবেশি সব দেশেই হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান তার বন্দিদের ওপর যা করেছিলো, তা বোধহয় জার্মানিকেও হার মানিয়েছিলো। বস্তুত তখনো পর্যন্ত এর কোনো নমুনা ছিলো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ যুদ্ধবন্দিদের দিয়ে বার্মা-থাইল্যান্ড রেল লাইন বসানোর কথা অনেকে বলেন। বন্দিদের দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করান হতো। কিন্তু তাদের খুব সামান্যই খেতে দেয়া হতো। যখন-তখন তাদের মেরে ফেলাসহ নানা ধরনের অত্যাচার চালানো হতো তাদের ওপর। জ্যান্ত লোকদের কোনো রকম অবশ করার ওষুধ না দিয়েই তাদের দেহে অস্ত্রোপচার করে নানা রকম চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরীক্ষ নিরীক্ষাও করা হতো।

১২. দ্রষ্টব্য : E. Markusen and D. Kopf. The Holocaust and Strategic Bombing : Genocide and Total War in the Twentieth Century (West Press, 1994) chapter 2.

১৩. ড্রেজডেনের ওপর তুমুল বোমাবর্ষণের ঘটনা ঘটে ১৯৪৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতের বেলা। সে রাতে ৮০০ জঙ্গি বিমান নিয়ে এই হামলা চালায় ব্রিটিশ বিমান বাহিনী। তার পরের দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনের আলোতে, ৪০০ বিমান নিয়ে এই

হামলা অব্যাহত রাখে মার্কিন বিমান বাহিনী। ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে হামলা চালানো হয় ৪০০ বিমান নিয়ে। দোসরা মার্চের আক্রমণে অংশ নেয় ৪০০ বিমান এবং ১৭ এপ্রিল তারিখে সর্বশেষ হামলায় অংশগ্রহণকারী বিমানের সংখ্যা ছিলো ৫৭২। বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত সৈন্যরা যাতে পুব দিক থেকে হামলা চালাতে পারে তার সুযোগ দেয়ার জন্যে এই বিমান আক্রমণ করা হয়েছিলো। কিন্তু আসলে এই অভূতপূর্ব বোমাবর্ষণ থেকে একটি অত্যন্ত সুন্দর নগরী ধ্বংস করা ছাড়া বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। এই আক্রমণের ফলে নিহত হয় প্রধানত বেসামরিক লোকেরা এবং মৃতের সংখ্যা ছিলো প্রায় এক লাখ বা তার চেয়েও বেশি। এতো বেশি মৃতদেহ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো যে, মৃতদের সঠিক সংখ্যা কখনোই নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

১৪. প্রবল শক্তি নিয়ে যুদ্ধ শুরু করলেও ১৯৪৫ সালে জাপান দুর্বল হতে থাকে। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান জয়ের পরিকল্পনা করে। এর আগে জাপান পার্ল হার্বারে মার্কিন ঘাঁটির ওপর আকস্মিক হামলা চালিয়ে যে ব্যাপক ক্ষতি করেছিলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা কখনোই ভুলে যেতে পারেনি। তারা বোমাবর্ষণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে জাপানকে দুর্বল করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত জাপান দখলের কৌশল গ্রহণ করে। ৯ এবং ১০ মার্চ রাতের বেলায় মার্কিন বাহিনী টোকিওর ওপর ন্যাপাম বোমা দিয়ে যে আক্রমণ চালায়, তাতে ৮০ হাজার লোক নিহত হয় এবং কাঠের তৈরি বেশিরভাগ বাড়ি পুড়ে যাওয়ায় দশ লাখ লোক গৃহহীন হয়। বলা বাহুল্য, এই লোকদের বেশির ভাগই ছিলো বেসামরিক নাগরিক। এর সঙ্গে প্রতি তুলনা করা যায় ওকিনোয়ার যুদ্ধকে। এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। সেখানে ১২ হাজার মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় ৩৪ হাজার। অপর পক্ষে নিহত জাপানিদের সংখ্যা ছিলো প্রায় এক লাখ। কিন্তু এর পরেও জাপান তার যুদ্ধ চালিয়ে যায়। জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্যে অতঃপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নতুন কৌশল নেন। ১৯৪১ সালের জুন মাস থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পারমাণবিক বোমা নিয়ে যে গবেষণা শুরু করেছিলেন তাতে সাফল্য আসে ১৯৪৫ সালে। ১৬ জুলাই তারিখে তাদের তৈরি একটি বোমা নিউ ম্যাক্সিকোতে পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই বিস্ফোরণের শক্তি ছিলো ১৫০০০ টন টিএনটির সমান। ট্রুম্যান এই ব্যাপকবিধ্বংসী বোমা দিয়ে জাপানের ওপর আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আপাতদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত নেন এ জন্যে যে, এর ফলে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি কম হবে। পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের তিন সপ্তাহ পরে মার্কিন বিমানবাহিনীর একটি বি-২৯ বিমান হিরোশিমার ওপর পারমাণবিক বোমা ফেলে। এর ফলে তখনই প্রায় আশি হাজার লোক নিহত হয়। আহতের সংখ্যা ছিলো আরও ৭০ হাজার। এবং পরবর্তীকালে তেজস্ক্রিয়তা থেকে হাজার হাজার লোক অকালে প্রাণ হারায়। তিন দিন পরে, নাগাসাকির ওপর দ্বিতীয় একটি পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়। তাতে তৎক্ষণাৎ মৃতের সংখ্যা ছিলো প্রায় চল্লিশ হাজার। আহতের সংখ্যাও ছিলো অনুরূপ। আর তেজস্ক্রিয়তা থেকে গত অর্ধশতাব্দী

ধরে প্রাণ দিয়েছেন অনেকেই। বেসামরিক নাগরিকদের ওপর এই দুই বিশাল বোমা হামলার পর জাপানের পক্ষে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ খোলা ছিলো না। সাম্রাজ্য বিস্তারের তোদের গোলাপী স্বপ্ন এভাবে ভেঙে যায়, কিন্তু তার জন্যে স্বদেশে এবং কোরিয়া ও চীনসহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লাখ লাখ লোককে প্রাণ দিতে হয়। ভারতবর্ষেও তার ঢেউ এসে লেগেছিলো। হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়ে প্রাণ দিয়েছিলো।

১৫. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মিত্রবাহিনী যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্যে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। ১৯৪৫ সালে নভেম্বর এই ট্রাইব্যুনাল বিচার আরম্ভ করে। এই বিচার নুরেনবার্গের বিচার নামে পরিচিত। দশ মাস বিচারে নাৎসি নেতাদের মাত্র ১৯ জন দণ্ডিত হয়। তাদের মধ্যে ১২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। জাপানের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয় ১৯৪৬ সালে। সেখানে বিচার হয়েছিলো পঁচিশ জনের। তবে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশের আদালতে আরও প্রায় দু'হাজার মামলার বিচার হয়।

১৬. E. Markusen and D. Kopf, The Holocaust and Strategic Bombimg : Genocide and Total War in the Twentieth Century, Chapter 2.

১৭. ভারত এবং বাংলাদেশের যুক্ত কম্যান্ডের কাছে যে-পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছিলো, তাদের সংখ্যা ছিলো ৯৩ হাজার। অনেক দরকষাকষির পর এক সময়ে ভারত প্রতীক স্বরূপ ১০০ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করতে রাজি হয়েছিলো, কিন্তু ভারত এবং পাকিস্তানের পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে যে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, সেই চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানের সব সৈন্যই ছাড়া পায়। তাদের মধ্যে ধর্ষণকারী, লুণ্ঠনকারী, গৃহে অগ্নিসংযোগকারী, খুনি, পাইকারি হত্যাকারী ইত্যাদি সব রকমের অপরাধীই ছিলো।

১৮. ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে হিটলার ক্ষমতায় আসার এক মাস পর থেকে প্রধানত ইহুদীদের ওপর নিপীড়ন শুরু হয় এবং তারপর বারো বছর ধরে এই নিপীড়ন অব্যাহত থাকে। প্রথম পাঁচ বছর চালানো হয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার থেকে ইহুদীদের বঞ্চিত করার কর্মসূচি। ১৯৩৫ সালে তাদের জার্মান নাগরিকত্বও লোপ করা হয় এবং অন্য জার্মান নাগরিকদের সঙ্গে তাদের বিয়ে নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু তখনো তাদের হত্যা করার কর্মসূচি আরম্ভ হয়নি। ১৯৩৮ সালের ৯ এবং ১০ নভেম্বর রাতের বেলায় তাদের প্রায় প্রতিটি সিন্যাগগ ভেঙে ফেলা হয়। তারপরই বন্দিশিবিরে আটক করা হয় হাজার হাজার ইহুদীকে। এমনকি তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়াও নিষিদ্ধ হয়। এ সময়ে তাদের প্রায় সমস্ত সম্পত্তি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়, এমন কি তাদের চাকরি-বাকরি করার অধিকারও বাতিল করা হয়। কিন্তু ব্যাপকহারে তাদের হত্যা করার কর্মসূচি ১৯৪১ সালের আগে পর্যন্ত নেয়া হয়নি। ১৯৩১ থেকে ৪১ সালের মধ্যে অনেক ইহুদীই অন্যান্য দেশে চলে যেতে বাধ্য হয়। এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এ সময়ে দেড় লাখের বেশি ইহুদী

অভিবাসন করে। আর মাদাগাস্কার পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪০ সালে নাৎসি জার্মানি সিদ্ধান্ত নেয় যে, ইহুদীদের সবাইকে মাদাগাস্কার দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু ব্রিটেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই চলতে থাকায় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। তারা বদলে ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে নাৎসি কর্মকর্তারা 'চূড়ান্ত সমাধান' নামে পরিচিত একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারা ঠিক করেন যে, পূর্বাঞ্চলে ইহুদীদের কাউকে কাউকে 'খতম' করা হবে, কিন্তু বাকিদের পাঠানো হবে বন্দিশিবিরে অথবা শ্রমশিবিরে। কর্মকর্তারা ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করেছিলেন যে, ন্যূনতম খাদ্য এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে শ্রমশিবিরের ইহুদীরাও শেষ পর্যন্ত মারা যাবে। কিন্তু এসবের মাধ্যমে যখন ব্যাপক হারে ইহুদীদের খতম করা গেলো না, তখন নাৎসিরা আশউইশ, ত্রেবালিঙ্কা, মায়দানেক ইত্যাদি জায়গায় ইহুদীদের হত্যা করার আরও 'কারখানা' নির্মাণ করে। এসব জায়গাতে গ্যাস দিয়ে ইহুদীদের হত্যা করে তাদের মৃতদেহ পোড়ানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়। ধারণা করা হয় যে, এসব কারখানায় ৪০ লাখ ইহুদীকে পদ্ধতিগতভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। আর জার্মানির হাতে মোট নিহত ইহুদীর সংখ্যা ছিলো প্রায় ৬০ লাখ। For details, see E, Markusen and D. Kopf, pp. 120-33.

১৯. E. Markusen and D. Kopf, Chapter 2.

২০. বসনিয়ার সেব্রেনিচা একটি মুসলমান-প্রধান শহর। ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, তখন জাতিসংঘ এই শহরকে তাদের সংরক্ষিত নিরাপদ এলাকা বলে ঘোষণা করে। এই শহরে প্রায় ৩০ হাজার মুসলমান আশ্রয় নিয়েছিলো। তাদের রক্ষা করার জন্যে দায়িত্ব দেয়া হয় ডাচ সৈন্যদের। কিন্তু সেই সৈন্যদের নিষ্ক্রিয়তার মুখে রাৎকো স্তাডিচ এবং রাদিস্তাভ ক্রিস্তচের সার্ব সৈন্যরা এই শহরে ঢুকে পড়ে তারপর ১১ জুলাই তারিখে তারা বন্দি পুরুষ এবং নারীদের আলাদা করে পুরুষ এবং ছেলেদের অন্যত্র নিয়ে যায়। ঐ দিনই তারা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর প্রায় পাঁচশ' পুরুষকে হত্যা করে। তবে হত্যা করার আগে এই লোকদের দিয়ে তারা বিশাল কবর খোঁড়ায় এবং তারপর লাইন করে দাঁড় করিয়ে তাদের গুলি করে। তারপর শ খানেক বন্দিকে দিয়েই আবার মৃতদেহগুলো কবরে ফেলে। অতঃপর এই বন্দিদের আদেশ দেয়া হয়, তাদের খবর খুঁড়তে। দাবি করা হয় যে, এখানে প্রায় ৪০০ মুসলমানকে জ্যান্ত কবর দেয়া হয়েছিলো। গণকবর আবিষ্কারের পর রেডক্রস মোট সাত হাজার উন আশিজন মৃতের তালিকা তৈরিকরে। তবে বেসরকারি হিসেব অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা আট থেকে দশ হাজার। তাছাড়া যে মহিলা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের ওপর ধর্ষণ চালানো হয়, তাদের সংখ্যাও ছিলো অনেক। সাড়ে তিন বছরের মেয়ের ওপর ধর্ষণের ঘটনাও ঘটেছিলো এখানে। বসনিয়ার তখনকার শাসক কারাজিচ এবং সেনাপতি স্তাডিচের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে এখনও তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি, অথবা তাদের বিচার হয়নি। অবশ্য রাদিস্তাভ ক্রিস্তিচকে বিচারের জন্যে আন্তর্জাতিক

ট্রাইবিউনালের সামনে দাঁড়াতে হয় ২০০০ সালের বসন্তকালে। ২০০২ সালে ডাচ সৈন্যদের এই নিষ্ক্রিয়তার ওপর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হলে নেদারল্যান্ডের সরকারের পতন হয় এবং তখনকার প্রধান সেনাপতিও পদত্যাগ করেন।

২১. এ বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন কৃষ্ণা দত্ত এবং অ্যানড্রু রবিনসন তাদের (Rabindranath Tagore: The Myriad-minded Man (London: Bloomsbury, 1995) গ্রন্থে, পৃ. ২০০-১৮।

২২. ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকী কোনো সামরিক ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করেননি। এমন কি, তখনকার ঔপনিবেশিক সরকারের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ওপরও নয়। তাদের লক্ষ্য ছিলেন একজন বিচারক, কিংসফোর্ড। তবে ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল তারিখে তারা গাড়ির ওপর বোমা ছুড়ে দিয়ে যাদের হত্যা করতে সমর্থ হন, তারা দুজন ইংরেজ মহিলা। প্রফুল্ল চাকী অতঃপর আত্মহত্যা করেন। সাড়ে তিন মাস পরে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। তিনি এরপর জাতীয় বীরে পরিণত হন। তার প্রতি পরাধীন ভারতে এবং তারপর ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও সাধারণ মানুষের মনোভাব কেমন ছিলো, তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতকোষে কমলা দাশগুপ্তের লেখা তার জীবনী থেকে। এতে তাকে একটি ইসলামী অনুষঙ্গের বিশেষণ দিয়ে 'শহীদ' আখ্যায়িত করা হয়। বাঘা যতীন (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) সন্ত্রাসমূলক স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে বিখ্যাত হন। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক পরে তিনি যুগান্তর দলের নেতা হন এবং জার্মান অস্ত্র আমদানি করে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার অবাস্তব পরিকল্পনা করেন। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি চারজন সঙ্গী নিয়ে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং পরের দিন হাসপাতালে মারা যান। তার একজন সঙ্গী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। অন্য দু'জনের ফাঁসি হয়। আর একজন জেলে মারা যান। তাদের বীরত্বের কাহিনী প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। গোপীনাথ সাহা হত্যা করতে চেয়েছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে। ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি কলকাতায় রাস্তায় গুলি করে যাকে হত্যা করেন তিনি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন। মার্চ মাসে গোপীনাথের ফাঁসি হয়। সত্যি বলতে কি, বাংলায় যে সন্ত্রাসমূলক স্বাধীনতা আন্দোলন হয়, তাতে ইংরেজ কর্মকর্তা, বলতে গেলে, কেউই নিহত হননি। হত্যা করা হয়েছিলো কয়েকজন ভারতীয়কে, যারা ছিলেন প্রধানত আইনজীবী এবং পুলিশের অধস্তন কর্মকর্তা। বরং পশ্চিম ভারতের সন্ত্রাসীরা তুলনামূলকভাবে বেশি ইংরেজ কর্মকর্তা মারার ব্যাপারে সফল হয়েছিলো। বলা বাহুল্য, সন্ত্রাসমূলক স্বাধীনতা আন্দোলন তখনকার জনগণের মনে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করলেও, শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা এসেছিলো প্রধানত কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে।

২৩. স্তালিন ছিলেন অসম্ভব নির্দয় চরিত্রের মানুষ। তার কাছে আদর্শ অথবা মানবতা নয়, বরং ক্ষমতা ছিলো অনেক বেশি মূল্যবান। সে জন্যে তিনি দলের ভেতরে এবং বাইরে যেখানে যতো শিক্ষিত এবং পেশাদার লোক ছিলেন, যারা তাকে চ্যালেঞ্জ

জানাতে পারতেন, তাদের ওপর অসাধারণ অত্যাচার শুরু করেন। তাদের সরিয়ে দিতে অথবা প্রয়োজনবোধে তাদের হত্যা করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আগেই তিনি ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবে যারা অংশ নিয়েছিলেন, তাদের প্রায় সবাইকে খতম করেন। এছাড়া তিনি দেশের অর্থনীতি গড়ে তোলার অংশ হিসেবে যে শ্রমশিবিরের পরিকল্পনা করেন, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৭০ লাখ থেকে দেড় কোটি লোককে শ্রমশিবিরে পাঠান। তিনি ইউক্রেনের ওপরও একই নীতি প্রয়োগ করেন। ১৯২৯ সাল থেকে তিনি ইউক্রেনের পাঁচ হাজার জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং ধর্মীয় নেতাকে তারা সামরিক অভ্যুত্থান করার চেষ্টা করছিলেন, এই অজুহাত দেখিয়ে আটক করেন। এদের অনেককে গুলি করে হত্যা করা হয়, আর অনেককে নির্বাসন দেয়া হয় রাশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বন্দিশিবিরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও স্তালিন স্বদেশের অসংখ্য লোককে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করেন। তাছাড়া ইউক্রেনে যাদের ২৪ একর অথবা তার চেয়ে বেশি জমি ছিলো, তেমন খামার মালিকদের খতম করার নীতি গ্রহণ করা হয়। এদের অনেককেই নির্বাসন দেয়া হয় সুদূর সাইবেরিয়ায়। অনেকে আবার গ্রামের সাধারণ শ্রমিকে পরিণত হয়। মোট কথা, ইউক্রেনের কৃষিব্যবস্থার ওপর স্তালিনের কঠোর নির্যাতন এমনভাবে নেমে আসে যে, ১৯৩২ থেকে ৩৪ সালে সে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দেশের ভেতরে প্রচুর জমানো খাদ্যশস্য ছিলো, কিন্তু একনায়ক স্তালিনের নির্দেশে তা অন্যত্র পাঠানো হয়। ফলে ইউক্রেনে লাখ লাখ লোক অনাহারে মারা যায়। অনেকের ধারণা, মানুষের তৈরি এই দুর্ভিক্ষে পনেরো লাখ পর্যন্ত লোক প্রাণ হারিয়েছিলেন। স্তালিনের বিশ্বাস ছিলো তার নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি এবং রাষ্ট্রযন্ত্র উভয়কে চূড়ান্ত রকমের ক্ষমতা দেয়া দরকার। তাছাড়া তিনি মানবতাবাদীদের বক্তব্যকে বস্তাপচা উদারনীতি বলে আখ্যায়িত করেন।

২৪. চীনা কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে শিক্ষিত উদারপন্থীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে মাও সত্যিকার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে অনেকটাই সরে যান। তাছাড়া তিনি মনে করেন যে, চীন আসলে রাশিয়ার পথকেই অনুসরণ করছে এবং শেষ পর্যন্ত তার আন্দোলন ব্যর্থ হবে। কমিউনিস্ট পার্টি তখন যারা চালাচ্ছিলেন, বিপ্লবের প্রতি তাদের আন্তরিক প্রতিশ্রুতি কতোটা, তাতেই তিনি সন্দিহান হন। সে জন্যে তিনি তার ভাবধারায় বিশ্বাসী নেতাদের হাতে দলের দায়িত্ব ন্যস্ত করার উদ্যোগ নেন। তিনি তার আদর্শ বাস্তবায়িত করার জন্যে শহরের তরুণ সমাজকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগান। এই তরুণদের বলা হয় লাল প্রহরী। যাতে লাল প্রহরীরা মাও-এর নির্দেশ সংবলিত লাল গ্রন্থ নিয়ে বিনা বাধায় শুদ্ধি অভিযান চালাতে পারে, তার জন্যে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি এবং সৈন্য বাহিনীকে এই অভিযানে বাধা না দেয়ার নির্দেশ দেন। এই কাজে তিনি তখনকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াও এবং তার স্ত্রী জিয়াং চিংকেও সহায়ক হিসেবে পেয়েছিলেন। চেন পোতা, কাং শেং, ওয়াং তুং শিংও তাকে বিশেষ সহায়তা করেন। ওদিকে দেশ পরিচালনার কাজ শক্ত

হাতে চালাতে থাকেন চৌ এন লাই। মাও আনুষ্ঠানিকভাবে তার সংস্কারের আন্দোলন শুরু করেন ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে। তিনি এ সময়ে সব স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেন এবং লাল প্রহরীদের সব রকমের সনাতন এবং বুর্জোয়া মূল্যবোধকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এবং এর প্রথম শিকার হন শিক্ষিত উদারপন্থী লোকেরা, যাদের এক কথায় বলা যেতে পারে বুদ্ধিজীবী। তাদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করা হয়, এমনকি শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এই নির্যাতন ইহুদীদের ওপর নাৎসিদের প্রথম পাঁচ বছরের অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। বুদ্ধিজীবী এবং তথাকথিত এলিটদের ওপর অত্যাচার ছাড়াও, দলের নেতৃত্বে বড় রকমের পরিবর্তন আসে। দলের সভাপতি লিও শাওচি এবং মাও-এর পূর্বঘোষিত উত্তরাধিকারী দলীয় সাধারণ সম্পাদক দেং শিয়াওপিং ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন। ওদিকে, লাল প্রহরীদের মধ্যেও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বহু উপদল তৈরি হয়। এসব উপদলের আক্রমণ এবং এসব উপদলের অন্তর্বিরোধ থেকে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা অনেকটাই ব্যাহত হয়। এমন কি, এক বছরের মধ্যে দেশের শিল্প-উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগ কমে যায়। ১৯৬৮ সাল নাগাদ দেশে এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে আবার শৃঙ্খলা ফিরে আসতে আরম্ভ করে। ১৯৭২ সালে মাও একটি বড় রকমের স্ট্রোকে শারীরিক শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাছাড়া ১৯৭১ সালে তার ডান হাত লিন এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হওয়াতেও মাও-এর ক্ষমতা অনেকটা কমে গিয়েছিলো। তাই ১৯৭৩ সালে মাও এবং চৌ মিলে দেংকে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু তার পরেও পার্টির ভেতরে ক্ষমতার লড়াই অব্যাহত থাকে। মোট কথা, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে মানবতাবাদ অথবা মানুষের প্রাত্যহিক সুযোগ সুবিধা কোনো বিবেচ্য বিষয়ই ছিলো না, ক্ষমতার লড়াইতে কে হারলো, কে জিতলো, সেটাই বেশি গুরুত্ব লাভ করেছিলো।

২৫. কমিউনিস্ট সক্রিয়বাদী চারু মজুমদার কৃষক এবং চা শ্রমিকদের পক্ষে অনেক আগে থেকে আন্দোলন শুরু করলেও, তার নেতৃত্বে যাকে বলা হয় নকশালবাড়ি আন্দোলন, তা শুরু হয় ১৯৬০ এর দশকের শেষ দিকে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে মতাদর্শ নিয়ে তার বড় রকমের বিরোধ শুরু হয়। এই বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ১৯৬৯ সালের পয়লা মে তারিখে মাও-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সূচনা করেন এবং অল্প কালের মধ্যে সারা ভারতে সবচেয়ে নামকরা উগ্রবাদী বিপ্লবী নেতা হিসেবে পরিচিত হন। চারু মজুমদার বিশ্বাস করতেন যে, জমির সত্যিকার মালিক হলো কৃষকরা, মধ্যস্বত্বভোগীরা নয়। নকশালবাড়িতে কৃষকরা জমির মালিকানা লাভ করার ঘটনা থেকে এই আন্দোলনের নামই হয় নকশাল আন্দোলন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই দল অত্যন্ত সুপরিচিত এবং ভীতির বস্তুতে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের প্রভাব ভারতের অন্য কয়েকটি রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি এখনও অন্ধ্র এবং নেপালে এই দলের প্রভাব রয়ে

গেছে।* অত্যন্ত মেধাবী অনেক তরুণ-তরুণী এই আন্দোলনে যোগ দেয়। তারা জোতদারদের খতম করাকে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের একটা বড় পদক্ষেপ বলে গণ্য করে। কিন্তু চারু মজুমদারের কৃষি বিপ্লব শেষ পর্যন্ত তার সমর্থকদের হাতে প্রধানত ব্যক্তিগত হত্যা এবং তথাকথিত বুর্জোয়া নেতাদের মূর্তির ভাঙার আন্দোলনে পরিণত হয়। বিদ্যাসাগর অথবা রামমোহনের মূর্তিও এ থেকে বাদ যায়নি। ১৯৭২ সালে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই নকশালবাদীদের বিরোধ তীব্র হয়ে দেখা দেয়। একদিকে নকশালীরা যেমন তাদের 'শ্রেণী শত্রুদের' খুন করার বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটাতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি কংগ্রেস কেন্দ্রীয় রিসার্ভ পুলিশসহ নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় গ্রেফতার এবং গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে এই আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালে চারু মজুমদার গ্রেফতার এবং গ্রেফতারের ক'দিন পরে কারারুদ্ধ অবস্থায় খুব সম্ভব নিহত হওয়ার পর তরুণদের এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়। কিন্তু আন্দোলন থেমে যাওয়ার আগে অনেক সহিংসতার শিকার হয় বহু নিরপরাধ মানুষ।

---

* চারু মজুমদারের মাওবাদী আদর্শের সাথে নেপালী মাওবাদিদের সম্পর্ক কিন্তু স্পষ্ট নয়– সম্পাদক মণ্ডলী।

ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন নিয়ে কূটকচাল

অভিজিৎ রায়

আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী আর শেষ পর্যন্ত প্রাণ কি ভাবে সৃষ্ট হল– এটি ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞান জগতের এক অতি পুরনো প্রশ্ন। বিজ্ঞান তো এর উত্তর খুঁজছেই, সেই সাথে এর একটি দিক নির্দেশনা দিতে চাইছে ধর্মগ্রন্থগুলো, চাইছে দর্শন শাস্ত্রগুলোও। আর এই সৃষ্টি রহস্য নিয়ে প্রত্যেক জাতির মধ্যে সেই প্রাচীন কাল থেকেই ছড়িয়ে রয়েছে নানা ধরনের কল্প-কাহিনী, ইংরেজিতে যেগুলোকে বলে 'myth'। যেমন প্রাচীন চৈনিক একটি কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির শুরুতে একটা কালো ডিমের মত ছিল। প্যান ও গু নামের একজন দেবতা তাঁর কুড়ালের কোপে ডিমটিকে দ্বিখণ্ডিত করেন এবং মহাবিশ্বকে প্রসারিত হবার সুযোগ করে দেন। প্যান গুর শরীরের মাছি আর উকুন থেকেই নাকি পরবর্তীতে মানব সভ্যতার জন্ম হয়েছে। আবার অ্যাপাচি মিথ অনুযায়ী, সৃষ্টির শুরুতে আসলে কিছুই ছিল না- না ছিল এই পৃথিবী, আকাশ কিংবা কোন সূর্য-চন্দ্র-তারা। এই তমসাচ্ছন্ন নিকষ অন্ধকার থেকে হঠাৎ করেই একটি পাতলা চাকতির অভ্যুদয় ঘটে, যেখানে আসীন ছিলেন এক 'দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক'– যিনি এ জগতের মালিক, আমাদের বিশ্বপিতা! তিনিই নিজের ইচ্ছায় জগৎ থেকে শুরু করে প্রাণ পর্যন্ত সব কিছুই সৃষ্টি করেন। তাহিতি কল্পকাহিনী আবার শুরু হয়েছে তারোয়াকে দিয়ে যিনি অনন্ত এবং চিরন্তন। হঠাৎ করেই একদিন একাকীত্ব অনুভব করতে থাকেন তিনি, আর সেই একাকীত্ব ঘোচানোর জন্যই বোধহয় তার চারদিকে সবাইকে ডাকাডাকি করতে শুরু করতে লাগলেন। কিন্তু কোন দিক থেকেই কোন প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় তিনি অগত্যা মনের দুঃখে নিজেকেই শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিণত করে ফেলেন। হিন্দু পুরাণ কিন্তু বলছে, মহাপ্রলয়ের শেষে এই জগৎ যখন অন্ধকারময় ছিল, তখন বিরাট মহাপুরুষ পরম ব্রহ্ম নিজের তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন, সেই জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। তখন ওই বীজ

সুবর্ণময় অণ্ডে পরিণত হয়। অণ্ড মধ্যে ওই বিরাট মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান নিতে থাকেন। তার পর ওটিকে বিভক্ত করে আকাশ ও ভূমণ্ডল আর পরবর্তীতে প্রাণ সৃষ্টি করেন। বাইবেল এবং কোরান আবার বলছে, সৃষ্টিকর্তা ছয় দিনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি করেছিলেন। এর মধ্যে বাইবেলের (জেনেসিস) ধারণা অনুযায়ী ছয় দিনের প্রথম দিনটিতেই ঈশ্বর আমাদের এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেন। আর চারদিন পর তিনি সূর্য, চন্দ্র আর তারকারাজির সৃষ্টি করেন।

এতো গেল কল্পকাহিনী আর সাধারণ মানুষজনের প্রাচীন কাল থেকে গড়ে ওঠা নানা ধরণের বিশ্বাস-অপবিশ্বাসের কথা। বিজ্ঞান কিন্তু বিশ্বাস কিংবা কল্পকাহিনী নিয়ে কাজ করে না, বিজ্ঞানের কাজ তথ্য এবং প্রমাণে। সাম্প্রতিক সময়ে জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা আর পর্যবেক্ষণশীল জ্যোতির্বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি নিখুঁতভাবে মহাবিশ্বের অনেক জটিল রহস্যের সমাধান আমাদের কাছে খুব সহজভাবে তুলে ধরেছে। শক্তিশালী টেলিস্কোপ আর আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির নিখুঁত সমন্বয়ে সাম্প্রতিক তথ্য এবং উপাত্তকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে; আর এর ফলে বিজ্ঞানীরা এখন মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন, এ মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছে প্রায় চৌদ্দশ কোটি বা ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে অতি ক্ষুদ্র স্থান-কালের এক অদ্বৈত বিন্দু থেকে– মহাবিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে (যাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'বিগ ব্যাং')। তারপর তা ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। বিগ-ব্যাং-এর সাথে এই মহাজাগতিক স্ফীতিকে জুড়ে দিয়ে যে প্রতিরূপ নির্মাণ করা হয়েছে, তাকেই আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা আদর্শ প্রতিরূপ (standard model) হিসেবে গণ্য করেছেন। আমাদের এ চেনা পরিচিত মহাবিশ্বে শুধু কোটি কোটি গ্রহ, তারা নিহারীকাই রয়েছে তা নয়, সেই সাথে রয়েছে রহস্যময় গুপ্ত পদার্থ (dark matter) এবং গুপ্ত শক্তি (dark energy)।*

বিজ্ঞানেরও কিন্তু সীমাবদ্ধতা আছে। হয়ত সীমাবদ্ধতাটি ঠিক বিজ্ঞানের নয়, সঠিকভাবে বলতে গেলে এটি কালের সীমাবদ্ধতা। বিজ্ঞান আলাদীনের চেরাগের মত একসাথে সব রহস্যের সমাধান করতে পারে না। বরং বিজ্ঞান এগোয় হাটি হাটি পা পা করে। এক যুগের বিজ্ঞানীরা আলোর মশাল জ্বেলে দেন আর পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীরা সেই আলোয় বিনির্মাণ করেন আগামীকালের যাত্রাপথ। এক যুগেই সব কিছুর সমাধান দেওয়ার 'টনিক' বিজ্ঞান কখনই আবিষ্কার করেনি, সে দাবিও সে করে না। যুগের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়েই বিজ্ঞান এগোয়। নিউটনের যুগে নিউটনের পক্ষে সম্ভব হয়নি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুধাবন করার, আবার আইনস্টাইনের পক্ষেও সম্ভব হয়নি আজকের স্ট্রিং তত্ত্বের

* বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

রহস্য ভেদ করার মত অবস্থায় পৌঁছাবার। এই কালের সীমাবদ্ধতার কারণেই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বিজ্ঞান এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সকল রহস্যের সমাধান দিতে পারেনি। যেমন, বিজ্ঞান এখনও ব্যাখ্যা করতে পারে না মহাবিস্ফোরণ বা বিগ-ব্যাং-এর পূর্বের কোন অবস্থাকে, কিংবা বলতে পারে না আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের কারণ। আর যেখানেই বিজ্ঞান নীরব, সেখানেই বোধহয় শুরু হয় ধর্ম আর দর্শনের আনাগোনা।

সম্প্রতি কিছু দার্শনিকদের পক্ষ থেকে নতুন কিছু যুক্তির অবতারণা করে একটু ভিন্নভাবে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় তত্ত্বটি হল : সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত নকসার যুক্তি বিন্যাস (Intelligent Design argument), সংক্ষেপে আই. ডি। মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেমস্কি, জর্জ এলিস, ফিলিপ জনসন প্রমুখ এ তত্ত্বটির প্রবক্তা। এঁদের যুক্তি হল, আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমন কিছু চলক বা ভ্যারিয়েবলের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের (Fine Tuning) মাধ্যমে তৈরি হয়েছে যে এর একচুল হের ফের হলে আর আমাদের এ পৃথিবীতে কখনই প্রাণ সৃষ্টি হত না। অর্থাৎ পরবর্তীতে প্রাণ সৃষ্টি করবেন এই ইচ্ছাটি মাথায় রেখে ঈশ্বর (কিংবা হয়ত অন্য কোন বুদ্ধিমান সত্তা) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি করেছিলেন, আর সে জন্যই আমাদের মহাবিশ্ব ঠিক এরকম; এত নিখুঁত, এত সুসংবদ্ধ। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বর জড়িত থাকবার ব্যাপারটা মুখ ফুটে সরাসরি না বললেও সেদিকেই প্রায়শ ইঙ্গিত করে বলেন, বৈজ্ঞানিক ডেটাগুলো শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় কিংবা উচিৎও নয়, এগুলোকে সঠিকভাবে বোঝা যাবে তখনই, যখন এক সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্তার (intelligent agent) সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে এগুলোকে দেখার চেষ্টা এবং বিশ্লেষণ করা হবে। এই 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন' বা সংক্ষেপে 'আইডি' ইদানিংকালে কারো কারো কাছে এতটাই গুরুত্ব পেয়েছে যে, তারা অনেকেই এই তত্ত্বটিকে বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত করে স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে চান, এবং এ নিয়ে এক ধরনের আন্দোলনও তারা শুরু করেছেন সারা বিশ্বব্যাপী।

'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত নকসা'– ব্যাপারটা একটু ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক মাধ্যাকর্ষণের কথা। নিউটন তার মাধ্যাকর্ষণ সূত্রে একটি ধ্রুবক ব্যবহার করেছিলেন যাকে আমরা বলি নিউটনীয় ধ্রুবক, বা গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট (G)। নিউটন তার সেই বিখ্যাত সূত্রে দেখিয়েছিলেন, দুটো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণবলের পরিমাণ ঠিক কতটা হবে সেটা নির্ণয়ে এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট নামের রাশিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি ওই ধ্রুবটির মান এখন যা আছে তা না হয়ে অন্যরকম হত আকর্ষণ বলের পরিমাণও যেত বদলে। সাদা চোখে মনে হবে যে ব্যাপারটা সামান্যই, আকর্ষণ বল বদলালেও বোধ হয় তেমন কিছু যাবে আসবে

না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, ওই ধ্রুবকের মান আসলে আমাদের এই পরিচিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে। ওটার মান এখন যা আছে তা না হয়ে যদি অন্য ধরনের কিছু হত তাহলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটাই হত অন্যরকম। ওই ধ্রুবকের মান ভিন্ন হলে তারাদের মধ্যে হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হয়ে হিলিয়াম উৎপাদনের মাত্রাকে দিত বদলে। হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পর্যাপ্ততা শুধু এই গ্রাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট এর উপরই নয়, মহাকর্ষ এবং দুর্বল পারমাণবিক বলের মধ্যকার শক্তির ভারসাম্যের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন, তারা দেখিয়েছেন, দুর্বল পারমাণবিক বলের শক্তি যদি একটু বেশি হত, এই মহাবিশ্বে পুরোটাই মানে শতকরা একশ ভাগ হাইড্রোজেনে পূর্ণ থাকত, কারণ ডিউটেরিয়াম (এটি হাইড্রোজেনের একটি মাসতুত ভাই, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'আইসোটোপ') আর হিলিয়ামে পরিণত হবার আগেই সমস্ত নিউট্রন নিঃশেষ হয়ে যেত। আবার দুর্বল পারমাণবিক বলের শক্তিমত্তা আরেকটু কম হলে সারা মহাবিশ্বে শতকরা একশ ভাগই হত হিলিয়াম। কারণ সে ক্ষেত্রে নিউট্রন নিঃশেষিত না হয়ে তা উৎপন্ন প্রটোনের সাথে যোগ দিয়ে হাইড্রোজেন তৈরিতে বাধা দিত। কাজেই এ দু'চরম অবস্থার যে কোন একটি সঠিক হলে মহাবিশ্বে কোন নক্ষত্ররাজি তৈরি হওয়ার মত অবস্থা কখনও তৈরি হতো না, ঘটত না আমাদের এই মলয়শীতলা ধরণীতে কার্বন ভিত্তিক প্রাণের নান্দনিক বিকাশ। আবার, বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের ভর মাপতে গিয়ে দেখেছেন তা নিউট্রন- প্রোটনের ভরের পার্থক্যের চেয়ে কিছুটা কম যার ফলে তারা মনে করেন, একটি মুক্ত-নিউট্রন- প্রোটনের ভরের পার্থক্যের চেয়ে কিছুটা কম যার ফলে তারা মনে করেন, একটি মুক্ত-নিউট্রন সহজেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও অ্যান্টিনিউট্রিনোতে পরিণত হতে পেরেছে। যদি ইলেকট্রনের ভর সামান্য বেশি হত, নিউট্রন তাহলে সুস্থিত হয়ে যেত, আর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন সমস্ত ইলেকট্রনের ভর সামান্য বেশি হত, নিউট্রন তাহলে সুস্থিত হয়ে যেত, আর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন সমস্ত ইলেকট্রন আর প্রোটন সব একসাথে মিলে-মিশে নিউট্রনে পরিণত হয়ে যেত। এর ফলে যেটা ঘটত সেটা আমাদের জন্য খুব একটা সুখপ্রদ কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে খুব কম পরিমাণে হাইড্রোজেনই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকত আর তা হলে নক্ষত্রের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানিই হয়ত খুঁজে পাওয়া যেত না। জন ডি ব্যারো এবং ফ্রাঙ্ক জে. ট্রিপলার এ ধরনের নানা রহস্যময় 'যোগাযোগ' তুলে ধরে একটি বই লিখেছেন ১৯৮৬ সালে, নাম– 'The Anthropic Cosmological Principle'। তাদের বক্তব্য হল, আমাদের মহাবিশ্বে গ্র্যাভিটেশনাল অথবা কসমলজিকাল ধ্রুবকগুলোর মান এমন কেন, কিংবা মহাবিশ্বের চেহারাটাই বা এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির জন্য সর্বোপরি মানুষের

আবির্ভাবের জন্য এই মৌলিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান ঠিক এমনই হওয়া দরকার ছিল– সে জন্যই ওগুলো ওরকম। দৈবক্রমে ওগুলো ঘটেনি, বরং এর পেছনে এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্তার (বিধাতার) একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। মানুষকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম-নীতিগুলোকে ব্যাখ্যা করবার এই যুক্তিকে বলা হয় 'অ্যানথ্রোপিক আর্গুমেন্ট' বা 'নরত্ববাচক যুক্তি'। গনিতবিদ এবং দার্শনিক ড. উইলিয়াম ডেমস্কি ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত তার 'Intelligent Design : The Bridge Between Science & Theology' বইয়ে তথ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, আমাদের এই মহাবিশ্বের ভিতর যে ধরনের বিমূর্ত তথ্য লুকানো আছে তা কোনভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট হতে পারে না। বায়োরসায়নবিদ ড. মাইকেল বিহে তার 'Darwins Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution' (১৯৯৬) বইয়ে 'Irreducible complexity' নামক একটি নতুন শাব্দিক পরিভাষা সৃষ্টি কছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন, স্রেফ প্রাকৃতিক নিয়মে সরল অবস্থা হতে জটিল জৈব- অভিব্যক্তির মাধ্যমে আজকের জটিল জীবজগতের সৃষ্টি হতে পারে না।

এ ধরনের যুক্তিগুলো প্রথম দৃষ্টিতে খুব আকর্ষণীয় দেখালেও, অনুসন্ধিৎসু সংশয়বাদী চোখ দিয়ে দেখলে কিন্তু নানা দুর্বলতা প্রকাশ পায়। প্রথমত ব্যারো এবং টিপালার যে যুক্তি দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে এটি ধরেই নেওয়া হয়েছে আমাদের পৃথিবীতে যেভাবে কার্বন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেছে সেভাবে ছাড়া আর অন্য কোনভাবে প্রাণ সৃষ্ট হতে পারবে না। এই সজ্ঞাত ধারণাটি কখনই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। যেমন, বিজ্ঞানীরা কিন্তু কার্বনের পাশাপাশি সিলিকন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশকেও ইদানিংকালে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। প্রকৃতিতে পাওয়া ডায়াটমগুলো (জীববিজ্ঞানের ভাষায় এগুলো এক ধরনের eukaryotic algae) এমনি একটি উদাহরণ। এছাড়াও আমাদের কম্পিউটারে, রবোটে সিলিকন ভিত্তিক চিপের ব্যাপক ব্যবহার কার্বন ভিত্তিক প্রাণের পাশাপাশি আগামীর পৃথিবীতে সিলিকনভিত্তিক কৃত্রিম প্রাণের বিকাশের গুরুত্বকেও স্পষ্ট করে তোলে। আবার আমরা প্রায়শঃই শুনি যে, আমাদের পৃথিবীতে তাপ, চাপ সবকিছু যদি সঠিক অনুপাতে না থাকত, তবে নাকি প্রাণের বিকাশ ঘটত না। এই যে পৃথিবীটা ২৩.৫ ডিগ্রিতে হেলে আছে, তার এক চুল এদিক ওদিক হলে তাপ আর চাপের এমন বৈষম্য তৈরি হত যে, প্রাণ সৃষ্টিই অসম্ভব একটি ব্যাপারে পরিণত হত। কিন্তু অনেকেই প্রাণের এই ধরনের 'সঙ্কীর্ণ' সংজ্ঞার সাথে একমত পোষণ করেন না। তারা বলেন, আমরা ঐ ধরনের 'সর্বোত্তম' পরিবেশে বিকশিত হয়েছি বলে আমরা মনে করি প্রাণের উৎপত্তির জন্য ঠিক এই ধরনের পরিবেশই লাগবে। যেমন, বাতাসে সঠিক অনুপাতে অক্সিজেন, চাপ, তাপ ইত্যাদি। এগুলো ঠিক ঠিক

অনুপাতে না থাকলে নাকি জীবনের বিকাশ ঘটবে না। এটি একটি সজ্ঞাত ধারণা, প্রমাণিত সত্য নয়। অক্সিজেনকে জীবন বিকাশের অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হয়, কিন্তু মাটির নিচে এমন অনেক ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের জন্য অক্সিজেন শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। সমুদ্রের গভীর তলদেশে এমনকি কেরসিন তেলের ভিতরের বৈরী পরিবেশেও প্রাণের বিকাশ ঘটেছে এমন প্রমাণ বিজ্ঞানীদের কাছে আছে– যে পরিবেশের সাথে আসলে আমাদের সংজ্ঞায়িত 'সর্বোত্তম পরিবেশের' কোনই মিল নেই। কাজেই হলফ করে বলা যায় না যে, মহাজাগতিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান অন্যরকম হলে এই মহাবিশ্বে প্রাণের বিকাশ ঘটত না। বিখ্যাত জ্যোতিপদার্থবিদ অধ্যাপক ভিকটর স্টেংগর তার 'The Unconscious Quantum : Metaphysics in Modern Physics and Cosmology' বইয়ে দেখিয়েছেন চলক আর ধ্রুবকগুলোর মান পরিবর্তন করে আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মতই অসংখ্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তৈরি করা যায়, যেখানে প্রাণের উদ্ভবের মত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এর জন্য কোন সূক্ষ্ম সমন্বয় বা 'ফাইন টিউনিং'-এর কোন প্রয়োজন নেই। এই ব্যাপারটি বোঝানোর জন্য তিনি 'মাংকি গড' নামের একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখেছেন যার প্যারামিটারগুলোতে নির্বিচারে মান বসিয়ে সেই তথাকথিত 'অ্যানথ্রোপিক কোইন্সিডেন্স' ঘটানো যায়, ঈশ্বরের বা অন্য কোন সজ্ঞাত সত্তার হাত ছাড়াই। 'মাঙ্কি গড' শুনতে খেলো শোনালেও এটি কোন ছেলে খেলা নয়, বরং প্রখ্যাত যুক্তিবাদী এবং স্যেকুলার ওয়েবের প্রধান সম্পাদক রিচার্ড ক্যারিয়ারের ভাষায়, একটি 'সিরিয়াস রিসার্চ প্রোডাক্ট' যা Philo, 3:2 (Fall-Winter 2000) জার্নালে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। আমি নিজেও ড. স্টেংগরের এই প্রোগ্রামটি তার ওয়েবসাইট থেকে বহুবার ব্যবহার করেছি। কাজেই ড. স্টেংগর যখন বলেন, 'Fine Tuners have no basis in current knowledge for assuming that life is impossible except for a very narrow, improbable range of parameters' তখন সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের উপায় থাকে না।

'ফাইন টিউনিং' সমালোচনা করেছেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ভাইনার্গও। তিনি 'A Desingner Universe?' প্রবন্ধে এ ধরনের যুক্তির সমালোচনা করে বলেন :

'কোন কোন পদার্থবিদ আছেন যারা বলেন প্রকৃতির কিছু ধ্রুবকের মানগুলোর এমন কিছু মানের সাথে খুব রহস্যময়ভাবে সূক্ষ্ম-সমন্বয় (fine-tune) ঘটেছে যেগুলো জীবন গঠনের সম্ভাব্যতা প্রদান করে। এভাবে একজন মানব দরদী সৃষ্টিকর্তাকে কল্পনা করে বিজ্ঞানের সব রহস্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। আমি এই ধরনের সূক্ষ্ম-সমন্বয়ের ধারণায় মোটেও সন্তুষ্ট নই।'

সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পটি শুধু জ্যোতির্বিদ্যায় নয়, খুব উচ্ছ্বাসের সাথে ইদানিং ব্যবহার করা হয় জীববিজ্ঞানেও। কিন্তু মজার ব্যাপার হল জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা যেভাবে যুক্তি সাজিয়ে থাকেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা দেন ঠিক উল্টো যুক্তি। জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা বা সূক্ষ্ম সমলয়ী বা বলেন, আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই অনুপযুক্ত যে প্রাকৃতিক নিয়মে এখানে এমনি এমনি প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না। আবার জ্যোতির্বিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা উলটোভাবে বলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই উপযুক্ত যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃতিক নিয়মে কোনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। একসাথে দুই বিপরীতধর্মী কথা তো সত্য হতে পারে না। আসলে মাইকেল আইকেদা, বিল জেফ্রিস, ভিক স্টেংগর, রিচার্ড ডকিন্সসহ অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন এই 'ফাইন টিউনিং' বা 'এনথ্রোপিক' আর্গুমেন্টগুলো সেই পুরনো 'গড ইন গ্যাপস' আর্গুমেন্টেরই নয়া সংস্করণ। যেখানে রহস্য পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা আধুনিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না সেখানেই ঈশ্বরকে আমদানি করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে। এভাবে মুক্ত-বুদ্ধি এবং বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত না করে বরং অন্ধ বিশ্বাসের কাছে প্রকারন্তরে নতি স্বীকারে আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে।

আসলে অনেক বিজ্ঞানীই আজ এই মতের সাথে পুরোপুরি আস্থাশীল যে, মহাবিশ্ব মোটেও আমাদের জন্য 'ফাইন টিউনড' নয়, বরং আমরাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে টিকে থাকার সংগ্রামে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে 'ফাইন টিউনড করে গড়ে নিয়েছি– 'The universe is not fine-tuned for humanity; Humanity is fine-tuned to the Universe'। ব্যাপারটা হয়ত মিথ্যে নয়। আমাদের চোখের কথাই ধরা যাক। মানুষের চোখ বিবর্তিত হয়েছে এমনভাবে যে, এটি লাল থেকে বেগুনি পর্যন্ত– এই সীমার তড়িচ্চুম্বক বর্ণালীতেই কেবল সংবেদনশীল। এর কারণ হল, আমাদের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এই সীমার আলোই বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুচ্ছে। কাজেই সেই অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের চোখও সেভাবেই বিবর্তিত হয়েছে। এখন এই পুরো ব্যাপারটিকে কেউ উলটোভাবেও ব্যাখ্যা করতে চাইতে পারেন। বলতে পারেন যে, কোন এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্তা আমাদের চোখকে লাল থেকে বেগুনী আলোর সীমায় সংবেদনশীল করে গড়বেন বলেই বায়ুমণ্ডলের মাধ্যমে তিনি সেই সীমার মধ্যবর্তী পরিসরের আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করতে দেন। তাই আমাদের চোখ এরকম। কিন্তু এভাবে ব্যাখ্যা করাটা কতটা যৌক্তিক? অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার মতনই শোনায়। তারপরও 'ফাইন টিউনার'রা ঠিক এভাবেই যুক্তি দিতে পছন্দ করেন। মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান এরকম কেন,

বৈজ্ঞানিকভাবে এটি না খুঁজে এর ব্যাখ্যা হিসেবে 'না হলে পরে পৃথিবীতে প্রাণের আর মানুষের আবির্ভাব ঘটত না' এই ধরনের যুক্তি হাজির করেন। প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মুখ্য হয়, তবে মহাবিস্ফোরণের পর ঈশ্বর কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরি করতে, আর তারপর আরো ৬০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন মানুষের উন্মেষ ঘটাতে তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা আজ জানি, মানুষ তো পুরো সময়ের একশ এক ভাগেরও কম সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন?

আসলে শতাব্দী প্রাচীন 'মানবকেন্দ্রিক' সংস্কারের ভূত মনে হয় কারো কারো মাথা থেকে নামছে না। সেই টলেমীর সময় থেকেই আমরা তা দেখে এসেছি। আমাদের এই পৃথিবীটা যে মহাকাশের কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া একটা নিতান্ত সাধারণ গ্রহ মাত্র, এটি যে কোন কিছুরই কেন্দ্রে নয়– না সৌরজগতের, না এই বিশাল মহাবিশ্বের– এ সত্যটি গ্রহণ করতে মানুষের অনেকটা সময় লেগেছে। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিলে এর বিশিষ্টতা ক্ষুণ্ন হয় এই ভয়েই বোধ হয় টলেমীর 'ভূ- কেন্দ্রিক' মডেল জনমানসে রাজত্ব করেছে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে, আর ধর্মবিরোধী সত্য উচ্চারণের জন্য কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিওদের সইতে হয়েছে নির্যাতন। একই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দেখেছি ঊনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৫৯ সাল) যখন চার্লস ডারউইন এবং এ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বিবর্তনের ধারণা সাধারণ মানুষ এখনও 'মন থেকে নিতে পারেনি' কারণ এই তত্ত্ব গ্রহণ করলে 'সৃষ্টির সেরা জীব' মানুষের বিশিষ্টতা ক্ষুণ্ন হয়ে যায়! এই সংস্কারের ভূত এক-দু-দিনে দূর হবার নয়। তাই রহস্য দেখলেই জটিলতা দেখলেই মানুষ আজও নিজেকে সৃষ্টির মাঝখানে রেখে, পৃথিবীকে মহাবিশ্বের মাঝখানে বসিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। 'ফাইন-টিউনিং' আর 'অ্যানথ্রোপিক' যুক্তিগুলো এজন্যই মানুষের কাছে এখনও এত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।

অধিকাংশ বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পটি কিছু গোঁড়া খ্রিষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভুত একটি বিশ্বাস নির্ভর ধারণার চতুর অভিব্যক্তি মাত্র এবং এটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িতও নয় যে এটির সত্যতা কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা কখনও নির্ণীত হওয়া সম্ভব। সেজন্যই এটি কখনও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি করতে পারে না। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সাফল্যজনক প্রয়োগেই মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য উদঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন, বহু ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন।

এভাবেই ধাপে ধাপে আমরা এগুচ্ছি। তার পরেও এটি অবশ্যই স্বীকার্য যে, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই এখনও 'ফাঁক' রয়ে গেছে; রয়ে গেছে অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, জটিল কিছু দেখলেই বিজ্ঞান তার পেছনে কোন সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে এত সহজেই বৈধতা দিয়ে দেবে। সরল সিস্টেম থেকে জটিল সিস্টেমের উন্নয়নের উদাহরণ প্রকৃতিতে খুঁজলেই অনেক পাওয়া যাবে। ঠাণ্ডায় জলীয়-বাষ্প জমে তুষার কণিকায় পরিণত হওয়া, কিংবা বাতাস আর পানির ঝাপটায় পাথুরে জায়গায় তৈরি হওয়া জটিল নকসার ক্যাথেড্রালের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতেই আছে। যখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসে বিচিত্র নক্সার হিমবাহ, কিংবা এক পশলা বৃষ্টির পর পশ্চিমাকাশে উদয় হয় বর্ণিল রংধনু, মুগ্ধ হয় আমাদের অনেকের মন, কিন্তু আমরা কেউ এগুলো তৈরি হওয়ার পেছনে সজ্ঞাত সত্ত্বার দাবি করি না। কারণ আমরা সবাই জানি ওগুলো সবই তৈরি হয় কোন সজ্ঞাত সত্তার হস্তক্ষেপ ছাড়াই, পদার্থবিজ্ঞানের কতকগুলো প্রাণহীন নিয়মকে অনুসরণ করে। ক্যালস্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এমিরিটাস অধ্যাপক মার্ক পেরাখ সম্প্রতি 'Unintelligent Design' নামে একটি বই লিখেছেন। বইটিতে তিনি উইলিয়াম ডেম্বস্কি, মাইকেল বিহে আর ফিলিপ জনসনসহ অন্যান্য আইডি প্রবক্তাদের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, আইডি কখনই বিজ্ঞান নয়, বরং ছদ্মবেশী বিজ্ঞান, যাকে ইংরেজিতে আমরা বলি pseudoscience। পেরাখ তার বইয়ে নিত্যদিনের বেশ কিছু সাধারণ উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন, জটিলতা মানেই বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ নয়, অনর্থক জটিলতা বরং প্রকারন্তরে বুদ্ধিহীনতাই প্রকাশ করে। তার ভাষায়, 'কোন যন্ত্র তা সে মেকানিকালই হোক আর বায়োমেকানিকালই হোক, যদি অতিরিক্ত জটিল হয়, তা বরং বুদ্ধিহীন উৎসের দিকেই নির্দেশ করে' (আনইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন, মার্ক পেরাখ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১২৬)। কাজেই মহাবিশ্বের কিংবা জীবজগতের জটিলতাকে বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পের প্রমাণ ভাবার কোন যৌক্তিকতা নেই। আর তাছাড়া জীববিদ্যার ব্যাপারগুলো– যেগুলোকে মাইকেল বিহে বলেছেন 'Irreducible complex', সেগুলো আদপেই সেরকম কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। এ যুগের প্রথিতযশা সংশয়বাদী, টেনিজি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মাসিমো পিগ্লিউসি তার 'Design yes, intelligent no: a critique of intelligent design theory and neo-creationism' প্রবন্ধে বলেন, জীবজগতে হয়ত বেশ কিছু উদাহরণ আছে যেগুলোকে জীববিজ্ঞানীরা বিবর্তন তত্ত্বের আলোকে এ মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না; কারণ জীব বিজ্ঞানীদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য নেই। কাজেই এটি মূলত অজ্ঞতাসূচক যুক্তি (Argument from ignorance),

কখনই বিহের তথাকথিত Irreducible complexity'র প্রমাণ নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উইলিয়াম পিলে যখন প্রথম আঠারো শতকে 'আর্গুমেন্ট অব ডিজাইন' বা পরিকল্পনার যুক্তি বিন্যাসের অবতারণা করেছিলেন, তখন তিনি চোখের গঠন দেখে যার পর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। পিলে ভেবেছিলেন চোখের মত একটি জটিল প্রত্যঙ্গে কোনভাবেই প্রাকৃতিক উপায়ে বিবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু আজকের দিনের জীববিজ্ঞানীরা পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক নিয়মে চোখের বিবর্তনের ধাপগুলো সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছেন।

আর তাছাড়া আই ডির বিরুদ্ধে সবচাইতে বড় যুক্তি তো হাতের সামনেই রয়ে গেছে। আমাদের এই 'জটিল' মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যার জন্য যদি কোন বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার সত্যই প্রয়োজন হয়, তবে ধরেই নেওয়া যেতে পারে সেই বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বাকে এই মহাবিশ্বের চেয়েও জটিল কিছু হতে হবে। তা হলে সেই জটিল বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করবার জন্য ঐ একই যুক্তিতে আবার ততোধিক জটিল কোন সত্ত্বার আমদানি করতে হবে, এমনিভাবে জটিলতর সত্ত্বার আমদানির খেলা হয়ত চলতেই থাকবে একের পর এক। এ ধরনের যুক্তি তাই আমাদেরকে অনর্থক অসীমত্বের দিকে ঠেলে দেয়, যা বার্ট্রান্ড রাসেল এবং ডেভিড হিউমের মত দার্শনিকেরা অনেক আগেই অগ্রহণযোগ্য বলে বাতিল করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত না আই ডি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যুক্তি আর সংশয়বাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আই ডি প্রবক্তাদের ভাগ্যের শিকে ছিড়ছে না বলেই মনে হচ্ছে।

চৈতন্যের পরিচর্যা

আহমদ শরীফ

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য বাণীবিদ্ধ মনমাতানো গান আছে, পামমোচন গীতিনাট্যে ব্যবহৃত তেমনি একটি গান নাটকের বক্তব্য সম্পৃক্ত হলেও বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন তাৎপর্যেও একে অনুভবের ও উপলব্ধির মাধ্যমে উপভোগ করা যায় বলে আমাদের ধারণা। এখানে পুরো গানটি তাই উদ্ধৃত করছি :

রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে
তোমার আপন রাগে, তোমার গোপন রাগে,
তোমার তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
অশ্রু জলের করুণ রাগে॥
রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে, গভীর রাতের জাগায় লাগে॥
যাবার আগে যাও গো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ– দোলা লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণগুহার কক্ষে নিঝর ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে
বিশ্ব-নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন-বাঁধন ভাঙিয়ে দিয়ে।

এক এক মানুষের জীবনে প্রেমের প্রভাবে ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আদর্শের প্রভাবে নতুন চেতনার ও চিন্তার প্রভাবে জীবনদৃষ্টির জীবনের গতি-প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। সাদামাঠা কথায় জীবনের খোল নলচে বদলে যায়। এ প্রভাব আমরা ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে স্বীকার করি। এ প্রভাবের

অনুগত হই। ব্যক্তির সমষ্টিতে গড়ে ওঠে পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি, রাষ্ট্র। আদি ও আদিমকাল থেকেই একটা গোষ্ঠী, গোত্র বা সমাজ কারো না কারো প্রভাবে, নেতৃত্বে, আদেশে, নির্দেশে উপদেশে বা পরামর্শে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং সেই ভাবেই কিছু নীতিনিয়ম রীতি রেওয়াজ প্রথাপদ্ধতি গড়ে ওঠে, যা জনজীবনে তাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অভিব্যক্তি লাভ করে। অতএব ব্যক্তির উপর ব্যক্তির প্রভাব যেমন পড়ে, তেমনি বড় মনের, বড় মগজের, বড় মননের, বড় মনীষার প্রভাব ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে গোষ্ঠী গোত্র দেশ জাতি প্রভৃতিকে অতিক্রম করে বৃহত্তর মানব সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এবং শাস্ত্রের ক্ষেত্রে তা প্রায় চিরন্তন হয়ে বহু মানুষের জীবন, জগৎ ও জীবনভাবনা নিয়ন্ত্রণ করে, এভাবে পৃথিবীর ধর্ম সম্প্রদায়গুলো গড়ে উঠেছে নবী, অবতার, সন্ত, দরবেশ প্রভৃতির ব্যক্তিত্বের ও মনীষার প্রভাবে। বস্তু যেমন পুরোনো হলে রূপ বদলায় রঙ বদলায় জীর্ণতা পায়, তেমনি তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যও কালে কালে বিবর্তন ও বিকৃতি পায় অনেক সময়ে তাৎপর্য হারিয়ে উপযোগরিক্ত হয়ে রীতিরেওয়াজের প্রথাপদ্ধতির অসার্থক অংশ হয়ে টিকে থাকে এবং কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ করে বেশি। কাজেই বস্তু যেমন চিরকাল ব্যবহার্য থাকে না, তত্ত্ব, তথ্য এবং সত্যও তেমনি কালক্রমেও ও প্রজন্মক্রমে পরিবর্তিত প্রতিবেশে, অবস্থায় ও অবস্থানে তার তাৎপর্য ও উপযোগ হারায়, তখন তা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয় কল্যাণকর হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ জীবিকাচিন্তায় প্রাধান্য দেয় বলে এবং প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা পূরণে ব্যস্ত থাকে বলে তাদের আস্তিক্যবোধের শাস্ত্রচিন্তার রূপ-স্বরূপ বিচারে-বিশ্লেষণে কখনো মনোযোগী হয় না। ফলে আশৈশব শ্রুত, প্রাপ্ত ও দৃষ্ট গতানুগতিক বিশ্বাসে সংস্কারে ও ধারণায় চালিত হয়ে সারা জীবন নিঃসংশয় জীবন-যাপন করে। মনে করে এর চেয়ে শ্রেয়স কোন মত-পথ-নৈতিক চেতনা বা আদর্শ অথবা জীবনদৃষ্টি হতেই পারে না। এ হচ্ছে এক রকমের মূর্খের স্বর্গে বাস করা এবং এই নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় গতানুগতিক জীবনে তাই তাদের অন্ধতা ঘোচেনা, মানবিক গুণেরও হয় না বিকাশ। এমনকি অধিকাংশ মানুষ থেকে যায় নিতান্ত প্রাণীর স্তরেই। তারা লৌকিক স্থানিক অলৌকিক অলীক উপযোগরিক্ত বিশ্বাসে, সংস্কারে ধারণায় খাঁচায় বদ্ধ পাখির মতো এক ঘেয়ে জীবন যাপনে থাকে তুষ্ট তৃপ্ত ও হৃষ্ট, অথচ প্রতিদিনের নতুন সূর্যের সঙ্গে তাল রেখে নতুন নতুন চিন্তায় ও চেতনায় মন মগজ মনন মনীষা রাঙিয়ে না তুললে নতুনভাবে চিন্তায় কর্মে ও আচরণে নতুন কিছু যুক্ত না হলে জীবন যে পিছিয়ে পড়ে, মগজ মনন মনীষা যে গতানুগতিক ধারায় আবর্তিত হয়, চিত্তলোকে নতুন চেতনার ও আনন্দের সঞ্চার পন্থা রুদ্ধ হয় তা তাদের ধারণার মধ্যেও থাকে না। ভাববাদী কবির এই কবিতা বা গান আমরা উদ্ধৃত করেছি অন্তরে ভক্তিভাব জাগানোর জন্যে নয়। কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতির মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যেও নয়। আমরা শেষের দিকের কয়েকটি চরণের আক্ষরিক রূপায়ণ জীবনে

কাম্য বলেই মনে করি সমকালীন জীবনের চাহিদা পূরণের জন্যে অনুপ্রাণিত হওয়ার লক্ষ্যে চরণগুলো এই–

আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণ গুহার কক্ষে নিঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে।
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,

জীবনকে কালোপযোগী করে গড়ার জন্যে, চালিত করার জন্যে এবং উপভোগ করার জন্যে আর সার্থক করার জন্যেই চাই বটে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন, যন্ত্র বিজ্ঞানে বাণিজ্যে এবং সম্পদ সঞ্চয়ে গুরুত্ব। এছাড়া একালে ফ্রিথিংকার না হলে কারো পক্ষে মুক্ত চিন্তা ও শ্রেয়স চেতনা নিয়ে যুক্তি ও বুদ্ধি গ্রাহ্য জীবন যাপন সম্ভব নয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে আর বৈষয়িক ও আন্ত র্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধ রক্ষায় এমনি এক জাগ্রত জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। নইলে আমরা ক্রয় করা যন্ত্রে ব্যবহারিক জীবনে আধুনিক থাকব বটে, কিন্তু মানসিক জীবনে সেই হাজার, দুই হাজার, তিন হাজার বছর আগেকার জীবনের পুরোনো জগতেই বাস করব। সেই জীবন কারো অভিপ্রেত হতে পারে না, কেন না মনে, মগজে, মননে, মনীষায় সমকালীনতা না থাকলে, তা জীবনের সম্পদ না হয়ে জীবনের বোঝা হয়েই দাঁড়ায়। আমাদের সর্বপ্রকারে রেনেসাঁসপন্থী হতে হবে। অতীত ও ঐতিহ্যমুখিতার নাম হচ্ছে রিভাইভ্যালিজম, তা কাম্য নয়।

সমাজের মানুষকে নতুনভাবে চিন্তায়, চেতনায়, কর্মপ্রেরণায় রাঙিয়ে দেওয়ার মতো, জাগিয়ে দেওয়ার মতো, মনে ধরিয়ে দেওয়ার মতো, মর্মে লাগিয়ে দেওয়ার মতো মনীষা সম্পন্ন প্রজ্ঞাবান লোকের আবির্ভাব সবসময়ে কাম্য হলেও দেখা যায় কোটিতে গুটিকও মেলে না শতাব্দীর পর শতাব্দীর কালের পরিসরেও কোন কোন দেশে বা সমাজে। তাই সংস্কৃতিতে সভ্যতায় মানুষের কোন অগ্রগতি হয় না, লাটিমের মতো গতানুগতিক অভ্যস্ত রীতিতে জীবন অবক্ষয়গ্রস্ত হয় মাত্র। আমাদের দেশে আমরা এই রাঙিয়ে দেয়ার মতো, জাগিয়ে দেবার মতো, মুক্তির স্পৃহা জাগানোর মতো মানবিক গুণে আত্ম-বিকাশে অনুপ্রাণিত হবার মতো মানবতায় ও মনুষ্যত্বে ঋদ্ধ হওয়ার প্রবর্তনা দেওয়ার মতো লোক চাই। এ লোক আমাদের বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। আমাদের অতীত ও ঐতিহ্যমুখিতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে যুক্তি-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা প্রয়োগে যৌক্তিক বৌদ্ধিক জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্যে আমরা সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, যন্ত্র আবিষ্কারে-নির্মাণে, সম্পদ সৃষ্টিতে, বাণিজ্যে সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তা- চেতনা সম্পন্ন মানববাদী ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বের, মনীষার প্রত্যাশী।

যুক্তিবাদ

বশীর আল হেলাল

আমি দর্শনের সেই সঙ্গে যুক্তিবিদ্যার ছাত্র নই। যদি ইচ্ছা করেন, সাহিত্যের লোক বলতে পারেন আমাকে। লোক আর ছাত্রের মধ্যে পার্থক্যও থাকতে পারে। ছাত্ররা, তাদের শিক্ষকরা বাঁধাধরা পথে চলেন। যার যে পথ তার তাই হলেও শিক্ষকরা যার যার জ্ঞানবিদ্যার ধরার পথ বেঁধে দেন। আবার 'যত মত তত পথ'। সংখ্যায় শাখায় যতই হোক, পথগুলি বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার মাঝখানটায় বললেন, হ্যাঁ, পথ তাদের বেধে দিল কী? 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দু'জন চলতি হাওয়ার পন্থী।' জীবনের যৌবনের আনন্দের সময়টাতে এই দুই পথিক যে পথে চলছেন সেই পথের গুরু বা আলেম ফাজেল, শেখ পীর-পীরান নেই, চলতি হাওয়া যত চলে তত বদলাতে পারে, আধুনিকের পরে আবার এমনকি উত্তর-আধুনিকের পশ্চাদপথ খুঁজতে লেগে যান তারা। রবীন্দ্রনাথের ওই উপন্যাসেও তাই হয়েছিল। সাহিত্য এলোমেলো জিনিস। এর অবশ্য পোয়েটিকস ছিল, হয়তো এখনো আছে। ওতে বিষাদ ও আনন্দ হতে পারে। এই লেখক আমি সাহিত্যের সেই এলোমেলো কারিগর। এবং এটাই আমার প্রধান পেশা। আমার পক্ষে তাই যুক্তিবাদ সম্পর্কে একটা কোনো লাইন ধরে হয়তো কিছু বলা কঠিন।

কেউ হয়তো উঠে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন, কেন, সাহিত্যিক হলে কী হয়? আমি তো জানি আপনি বস্তুবাদী, এমনকি মার্কসবাদী- লেনিনবাদী!' ওরে বাবা, আমি মার্কসবাদী- লেনিনবাদী? হই বা না হই, হ্যাঁ মনে হয়, মার্কসবাদ-লেলিনবাদের কেবল বস্তুবাদ নয়, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে গুটি গুটি পায়ে পৌঁছানো হলে ওই যুক্তিবাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ-মুলাকাত তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-ঝাঁটিও হতে পারে, হ্যাঁ, যে দ্বন্দ্বের যার সহায়তা জরুরি।

আপনারা হয়তো বিশ্বকোষগুলোতে যুক্তিবাদের ইংলিশে র‍্যাশনালিজমের সংজ্ঞার্থ, খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই পাবেন যে, ' যে কোনো দার্শনিক মতবাদে

জ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তিকে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া হয় তাহাকেই এই যুক্তিবাদ নাম দেওয়া হয়। এই মতবাদে প্লেটো হইতে আধুনিককালের ভাববাদিগণ সকলেই বিশ্বাসী। এই rationalism শব্দটি সাধারণভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর যেসব দার্শনিক প্রত্যয় ও প্রত্যাদেশকে বর্জন করিয়া ধর্মকে আক্রমণ করিতেন তাহাদের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হয়।' (ঢাকায় প্রকাশিত 'বাংলা বিশ্বকোষ' চতুর্থ খণ্ড, ১৯৭৪।)

'এই মতবাদে প্লেটো হইতে আধুনিককালের ভাববাদিগণ সকলেই বিশ্বাসী', এখানে যুক্তিবাদের পরিচয়ের এই বাক্যটি জরুরি। যুক্তি সবার আছে, নাস্তিক থেকে ধর্মান্ধের। এক নিরক্ষর বয়স্ক ধর্মান্ধ একদিন আমাকে বারবার বলতে থাকলেন, 'কিভাবে লেখা আছে।' এটাও তার যুক্তি। ধাপে ধাপে সত্যে পৌঁছানোর সিঁড়ি হতে পারে যুক্তিবাদ। তর্ক, বুদ্ধি, হেত্বাভাস, যুক্তিবিন্যাস এগুলি সত্যে পৌঁছানোর কার্যকর পন্থা বটে। তবে যার যত বুদ্ধি, সত্যে হোক বা না হোক, তিনি তর্কে তত জিততে পারেন। বেচারা কম-বুদ্ধির মানুষের সত্যে পৌঁছানো হলো না। ড. আহমদ শরীফ সবচেয়ে বেশি সাহায্য নিয়েছিলেন যুক্তির, লজিকের, র‍্যাশনালিজমের। কিন্তু মার্কসবাদে তার অবিশ্বাস ছিল না। তিনি আমাদের বলেছিলেন, মার্কসবাদ তিনি ব্যাপক পড়েছিলেন কিন্তু বুঝতে পারেন নি। আক্ষরিকভাবে সাধারণত পণ্ডিত না হয়েও আরজ আলী মাতুব্বর প্রখর যুক্তিবাদের মাধ্যমে ভয়ানক সত্যগুলি সমাজের সামনে তুলে ধরছিলেন।

যুক্তিবাদ সামাজিক নয়, বৈজ্ঞানিক নয়, কোনো একটা দার্শনিক মতবাদের, যার একটা হয়তো ন্যায়তত্ত্ব (সিলোজিযম), এগুলির মাধ্যমে সত্যে পৌঁছানোর হয়তো অসমাপ্ত কলকাঠি, ইন্সট্রুমেন্ট।

আমি এখানে যুক্তিবাদ সম্পর্কিত ও তার আশপাশের আনুষঙ্গিক কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ ইংলিশ প্রতিশব্দসহ তুলে দিচ্চি। ভুল বা অপূর্ণ হলে কেউ সংশোধন করে দিতে পারেন। এগুলির ব্যাখ্যা পেয়ে বা খুঁজে আলোচিত বিষয়ে ব্যাপক জানা যেতে পারে।

যুক্তি Logic/Reason
যুক্তিবিদ্যা Logic
যুক্তিবাদ Rationalism
যৌক্তিক Logical/rational
যুক্তিবাদী Rationalist
যুক্তি ও প্রত্যয় Reason and faith
যুক্তিবিন্যাস Reasoning
যুক্তিবৃত্তি Reasoning
হেতুবাদ Reasoning

প্রত্যয় Faith
যুক্তিসহ দৃষ্টসত্তবাদ Logical positivism
হেত্বাভাস Fallacy
দর্শন, দর্শনশাস্ত্র Philosophy
ধর্মতত্ত্ব Theology
ধর্মের অনুশাসন Dogma
প্রয়োগবাদ Empiricism
ন্যায়, ন্যায়তত্ত্ব Syllogism (সিলোজিযম)
তর্ক, তর্কশাস্ত্র Logic
অধিবিদ্যা Metaphysics
বিজ্ঞান Science
বিজ্ঞানের যুক্তিবিজ্ঞান Logic of scince
যুক্তির যুগ, আলোর যুগ Enlightenment
ইউটোপিয়া Utopia
দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ Dialectical materialism
বিবর্তন Evolution

ব্রুনোর আত্মত্যাগ ও যুক্তিবাদ

শহিদুল ইসলাম

মানুষ কখনই কোনো প্রশ্ন বা ব্যাখ্যা ছাড়া জীবনকে মেনে নেয়নি। এটাই মানুষের স্বভাব। প্রাচীনকাল থেকেই, বিশেষ করে গ্রিক সভ্যতার শুরুর কাল থেকে, মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে এসেছে। 'আমি কি', 'কোথা থেকে এসেছি', 'কোথায় চলেছি', 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছে কে?', 'বস্তুর প্রকৃত সত্তা কি?', 'জীবন মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য কি?' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে এসেছে মানুষ সেই আদিকাল থেকেই। ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান যুগে যুগে এসব প্রশ্নের যুৎসই উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে। সে সব প্রশ্ন স্থান-কাল ঐতিহাসিকতার সীমানায় আবদ্ধ ছিল। উত্তরও। মধ্যযুগের দার্শনিকরাও তাদের যুগের ভাবাদর্শের মধ্যেই এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চার্চের মৌলিক মতাদর্শগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা। নতুন কোনো চিন্তার অনুসন্ধান করা সে সময় ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মধ্যযুগের এক হাজার বছর দর্শন ও বিজ্ঞান ধর্মতত্ত্বের ক্রীতদাস ছিল বললে ভুল বলা হয় না। মধ্য ও আধুনিক যুগের সীমানায় দাঁড়িয়ে জিওর্দানো ব্রুনো তার সীমাহীন জ্ঞানানুশীলনের জন্য ক্যাথলিক ধর্ম আদালতের রায়ে আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

জিওর্দানো ব্রুনো সময়ের অনেক আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন মধ্যযুগ শেষ হয়েও হয়নি, মধ্যযুগের ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং আধুনিক যুগের যুক্তিবাদ শুরুর সন্ধিক্ষণে তার জন্ম হয়। ১৫৪৮ সালে ইতালির ভিসুভিয়াস পর্বতমালার অদূরে ছোট্ট একটি শহর নোলায় তার জন্ম। ইউরোপের দীর্ঘ অন্ধকার যুগের শেষে এই ইতালিতেই ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে রেনেসাঁর যাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তী দুশো বছর তা ইতালি এবং সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিল্পকলায় অভূতপূর্ব জোয়ার নিয়ে আসে। সে রেনেসাঁর সুতিকাগার ইতালিতে

জন্মগ্রহণ করে জিওর্দানো ব্রুনোকে শুধু জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য মাত্র ৫২ বছর বয়সে পরম ক্ষমতাশালী চার্চের এক ঘৃণ্য বিচারের রায়ে জীবন্ত পুড়ে মরতে হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম বছরে তার সে আত্মত্যাগ রেনেসাঁর সব অর্জনকে যেন ব্যঙ্গ করে। ১৫৫০ সালে রেনেসাঁ আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে। রিফর্মেশন বিরোধী এক প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনে সমগ্র ইউরোপ তখন কাঁপছে। ব্রুনো সেই সময় তার দর্শন ও বিজ্ঞান প্রচার করেছিলেন। তখন দর্শন ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটেনি। দর্শনচ্যুত বিজ্ঞান কিংবা বলা যায় বিজ্ঞানচ্যুত দর্শনের এক অন্ধকারময় সময়ে ব্রুনো তার বিপ্লবী মতবাদ নিয়ে অবতীর্ণ হন।

ব্রুনো হত্যা প্রমাণ করে যে তখনও সমাজের ওপর গির্জার দাপট কমেনি। ধর্মনিরপেক্ষ শাসকের শক্তি তখনও তেমন বৃদ্ধি পায়নি। সামন্তবাদী অর্থনীতির ভাঙন শুরু হলেও সমাজের ওপর তার সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ তখনও রীতিমত বহাল রয়েছে। পুঁজিবাদ কেবল উঁকিঝুঁকি মারছে। শিল্পবিপ্লব তখনও বহুদূরে। গির্জার সঙ্গে রাজার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তখনও নিরসন হয়নি। আর রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের দ্বন্দ্ব তখনও জমে ওঠেনি। সময়ের সাথে সাথে শেষের দুই দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে ওঠে। বলা যায় সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই গির্জা ও সেক্যুলার শাসকের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলে আসছিল। পোপ ইনোসেন্ট ৩য় (১১৯৮-১২১৬)র সময়ে চার্চ ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে। কিন্তু তা অল্পকাল স্থায়ী হয়। তবে রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বে গির্জার পরাজয় ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। গির্জা তার ক্ষমতা সংরক্ষণে মরিয়া হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক চার্চ মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ইহজাগতিকতা এবং প্রটেস্টান্ট ধর্মের বিস্তার রোধে মরিয়া হয়ে ওঠে। ১৫৪২ সালে খ্রিস্টীয় ধর্ম আদালত (Inquisition) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৫৬৪ সালে Council of Trent সর্বপ্রথম নিষিদ্ধ বই-এর তালিকা প্রকাশ করে। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি পরস্পর সহঅবস্থান করে। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিক্রিয়ার শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ব্রুনোর ওপর যখন অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়, সেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ পশ্চিম ইউরোপ কিছুটা হলেও মধ্যযুগীয় বিশ্বছবি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। অধিকাংশ সাধারণ মানুষ মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার মধ্যে নাক ডুবিয়ে থাকলেও মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তনের রেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্বাসের স্থানটি ক্রমশ গ্রহণ করতে থাকে যুক্তি। আবেগ, মিথ এবং অতিপ্রাকৃতের স্থান দখল করে যুক্তি। মানুষ তার নিজের ওপর আস্থা ফিরে পায়। নবোত্থিত বিজ্ঞানের প্রভাব অবহেলা করতে পারে না পশ্চিম ইউরোপ। সেই সঙ্গে ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি। বংশ পরিচয় নয়, মেধা, মনন ও পরিশ্রমের দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে সাধারণ ঘরের মানুষ।

কোপারনিকাস, গ্যালিলিও ও নিউটনের নতুন বিশ্বছবি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় এরিস্টটলের মধ্যযুগীয় বিশ্বছবিটাকে। সেই নবোত্থিত বিজ্ঞানের অণুপ্রেরণায় দর্শন ধর্মতত্ত্বের শক্ত রশি ছিড়ে বের হয়ে আসতে সমর্থ হয়। অনেকেই অ-খ্রিস্টান হয়ে পড়েন, অনেকে আবার ধর্মবিরোধী। যুক্তিহীন বিশ্বাস নয়, অনুভূতিপ্রসূত যুক্তিই হয়ে ওঠে তাদের হাতের প্রধান হাতিয়ার। অভিজ্ঞতা ও যুক্তি দিয়েই তারা ওপরের প্রশ্নগুলোর সমাধান চান। কোন প্রাচীন বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব তারা আর মানতে রাজি নন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার গুরুত্ব অনুভূত হতে থাকে। আল কেমিস্টরা হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারাই ব্যবহার করতো। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল, বিজ্ঞান চেতনাবিরোধী। লক্ষ্য ভুল হলে যা হয়, তাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তবে তাদের সে অপচেষ্টার সুতিকাগার থেকে রসায়ন জন্মগ্রহণ করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সম্ভবত রোজার বেকন (১২১৪-১২৯২) সর্বপ্রথম যুক্তি ও হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষার ওপর জোর দেন এবং এরিস্টটলের অপবিজ্ঞানকে সাংঘাতিক ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি এরিস্টটলের সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম সামন্ত বাদী অর্থনীতির ভাবাদর্শ ও জীবনাচরণের অমানবিকতার কথা বলেন। চারিত্রিক সঙ্গতি না থাকলেও তার দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল বস্তুতান্ত্রিক। এরিস্টটলীয় ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অধ্যাপনার পদ থেকে সরিয়ে দেয় এবং গির্জা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে বন্দি করা হয়। জিওর্দানো ব্রুনোর হত্যার ২০ বছর পর ফ্রান্সিস বেকন (১৫১৬-১৬২৫) তার বিখ্যাত বই 'নোভাস অর্গানাম' প্রকাশ করেন। সেই বইতে তিনি স্কলাসটিসিজম নামের বিজ্ঞান বিরোধী দর্শনকে আক্রমণ করেন এবং আধুনিক আরোহী পদ্ধতির সাহায্যে বিজ্ঞানের বন্ধ দরজা খুলে দেন। ঐ বইতে বেকন পরিষ্কার ভাষায় ধর্মের বিজ্ঞান বিরোধী চরিত্রের উন্মোচন করেন এবং ধর্ম-সংস্থার হাতে বিজ্ঞানীদের অত্যাচার-নির্যাতনের কথাও উল্লেখ করেন। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি যে মাত্র ২০ বছর আগে ক্যাথলিক চার্চ যে ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল, সে কথার কোন উল্লেখ নেই উক্ত গ্রন্থে।

একজন সৈনিক জিওভ্যানী ব্রুনোর ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও সত্যি কথা বলতে কি ব্রুনোর কোনো পরিবার ছিল না, জন্মস্থান ছিল না, ধর্ম ছিল না। এই বিশাল পৃথিবীতে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ-একা। ভবঘুরের মত প্রাণ হাতে করে ইউরোপের দেশে দেশে তাকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। তবুও আশ্চর্যের কথা এই যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যাজক-ঐতিহ্যের দ্বারা নিপীড়িত নিঃসঙ্গ ব্রুনো তৎকালীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে একজন প্রকৃত দার্শনিকের মত পৃথিবীকে বিচার করতে বসেছিলেন। এটি আশ্চর্যের এই জন্য যে মাত্র বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা এই ধরনের চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই বলছিলাম

ব্রুনো তার সময়ের অনেক আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন তার দর্শন শোনার কান তৈরি হয়নি। বিশ্বাস করার মন তো তৈরিই হয়নি।

আধুনিক অর্থে ব্রুনোই ছিলেন প্রথম সর্বপ্রাণবাদী। সর্বেশ্বরবাদ মনে করে পৃথিবীর সবকিছুর প্রাণ আছে। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তাই ঈশ্বরকে খোঁজার জন্য কোন উপাসনালয়ের প্রয়োজন নেই। তিনি খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বস্তুবাদ ও স্টয়িক মতবাদের পুনরুত্থান ঘটান। তার সঙ্গে অনন্ত অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা সংযুক্ত করেন।

তের বছর থেকে পরবর্তী দশ বছর তিনি নেপলসের সেন্ট ডোমিনিকান স্কুলে লেখাপড়া করেছিলেন। বিখ্যাত স্কুল সেটি। সেন্ট থমাস এ্যাকুইনাস ছিলেন ডোমিনিকান গোত্রের একজন মানুষ। তিনি সেই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ব্রুনো এ্যাকুইনাসের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেননি এবং কিছুকালের মধ্যে ব্রুনো একজন ডোমিনিকান ধর্মযাজক হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি জিওর্দানো নামটি গ্রহণ করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলের সবাই তার অসাধারণ মেধা ও স্মরণশক্তির পরিচয় পান। তিনি একজন স্পষ্টভাষী, মুক্তমনের মানুষ ছিলেন। কিন্তু বাকসংযম করতে জানতেন না। যা সত্যি মনে করতেন, অনায়াসে তা প্রকাশ করতে পিছপা হতেন না। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিজেকে বিপদের জালে জড়িয়ে ফেলেন। প্রমাণ হয়ে যায় যে এই বালক ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের উপযুক্ত নন। সেকালের ছাত্রদের প্রশ্ন করার কোনো অধিকার ছিল না। শিক্ষক ছাত্রদের যা শেখান, ছাত্রদের সেটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। ছাত্র অবস্থায় যা তাকে শেখানো হতো, শিক্ষক হয়েও তার মধ্যে খুব ডুবে থাকাই ছিল, সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ। শিক্ষকরা ছিলেন পুরাতন জ্ঞানের সংরক্ষক। নতুনের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। ছাত্ররা ছিল তাদের শ্রোতা। শিক্ষকদের জ্ঞানের প্রশংসা করাই ছিল একজন ভাল ছাত্রের সদগুণ। নতুন কোন কথা বলা, কোন রকম সন্দেহ প্রকাশ ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সৃজনশীলতা ছিল মাহপাপ। তারা পরিশ্রম করবে, পরীক্ষা দেবে এবং ফলের জন্য অপেক্ষা করবে। শিক্ষা ছিল এরকম একরৈখিক ব্যাপার। কিন্তু ব্রুনোর চরিত্রে সেরকম সদগুণ ছিল না। নতুনের প্রতি তার আগ্রহ ছিল মজ্জাগত। মাঝে মধ্যে বেয়াড়া ধরনের প্রশ্ন করে শিক্ষকদের বেকায়দায় ফেলে দিতেন। তাই অচিরেই তিনি বিপদগ্রস্ত হলেন। প্রচলিত ধর্মকে তিনি যুক্তির অস্ত্র দিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করতেন। ফলে শিগগিরই তিনি ধর্ম আদালতের নজরে পড়েন। ১৫৭৬ সালে বিচার এড়াতে তিনি নেপলস ত্যাগ করে রোমে যান। সেখানেও নিস্তার নেই। বিচারের ভয়ে সত্বর রোম ত্যাগ করেন। এই সময় তিনি ডোমিনিকান ধর্মমত পরিত্যাগ করেন। ১৫৭৯ সালে তিনি জেনেভায় যান। সেখানে কেলীভন একটি প্রটেস্টান্ট রিপাবলিক স্থাপন

করেছিলেন। তিনি কেলভিন ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু বেশিদিন তিনি তা ধরে থাকতে পারেন না। আবারও তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। একটি প্রবন্ধে তিনি জনৈক কেলভিনপন্থী দর্শনের অধ্যাপককে আক্রমণ করেন এবং তার একটি বক্তৃতায় ২০টি ভুল শনাক্ত করেন। ফলে তাকে কিছুদিন কারাভোগ করতে হয়। ভুল স্বীকার করে তিনি মুক্তি পান।

১৫৮১ সালে তিনি প্যারিসে পলায়ন করেন। সেখানে তখন ক্যাথলিক ও হুগোনটদের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধ চলছে। তার ধর্মবিশ্বাসের কারণে সেখানে তিনি শিক্ষকতার কোন কাজ পেলেন না। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সেখানকার বিদ্বৎসমাজের সামনে বক্তৃতা দেন। প্রথম দিকে তিনি কিছু সাহনুভূতিশীল বন্ধুও পেয়ে যান। তার গুণপনা, বিশেষ করে তার অসাধারণ স্মরণশক্তির কথা, রাজা তৃতীয় হেনরির কানে পৌছায়। ব্রুনোর নতুন দর্শনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। ব্রুনো কি আসলেই জাদুকর নাকি মায়াবী কিছু, তা জানার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ব্রুনো তার প্রখর স্মরণশক্তির জন্য যাদুকর বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাজা তাকে ডেকে পাঠান। ব্রুনো তাকে বোঝাতে সক্ষম হন যে ম্যাজিক নয়, তার সিসটেম সুসংগঠিত জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অল্পকালের জন্য হলেও ব্রুনো ফ্রান্সের রাজার আশীর্বাদ লাভ করেন। ১৫৮৩-১৫৮৫ এই দুই বছর তিনি লন্ডনে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে বাস করেন। এই সময়ে ১৫৮৪ সালে তার দুখানা বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় : The Ash Wednesday Supper এবং On the Infinity, Universe and World- এ বই দুখানি তো বটেই, তার প্রায় ২০টি বই বেশ সাড়া জাগায়। দ্বিতীয় বইটিতে তিনি আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মত আরও অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের কথা বলেন এবং বলেন তাদের প্রত্যেকটিতে মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণীর বাস আছে। তার এ মত সরাসরি বাইবেলের জেনেসিস পর্বের বিরোধী। তাই চার্চ তা মানতে রাজি ছিল না। ঐ বছর তার আরও একখানা বই প্রকাশিত হয়। On Cause, Principle and Unity– এই তিনখানা বইতে ব্রুনো তার বিশ্বতত্ত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তা ছিল ধর্মীয় ও এরিস্টটলীয় বিশ্বতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। শেষ বইতে তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মত বলেন, 'The entire globe, this star, not being subject to death and dissolution and annihilation being impossible anywhere in Nature, from time to time renews itself by changing and altering all its parts. There is no absolute up or down, as Aristotle taught; no absolute position in space; but the position of a body is relative to that of other bodies. Everywhere there is incessant relative change in position throughout the universe, and the observer is always at the center of things.' এভাবে ব্রুনো গতির আপেক্ষিকতা তত্ত্বের আভাষ দেন।

কোপারনিকাস শুধু সৌর জগতের কেন্দ্রে পৃথিবীর জায়গায় সূর্যকে স্থাপন করে এক বিপ-ব সাধন করেছিলেন। কোপারনিকাস অনন্ত বিশ্বজগতের কথা ভাবেননি, তার ভাবনা ছিল সৌরজগতকে ঘিরে। কিন্তু ব্রুনো কপারনিকাসের কল্পিত সীমিত বিশ্বের মডেলটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন, একাধিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণাও তিনি করেছিলেন। পরবর্তী বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ব্রুনোর কল্পনাকে সত্যি বলে প্রমাণ করে। হাজার হাজার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আজ আর অনুমানের ব্যাপার নয়। তাই জার্মান দার্শনিক আর্নেস্ট ক্যাসির বলেন, 'ব্রুনোর সিদ্ধান্ত মানুষের স্বাধীনতার পথে প্রথম ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ। মানুষ কেবল আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে রাজি নয়। ... অনন্ত ও অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা মানুষের দৃষ্টির সীমানাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বরং তা মানুষের চিন্তার স্বাধীনতার জন্য এক বিরাট উদ্দীপক সিদ্ধান্ত। (আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায়, পৃ. ১৩৭)

এর কিছু আগে ১৫৮২ সালে তার দুখানা বই প্রকাশিত হয়। Shadows of Idea এবং Art of Memory. এই বই দুখানাতে তিনি মানুষের ধারণা বা আদর্শকে সত্যের ছায়া বলে মনে করেন। একই বছরে তার Brief Architecture of the Art of Lully নামে আরো একটি বই প্রকাশিত হয়। লুলি নামের প্রধান চরিত্রটি গির্জার ধর্মমত মানুষের বিচার বুদ্ধি দিয়ে প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু ব্রুনো প্রমাণ করেন যে এই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার কোনো অর্থ হয় না। খ্রিস্টধর্মকে তিনি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন যে ধর্ম সম্পূর্ণ দর্শনবিরোধী। খ্রিস্টধর্মী অন্যসব ধর্মের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, ধর্মের ভিত্তি হল অন্ধ বিশ্বাস। তথাকথিত প্রত্যাদেশের কোনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

তিনি যে অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রস্তাবনা করেন সেখানে ঈশ্বরের ধারণার কোনো জায়গা রাখেননি। তিনি ধারণাই করতে পারতেন না যে, ঈশ্বর এবং প্রকৃতির কোনো আলাদা সত্তা আছে এবং পৃথকভাবে তারা অস্তিত্ববান। বাইবেলের জেনেসিস পর্ব, ক্যাথলিক চার্চ, এমন কি এরিস্টটল তেমনিই শিক্ষা দেয়। এটা ব্রুনো মানতে পারেননি। তার কাছে মেরীর কৌমার্য এবং যিশুর ক্রুসবিদ্ধের ব্যাপারটি অর্থহীন। তিনি বাইবেলকে অশিক্ষিতের জন্য একখানা বই ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেননি। তিনি চার্চের শিক্ষাকে অনর্থক মনে করেন এবং মনে করেন যে তা মানুষের অজ্ঞতাকে উসকে দেয়। ব্রুনো লেখেন 'Everything however men may deem it assured and evident, proves, when it is brought under discussion to be no less doubtful than are extravagant and absurd beliefs (John J. Kessler, Ph.D. Ch. E-Internet)। তিনি

Libertes Philosophica নামে একটি শব্দবন্ধের প্রচলন করেন যার অর্থ হল চিন্তার স্বাধীনতা, স্বপ্ন দেখার স্বাধীনতা এবং যদি ইচ্ছা কর দর্শন সৃষ্টির স্বাধীনতা। তার চতুর্থ বইয়ের নাম The Incantation of circe, সিরসি-র যাদু। সিরসি হচ্ছে হোমারের সেই যাদুকর যে মানুষকে পশুতে রূপান্তর করে এবং সেই পশুর সঙ্গে তাদেরই ভুলভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করে। ব্রুনোর এই বইটা প্রমাণ করে যে তিনি ভাবানুষঙ্গ নিয়ে চিন্তা করতেন এবং ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও তার পদ্ধতি নিয়ে অবিরাম প্রশ্ন উত্থাপন করতেন।

৩৪ বছর বয়সে ১৫৮২ সালে তিনি The Chandler নামে একটি নাটক লেখেন। নাটকের থিম এরকম : একজন মোমবাতি প্রস্তুতকারক চর্বি ও তৈলজ পদার্থ দিয়ে মোমবাতি তৈরি করে এবং সেগুলো বিক্রি করার সময় উচ্চস্বরে বলতেন, Behold in the candle borne by this Chandler, to whom I give birth that which shall clarify certain shadows of ideas... I need not instruct you of my belief. Time gives all and takes all away, everything changes but nothing perishes... with this philosophy my spirit grows, my mind expands, whereof however obscure the night may be, I await the daybreak and they who dwell in day look for night... Rejoice, therefore, and keep whole if you can and return love for love (John J Kessler Ph. D. Ch.E. Internet).

ব্রুনো প্রায় এককভাবে কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে প্রচারাভিযান চালিয়ে যান। তখন প্রায় সবাই তার কথায় হাসাহাসি করতো– ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতো। কোপারনিকাসের তত্ত্ব তখন প্রায় কেউই বিশ্বাস করতো না কারণ তা এরিস্টটলের বিশ্বতত্ত্বের সঙ্গে মেলে না। ১৫৮২ থেকে ১৫৯২ সালের মধ্যে ইউরোপে এমন একজন শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যেত না, যিনি সক্রিয় ও খোলাখুলিভাবে কোপারনিকাসের বিশ্বতত্ত্বের পক্ষে কথা বলতেন। একমাত্র ব্রুনো ছাড়া। গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) কখনও ব্রুনোর সঙ্গে দেখা করেননি এবং তিনি তার কোনো লেখায় ব্রুনোর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) ও গ্যালিলিও উভয়েই ব্রুনোকে খুব একটা পছন্দ করতেন না।

ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথের সঙ্গে তার একবার দেখা হয়েছিল। তিনি তার গুণকীর্তনে খুবই বাড়াবাড়ি করেছিলেন। রানীকে তিনি অপেরা গায়িকা, প্রোটেস্টান্ট শাসক, পুতপবিত্র, স্বর্গীয় ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন এবং তাকে His Most Christian Majesty এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান বলে সম্বোধন করেছিলেন। তার এই উচ্ছ্বাসময় উক্তি তার বিচারের সময় তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাকে একজন নাস্তিক এবং ধর্মদ্রোহী বলে চিহ্নিত

করা হয়েছিল। রানী এলিজাবেথও ব্রুনো সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি তাকে একজন জংলি, বিপ-বী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও ভয়ঙ্কর মানুষ বলে মনে করতেন। ব্রুনো ইংরেজদের কর্কষ মানুষ বলে মনে করতেন।

ইতোমধ্যে ধর্মসংস্কার আন্দোলনে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের বিজয় সূচিত হয়েছে। ইংলন্ড তখন ক্যাথলিক ধর্ম ও রোমের বিরুদ্ধে সোচ্চার। ব্রুনো এতে আশাবাদী হয়ে ওঠেন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ইংলন্ডে যান। অনেক আশায় আবার বুক বেঁধে ব্রুনো আক্সফোর্ডে দর্শনের অধ্যাপক পদের জন্য দরখাস্ত করেন। কিন্তু অক্সফোর্ড তখনও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নির্জীব এরিস্টটলবাদের হাতে বন্দি। ব্রুনো সেখানে কোপারনিকাসের নতুন বিশ্বতত্ত্বের সমর্থনে বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু অক্সফোর্ডে তখন সাধারণভাবে কোপারনিকাসের সে তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। সেখানে তখনও সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। সেই সঙ্গে তিনি এরিস্টটলের বিশ্বছবিটাকে উচ্চকণ্ঠে আক্রমণ করেন। ব্রুনো ভীমরুলের চাকে আঘাত করেন। তার সেই বক্তৃতা তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি করে। চৌর্যবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত হন তিনি এবং অক্সফোর্ড ছাড়তে বাধ্য হন। লন্ডনে এসে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৫৮৫ সালের আগে তিনি আর প্যারিসে ফিরে আসেননি। প্যারিসে এসে পুনরায় তিনি বিপদের মধ্যে পড়েন। কেমব্রাই কলেজে বক্তৃতায় তিনি এরিস্টটলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং কোপারনিকাসের তত্ত্বের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ফলে শ্রোতারা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাকে কেবল ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেই তারা ক্ষান্ত হননি, শারীরিকভাবেও লাঞ্ছিত করা হয়। দেশ ছেড়ে পালাতে তাকে বাধ্য করা হয়। তিনি পালান কিন্তু তিনি তার মতাদর্শ পরিত্যাগ করেন না। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে ঘুরে বেড়ান। পাঁচ বছর তিনি মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। মাঝে মধ্যে মার্বুব, মেইনজ, উইটেনবার্গ, প্রাগ, হেমেস্টেড, ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং জুরিখ প্রভৃতি স্থানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন। এসব প্রোটেস্টান্ট দেশ। এর মধ্যে তিনি ল্যাটিন ভাষায় দর্শন, বিশ্বতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান, ম্যাজিক এবং স্মৃতিবিজ্ঞানের উপর বেশ ক'টি বই লেখেন।

যদি তিনি জার্মানিতে থাকতেন তাহলে হয়তো ভয়ের কিছু ছিল না। কিন্তু ১৫৯১ সালে ভেনিস থেকে তিনি এক রহস্যময় আমন্ত্রণ পান। জুয়ানে মোসেনিগো নামের এক যুবক স্মৃতিবিজ্ঞান শেখার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানান। ভেনিস তখন ইতালির একটি স্বাধীন প্রদেশ। তিনি ভেবেছিলেন রোমের প্রসারিত হাত হয়তো সেখানে পৌঁছাবে না। তিনি ভেনিসে গেলেন। তার ছাত্র তখন তাকে সেখানকার ধর্ম আদালতের হাতে তুলে দিল। ব্রুনো ভেনিসের ধর্ম আদালতে বিচারের সম্মুখীন হলেন। তার গুণধর ছাত্রটি তার বিরুদ্ধে অভিযোগের এক দীর্ঘ তালিকা প্রদান

করেন। অভিযোগের তালিকায় বলা হয়েছিল যে ব্রুনো হযরত মুসাকে একজন বড় যাদুকর হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে গল্প করেছিলেন, বাইবেলে যে কল্পকাহিনী ছাপানো আছে, তা গাঁজাখুরে গল্প ছাড়া কিছু নয়। যিশুও একজন যাদুকর ছিলেন এবং তিনি একজন জঘন্য ব্যক্তি। ব্রুনো নাকি বলতেন তিনি যিশুর চাইতেও ভাল ম্যাজিক দেখাতে পারেন। যিশুর পুনরুত্থান ও তার virgin birth নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতেন। নরক বলে কিছু আছে বলে তিনি মনে করতেন না। তাই মৃত্যুর পর মানুষকে কোনো শাস্তি পেতে হবে না। ঈশ্বর বলে আলাদা কিছুর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতেন না। কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকলে এমন অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ পৃথিবীর সৃষ্টি হত না। প্রার্থনা, সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন, ছবি কোন কিছুই কোন উপকারে আসে না। যাজকরা সবাই গাধা। কোন ধর্মই তাকে খুশি করতে পারে না। মোসেনিগো তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তাহলে আপনি কোন ধর্ম বিশ্বাস করেন?' উত্তরে এরিস্টটলের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, 'যা প্রত্যেকটি আইন ও প্রত্যেকটি বিশ্বাসের শত্রু', বলে উচ্চস্বরে হেসে উঠেছিলেন। ভেনিসের আদালতের সামনে নতজানু হয়ে তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন এবং তার এ সমস্ত ধর্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব অস্বীকার করেছিলেন। এর মধ্যে তিনি কোনো অন্যায় দেখেননি। মৃত্যুকে তিনি পরিহার করতে চেয়েছিলেন আরও কিছু কাজ করার সুযোগ পাওয়ার জন্য। তিনি তার নতুন দর্শনের আলোকে ধর্মের একটি নতুন সম্প্রদায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মুক্ত হলে তিনি জার্মানি বা ইংলন্ডে চলে যেতেন এবং তার ধর্মমতের পক্ষে প্রচার চালাতেন। কিছু অনুসারী তৈরির চেষ্টা চালাতেন। ব্রুনো ভেবেছিলেন তিনি মুক্তি পাবেন। কিন্তু রোমের উচ্চ আদালত সে সুযোগ তাকে দেয়নি। প্রধান ধর্ম বিচারক কার্ডিনাল সান্তাসেভেরিনা ব্রুনোকে রোমের ধর্ম আদালতে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয়। ভেনিস সরকার প্রথমে বাধা দিলেও ব্রুনোকে রোমের ধর্ম আদালতের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।

১৫৯৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তাকে রোমে আনা হয়। সাত বছর সেখানে তাকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। তাকে লেখাপড়ার কোন সরঞ্জাম দেয়া হয়নি। ব্রুনোর বিরুদ্ধে আটটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। সেগুলো যে কি, তা কোন দিনই জানা যাবে না। কারণ তার ফাইলটি লুকিয়ে রাখা হয়। পরে নেপোলিয়নের হাতে পড়ে তা ধ্বংস হয়। ১৫৯৯ সালে তার বিচার শুরু হয়।

১৬০০ সালের ২৫ জানুয়ারি পোপ ক্লিমেন্ট ৬ষ্ঠ তাকে ধর্মনিরপেক্ষ শাসকের হাতে বিচারের ভার অর্পণ করেন। ব্রুনো এবারে কিন্তু ক্ষমা চান না। তিনি বলেন যে তিনি তার বক্তব্য প্রত্যাহার করবেন না। কারণ তিনি এমন কিছু লেখেননি বা বলেননি যা প্রত্যাহারযোগ্য। ৮ই ফেব্রুয়ারি বিচারের রায় পাঠ করা হয়। সে রায়ে ব্রুনোকে অনুতাপশূন্য, গোঁয়ার, দুর্দম, একগুঁয়ে এবং ধর্মহীন হিসেবে চিহ্নিত করা

হয়। তাকে গির্জা থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং যাজকীয় ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়। সেন্ট পিটার গির্জার আঙ্গিনায় জনসম্মুখে তার বই আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং সেসব বইগুলোকে নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার সে বইগুলো আজও নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকায় রয়েছে। বিচারের রায় শুনে ব্রুনো বলেছিলেন, 'Perhaps you who pronounce my sentence are in greater fear than I who receive it.'

১৬ ফেব্রুয়ারি ব্রুনোকে Caupo dei Fiori তে আনা হয়। তাকে ক্লান্ত ও ভগ্নহৃদয় দেখাচ্ছিল। শেষ মুহূর্তেও চার্চ তাকে একা ছেড়ে দেয়নি, একদল যাজক তাকে ঘিরে থাকে এবং তার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। আগুন লাগাবার ঠিক আগ মুহূর্তে চুমু খাওয়ার জন্য তাকে একটি ক্রুশ দেয়া হয়। রাগে তিনি মুখ ঘুরিয়ে নেন। বলেন, 'আমি স্বইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করছি।' তিনি মনে করেন চিতার আগুনের লেলিহান শিখার ওপর চেয়ে তার আত্মা স্বর্গে পৌঁছে যাবে। তাকে উলঙ্গ করে একটি খুঁটির সঙ্গে বাধা হল। তারপর আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সক্রেটিসের পর আর একজন পণ্ডিতকে জ্ঞানচর্চার, ভিন্নমত পোষণ করার জন্য এবং কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য আত্মাহুতি দিতে হল।

ব্রুনোকে হত্যা করার দায় থেকে চার্চ কখনও নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। কোপারনিকাসের De revolutionbus প্রকাশিত হওয়ায় (১৫৪৩) ক্যাথলিক চার্চ ততটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। কারণ সম্ভবত এই যে তার সে তত্ত্ব কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও বিদ্বৎসমাজের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ব্রুনোর সমর্থনজ্ঞাপন এবং তার সে তত্ত্বের পক্ষে প্রচারাভিযান চালানোর পরই বইটি নিষিদ্ধ করা হয় ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে, প্রকাশের পর ৭৩ বছর পরে। আঠার শতক পর্যন্ত সে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। কিন্তু জিওর্দানো ব্রুনোর বইগুলো (প্রায় ২০টি) আজও ক্যাথলিক চার্চের নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকায় রয়েছে। ১৯৭৯ সালের ১০ নভেম্বর আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকীতে ধর্মযাজকীয় বিজ্ঞান একাডেমীর বিজ্ঞানীদের এক সমাবেশে পোপ ২য় জন পল যে মন্তব্য করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। বলেছিলেন,

'মাননীয় সভাপতি, আপনি আপনার ভাষণে সত্যিই বলেছেন যে গ্যালিলিও ও আইনস্টাইন একটি যুগকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। গ্যালিলিওর বিশালত্ব সকলের জানা, আইনস্টাইনের বিশালতার মতই। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তির বিপরীতে যাকে আজ আমরা সম্মানিত করছি কার্ডিনালদের কলেজের সামনে, প্রথম ব্যক্তিটিকে সীমাহীন কষ্ট দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে চার্চের মানুষ ও সংগঠনের হাতে। আর এ সত্য আমরা চাপা দিতে পারি না।' (আলো হাতে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায় পৃ. ৩২)। ১৯৯২ সালের ৩১ অক্টোবর রোমান ক্যাথলিক চার্চ অনিচ্ছা

সত্ত্বেও স্বীকার করেছেন যে কোপারনিকাসের তত্ত্ব সমর্থন করে গ্যালিলিও সঠিক কাজ করেছিলেন, ব্রুনোর প্রতি এরকম কোনো স্বীকারোক্তি চার্চ আজ পর্যন্ত করেনি। (আলো হাতে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায়, পৃ. ৩৩) বরং ব্রুনোর প্রতি ক্যাথলিক চার্চ যে এখনও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তা এনসাইক্লোপোডিয়ার সর্বশেষ সংখ্যায় ব্রুনো সম্পর্কে মন্তব্যে প্রকাশ পায়। সেখানে ব্রুনোকে চপলমতি ও অস্থিতিশীল চরিত্রের অধিকারী একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্রুনোর ধর্ম সম্পর্কে ধারণাগুলোকে ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেজন্য চার্চের রক্ষণশীল অঙ্গ 'ইনকুইজিশনে'র হাতে দীর্ঘদিন ধরে কারাবন্দি ও নির্যাতন ভোগ করার কথা বলা হলেও চার্চ কর্তৃপক্ষ যে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করে তার জন্য কোন অনুশোচনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়নি। (আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায়, পৃ. ৩৩)।

তাই আসুন ব্রুনোর হত্যাকাণ্ডের চারশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র স্মরণসভা থেকে আমরা আওয়াজ তুলি যে গ্যালিলিওর মত ব্রুনোর প্রতিও যে ক্যাথলিক চার্চ অমানবিক অপরাধ করেছিল আজ চার্চকে তা স্বীকার করতে হবে এবং তার জন্য সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সেই সঙ্গে তার সকল বই এর ওপর থেকে ধর্মীয় আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।*

সহায়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমূহ

1. Giordano Bruno (1548-1600) : Christan Bartholmess- Internet.
2. John J. Kessler Ph. D. Ch. E: Giordano Bruno : The Forgotten Philosopher- Internet.
৩. অভিজিৎ রায়, 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী', অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫।
4. H. Butterfield : The Origins of Modern Science, 1300-1800, G Bell and Sons Ltd. London, 1968.
৫. শিশির কুমার ভট্টাচার্য, 'মানুষ ও মহাবিশ্ব', সময় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৪।
6. Edward McNall Burns, Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner et. al. 'Wrold Civilization', Special Indian Edition, 1991.
7. M. Rosenthal & P. Yudin, 'A Dictionary of Philosophy', Progress Publishers, Moscow, 1967.
8. Jostein Gaarder, 'Sophies World', Berkley Books, New York, 1996.
৯. সরদার ফজলুল করিম, 'দর্শন কোষ', বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৭৩।

* শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ আয়োজিত 'ব্রুনোর আত্মত্যাগ' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ।

ইহজাগতিকতা ও আরজ আলী মাতুব্বর– একজন যুক্তিবাদী দার্শনিক

অজয় রায়

ইহজাগতিকতা কি?

বাংলা ভাষায় ইহজাগতিকতা একটি চমৎকার শব্দ। আমরা সেক্যুলারিজম শব্দটির বাংলা নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামাই। আমার মনে হয় ইহজাগতিকতা শুধু সেক্যুলারিজমকে ধারণ করে না, এর ব্যাপ্তি অনেক ব্যাপক। যে দার্শনিক মতবাদ বস্তুবাদী দৃশ্যমান জগৎ ছাড়া অন্য কোন আধিভৌতিক জগতের (metaphysical world) অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না ভারতীয় দর্শনে এই মতবাদকে বলা হয়ে থাকে ইহজাগতিকতা। ইহজাগতিকতার মূল ভিত্তি হল বস্তুতন্ত্রবাদ বা ম্যাটিরিয়ালিজম (materialism)। ইহজগতের অর্থ হল এই জগৎ অর্থাৎ যে দৃশ্যমান জগতে অর্থাৎ পৃথিবী ও চতুষ্পার্শ্ব নিয়ে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমরা বসবাস করছি। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'mortal world' অর্থাৎ মরজগৎ বা মর্তজগৎ। ইহজাগতিকতা মতবাদ গড়ে উঠেছিল দার্শনিক কপিলের 'সাংখ্য দর্শন', চার্বাকের 'লোকায়াত দর্শন' ধীষণের 'নাস্তিকতাবাদ', সঞ্জয় বেলথিপুত্তের 'অজ্ঞেয়বাদ' (agnosticism) ও ন্যায় শাস্ত্রের 'হেতুবাদ'কে (rationalism) আশ্রয় করে। আমরা এসব প্রসঙ্গে পরে ফিরে আসব।

অন্যদিকে ভাববাদী দার্শনিকেরা মনে করেন 'লোক' (world) দুই ধরনের। যে মর্তলোকে আমরা বসবাস করছি নির্দিষ্ট সময়ে তা হল 'ইহলোক', এবং ইহকাল শেষে আমরা ফিরে যাব অন্য এক জগতে যার নাম 'পরলোক'। হিন্দু পুরাণকারেরা একে নানা শব্দে অভিহিত করেছেন যেমন ব্রহ্মলোক, অমরলোক, অমর্তলোক বা স্বর্গ-নরক; বাইবেলে একে বলা হয়েছে 'হেভেন ও হেল' আর কোরান শরীফে 'বেহেস্ত ও দোজখ'। জীবিত অবস্থায় সেখানে যাওয়া যায় না, যদিও মহাভারতে

বলা হয়েছে যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন– স্বয়ং ধর্মরাজ তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন কুকুরের ছদ্মবেশে। কিন্তু এসবই মিথোলজি বা রূপকথা। বাস্তব জীবনে এটি ঘটে না। মৃত্যুতেই আমাদের ইহজীবনের সমাপ্তি। ওপার থেকে এসে কেউ আমাদের বলেনি পরলোক কোথায় এবং সেখানে তিনি শরীর ছাড়া কি ভাবে রয়েছেন এবং কতটা সুখে শান্তিতে।

শুধু দার্শনিক মতবাদ হিসেবে নয় ইহজাগতিকার ধারণা অনেক বেশি ব্যাপ্ত। ইহজাগতিকতার সাথে জড়িয়ে রয়েছে ধর্মবিরুদ্ধ না হলেও 'ধর্মঅনপেক্ষ বা ধর্মপ্রভাবহীন' সমাজের কথা, লোকায়ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা, মানবিকতা, বহুমাত্রিকতা ও বৈচিত্রময়তার ধারণার কথা। এক কথায় আধুনিকতা বলতে যা বুঝি তার সামষ্টিক ধারণা বহমান এই ইহজাগতিকতার শব্দটির মধ্য দিয়ে।

কিন্তু আধুনিকতা বলতে আমরা কি বুঝব? আধুনিকতা শব্দ দিয়ে আমরা অনেক কিছু বোঝাতে চাইলেও এক ধরনের অস্পষ্টতা থেকে যায়। আমরা একজন আধুনিক মানুষ বলতে কাকে বোঝাব? বিজ্ঞানের চিন্তা চেতনা ও আবিষ্কারের সাথে যিনি পরিচিত, যুক্তি-তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে যিনি বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হন, অর্থাৎ যিনি বিজ্ঞানমনস্ক, মুক্তবুদ্ধি চর্চায় নিবেদিত প্রাণ মুক্তমনের অধিকারী এবং যুক্তিবাদী, তাকেই তো আমরা বলতে পারি 'আধুনিক মানুষ'। এই প্রবন্ধের নিরিখে আধুনিকতা বলতে আমরা বুঝব কোন বিশ্বাস নয়, প্রতিটি ঘটনার পশ্চাতে রয়েছে বিশে-ষণধর্মী ব্যাখ্যা, যা যুক্তি ও তথ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, কোন আধিভৌতিক সত্তা বা আলৌকিক কোন বিষয় নয়; আধুনিকতার মূলে রয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভিত্তিক তথ্য ও প্রমাণ যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে অনুসন্ধিৎসু মুক্ত মন ও স্বাধীন চিন্তা; তথ্য-প্রমাণ-যুক্তির পথ ধরে বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, সামষ্টিক বা ব্যষ্টিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার বিশে-ষণী পথকেই বলা হয় বৈজ্ঞানিক বা আধুনিক পথ। আধুনিকতার আর একটি লক্ষণ হল সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া, তবে ইতিহাস-ঐতিহ্য-কৃষ্টিকে অস্বীকার করে নয়, পেছনের দিকে অতিতাশ্রয়ী হওয়া নয়। ইতিহাসের ভুল থেকে আমরা শিক্ষা নেব, ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা পাব এবং কৃষ্টি আর সংস্কৃতিকে নতুন থেকে নতুনতর করে নির্মাণ করার সতত প্রয়াস পাব, কারণ জীবন চলমান- আর জীবন চর্চারই অপর নাম সংস্কৃতি। একেই আমরা বলব আধুনিকতা। মানবতাবাদ অর্থাৎ 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' এই নীতিবোধই হল আধুনিকতা, এবং মানুষের অনন্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে এই জগতেই বিকাশ করার লক্ষ্যই হল ইহজাগতিকতা, অন্য কোন জগতের জন্য উপযোগী করে তোলা নয়। মানুষের স্বাধীনতা ও সার্বজনীন অধিকার চেতনায় বিশ্বাসী মানুষকেই আমরা বলব আধুনিক মানুষ।

প্রশ্ন হল একজন ধর্মভীরু মানুষ কি ইহজাগতিক বা আধুনিক হতে পারেন?

আমাদের বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, কারণ আপ্তবাক্যের মত আমাদের বলা হয় বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু ধর্মাচারী ও ধর্মনিষ্ঠ। এ প্রশ্নের উত্তর অনেকাংশে নির্ভর করবে এই শব্দগুলো দিয়ে ঠিক আমরা কি বুঝাতে চাই। সাধারণভাবে যে ব্যক্তি পরলোকে বিশ্বাসী ও ধর্মচর্চা ও ধর্মকর্মে এবং ধর্মীয় আচার আচরণে নিষ্ঠাবান আমরা তাকেই সাধারণত বলে থাকি 'ধর্মাচারী ও ধর্মনিষ্ঠ'। ধর্মভীরু শব্দটির সাথে জড়িয়ে রয়েছে একধরনের ভয় ও ভীরুতা ধর্ম সম্পর্কে। ধর্মাচার থেকে স্খলনজনিত পাপ বোধ থেকেই এই ভয়ের জন্ম, আর এ ধরনের মানুষকেই আমরা বলে থাকি ধর্মভীরু। বস্তুত আমরা সাধারণ মানুষেরা ধর্মকে ভালবাসার চাইতে একে ভয় পাই– কারণ ধর্মচ্যুতি ঘটলে আমরা পতিত হব নরকে বা দোজখে। আমাদের ধর্মাচরণের পশ্চাতে যতটা না রয়েছে ঈশ্বর প্রীতি তার চাইতে অনেক বেশি রয়েছে ঈশ্বর ভীতি, কারণ তিনি রুষ্ট হলে নরকে পতন ও দোজখের আগুনে দহন অবধারিত। সে অর্থে সাধারণ মানুষ যতটা ধর্মাচারী ও ধর্মনিষ্ঠ তার চাইতে অনেক বেশি ধর্মভীরু। আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ধর্মভীরু মানুষ ইহজাগতিক হতে পারে না। হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের জনগণ কি সত্যিই ধর্মভীরু যে অর্থে তাদের বলা হয়? আমার তো মনে হয় জনগণকে ধর্মবাদীরা তাদের প্রচারের মাধ্যমে ধর্মভীরু বানিয়েছেন।

আমাদের জনগণের একটি বৈশিষ্ট্য হল তারা বাহ্যিকভাবে যত ধর্মাচারই করুক না কেন, তাদের দর্শনের মূল ভিত্তিটা কিন্তু মানবতাবোধ বা মানুষের প্রতি ভালবাসা। আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বাঙালি যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন, সে তার লোকজ ঐতিহ্য ও বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করেনি, বা করতে চায়নি। আর আমাদের সংস্কৃতির উৎস ও অনুপ্রেরণা কিন্তু সেখানেই প্রোথিত। তাই সাঁওতালী নৃত্য, বেদে নৃত্য, মণিপুরী নৃত্য ও গীত আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, বিয়েতে গায়ে হলুদ, পান চিনি অনুষ্ঠান, বিয়ে ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে মেয়েলী গীত, নবান্ন, পৌষমাষে পীঠে পার্বণ, নববর্ষপালন, এমনকি নানা অনুষ্ঠানে নানা রঙে আলপনার ঢঙে মেঝেতে চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি অনুষ্ঠান– তাত্ত্বিক ইসলাম ধর্ম অনুমোদিত না হলেও, বাঙালি মুসলমান তা পালন করে আনন্দের সাথে। এবং সমাজ জীবনের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে সংশি-ষ্ট। এসব আচার আচরণে হিন্দু বাঙালি ও মুসমান বাঙালি জীবনে তেমন পার্থক্য নেই, কারণ এসব অনুষ্ঠান একই উৎস থেকে ক্ষরিত– আমাদের ফেলে আসা লোকজ জীবন, সংস্কৃতি ও আচার আচরণ। ওহাবী ইসলামে 'মিলাদ' উৎসবের কোন সুযোগ নেই, কিন্তু বাংলার মুসলমান হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর অনুকরণে 'মিলাদ'কে আত্মীকরণ করেছে। ইংরেজ আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সম্প্রদায় নির্বিশেষে ছাত্ররা একদিকে যেমন বীণাপাণির আরাধনা করেছে, ঠিক তেমনি মুহম্মদকে স্মরণ

করেছে ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে মিলাদ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

আমাদের জনগণের ধর্মচেতনার আর একটি বৈশিষ্ট্য এদের চেতনায় নম্যতা (flexibility)।

তাই দেখা যায় রাজা বা শাসকের ধর্মবিশ্বাসের সাথে জনগণের ধর্ম পরিবর্তন ও নতুন ধর্মগ্রহণ। পাল রাজাদের আমলে জনগণ মূলত ছিল তথাগতের অনুসারী, যদিও হিন্দুর সংখ্যা ছিল তাৎপর্যময়, আবার সনাতনপন্থী সেন রাজারা ক্ষমতায় এলে, সারাদেশ হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করতে সময় নেয়নি। যখন ১২০২-৩ সালে বখতিয়ার খিলজি'র আক্রমণের মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসনকর্তারা বাংলার ক্ষমতায় এল, কিছুদিনের মধ্যে বাঙালি জনসংখ্যার সিংহভাগ ইসলাম ধর্মগ্রহণে দ্বিধা করে নি। কিন্তু এই ধর্মান্তরে, বাঙালি তার অতীত ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে নিয়ে এসেছে, কোন দূরাগত সংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতি বলে মনে করে নি, কিন্তু নিজের প্রয়োজনে মুসলমান বাঙালি অনেক তুর্কী, পারসিক, আরবী শব্দকে বাংলা ভাষায় গ্রহণ করেছে। আর এখানেই বাঙালি মুসলমানকে অনন্যতা প্রদান করেছে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের তুলনায়। বাংলাদেশে ইসলামের একটি নিজস্ব লোকজ স্থানিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু ওহাবী, আহলে হাদিস প্রমুখ উগ্র ও কট্টর ইসলামী আন্দোলন চেয়েছে এই বৈশিষ্ট্যকে নির্মূল করে তাত্ত্বিক ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে। এদের উত্তরসুরীরাই নবান্ন, পহেলা বৈশাখ ও বাঙালির ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি ও আচার আচরণকে অ-ইসলামী নাম দিয়েছে, এমন কি শহীদ মিনারের অনুষ্ঠানকে 'পৌত্তলিকতা' নাম দিয়ে হারাম ঘোষণার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। আবার ইংরেজ শাসনকালে অনেক বাঙালি, বিশেষ করে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ খ্রিষ্টীয় মিশনারীদের কল্যাণে ও অন্যবিধ কারণে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, ইংরেজদের শাসনের স্পর্শে আসার ফলে পশ্চিমী সংস্কৃতির দুয়ার বাঙালির কাছে খুলে গেল, পশ্চিমের উদারনৈতিক চিন্তা চেতনা দর্শন ও সংস্কৃতি বাঙালি জীবনকে প্রভাবিত করল বিপুলভাবে। জন্ম নিল একটি নতুন ও আধুনিক বাঙালি সমাজের, চিন্তা চেতনায় বলা যেতে পারে আধুনিক, প্রগতিবাদী এবং ইহজাগতিক। বাঙালি মননের এই যে পরিবর্তনশীলতা ও নম্যতা প্রমাণ করে যে ধর্ম বিশ্বাসে বাঙালি চিত্ত কখনও সংরক্ষণশীল ও অনড় ছিল না। নতুন ও পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে সে পেছপা হত না। তাই সিপাহী বিদ্রোহকালে, সারা ভারত একে সমর্থন জোগালেও বাঙালি অগ্রবর্তী সমাজ একে পশ্চাদমুখী আখ্যায়িত করেছে; কেবলমাত্র সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেমের কাঠামোতে বিচার করে ক্ষয়িষ্ণু মোগল সামন্তবাদের পশ্চাতে দাঁড়াবার বুদ্ধিবৃত্তিক কোন যুক্তি সে কালের আধুনিকমনা বাঙালি সমাজ খুঁজে পায়নি। আর ধর্মবিশ্বাসের নমন্য স্বভাব ও মানুষের প্রতি ভালবাসা বোধ থেকেই এখানে জন্ম হয়েছে চৈতন্য, কবীর আর লালন প্রমুখ মানবতাবাদী সমন্বয়বাদীদের।

তবে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও আত্মসমর্পণ থেকেও অবশ্য জন্ম নিয়েছে এক ধরনের ধর্মচেতনা যাকে এক কথায় বলা যায় ভক্তিবাদ। 'সর্বধর্মং পরিত্যজ্যয়া মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি' গীতার এই বাণী, অথবা পরমাত্মার মধ্যে ব্যক্তি আত্মার বিলীন– বৈদান্তিক দর্শনের এই সার কথা, কিংবা কলিকালে হরিনামই সর্বস্ব ও মুক্তির একমাত্র উপায়– চৈতন্য ধর্মের এই মর্মবাণী, অথবা আল্লাহতালার সাথে ব্যক্তি রুহের অন্তর্মিলন– সুফিবাদের এই উপলব্ধি, অথবা রামকৃষ্ণের আত্মসমর্পিত হয়ে কালী মাতাকে ভক্তির মধ্য দিয়ে সাধনা ভক্তিবাদেরই নানা প্রকাশ– এর মূলে রয়েছে ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে গীতায় বলা হয়েছে যে তিন ধরনের সাধনার পথ বা মার্গ অনুসরণ করে ঈশ্বরোপলব্ধি বা নির্বাণ লাভ সম্ভব– এই তিনটি মার্গ হল কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

বাংলার সাধারণ মানুষের ঐতিহাসিক মানবতাবোধ ও উদার সাংস্কৃতিক পটভূমিতেই আমরা গ্রাম বাংলার ইহজাগতিক দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরকে উপস্থাপন করতে চাই। আমরা দেখেছি যে ইহজাগতিকতা হল আরজ আলী দর্শনের মূল ভিত্তি। আর ইহজাগতিকতার মূলে রয়েছে অনুসন্ধিৎসা বা মুক্ত মনের জিজ্ঞাসা এবং যুক্তিবাদ বা র‍্যাশনালিজম (rationalism)।

বিদগ্ধ পাঠককে অবশ্য র‍্যাশনালিজমের ধারণা নিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। তবে যুক্তিবাদিতা বা র‍্যাশনালিজম বলতে আমার ধারণা হল এটি কোন বিশ্বাস বা ডকট্রিন নয়। এটি হল কারণ, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে সত্যে উপনীত হওয়ার বিশে-ষণমূলক পদ্ধতি (system)। চিরায়ত র‍্যাশনালিজমের সংজ্ঞার জন্য আমরা নীচের যেকোন একটি বক্তব্যকে বিবেচনা করতে পারি :

1. 'the principle or practice of accepting reason as the only authority in determining one's opinon or course of action.'
2. In philosophy, the theory that the reason or intellect, is the true source of knowledge, rather than senses.
3. In theology, the doctrine that rejects that revelation and the supernatural, and makes reason the sole source of knowledge.

তাহলে দেখা যাচ্ছে যুক্তিবাদিতার মূলগত কথা হল কারণ বা যুক্তি (reason) ও বুদ্ধিমত্তা (intellect)। সংশয়াবাদ বা স্কেপটিসিজম (skepticism) হল যুক্তিবাদিতার পশ্চাতে চালক শক্তিরূপ। সংশয় ব্যতিরেকে কোন কিছু, যা আপাত দৃষ্টিতে যতই দুর্বোধ্য মনে হোক না কেন, গ্রহণ করা জন্ম দেয় বিশ্বাসের। আর প্রশ্নাতীত বিশ্বাস ঠেলে দেয় অন্ধত্বের দিকে। কাজেই কোন ঘটনা সম্পর্কে 'জিজ্ঞাসাবোধ ও প্রশ্নকরা', সে ঘটনা প্রাকৃতিকই হোক আর সামাজিকই হোক,

রচনা করে বিশে-ষণী পন্থার ভিত্তি যা থেকে জন্ম নেয় যুক্তিবাদিতা।

একজন যুক্তিবাদী মানুষ অবরোহী (deductive) ও আরোহী (inductive) উভয় পদ্ধতিতেই সিদ্ধান্ত বা সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে। আমরা বিজ্ঞানের জগতে দুটি পদ্ধতিই অণুসরণ করে থাকি। দু'একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ১৯২৪ সালে (১) আলো কণিকাগুলো কেবল অবিকল (identical) এক নয়, এরা পার্থক্য অযোগ্যও (indistinguishable) (২) এসব ফোটন যে দশা-স্থানে বিচরণ করে এর ন্যূনতম আয়তন h^3 এবং একটি ফোটন তার মেরুবর্তিতার প্রসঙ্গে মাত্র দুটি অবস্থানে থাকতে পারে– এই দুটি অনুমিতির ওপর ভিত্তি করে সত্যেন বোস ফোটন কণিকারা মেনে চলে এমন একটি নতুন কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের জন্ম দেন যা থেকে সহজেই প-্যাঙ্কের বিকিরণ সূত্র পাওয়া যায়। বোস কর্তৃক এই সংখ্যায়নকে বর্তমানে বলা হয় বোস সংখ্যায়ন (Bose statistics)। আবার ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন (১) সকল জাড্য কাঠামোতে আলোর দ্রুতি সব সময় অপরিবর্তিত থাকে, ও (২) সকল জাড্য কাঠামোতে পদার্থবিদ্যার সূত্রসমূহের রূপ একই থাকবে– এই দুটি অনুমিতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব', যা চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তিটাকেই প্রবল নাড়া দিয়েছিল। উপরে উদ্ধৃত বোস ও আইনস্টাইন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি দুটি হল অবরোহী (deductive) পদ্ধতির চমৎকার উদাহরণ। অন্যদিকে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল তার সময়ে বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব ও আলো সম্পর্কিত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা নিয়ম, তথ্য ও পরীক্ষালব্ধ ফলাফল অনুপুঙ্খ বিশে-ষণ করে তার নামে পরিচিত চারটি ক্ষেত্র সমীকরণে উপনীত হলেন যা প্রয়োগ করে আলো, বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব সম্পর্কে চিরায়ত সকল ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। এটি হল বিজ্ঞানে অনুসৃত আরোহী পদ্ধতির একটি সুন্দরতম উদাহরণ।

যেহেতু যুক্তিবাদীরা সত্যে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে তাদের যুক্তিনির্ভর বিশে-ষণ পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য সব কিছু সম্পর্কেই প্রশ্ন ও সন্দেহ প্রকাশ করে থাকে– এ কারণে তারা বর্তমানে অর্জিত জ্ঞানের স্তর ও লভ্য তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কি জানা সম্ভব আর কী জানা সম্ভব নয়, এ নিয়েও তাদের চিন্তাভাবনা রয়েছে। এ কারণে যুক্তিবাদ ও সংশয়বাদ (agnosticism) পরস্পর কাছাকাছি। সনাতনী ধারণা অনুযায়ী যিনি মনে করেন যে, 'আমরা বস্তুজাগতিক ঘটনার বাইরে কোন কিছু জানতে পারি না,– অর্থাৎ প্রথম কারণ এবং অদৃশ্য জগৎ আমাদের কাছে অজানা (unknown), এবং আপাতদৃষ্টিতে অজ্ঞেয় (unknowable)'– তিনি হলেন অজ্ঞেয়বাদী (agnostic)। এবং এই মতবাদকে বলা হয় অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism)। ধর্মীয় দৃষ্টিতে বলতে গেলে যারা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর এবং ইহজগতের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন কিছুই জানা অসম্ভব– এই

মতবাদকে বলা যায় অজ্ঞেয়বাদ। ঈশ্বর আছেন কি না, বা স্বর্গ ও নরক আছে কি না– এ ধরনের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। সুতরাং আধিভৌতিক জগৎ সম্পর্কে কোন আলোচনা করা অবান্তর। এই নীতিকে চমৎকারভাবে উত্থাপন করেছেন জি. জে. রামানেস (G. J. Ramanes) : "By agnosticism, I understand a theory of things which abstains from either affirming or denouncing the existence of God; all it undertake to affirm is that, upon existing evidence, the being God is unknownable.") এ বক্তব্যটি পুরোপুরিই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। শুধু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে বা পারলৌকিক বিষয়ে নয়, পার্থিব অনেক ঘটনা আমাদের সামনে ঘটে যা আমাদের এখন পর্যন্ত জানা তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে বিশে-ষণ করা যায় না। যতক্ষণ না পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরিত হচ্ছে ততক্ষণ ঐ ঘটনাটির স্বরূপ বা প্রকৃতি অজ্ঞেয়। এই অজ্ঞেয় বস্তুকে জানার অহরহ চেষ্টাই হল মুক্তচিন্তা ও মুক্তমনের বৈশিষ্ট্য– পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিশে-ষণের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হবে ঐ দুর্জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ। বিজ্ঞান এই পথ ধরেই অগ্রসর হয় সত্যের সন্ধানে।

আমরা পদার্থবিদরা অজ্ঞেয়বাদের কাছাকাছি এক ধরনের মৌল নীতিতে বিশ্বাস করি– এটিকে বলা যেতে পারে অসম্ভব্যতার নীতি (principle of impossibility) দু'একটি উদাহরণ দেই। তাপবলবিদ্যায় দুটি নীতি রয়েছে– একটি হল আমাদের পক্ষে এমন কোন যন্ত্র নির্মাণ করা অসম্ভব যা সৃষ্টি করতে পারে চিরস্থায়ী গতি (perpetual motion), আর অন্যটি হল পরম শূন্য ডিগ্রির তাপমাত্রায় পৌছানো অসম্ভব। আবার আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী শূন্য স্থানে বস্তুকণার বেগ আলোর বেগের সমান বা এর বেশি হতে পারে না। হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে ক্যানোনিকভাবে সম্পর্কযুক্ত (canonically related) কোন দুটি ভৌতরাশি ১০০% নিশ্চয়তা নিয়ে পরিমাপ করা যায় না। যেমন কোন জড় কণিকার অবস্থান ও বেগ একই সাথে ১০০% নিশ্চয়তায় মাপা যায় না, অর্থাৎ কণিকাটির বেগ যদি ১০০% নিশ্চয়তা নিয়ে পরিমাপ করি, এর অবস্থান সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয় পড়বে। এমন কিছু সত্তা রয়েছে যার অস্তিত্ব জাড্য কাঠামোতে সম্পাদিত পরীক্ষণ দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, যেমন স্থানকালের 'পরমতা' (absoluteness)। তথাকথিত শাশ্বত ঈথারের কথা ধরা যাক, যার অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানীরা আলো পরিচালনার মাধ্যম হিসেবে, কিন্তু পদার্থবিদ্যার কোন পরীক্ষণেই এর অস্তিত্ব ধরা পড়েনি। ধর্মবাদী ও ভাববাদী দার্শনিকের কল্পিত ঈশ্বরও এমন একটি সত্তা বলে বিবেচনা করা যায় যার অস্তিত্ব ভৌত কাঠামোয় সম্পাদিত কোন পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। অজ্ঞেয়বাদ এ ধরনেরই একটি নীতি।

অজ্ঞেয়বাদ, যুক্তিবাদ বা র‍্যাশনালিজম এবং নিরীশ্বরবাদ কি কেবলই পাশ্চাত্য ধারণা?

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, এসব ধারণা পাশ্চাত্যে উদ্ভুত। কিন্তু সার্বিকভাবে একথা সত্য নয়। এথিইজম এর প্রাতিষঙ্গিক ভারতীয় দর্শনের ধারণাকে প্রকাশ করা হয় দুটি শব্দ দিয়ে– নাস্তিকতা বা নাস্তিবাদ এবং নিরীশ্বরবাদ। ন অস্তি তাই নাস্তি অর্থাৎ যার কোন অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বর, স্রষ্টা বা পরলোকের অস্তিত্ব নেই এই মতবাদকে বলা হয় নাস্তিকতা বা নাস্তিবাদ এবং নিরীশ্বরবাদ।

গৌতম বুদ্ধেরও আগে ভারতীয় দার্শনিক ধীষাণ নাস্তিবাদ অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদ (atheism) দর্শনের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তার এই বাদ অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার কোন অস্তিত্ব নেই। যে চির শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে তা হল জড় (matter) আর জড় পদার্থ, তার মতে, চারটি মৌল উপাদান নিয়ে গঠিত : মৃত্তিকা, জল, তেজ (আলো), বা শক্তি এবং বাতাস। জীবন সৃষ্টি হল একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া– এবং কথিত চারটি মৌলের সংযুক্ত সংমিশ্রণ (composite composition) থেকে উদ্ভুত হয়েছে। পরলোক বলে কিছু নেই মৃত্যুর সাথেই জীবের সম্পূর্ণ সমাপ্তি। ধীষাণের মতে প্রত্যক্ষণই (perception) হল 'অস্তিত্বের' প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ভারতীয় দর্শনে র‍্যাশনালিজমকে নাম দেয়া হয়েছে হেতুবাদ (যুক্তির তত্ত্ব)। বাংলায় আমরা যুক্তিবাদ কথাটি চালু করেছি। এই দার্শিনক মতবাদ মনে করে যে মহাবিশ্বে ঘটমান প্রতিটি ঘটনার পশ্চাতে রয়েছে কোন না কোন হেতু (cause) বা কারণ একেই বলা হয় 'কার্যকারণবাদ'।

বস্তুবাদ থেকেই যুক্তিবাদিতার উদ্ভব

অজ্ঞেয়বাদ, নিরীশ্বরবাদ বা যুক্তিবাদ যাই বলি না কেন– সব ধারণার মূল ভিত্তিটি কিন্তু বস্তুবাদ। বর্তমান কালে বস্তুবাদের নানা ধরনের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা রয়েছে। মার্কসবাদীরা এক ধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন, আবার বিজ্ঞানীরাও এক ধরনের বস্তুবাদী। কিন্তু দুয়ের মধ্যে ভেদ আছে। বার্ট্রান্ড রাসেল বা হোয়াইটহেড যেভাবে বস্তুতান্ত্রিকতাকে দেখেন তার সাথে মার্কসীয় বস্তুবাদের ভেদ আছে। আমরা অনেকেই এইসব পশ্চিমী বস্তুবাদের মূল ধারণাগুলোর সাথে কমবেশি পরিচিত। কিন্তু অতি দূর অতীতে প্রাচ্যে বিশেষ করে ভারতবর্ষের নিজস্ব দার্শনিক চিন্তা ধারণাতেও বস্তুবাদ তখনকার জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে বিকশিত হয়েছিল– সে খবর আমরা অনেকেই হয়তো রাখি না। এ কথা দিয়ে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, বস্তুতান্ত্রিকতা কোন এলিয়েন অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য বিরোধী ধারণা

নয়, আমাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমরা ভারতীয় চিন্তাধারার এই মূল স্রোতগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

যতদূর জানা যায়, কপিল প্রবর্তিত 'সাংখ্য দর্শনই' হল ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের প্রথম সার্থক প্রকাশ। কপিল ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মানুষ, গৌতম বুদ্ধের প্রায় একশ বছর আগের। এই দর্শনের মূল বক্তব্য ছিল প্রকৃতিই হচ্ছে একমাত্র শাশ্বত সত্তা যা থেকে বিশ্বজগৎ বিকশিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন 'মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম।' এর অর্থ হল প্রকৃতিই সকলের মূলে, তার মূলে কেউ নেই। প্রকৃতিই হল জগতের কারণ, প্রকৃতির পরিণাম হচ্ছে বিশ্ব। জগৎ সৃষ্ট হয়নি, এ জগতের স্রষ্টা বলে কেউ নেই। জগতের ক্রম বিকাশ হয়েছে। যান্ত্রিক বস্তুবাদীদের মত কপিল তার চারপাশের পরিদৃশ্যমান তথ্য, উপাত্ত ও ইতোমধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞান বিশে-ষণ করে আরোহী পদ্ধতিতে তার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করতেন। এই দর্শন বলে 'নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধি' অর্থাৎ অবস্তু থেকে বস্তুর যেমন উৎপত্তি হতে পারে না, তেমনি নিরাকার ব্রহ্ম থেকে জগতের বিকাশ ঘটতে পারে না। পঞ্চভূত থেকেই স্থূল জড় বা বস্তু সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক ঘটনার পশ্চাতে রয়েছে হেতু বা কারণ– আর কার্যকারণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বস্তুর রূপান্তর, ক্রমবিকাশ আর বিবর্তন ঘটে থাকে। প্রত্যেক কার্য কারণে সুপ্ত থাকে। অনস্তিত্ব বা অভাব কোন ক্রিয়ার বিষয় হতে পারে না। 'আকাশ কুসুম' কবির কল্পনায় থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব নেই। তবে প্রকৃতির এই বিবর্তন বা রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে অন্তর্নিহিতভাবে যুক্ত রয়েছে প্রকৃতি ছাড়াও প্রকৃতিরই আর একটি সত্তা– সাংখ্য দর্শনে একে বলা হয়েছে নিষ্ক্রিয় 'পুরুষ' সত্তা। যিশুর জন্মের ছ'শ বছর আগে কপিল কল্পনা করেছিলেন যে এই বিশ্ব জগতের কোন স্রষ্টা নেই– পঞ্চভূত থেকেই অজৈব জড়ের সৃষ্টি, আর অজৈব জড় থেকে উদ্ভুত হয়েছে চৈতন্যময় জীব। এ কেমন করে হয়– এ প্রশ্নের জবাবে কপিল তখনকার জ্ঞান ও তথ্যের ভিত্তিতে বলেছিলেন : 'মাদকশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেক পরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ', যার সারমর্ম হল যে যে দ্রব্য দিয়ে মদ তৈরি হয় তার কোনটিতেই মাদক শক্তি থাকে না, কিন্তু সেসব দ্রব্য মিশিয়ে সৃষ্ট মদে থাকে 'মাদকতা'। অনেকটা সেরকমই স্থূল ভূতগুলির আলাদাভাবে চৈতন্য না থাকলেও মিলিত ভূতগুলির পরিণামস্বরূপ নতুন সৃষ্ট ভূতে চৈতন্য সৃষ্টি হতে পারে। আর এই চৈতন্যময় ভূতেরই নাম জীব। কপিলের এই অনুকল্পকেই আমরা আধুনিক পরিভাষায় বলতে পারি 'জীবনের রসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব' (Theory of chemical origin of life)। সুতরাং মহাব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে যেমন ঈশ্বর নামক কোন বহির্প্রতিভূর প্রয়োজন নেই, জীব সৃষ্টিতেও তেমন এর কোন ভূমিকা নেই। কপিল বলেছেন জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা দেয় তা তাদের স্ব স্ব গুণের ভিন্নতার কারণে। সুতরাং আমরা বলতে পারি,

কপিলের দৃষ্টিতে, চৈতন্য-গুণযুক্ত জড়ই হল জীব। 'দেশ ও কালও' প্রকৃতির প্রকাশ যা নিরবিচ্ছিন্ন ও অনন্ত। কপিল অনুসৃত আরোহী পদ্ধতির মূল তিনটি প্রকরণ হচ্ছে 'প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম'। আগম হল শ্রবণ বা শব্দ, শ্রবণের মাধ্যমে যে জ্ঞান তাকে বলা হয় আগম। আর যেহেতু শ্রবণ বা শব্দের মাধ্যমে বেদ প্রকাশিত হয়েছে তাই বেদাদি গ্রন্থকে আগম শাস্ত্র বলা হয়। তিনি তার মত করে এই তিনটি প্রকরণ করে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই কপিলের মতে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই: 'ঈশ্বরাসিদ্ধে'। যুক্তির দ্বারা যে সত্তার হদিস মেলে না, তার অস্তিত্ব নেই, আর সেজন্য ঈশ্বর অসিদ্ধ। একথা বলে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করব যে সাংখ্যদর্শনের মূলে রয়েছে কঠোর অভিজ্ঞতা, আর এর ভিত্তি হল ভুয়োদর্শন। ভাববাদী দার্শনিকেরা কপিলের বস্তুবাদী দর্শনকে ভুয়োদর্শন অর্থাৎ মিথ্যে বা ভ্রান্ত নামে অভিহিত করত।

আমাদের কালে এসব কথা স্থূল ও অপক্ব মনে হতে পারে, কিন্তু কপিলের কালের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। তখন কেবল মানুষ চাকার ব্যবহার শিখেছে কাঠের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে ব্যবহার করতে শিখেছে। তাম্র- লৌহের ব্যবহার্য কারিগরী ও শিল্পীগোষ্ঠী কেবল সৃষ্টি হচ্ছে।

আধুনিক পরিভাষায় এই দর্শনকে বলা যেতে পারে 'prime ordial matter'। কপিল দর্শনের বিশেষ দিকগুলো বিশে-ষণ করলে দেখা যায় যে, তার দার্শনিক মতটিকে আধুনিক দর্শনের দৃষ্টিতে অনেকটা যান্ত্রিক বস্তুবাদের (mechanical materialsm) সামিল।

বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন দুটিকেও এক ধরনের বস্তুবাদের প্রকাশ বলে ধরা যায়। জৈনদর্শনে বস্তু বা জড় হল সগুণ, অর্থাৎ গুণ বা ধর্ম ছাড়া বস্তুর কোন অস্তিত্ব অসম্ভব, তেমনি বস্তু নিরপেক্ষ কোন গুণের অস্তিত্ব কল্পনাহীন। জৈনদর্শন পদ্ধতি হল বিশে-ষাত্মক। জড়ের বাইরেও জৈনরা কল্পনা করে এক ধরনের প্রহেলিকাময় সত্তার যার নাম কর্ম, আর এই কর্মের মধ্য দিয়ে সমন্বয় ঘটে জড় ও মনের এবং দেহ ও চৈতন্যের। এই রহস্যবাদী জৈন বস্তুতান্ত্রিকতা বোঝা বেশ কষ্টকর। স্থান কাল সম্পর্কে তাদের ধারণা আরও অস্পষ্ট; তারা বলে কাল পুরোপুরি জড় নয়, বলা যেতে পারে অর্ধজড়। একথা দিয়ে তারা ঠিক কী বোঝাতে চায় অনুধাবন করা বেশ কষ্টকর। এই দর্শনে বলা হয় কাল বিশ্বব্যাপী এবং বস্তুর গতিই হল কালের প্রকাশ। অর্থাৎ বোধগম্য ভাষায় বলা যেতে পারে বিশ্ব ঘটনাবলী কালের কোলে গ্রোথিত। কালের অস্তিত্ব আছে কিন্তু নেই পরিণাম।

মহাত্মা বুদ্ধের বাণী, উপদেশ ও চিন্তাভাবনাকে কেন্দ্র করে যে দার্শনিক পদ্ধতি গড়ে উঠেছে পরবর্তীকালে তাকেই বলা হয়েছে বৌদ্ধ দর্শন। নাগসেন, বসুমিত্র, বুদ্ধঘোষ প্রমুখ বৌদ্ধাচার্যদের মনীষার লালনে এই পদ্ধতি একটি যৌক্তিক স্তরে

উন্নীত হয়েছিল, তারা একে পরিণত করেছিলেন এক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে। এই বস্তুতান্ত্রিকতা একদিকে যেমন যান্ত্রিক নয়, অন্য দিকে জৈনদর্শনের মত কুহেলিকাময় নয়। আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করলে বলা যায় এই দর্শন পদ্ধতির মূলে রয়েছে দ্বান্দ্বিকতা (dialectical)। বুদ্ধের মতে জড়জগৎ সতত পরিবর্তনশীল, স্থান নয়। আর এই পরিবর্তন সাধিত হয় দ্বান্দ্বিকতার পথ ধরে। উদাহরণ টেনে বলেছেন– এই মুহূর্তে যে লাল কুসুমটি দৃশ্যমান, তা কিন্তু পরক্ষণেই একই কুসুম নয়, পরিবর্তিত হয়ে একটি নতুন কুসুম জন্ম নিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী চলছে এক সীমাহীন বিরামহীন পরিবর্তনের প্রবাহ, বস্তুর রূপান্তর আর বিবর্তন। জীবনের সৃষ্টি, বেড়ে ওঠা আর তিরোধান একটানা প্রবহমান এক ছন্দ যেন। এই পরিবর্তন ঘটার পেছনে রয়েছে একটি চালিকা শক্তি অস্তি ও নাস্তির দ্বন্দ্ব; আস্তিক-নাস্তিক, হ্যাঁ ও না' এর যুগপৎ মিছিল। এই অস্তি-নাস্তির মাঝে নেই কোন ছেদ- তা সতত চলমান এক বিরামহীন প্রক্রিয়া। বুদ্ধের মতে 'সত্তা' বলে কিছু নেই, যা আছে তা হল উৎপাদমান অর্থাৎ 'ভব' (being)- 'সবই আছে যেমন একটি অতিশয়োক্তি, তেমনি কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই আর একটি অতিশয়োক্তি, মাঝামাঝিই সত্য। একটি ভব থেকে আর একটি ভবের যে সতত ধারা অর্থাৎ উৎপাদমানের যে অনন্ত স্রোতধারা তার পশ্চাতে রয়েছে হেতু, অর্থাৎ পরিবর্তনের এই ধারা কার্যকারণ দ্বারা অন্বিষ্ট। বুদ্ধের এই দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে বলা হয় 'প্রত্যুৎ সমুদপাদ' বা জগতের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব। আর এ কারণেই বৌদ্ধদর্শনের দৃষ্টিতে পরম সত্য বলে কিছু নেই, সকল সত্যই আপেক্ষিক। তাদের মতে পঞ্চভূত নিয়েই জড়, এবং জড় ও মন দুটি পৃথক সত্ত্বা হলেও পরস্পরকে আশ্রয় করে থাকে। জৈনদের মতই তারা মনে করে জড়বস্তু সগুণ, আর বস্তুর এই গুণ তার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক, আমাদের মনোলোকের সৃষ্ট কোন প্রতিতী নয়। তারা আরও বলেন যে, অনেক সত্য আমাদের জানা, এবং অনেক সত্য হয়তো আমাদের অজানা থাকবে। গৌতম বুদ্ধ, একগুচ্ছ জীর্ণ পত্র হস্তে ধারণ করে শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আমি এই মুষ্টিমেয় কয়েকটি পত্রের মত তোমাদের মুষ্টিমেয় সত্যের কথা বলেছি, এছাড়া জগতে অসংখ্য সত্য আছে।'

ভারতীয় দর্শনে আরও একজন বস্তুবাদীর সাক্ষাৎ মেলে– তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতকের দার্শনিক 'কণাদ'। তিনি বলেছিলেন যে, জড় কেবল মাটি, জল, তেজ আর বায়ু দিয়ে তৈরি নয়, প্রতিটি বস্তুর রয়েছে এক একটি ক্ষুদ্রতম কণা– এই কণা সমষ্টি নিয়েই গঠিত হয়েছে স্থূল বস্তু: বস্তুটির এই কণা কিন্তু নির্গুণ নয়, বরং বস্তুটির স্থূল ধর্ম এই কণিকাটি বহন করে, যা দিয়ে এটিকে অন্য বস্তুকণা থেকে আলাদা চিহ্নিত করা যায়। কণাদের 'কণা' অনেকটা বর্তমানের 'অণুর' (mdecute) মত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বস্তু গঠন আর সন্তত নয়, এর প্রকৃতি রেণুধর্মী (discrete)।

কনাদের এই 'কণিকাবাদ' কতকটা গ্রীক কণিকাবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত আর কতটা কণাদের নিজস্ব সে বিতর্কে যাওয়ার অবকাশ আমাদের নেই। কণাদের প্রবর্তিত এই দর্শন পদ্ধতিকে বলা হয় বৈশেষিক শাস্ত্র।

আমরা এবার ভারতীয় দর্শনচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করতে চাই–যা নানা নামে অভিহিত হয়ে থাকে, যেমন চার্বাক দর্শন, লোকায়ত দর্শন ইত্যাদি। নাম যাই হোক এই দর্শনের প্রবক্তারা কেবল ইহলোকের কথা বলেছেন, ইহজাগতিকতার কথা বলেছেন, কারণ তারা দৃশ্যমান ইহলোক ছাড়া পরলোক, স্বর্গ, নরক, পরমাত্মা, ঈশ্বর এসবের কোনটিতেই বিশ্বাস করতেন না। এ কারণেই এই দর্শনের আসল নাম ছিল 'লোকায়ত' অর্থাৎ ইহলোক সম্পর্কে যে জ্ঞান। 'লোকেষু আয়ত' সাধারণ মানুষের বোদ্ধ যে মতবাদ অর্থাৎ ইহলোক নিয়ে যে কথাবার্তা তাকেই নাম দেওয়া হয়েছিল লোকায়ত। অন্যদিকে এই দর্শনের বিরুদ্ধবাদীরা বলতেন যে লোকয়তিকরা ভাল ভাল মন ভোলানো কথা বলে অর্থাৎ চারু বাক্যের দ্বারা সাধারণ মানুষের মনোহরণ করতেন সেজন্য তারা বিদ্রূপ করে এর নাম দিয়েছিলেন 'চার্বাক দর্শন। চারু বাক থেকেই চার্বাক নামের উৎপত্তি। এ নামের সত্যিই কোন দার্শনিক ছিলেন কিনা এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। লোকায়ত দর্শন পদ্ধতির প্রবক্তা কে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে পণ্ডিতদের মধ্যে। বৃহস্পতি, চার্বাক, ধীষাণ, অজিতকেশকম্বলী, কাশ্যপ, পুরন্দর, ভাণ্ডারী, সঞ্জয় প্রমুখদের নাম এই দর্শনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। এ থেকে মনে হয় এই দর্শন নানা জনের অবদানে পুষ্ট হয়েছে এবং হয়তো বা প্রচারিত হয়েছে। তবে গবেষণা থেকে দেখা যায় যে ধীষণই এই মতবাদের প্রথম প্রণেতা। তিনি কোন সময়ের তা সঠিকভাবে এখনও জানা যায়নি, তবে অনুমান করা হয় যে, তিনি কপিল ও বুদ্ধের পূর্ববর্তী, সম্ভবত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগের লোক। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, মহাভারতের শান্তি পর্ব ও শল্য পর্বে ধীষণ দর্শনের উল্লেখ রয়েছে। পদ্মপুরাণ থেকে জানা যায় যে ধীষণই ছিলেন লোকায়ত দর্শনের আদি প্রবক্তা : 'কণাদ নামে কোনও ব্যক্তি বৈশেষিক নামে মহৎ শাস্ত্র আবিষ্কার করেছেন। গৌতম ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন, কপিল সাংখ্য শাস্ত্র রচনা করেছেন, জৈমিনী নামে কোনও ব্রাহ্মণ নিরীশ্বরবাদের এক মহত্তম শাস্ত্র এবং ধীষণ নামে কোনও ব্যক্তি অতি গর্হিত চার্বাক শাস্ত্র এবং স্বয়ং বিষ্ণু দৈত্য বিনাশের নিমিত্ত বুদ্ধরূপী হয়ে সর্বোতভাবে অসৎ বৌদ্ধশাস্ত্র বলেছেন।' লোকায়তবাদীরা সবচাইতে গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ওপর যা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ এবং বাস্তবধর্মী। এই দর্শনের মতে প্রমাণ একটিই, তিনটি নয়, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (যেমন সাংখ্য দর্শন মনে করে)। ধীষণ বলেছেন যে শোনা কথা (আগম) কোন প্রমাণ হতে পারে না : 'ত্রয়োবেদস্য কর্তারো ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরঃ'। আর অনুমান সম্পর্কে ধীষণের মন্তব্য

হলো এটি নির্ভর করে ব্যাপ্তিজ্ঞানের ওপর। যেমন 'ধূমাৎ বহ্নি' অর্থাৎ যেখানেই ধূম সেখানেই অগ্নির অস্তিত্ব এই অনুমান নির্ভর জ্ঞানকেই বলা হয় ব্যাপ্তিজ্ঞান, যা সব সময় সত্য নাও হতে পারে। কাজেই ধীষণের মতে অনুমান কখনোই প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং প্রত্যক্ষই হল একমাত্র প্রমাণ, প্রত্যক্ষ ছাড়া সত্যে উপনীত হওয়ার অন্য কোন রাস্তা নেই। তবে এ নিয়ে কিছু মতান্তর রয়েছে লোকায়িতকরা অনুমানকে প্রমাণ হিসেবে একেবারেই গ্রাহ্য করে না এটি মাধবাচার্যের কথা, তবে পুরন্দর নামের এক লোকায়তিক অনুমানগ্রাহ্য প্রমাণকে একেবারে অস্বীকার করেননি, অবশ্য এ ধারণার পশ্চাতে থাকতে হবে যথেষ্ট হেতু।

লোকায়িতিকরা মনে করেন না যে, ঈশ্বর নামে কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে। তবে জগৎ ছিল, জগৎ আছে ও থাকবে; আর জগৎ বৈচিত্রময়। জড় জগৎ গড়ে উঠেছে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারটি মৌলিক উপাদান নিয়ে। অকাশকে তারা ভুতের মধ্যে গণ্য করেননি। এই চারটি ভুতের সংমিশ্রণে দেহ গঠিত হয়। আর চৈতন্যময় দেহই হল আত্মা, আত্মার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকতে পারে না। চারি ভুতের বিশেষ সংমিশ্রণেই চৈতন্যের উৎপত্তি। জড়বস্তুতে কীভাবে চেতনা বা প্রাণের উন্মেষ ঘটে এর ব্যাখ্যা সাংখ্য জড়বাদের ব্যাখ্যারই অনুরূপ। ধীষণ ব্যাখ্যায় বলেছেন গুড় ও চাল থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মদ তৈরি হয়– যা খেলে মানুষ মাতাল হয়। কিন্তু আলাদাভাবে চালের বা গুঁড়ের মাদতাগুণ থাকে না। আলাদাভাবে চাল বা গুড় খেলে কেউ মাতাল হয় না। জড়ে চৈতন্য বা প্রাণের সৃজনও অনুরূপভাবে ঘটে থাকে।

এ কারণেই লোকায়ত দর্শন হল দেহাত্মবাদ ও বস্তুবাদ। মৃত্যুতেই সব শেষ, তাই 'ন ধর্মাংশ্চরেৎ' অর্থাৎ মৃত্যুতেই যখন সব শেষ তখন ধর্মাচারণ- যাগযজ্ঞ, স্বর্গ, মোক্ষ, পরলোক সবই অর্থহীন। অধ্যাপক তুচির মতে 'আয়ত' শব্দের একটি অর্থ হল ভিত্তি বা ভূমি বা মাটি অর্থাৎ ইহলোক। সুতরাং বলা যায়, যে দর্শনের ভিত্তি হল ইহলোক বা মাটির পৃথিবী, তাকেই বলা যেতে পারে লোকায়ত। অন্যদিকে হরিভদ্র তার ষড়দর্শন সমুচ্চয় গ্রন্থে লোকায়ত মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, লোক অর্থ সেটুকুই বোঝায় যা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ : 'এতাবানেবলোকোহয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ'। একেই বলা হয়েছে 'লোক'। অর্থাৎ প্রত্যক্ষে যেটুকু ধরা পড়ে লোকায়তবাদীরা শুধুমাত্র সেটুকুকেই সত্য বলে স্বীকার করেন এর বাইরে সবকিছুকেই তারা অস্বীকার করে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দর্শনের কোন লেখ্য সাহিত্য আজও আবিস্কৃত হয়নি, ধরা হয় যে ভাববাদীদের আক্রমণে ও আক্রোশে এই দর্শনের সকল পুথি ও গ্রন্থ বিনষ্ট করা হয়েছে। মহাভারতে শান্তিপর্বে চার্বাক দর্শনকে কিভাবে লুপ্ত করা হল তার একটি প্রতীকী গল্প রয়েছে। পণ্ডিত নেহেরু এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে খুব সম্ভব উত্তরযুগে

পুরোহিত দল এবং সনাতন ধর্মে বিশ্বাসীরা ভারতবর্ষে বস্তুবাদীদের অনেক পুঁথিপত্র ইচ্ছে করে নষ্ট করেছিল। সুতরাং লোকায়ত সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের গ্রন্থে রক্ষিত মাল মশলাই লোকায়ত দর্শনের পুনর্গঠনের একমাত্র আকর, আর সে আকর কতটা বিশ্বস্ততার সাথে লোকায়ত মতকে আশ্রয় দিয়েছে সে প্রশ্ন মনে রেখেই একথা বলতে হচ্ছে। এ ধরনের আকর উৎসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : মাধাবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ, শঙ্করাচার্য প্রণীত সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ, এবং হরিভদ্রসূরীর ষড়দর্শনসমুচ্চয়...।

আমরা লোকায়ত দর্শন সম্পর্কে যে ধারণা দেবার চেষ্টা করেছি তা মূলত সর্বদর্শন সংগ্রহ থেকে উৎকলিত। আর একটি উৎস হল বৃহস্পতির নামে প্রচলিত 'বৃহস্পতি সূত্র', যদিও এখানে লোকায়ত মত সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য রয়েছে, তথাপি এর মূল সুরটি হল লোকায়ত দর্শনবিরোধী। ঐতিহ্য অনুযায়ী দেবগুরু বৃহস্পতি লোকায়ত দর্শনের আদি প্রবর্তক। গল্পটি হচ্ছে যে দেবাসুর যুদ্ধে দেবতারা সুবিধা না করতে পেরে, বৃহস্পতি অসুরলোকে গিয়ে অসুরকুলের গুরু শুক্রাচার্যের ছদ্মবেশে অসুরদের মধ্যে এই বস্তুবাদী ও দেহাত্মবাদী দর্শন প্রচার করে অসুরকুলকে মোহান্ধ করে তোলে। এতে অসুরদের মধ্যে নৈতিক অধঃপতন ঘটায় দেবতাদের হাতে তাদের পরাজয় ঘটে। লোকায়ত দর্শনের ওপর যে তাদের নিজস্ব রচনা ছিল তার অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়– যেমন বৌদ্ধ পুঁথি দিব্যদানে 'ভাণ্ডরি' নামের লোকায়ত শাস্ত্রের একটি ভাষ্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ঐ নামটুকুরই হদিশ মিলেছে– ভাষ্যটির সন্ধান আজও মেলেনি।

উপর্যুক্ত 'বার্হস্পত্যসূত্রম' ও অন্যান্য সূত্রে বলা হয়েছে যে লোকায়ত মতে 'বার্তাই' হল একমাত্র বিদ্যা। বর্তমানে আমরা জানি বার্তা মানে সংবাদ, সন্দেশ ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এর অর্থ ভিন্ন ছিল যেমন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে বার্তার মানে হল 'কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য'। তাহলে দেখা যাচ্ছে লোকায়িতকদের কাছে ইহজাগতিক অর্থকরী কার্যাদিই হল আসল বিদ্যা যা জীবনের প্রয়োজন ও বাঁচা মরার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত– যেসব বিদ্যাকে ব্রহ্মবাদীরা ব্যঙ্গ করে বলতেন অবিদ্যা। তাদের মতে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন যে বিদ্যায় লাভ করা যায় তাই হল বিদ্যা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইহজাগতিক বিদ্যাঅর্জন, মাটির সাথে সম্পর্ক, বস্তুর সাথে সংযোগ ইত্যাকার বিষয় নিয়েই গড়ে উঠেছে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদ। আমরা বস্তুবাদ ও জড়বাদ শব্দদুটিকে সমার্থক বিবেচনা করব। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে আমাদের আজকের ধারণায় 'materialism' এর ধারণার কাছাকাছি যে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হত তা হল 'ভূতচৈতন্যবাদ' অর্থাৎ যে মতবাদ বিশ্বাস করে চতুর্ভূত বা পঞ্চভূতের সমন্বয়েই চৈতন্যময় প্রাণের উন্মেষ ঘটে। ভূত অর্থ ম্যাটার বা জড়।

এখন প্রশ্ন হল বেদ- বেদান্ত- গীতা- মনুসংহিতার ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ও রাজন্যশ্রেণীর দোর্দণ্ড প্রতাপ ও প্রভাবকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এই দর্শন-চিন্তার উদ্ভব

ঘটল কি করে। মনু চার্বাকপন্থীদের প্রচণ্ড আক্রমণ করে বলেছেন এই মতবাদ নাস্তিক ও পাষণ্ডদের মতবাদ। আমরা দুটি পরস্পরবিরোধী মতের উলে-খ করতে চাই : প্রথমটি হল দার্শনিক অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণের অভিমত, তার মতে মহাভারত ও রামায়ণের যুগে, অর্থাৎ খ্রিষ্টের জন্মের ৬০০-২০০ বছর আগে 'ভারতবর্ষে শ্রুতি-শাসনের কঠোরতা ভেঙে চিন্তার মুক্তি ঘোষিত হয়েছিল', আর তারই ফলে এক ধরনের বিদ্রোহী চিন্তার ফসল হিসেবে এই চূড়ান্ত নাস্তিকতা ও জড়বাদী মতের স্ফূরণ ঘটে, পরে তা নানা জনের রচনায় একটি দার্শনিক রূপ লাভ করে। অন্যপক্ষে মুয়ারের মতে 'অতি সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় ধ্যানজগতে চিন্তার স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল। উত্তরকালে লোকায়তিক ও বৌদ্ধদের নাস্তিক্য-বাহুল্যের কালে আস্তিকেরা শঙ্কিত বোধ করেন এবং কঠোর শ্রুতি শাসন প্রবর্তন করেছিলেন। আবার প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক তুচি বলেছেন যে লোকায়ত বলতে প্রাচীন ভারতে রাজন্যসভার উপদেষ্টা পুরোহিতকুলের প্রজ্ঞাকে বোঝাত। সেই প্রাচীনকালে কখনও ধর্ম ও অর্থের মধ্যে বিরোধ প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু কাল ক্রমে সে বিরোধ প্রবল দ্বন্দ্বে রূপ নেয়, তখন অর্থ যেন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এরই পরিণামে আবির্ভূত হয় নিরীশ্বরবাদী 'ভোগসর্বস্ব' লোকায়ত দর্শন। এই আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে চার্বাক ও লোকায়ত দর্শন এক ও অভিন্ন এর বৈশিষ্ট্য হলঃ ১। লোকায়ত মানে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় ও সহজাত মতবাদ বা দর্শন; ২। লোকায়ত মানে ইহলোকসর্বস্ব বস্তুবাদী দর্শন। চার্বাক দর্শন যে কিভাবে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ তার নামে প্রচলিত অসংখ্য লোকগাঁথা; আমরা এখানে দু'চারটি উলে-খ করে এই পর্বের সমাপ্তি টানতে চাই।

- স্বর্গ বলে কিছু নেই : অপবর্গ বা মুক্তি বলেও নয়, পরলোকগামী আত্মা বলেও নয়। বর্ণাশ্রম-বিহিত ক্রিয়াকর্মও নেহাতই নিষ্ফল।
- যাদের না আছে বুদ্ধি, না খেটে খাবার মুরোদ তাদের জীবিকা হিসেবেই বিধাতা যেন সৃষ্টি করেছেন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, তিন বেদ, সন্ন্যাসীদের ত্রিদণ্ড, গায়ে ভস্মলেপন প্রভৃতি ব্যবস্থা।
- জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু যদি সরাসরি স্বর্গেই যায়, তাহলে যজমান কেন নিজের পিতাকে হত্যা করে না?
- কেউ মারা যাবার পর শ্রাদ্ধকর্ম যদি তার তৃপ্তির কারণ হয়, তাহলে তো প্রদীপ নিভে যাবার পরেও তেল ঢেলে তার শিখা প্রদীপ্ত করা যেত।
- যে পৃথিবী ছেড়ে গেছে তার পাথেয় (পিণ্ড) কল্পনা করা বৃথা, কেননা তাহলে ঘর ছেড়ে কেউ গ্রামান্তর গমন করলে ঘরে বসে তার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিলেই তো তার পাথেয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হত।
- যতদিন বেঁচে আছ সুখে বাঁচার চেষ্টা কর, ধার করেও ঘি খাবার ব্যবস্থা কর। লাশ

পুড়ে যাবার পর আবার কেমন করে ফিরে আসবে?

- জীব যদি এই দেহ ছেড়ে পরলোকে যায়, তাহলে বন্ধুবান্ধবের টানে সে আবার ফিরে আসে না কেন?
- যারা তিন বেদ রচনা করেছেন তারা নেহাতই ভণ্ড, ধূর্ত ও চোর। জর্ফরীতুর্ফরী (প্রভৃতি অর্থহীন বেদমন্ত্র) ধূর্ত পণ্ডিতদের বাক্য মাত্র। আর তারাই বিধান দিয়েছেন, অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমান পত্নী অশ্বের শিশ্ন গ্রহণ করবে।

ইত্যাদি অসংখ্য লোকগাথা ও লোকবাক্য।

আমরা আধুনিককালে কালে 'agnosticism' বলতে যা বুঝি সে ধরনের এক সংশয়বাদ প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বিকশিত হয়েছিল। এই দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন সঞ্জয় এবং তা 'অজ্ঞেয়বাদ' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন মোটামুটি গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। তার দর্শন মূলত ইহলোকসর্বস্ব এক ধরনের জড়বাদী হলেও, পরমাত্রা, ইশ্বর, আত্মা, পরলোক, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি মৌন থাকাই পছন্দ করেন। তবে বলেন, এসব আছে যেমন বলি না তেমনি এরা নেই তাও বলি না। তিনি বলেন, ওসব ভারি ভারি কথা ছেড়ে মানুষের মঙ্গলের কথা, মানুষের শোক দুঃখের কথা পার্থিব জগতের কথা ভাব; ইহলোকে মানুষ কিভাবে শান্তিতে বাস করতে পারে তার নিরলস চেষ্টা করাই তার দর্শনের মূল কথা। মরণের পর অস্তিত্ব থাকে কি না বা আত্মা কোথায় যায় এসব প্রশ্ন অবান্তর কারণ আত্মা সম্বন্ধে আমাদের জানা সম্ভব নয়, কাজেই তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কিনা আমাদের জ্ঞানে তা বলা সম্ভব নয়। ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, মোক্ষ এসব সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য– যা আমরা জানি তা হল প্রত্যক্ষমান বিশ্ব জগৎ যা পঞ্চভূত দিয়ে তৈরি, মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়।

যুক্তিবাদিতা ও মানবতা

ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় যুক্তিবাদ কিন্তু মানবতাবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং আমাদের যুক্তিবাদের ধারণা গড়ে উঠেছে মানবতাবোধ ও মানবতাবাদকে ভিত্তি করেই, বিশেষ করে গ্রাম বাংলায়। প্রকৃতিগতভাবে যদিও সাধারণ মানুষ ধর্মবিশ্বাসী, কিন্তু তারা কোন সময় ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী ছিলেন না, এবং আজও নেই। এমনকি বাংলার ইসলামের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মৌলবাদী কট্টর ইসলাম থেকে নানা দিক থেকেই স্বতন্ত্র। আর আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি আরজ আলী মাতুব্বরের যুক্তিবাদী দর্শনের ভিত্তি এই মানবতাবাদ থেকেই উৎক্ষরিত, মানুষের প্রতি প্রেম ও ভালবাসাই এর ভিত্তি। বাংলার লোক সংস্কৃতিতে মানবতাবোধ, যাকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে 'Humanism'-এর ভিত্তির গভীরে রয়েছে সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং সকল মানুষ সমান– এই বোধ।

ষোড়ষ শতকের বাংলার বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস খুব সাধারণ ভাষায় গানের মধ্যে দিয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন :

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই"

বহুকাল আগে বাংলার অজ্ঞাত কবি এই মানবতার জয়গান করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, বিশ্বের সকল মানুষ সমান ঃ

"নানান বরন গাভীরে ভাই,
একই বরন দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখি, সবই
একই মায়ের পুত"

স্থানিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইসলাম ধর্ম ছাড়াও, বাংলাদেশে সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুসারী রয়েছে। সাতচলি-শ বিভাগপূর্ব বাংলার যে অঞ্চলগুলো নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ সে এলাকায় সে সময় হিন্দু ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৪৬%। আজকের বাংলাদেশে এদের সংখ্যা ১২% বা তারও কম। যে কোন ভারততত্ত্ববিদ লক্ষ্য করবেন যে হিন্দুধর্মে রয়েছে তিনটি অন্তপ্রবাহ : (১). ব্রাহ্মণ্যবাদ যার মূলে রয়েছে বেদ ও পুরাণ; (২). বৈষ্ণববাদ ভক্তি ও মানুষের প্রতি ভালবাসাই যার মূল প্রেরণা; এবং (৩). শক্তিবাদ বা তন্ত্র। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদদের মতে বৈষ্ণব মার্গ ও শাক্ত মার্গ ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল। পূর্বভারতের অন্তর্ভুক্ত জনপদগুলোর নাম মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র এবং কামরূপ-প্রাগজ্যোতিষপুর (আসাম উপত্যকা)। অন্যপক্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্ম রূপ পেয়েছে উত্তর ভারতে, যার প্রাচীন নাম ছিল আর্যাবর্ত বা আর্যদের দেশ। বেদোত্তর পুঁথি ও সাহিত্যে, বিশেষ করে পুরাণাদিতে পূর্বাঞ্চলের মানুষকে 'অসুর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন পূর্ব জনপদসমূহের বিভিন্ন রাজন্যদের বলা হচ্ছে উত্তর বঙ্গের পুণ্ড্র দেশের রাজা বাসুদেবকে 'পুণ্ড্রকাসুর', শোণিতপুরের রাজাকে 'বাণাসুর', আর কামরূপ-প্রাগজ্যোতিষিপুরের রাজাকে 'নরকাসুর'... ইত্যাদি। পুরাণে যদিও দেবতাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে অসুরদের চিত্রিত করা হয়েছে, তবুও তাদেরকে অসভ্য ও অসংস্কৃতিবান বর্বর জাতি হিসেবে দেখান হয়নি। অসুরেরা অর্থাৎ পূর্বভারতের অধিবাসীরা যে সাংস্কৃতিক ও সম্ভবত নৃজাতিক দিক থেকে উত্তর ভারতীয়দের থেকে স্বতন্ত্র এটি চিহ্নিত করতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না। পুরাণের বর্ণনাতেই দেখা যায় পূর্ব জনপদবাসীদের চিত্রিত করা হয়েছে বীর ও সংস্কৃত জাতি হিসেবে, যারা

একটি বেশ উঁচু মানের সভ্যতার অধিকারী। মনে হয় ভাষার দিক থেকে এই দুই জনগণের মধ্যে আপাত তারতম্য দৃষ্ট হলেও ভাষাদুটির উৎস একটি অভিন্ন ভাষা থেকে।

কিন্তু পুরাণোক্ত এই অসুর ছিলেন কারা? তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির শেকড়ই বা কোথায়? এ বিষয়ে বিদ্বৎজনেরা একমত নন। অথর্ববেদে মগধের অধিবাসীদের (পূর্ব বিহার) বলা হয়েছে 'ব্রাত্য' এবং অথর্ববেদ ব্রাত্য বন্দনায় মুখর। কিন্তু ব্রাত্য বলতে কি বোঝায়? আজকের ধারণায় যারা ব্রত ভ্রষ্ট তারাই ব্রাত্য অর্থাৎ যারা প্রচলিত ধর্মীয় আচার আচরণ ও অনুশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখায় তারাই ব্রাত্য। যেমন কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যদি উপনয়ন সংস্কার মেনে না চলে তিনি ব্রাত্যত্বে অধঃপতিত হবেন। কিন্তু অথর্ববেদের কালে আর আজকের দিনে 'ব্রাত্য' শব্দের মানে এক নয়। অথর্ববেদেই বলা হয়েছে যে মগধবাসীরা বেদ শ্রুতি অনুশাসন মানে না, যাগ যজ্ঞে বিশ্বাসী নয়, তাদের ধর্মযাজকরা উপবীত ধারণ করে না। এক কথায় ব্রাত্যরা এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারক যারা বেদের অনুসারী নয় এবং বৈদিক আচার আচরণও মেনে চলে না। মহাভারত থেকে জানা যায় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধ্যম পাণ্ডবের মগধ ও উত্তর বঙ্গ অভিযানে, রাজ্য জয় ছাড়াও যার উদ্দেশ্য ছিল পূর্বভারতে বৈদিক ও শ্রুতি অনুশাসনের প্রাধান্য বিস্তার, প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। মগধরাজ পরাজিত হলেও পুণ্ডরাজ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে তাড়িয়ে আরব সাগরের দ্বীপে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিলেন। পূর্বাঞ্চলের তৎকালীন রাজন্যবৃন্দের মধ্যে মগধরাজ জরাসন্ধ ছিলেন ব্রাত্য, আর রাজা বাসুদেব এবং কামরূপরাজ ভগদত্ত ছিলেন অসুরকুলজাত। অর্থাৎ এরা কেউ শ্রুতি শাসনের অনুসারী ছিলেন না। গীতায় বলা হয়েছে জগতে দুই জাতের মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে দেবতা ও মানুষ। গীতার উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, অসুর ও দেবতারা ছিলেন জাতিতাত্ত্বিক ও ধর্ম সংস্কৃতির দিক থেকে স্বতন্ত্র দুটি জন। তবে গীতায় অসুরদের সম্পর্কে দুর্বাক্য উচ্চারিত হলেও পুরাণের যুগের আগে বৈদিক যুগে অসুরদের খারাপ বলা হয়নি, বরং বেদের বহুস্থানে অসুরদের প্রশংসা করা হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্রকে অসুর বলে প্রশংসা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ঋকবেদের এক স্থানে বলা হয়েছে, 'যিনি শত্রুকে জয় করেছেন, যিনি নিজ শক্তিতে অটল সেই ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নত হও, এবং বিনম্রভাবে তার প্রতি প্রশংসাবাণী উচ্চারণ কর কারণ তিনি প্রজ্জ্বল, মহান এবং অসুর।' এসব আলোচনা থেকে মনে হয় অসুর নামের কথিত মানুষেরা অবশেষে পূর্বভারতে স্থিতিলাভ করে, আর বেদের অনুসারীরা উত্তর ভারতে বিকশিত হয়। অবশ্য পরবর্তী বেদ রচনায় অসুরদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করা হয় এই বলে যে তারা বেদ বর্ণিত অনুষ্ঠানাদি পালন করে না, এমন কি বেদই যে জ্ঞানের একমাত্র উৎস তা তারা স্বীকার করে না। 'অসুরেরা বেদ-রহিত এবং

বেদ বিদ্বেষী' একথা বেদোত্তর সাহিত্য ও পুরাণেও বলা হয়েছে। আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে বৈদিক সংস্কৃতির বিপরীতে অসুর সংস্কৃতির উৎস সম্পর্কে।

আমরা আগেই বলেছি যে তন্ত্রবাদ ও শক্তিবাদ পূর্বভারতে বিশেষ করে বাংলায় বিকাশ লাভ করেছিল। অধুনা গবেষণায় দেখা গেছে যে, তন্ত্রবাদ ও শক্তিবাদের গোড়ায় রয়েছে 'লোকায়ত দর্শন'। মাধবাচার্য লিখিত 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' চার্বাক নামে যে দর্শন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে তা মূলত: 'লোকায়ত দর্শন'। আমরা ইতোপূর্বেই এই দর্শনের সারাৎসার উলে-খ করেছি, যার চৌম্বক কথা হল প্রত্যক্ষ থেকে উদ্ভুত জ্ঞান ছাড়া জ্ঞানের অন্য কোন উৎস থাকতে পারে না। এরই সূত্র ধরে বলা যায় যে এই দর্শনের মতে চরম আনন্দলাভ এ জগতেই পাওয়া সম্ভব অন্য কোন জগতে নয়। এ কথা বিভিন্ন শ্রেণীর তন্ত্রশাস্ত্রেরও অন্ত র্নিহিত মূল নীতি। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে 'অসুরের উপনিষদ' মতে প্রকৃত জ্ঞান হল 'দেহাত্মবাদ' অর্থাৎ চৈতন্যময় দেহকে আশ্রয় করে, – এ মতবাদকেই বলা হয় 'দেহতত্ত্ব'। ছান্দোগ্য উপনিষদে অসুর উপনিষদ সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'এ জগতে দেহেরই পুজা কর, এবং দেহের পরিচর্যা কর। তুমি যদি দেহকে গৌরবে ভূষিত কর, দেহকে যত্ন কর- তাহলে ইহলোক ও পরলোক দু'জগতেরই চরম আনন্দ লাভ করবে। এ কারণে যেসব লোক শাস্ত্র মানে না, বেদকে অশ্রদ্ধেয় মনে করে এবং যাগযজ্ঞ সম্পাদন করে না, তাদেরকেই অসুর হিসেবে জ্ঞান করা হয়। এই হল অসুরদের উপনিষদ।' আমরা এর আগেই বলেছি যে, লোকায়ত দর্শন গড়ে উঠেছে দুটি ধারণাকে আশ্রয় করে– 'দেহাত্মবাদ ও বস্তুবাদ'।

শঙ্করাচার্যের মতে 'দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমত্মে তি প্রাকৃতিজনালোকায়িতকশা প্রতিপন্ন।' গীতায় বলা হয়েছে :

'অসত্যমপ্রতিশ্যাং তে জগদাহুরনীশ্বরম।
অপরস্পরসম্ভুতাং কিম্যন্যৎ কামহৈতুকম॥'

এই শে-াকটির তাৎপর্য হল এই জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং স্থিত– এই অর্থে এই জগৎ সত্য নয়, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরেরই তো কোন অস্তিত্বই নেই। পুরুষ ও নারীর মিলনেই এই সৃষ্টি, আর সৃষ্টি মুখরিত হয় 'মিলনের উদগ্র বাসনা' অর্থাৎ 'কাম' থেকে। এছাড়া সৃষ্টির পশ্চাতে আর কোন কারণ নেই।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অসুর দর্শনের দুটি দিক রয়েছে : দেহতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব এবং সৃষ্টিতত্ত্ব। আমরা এ প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের একটি উক্তি মনে করতে পারি: 'নর নারীর মিলনের প্রক্রিয়ায় 'পুরুষ ও প্রকৃতি'র মিলনে জগৎ সৃষ্টি হয়।' উক্তির পরের অংশটি সাংখ্য দর্শনেরই কথা। পরবর্তীকালে তন্ত্রবাদ ও

শক্তিবাদ আসল বৈশিষ্ট্য ও পূর্বেকার শক্তি হারিয়ে ফেলে। এর মধ্যে বিকৃতরূপের প্রকাশ ঘটে, এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের প্রভাবে জ্ঞানের চরম উৎস হিসেবে বেদকে গ্রহণ করে; তন্ত্রশাস্ত্র অবশেষে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে অন্যতম 'মার্গ' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। একইভাবে হিন্দুধর্মের সর্বগ্রাসী আত্মিকরণ প্রক্রিয়ায় বৈষ্ণববাদ, জৈন মতবাদ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মমতগুলো, এমনকি বৌদ্ধ ধর্মও বিকৃতরূপে হিন্দুধর্মের কোলে স্থান লাভ করে।

আরজ আলী, যাকে নিয়ে আমাদের আলোচনা তিনি হলেন গ্রাম বাংলা থেকে উঠে আসা মানুষ- দরিদ্র কৃষকের সন্তান এবং গ্রামীণ পরিবেশেই লালিত হয়েছেন। এই পশ্চাদপটেই তার যুক্তিবাদ বিকশিত হয়েছিল। ক্ষুধা, দারিদ্র ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন যুদ্ধই হল তার অত্যাশ্চর্য সংগ্রামী জীবন। তার যুক্তিবাদী মতাদর্শের আলোচনায় যাওয়ার আগে, গ্রাম বাংলায় যুক্তিবাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা বলা যাক যা আমরা আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে কীভাবে লালন করে আসছি।

যুক্তিবাদ ও বাঙালির লোক ঐতিহ্য

একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে, আমরা যে অর্থে যুক্তিবাদকে আধুনিককালে বুঝে থাকি, আমাদের গ্রামীণ মানুষেরা সুদূর অতীতে যুক্তিবাদকে সেভাবে বোঝেননি। একথা বলা বোধহয় সত্যের অপলাপ হবে না যে জানা ইতিহাসের কাল থেকে বাংলার জনগণ রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে শাসিত হয়ে এলেও গ্রাম বাংলা শাসকদের ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। আমাদের ইতিহাসে, সাম্প্রতিক কাল ছাড়া, কখনও কোন ধর্মকে 'রাষ্ট্র ধর্ম' নামে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নি, এমন কি পাঠান যুগেও নয়। আমাদের অতীতের গ্রামীণ সমাজ মূলত কৃষিভিত্তিক ও গ্রামকেন্দ্রিক। বস্তুত দূরবর্তী গ্রামে বাস করা সাধারণ জনের সাথে রাষ্ট্র শক্তির কোন সরাসরি সম্পর্ক ছিল না, যে ধর্মই শাসকবৃন্দ অনুসরণ করে থাকুক না কেন। রাষ্ট্রের শাসকরা হিন্দু বা বৌদ্ধ ও মুসলমান যাই ছিলেন না কেন, কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা বাতিরেকে, সাধারণভাবে জনগণের ধর্মবিশ্বাসে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে বাংলার জনগণ ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মমতের মত প্রথাগত ধর্ম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু এসব প্রথাগত ধর্মের কোনটিই বাংলার মাটিতে তাদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে পারেনি। লোক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জারকে আত্মীকৃত হয়ে একটি স্থানীয় লোকজ রূপ পরিগ্রহ করেছিল প্রতিটি ধর্ম, যা আসলে বিশুদ্ধ রূপ থেকে তাৎপর্যময়ভাবে স্বতন্ত্র একটি নতুন রূপ। অতীতকালে বাংলার লোক ধর্ম বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ নির্ভর ধর্মগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে। জনগণের এই প্রত্যাখ্যানের, যে জনগণকে সংস্কৃত সাহিত্য

বলা হয়েছে 'প্রাকৃতজন', ভিত্তি ছিল তাদের বোদ্ধ যুক্তিবাদ।' প্রাকৃতজনের ভাষায় পুরাণের কথা, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যগুলো অনুবাদ করার ওপর সংস্কৃত পণ্ডিতেরা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন এবং এই মর্মে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে যারা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করবে তারা এই পাপকর্মের ফলে নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু বাংলার লোক কবি ও লেখকরা রক্ষণশীল এই শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের অনুশাসন তুচ্ছ করে রামায়ণ-মহাভারতসহ হিন্দু ধর্মের পুরাণীয় গল্প ও শাস্ত্রবাণী আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। মৌলবাদী ইসলামী পণ্ডিতেরাও একই ধরনের একই ফতোয়া জারী করেছিলেন মুসলিম শাসকদের আমলে। ইসলামের ধর্মের কথা, রসুলের কথা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যেসব পুঁথিকার বাংলা ভাষায় কাব্য লিখেছিলেন ও বাংলায় ইসলামী শাস্ত্রীয় বই প্রকাশ করেছিলেন তাদের 'কাফের' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৮ শতকের একজন মুসলিম লোক যুক্তিবাদী সৈয়দ সুলতান বাংলা ভাষায় 'নবী বংশ' পুঁথি কাব্য লিখে লোকায়ত আদর্শের ও মানবিক মূল্যবোধের কথা তুলে ধরেছিলেন। যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী না হলে এসব কথা লিখতে সাহসী হতেন না।

হিন্দুধর্মের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও কৃষ্ণকে তিনি পয়গম্বর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। 'জ্ঞান প্রদীপ' এবং 'জ্ঞান চৌতিসা' শিরোনামে যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্র নিয়ে দুটি পৃথক পুস্তক লিখেছিলেন। এই দুটি শাস্ত্র হল পূর্ব ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যিক বস্তুবাদের ধারক। এই দুটি দর্শনই ইসলামের চিন্তাধারার বিরুদ্ধবাদী।

আমরা গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যে দুই শ্রেণীর মানবতাবাদীকে দেখতে পাই– একটি দল ধর্মীয় সর্বোচ্চ কতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বস্তুবাদী ঐতিহ্যকে তুলে ধরে, অর্থাৎ এরা হলেন বিভিন্ন শাখার লোকায়ত ও তন্ত্রবাদের অনুসারী। অন্যপক্ষে দ্বিতীয় দলটি ধর্মের আঞ্চলিক লোকজ রূপটিকে আশ্রয় করে তাদের মানবতাবাদ প্রচার করে থাকেন– মানব মূল্যবোধের স্থান সবার ওপরে, তবে ঈশ্বরকে সরাসরি অস্বীকার করে নয়। প্রথম চিন্তাধারার উদাহরণ, যা আজও বিদ্যমান তা হল 'বৌদ্ধ সহজিয়া' মত। দ্বিতীয় পথের অনুসারীদের প্রবক্তা ছিলেন চৈতন্যদেবের বৈষ্ণববাদ। এই পথের অনুসারীরা 'আধ্যাত্মিক সমতা ও মরমী প্রেমময় ভক্তিবাদের' বাণী প্রচারের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ ও বৈষম্য দূর করতে চেয়েছিল। শেষোক্ত পন্থীরা প্রথাগত ধর্মের আঞ্চলিক লোকজ রূপটি ব্যবহার করে মানবতাবাদ প্রচার করেছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

'লালন মত' নামে পরিচিত লোক ধর্মের ছদ্মবেশে এ ধরনের একজন যুক্তিবাদী ছিলেন দুদু শাহ। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের মানবধর্মী লালন শাহের একজন অনুগত শিষ্য। তার লেখা থেকে একটি নমুনা উদ্ধৃতি দেওয়া যাক,

'বস্তু বা জড়কে আত্মা বলা যেতে পারে, আর তথাকথিত আত্মা রহস্যময় কোন কিছু নয়।' তিনি আরও বলেছেন :

বস্তু ছাড়া নাই আল-া কিংবা হরি।
এহি মত দেখে সবে নর-বস্তু ধারী॥
রজঃ বীর্য্য এই দুই বস্তু যেবা চিনে।
লালন সাঁইজীকে সেই জন চিনে॥

আমাদের লোক ধর্মের প্রবক্তারা যেভাবে বস্তুবাদকে বুঝেছিলেন উপরের কথাগুলো তারই সরলতম প্রকাশ। এই সরল মতের বস্তুবাদী দার্শনিকেরা দেহকেই সবার ওপরে স্থান দিয়েছিলেন একথা বলে, 'যাহা নাই দেহ মন্দিরে, তাহা কোথাও খুঁজে পাবে না কো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।' এই মতের অনুসারীরা প্রায়শঃ গেয়ে থাকেন:

অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই।
দেব- দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে॥

এই সরল চিন্তাশীলদের ধারণায় সরল বস্তুবাদের মতে সৃষ্টি হল নারীর রজঃ আর পুরুষের বীর্যের মিলনের ফসল, এবং দেহের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সৃষ্টির পেছনে রয়েছে ঈশ্বর বা আল-াহতায়ালার অস্তিত্ব– এই ধারণাকে এখানে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। লালন শাহ এক সময় বলেছিলেন:

আল-াহ হরি ভজন পূজন।
সকলই মানুষের সৃজন॥
অনামক অচিনয় কাকহন।
বগিন্দ্রীয় না সম্ভবে॥

লালনের একটি গানে কোরানের বাণীর ধাপ্পাবাজী নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে :

ধর্মের উদ্দেশ্য যদি হয়
আল-াহ নির্ণয়।
তা হলে সকল ধর্মেই
তারে পাওয়া যায়॥
পয়গম্বরের হলো খবর।
ঊনিশটি নাম কোরান-ভিতর
আর সকল কোথায়॥

সাধারণভাবে দেখা যায় যে আমাদের লোক সমাজে মুক্তচিন্তা ও মনের উদারতা লোকধর্ম ও লোক সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করেছে। আমরা জানি বাংলায় অনেক ধরেনর লোক ধর্মমত (folk cults)-এর মধ্যে কয়েকটি সুপরিচিত নাম হলঃ সহজিয়া (বৌদ্ধধর্ম জাত, বৈষ্ণবীয়, এবং বাউল), এবং সাহেবধনী, খুশি বিশ্বাসী, বল হরি ইত্যাদি। প্রতিটি কাল্টই তাদের মত করে মুক্ত ও উদার চিন্তার চর্চা করে এসেছে। লুপ্তপ্রায় বল হরি ধর্মমত, যা বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে উদ্ভুত হয়েছিল, হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মের আচার আচরণকে প্রত্যাখ্যান করেছে। নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য ছাড়া মানুষের মধ্যে জাতিভেদ, সামাজিক বিভাজন ও ধর্মীয় ভেদাভেদসহ কোন বিভেদই এরা মানতে নারাজ। এই মতের প্রতিষ্ঠাতা বলরাম, যিনি নিজেই জন্মেছিলেন নিচু জাতে, একদিন ব্রাহ্মণের অনুকরণে নদীতে নেমে কৃষিখেতের উদ্দেশ্যে জল ছিটাচ্ছিলেন। সে সময় ব্রাহ্মণটি তার পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে জল দিয়ে স্মৃতি তর্পণ করছিলেন। বলরামকে জল ছিটানো দেখে ব্রাহ্মণ তাকে কি উদ্দেশ্যে এটি করছেন জিজ্ঞাসা করলে বললাম জবাবে বলেছিলেন তিনি কৃষিখেতে জল সিঞ্চন করছেন। অতদূরের কৃষিখেতে কি করে পৌঁছাবে জিজ্ঞাসিত হলে বললাম উত্তরে বলেছিলেন ব্রাহ্মণের স্বর্গবাসী পিতৃপুরুষগণ যদি অন্যলোকে থেকে জল পান, তাহলে পার্শ্ববর্তী কৃষি জমিতে জল পৌঁছাবে না কেন? এই লোকবাদী তার একটি গানে বলেছিলেনঃ

মানুষ থুইয়া খোদা ভজ, এ মন্ত্র কে দিয়েছে?
মানুষ ভজ, কোরান খোঁজ পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে।

আমাদের লোক– ইহজাগতিক ও যুক্তিবাদীরা, তাদের বুদ্ধি ও ধারণা মতে 'অজ্ঞেয়বাদের' কথাও প্রচার করেছিলেন। ১৯ শতকের ঢাকার কাছে এ ধরনের একজন চিন্তাবিদ ছিলেন কবি বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, জনপ্রিয় গানের মধ্যদিয়ে– 'কেহ বলে তুমি আছ, কেহ বলে নাই; আমি বলি 'তিনি যদি থেকেই থাকেন, থাকতে দাও, আর যদি নাই থাকেন– তাহলে আর ভাবা কেন'? আর এক কবি পাগলা দ্বিজদাস বস্তুবাদী ধারণা প্রচার করতে গিয়ে বলেছেনঃ

বেদ পুরাণ বাইবেল আদি যত ইতি পুঁথি।
মানি বোলেই মোদের এতই দুর্গতি॥
মানতে মানতে শাস্ত্র না পাই অন্ন বস্ত্র।
ঘটি বাটি লাঠি বেঁচে কর্মে দিচ্ছি দান॥

প্রাচীন ভারতে যুক্তিবিজ্ঞানের নাম ছিল 'ন্যায়'; বলা হয়ে থাকে যে এই শাস্ত্র মতে

সাধারণ তত্ত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি হল যুক্তি ও প্রতিযুক্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া। সেখানে বলা হয়েছে: 'বাদে বাদে জয়তে তত্ত্ববোধ।' অর্থাৎ সার কথা হল চরম সত্যে উপনীত হতে হলে আমাদের অনুসরণ করতে হবে প্রশ্ন, যুক্তি ও প্রতিযুক্তির পথ। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই যদি আমরা মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার চর্চা করতে চাই। আধুনিক পরিভাষায় বা পশ্চিমী ধারণায় এইভাবে সত্যে পৌছানোর প্রক্রিয়ার নাম হল 'থিসিস-এন্টিথিসিস-সিনথেসিস' বাংলায় বলতে পারি 'প্রতিপাদ্য-বিপরীত প্রতিপাদ্য-সংশে-ষণ'। বাংলার লোক সংস্কৃতিতে 'কবির লড়াই' এর একটি চমৎকার উদাহরণ– দুই কবির যুক্তি ও প্রতিযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি মীমাংসায় উত্তীর্ণ হওয়া। বিতর্কের বিষয় নানা বৈচিত্রময় হতে পারে– সামাজিক সমস্যা থেকে রাজনীতি ও ধর্ম। কিন্তু সমাজের কর্ণধারেরা, পুরোহিতেরা, মৌলভীরা, অর্থাৎ এক কথায় মৌলবাদী ও সংরক্ষণবাদীরা গ্রামীণ এই লোকায়ত ও মুক্তচিন্তার লোক ঐতিহ্য ও সাহিত্যকে বিকৃত করে স্ব স্ব ধর্মের জারকে পরিশুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং জনপ্রিয় এসব লোক ধর্মমতকে প্রথাগত ধর্মীয় লেবাস পরানোর চেষ্টা করে আসছেন যুগযুগ ধরে। আধুনিক যুগেও এ প্রয়াস অব্যাহত তথাকথিত গবেষকদের হাতে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। সংরক্ষণশীল এই গবেষকদের অনেকে আদাজল খেয়ে লেগেছেন অজ্ঞেয়বাদী লালনকে ইসলামপন্থী প্রমাণ করতে। কেউ তাকে মুসলমান, আবার কেউ তাকে অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দু সন্তান বানাতে প্রাণপাত করছেন। এই গবেষকরা কী আশ্চর্যভাবে ভুলে গেছেন যে মানুষের মধ্যে জাতি ও শ্রেণীভিত্তিক যেকোন বৈষম্যকে চরমভাবে ঘৃণা করে এসেছেন লালন। তার একটি বিখ্যাত গানে তিনি বলেছেন:

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে,
যেদিন হিন্দু মুসলমান
বুদ্ধ ক্রিস্তান
জাতিগোত্রে নাহি রবে।
শোনায়ে লোভের বুলি
নেবে না কাঁধের ঝুলি
ইতর আশরাফ বলী
দূরে ঠেলে না দেবে।

এভাবেই স্মরণাতীতকাল থেকে আমাদের লোক চিন্তাবিদরা সমাজের এইসব সংরক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে এসেছিলেন, আর আধুনিক যুগে তাদেরই আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে আমরা তাদের উত্তরসুরী সেক্যুলারিস্টরা, মানবতাবাদীরা এবং যুক্তিবাদীরা এইসব দুর্বৃত্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

লোক বাংলার এই পটভূমিতেই দার্শনিক চিন্তাবিদ আরজ আলী মাতুব্বর

আমাদের সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইহজাগতিকতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি কিন্তু আমাদের লোক দার্শনিকদের চিরায়ত পথ হুবহু অনুসরণ করেননি, যদিও তাদের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। চিরায়ত লোকবাদীদের মত ধর্মকে ব্যবহার করতে চাননি মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠায়। ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি না দাঁড়িয়ে অন্ধ বিশ্বাস ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ধর্মেরই অস্ত্র ব্যবহারে হয়তো খানিকটা সুবিধা পাওয়া যায়, যেমনটি বিদ্যাসাগর ব্যবহার করেছিলেন। তবে এই প্রাচীন পথের সীমাবদ্ধতা আছে, বিশেষ করে বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে। এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আরজ আলী মাতুব্বর সম্যক অবগত ছিলেন। তাই তিনি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের পথকেই বেছে নিয়েছিলেন ইহজাগতিক মুক্ত চিন্তার দর্শন প্রতিষ্ঠায়। ধর্মীয় সংরক্ষণশীলতা, ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন বিজ্ঞান সিদ্ধ যুক্তিবাদিতার পথ ধরে। প্রশ্ন রেখেছেন, অনুসরণ করেছেন যুক্তির পথ, বিচার বিশে-ষণ করে বৈজ্ঞানিক পন্থায় উপনীত হতে চেয়েছেন সিদ্ধান্তে। অনেক সময় পাঠকদের বিচার বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে- কতকগুলো মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। এই অর্থে তাকে একজন আধুনিক লোক দার্শনিক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে যিনি আমাদের ঐতিহ্যিক লোক যুক্তিবাদকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপাদানে, আধুনিক চিন্তা ও ভাবধারায় পরিপুষ্ট করেছেন। মৌলবাদের বিরুদ্ধে তিনি নিজেকে একজন আপোসহীণ যোদ্ধায় পরিণত করেছিলেন। গ্রামীণ জীবনের পরিবেশে এই যুদ্ধ চালাতে গিয়ে শারীরিকভাবে তিনি নির্যাতিত হয়েছিলেন, আর সারা জীবন হয়েছিলেন মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত। নগর ভিত্তিক একজন যুক্তিবাদীর যুদ্ধের সাথে আরজ আলীর– যিনি মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদের সংগ্রামে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন আমাদের ঐতিহ্যিক লোকজ যুক্তিবাদ থেকে, যুদ্ধের রয়েছে বিশাল পার্থক্য– দুটিকে এক নিক্তিতে মাপা চলে না। অন্যদিকে নগর ভিত্তিক আধুনিক মুক্তচিন্তাবিদদের কাছে এই সংগ্রাম অনেকটাই বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন। আরজ আলী মুক্তবুদ্ধির লড়াইয়ে নেমেছিলেন তার সামাজিক সচেতনতা ও গ্রামীণ সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা থেকে। এ কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

এ কারণে আমরা বলতে পারি আরজ আলী হলেন চিন্তার স্বাধীনতার আমাদের লোক ঐতিহ্যের মহান উত্তরসুরি।

কে এই আরজ আলী মাতুব্বর?

আরজ আলী ছিলেন প্রকৃত অর্থেই নিজ থেকে উত্থিত দার্শনিক যার কোন প্রাতিষ্ঠানিক একাডেমিক শিক্ষা ছিল না। তিনি অন্যান্য অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির মত শিক্ষা লাভের জন্য কোন স্কুলে যাননি। তিনি জন্মেছিলেন বাংলা ১৩০৭

(১৯০০ খ্রিঃ) সালের ৩রা পৌষ তারিখে, বরিশাল সদর থেকে ১১ কি. মি. দূরে অবস্থিত চরবারিয়া ইউনিয়নের ভেতর লামছরি গ্রামে। তার বাবা ছিলেন জমিজমাহীন এক দরিদ্র কৃষক।

বাল্যের কথা তিনি এভাবে স্মরণ রেখেছেন 'চার বৎসর বয়সের সময় বিত্তহীন অবস্থায় রাখিয়া পিতা 'এন্তাজ আলী মাতুব্বর' সাহেব পরলোক গমন করেন (১৯০৪)। বিত্তহীনা বিধবা মাতা রবেজান আমাকে অতিকষ্টে প্রতিপালন করেন।' পিতার মৃত্যুর পর চার বছর বয়সী আরজ ও তার ছোট বোন নিয়ে গড়া সংসারের দায়ভার মাকেই বহন করতে হয়েছিল। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত ১৯১০ সালে স্থানীয় জমিদারের গোমস্তা খাজনা দিতে না পারায় সামান্য যে জমি পরিবারটির ছিল তা আত্মসাৎ করে, ফলে পরিবারটি ভিখিরিতে পরিণত হয়। কিন্তু এতেও নিস্তার নেই, স্থানীয় এক কুসীদজীবীর কাছ থেকে নেওয়া ঋণের টাকা শোধ করতে না পারায় বাস্তভিটাটিও পরিবারের হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে দয়া করে পরিবারটিকে ঘরে বাস করতে দেওয়া হয়।

গ্রামে কোন স্কুল না থাকায় এবং দূরের কোন স্কুলে পড়ানোর সঙ্গতি না থাকায় ছোটবেলায় আরজ আলী কোন শিক্ষা লাভ করতে পারেনি। উপরন্তু ছোটবেলা থেকে মার সাথে থেকে তাকে পরিবারের অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। বাল্যকালের শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে মাতুব্বর সাহেব পরবর্তীকালে বলেছেন, 'দূর সম্পর্কীয় এক চাচা দুই আনা মূল্যে একখানা 'আদর্শলিপি' বই কিনিয়া দিয়া আমাকে স্থানীয় পাঠশালায় ভর্তি করাইয়া দেন।' তিনি আরও বলেছেন, 'আদর্শলিপি পাঠ শেষ করিয়া রামসুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা' পাঠ আরম্ভ করিয়াছি, এমত সময় ছাত্রবেতন অনাদায়হেতু পাঠশালাটি বন্ধ হইয়া যায় এবং আমার পাঠশালার শিক্ষা সেখানেই চিরতরে বন্ধ হয়। অতঃপর স্থানীয় এক মুন্সি সাহেবের কাছে কোরান শরীফ, রাহে নাজাত ও পাঞ্জেনামা কেতাবের কিছু পড়ার সুযোগ লাভ করি।'

এরপর থেকেই জীবন যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়া এই মানুষটি গ্রহণ করেন এক দীর্ঘমেয়াদী স্বচেষ্টায় শিক্ষা লাভের কর্মসূচি। গ্রন্থাগার থেকে, ব্যক্তির কাছ থেকে বই ধার নিয়ে চলে শিক্ষা ও জ্ঞানের সাধনা। এর পেছনে ছিল কিশোর আরজ আলীর অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা। এ প্রসঙ্গে তার নিজস্ব বক্তব্য,

'আশৈশব প্রবল ছিল আমার অজানাকে জানার স্পৃহা। বিশেষত প্রকৃতি সম্পর্কে। মুন্সি সাহেবকে সময় সময় প্রশ্ন করিতাম– দিন-রাত, জোয়ার-ভাটা, শীত-গ্রীষ্ম হয় কেন ইত্যাদি। উত্তর যাহা পাইতাম মনোপুত হইত না। অথচ নিজেও সমাধান করিতে পারিতাম না বলিয়া অশান্তি বোধ করিতাম।'

অনেক কষ্টে পিতার তিনবিঘা দায়বদ্ধ জমি মুক্ত করে সংসার ব্যয় পরিচালনার

জন্য নিজ হাতে কৃষিকাজ শুরু করেন এবং অচিরেই একজন দক্ষ কৃষকে পরিণত হন। পাশাপাশি কঠোর শ্রম করে মাতুব্বর ধীরে ধীরে কিছু কিছু জমি ক্রয় করে পরিবারের স্বচ্ছলতা আনেন– আর সামান্য বাড়তি টাকা দিয়ে বই কিনতেন। সংসারের ব্যয়ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে তিনি পুঁথি ও সারি গানের দল গঠন করে গান গাওয়া শুরু করেন। এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত মৌলভি-মুন্সিদের কাছে কোরান, হাদিস, কেয়াস, ফেকাহ ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ এবং পুরুত ব্রাহ্মণদের নিকট থেকে বেদ পুরাণ গীতা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। কিন্তু মোল-াদের তিরস্কার ও বিরোধীতায় গানের দলের অবলুপ্তি ঘটাতে হয়। অতঃপর তিনি 'ভূমি সংক্রান্ত মাপ জোকে' দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে জমি 'সার্ভে' অর্থাৎ আমিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন (১৩৩৩ সন), এছাড়া তার নিজের ভাষায় '... পরিবারের বস্ত্রাভাব মিটাইবার জন্য শিক্ষা করি বস্ত্রবয়ন (১৩৩৬)।' অচিরেই জমির দক্ষ আমিন হিসেবে মাতুব্বরের খ্যাতি সমগ্র বরিশাল জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এই পেশা তাকে এন দেয় অনেকখানি আর্থিক সচ্ছলতা।

এভাবেই জীবন যুদ্ধে জয়ী এই মানুষটি শুধু ক্ষুধা ও দারিদ্রকেই পরাস্ত করেননি হয়ে উঠলেন একজন আলোকময় মানুষ, আর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন একজন যুক্তিবাদী ইহজাগহতিক দার্শনিক হিসেবে। ১৯৮৫ সালে মৃত্যুকালে সারা বাংলাদেশে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন এমন একজন সাহসী মানুষ হিসেবে যিনি আজন্ম গ্রোথিত অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে– যা থেকে সহজেই মৌলবাদের উত্থান ঘটে, কথা বলতে ভয় পেতেন না। সব ধরনের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদির শেকড় উপড়ে ফেলতে সর্বাত্মক আঘাত করাকে আরজ আলী তার জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন– যার মধ্যে দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা ও ধর্মানুভূতির চমৎকার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা। তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দিতে চাননি, চেয়েছিলেন তাদের মন থেকে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারকে মুছে দিতে, অন্ধ বিশ্বাসের অন্ধকার থেকে যুক্তিবাদের আলোতে নিয়ে আসতে। কাজটি নিঃসন্দেহে অতিমানবিক বিশেষ করে যে সমাজে নেই শিক্ষার আলো। তার ভাষা ছিল সরল সোজা, অলঙ্কার বিবর্জিত, যা কিনা সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য।

জ্ঞানচর্চার সাধনা অব্যাহত রেখেছিলেন আজীবন এই মাটির কাছাকাছি থাকা স্বশিক্ষিত মানুষটি। এ কারণেই বরিশাল শহরে বহু জ্ঞানবান মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন ও তাদের সাথে গড়ে উঠেছিল অটুট বন্ধতত্ত্ব। তাদেরই উৎসাহে আরজ আলী শুরু করেন তার উপলব্ধ জ্ঞানের ওপর বই লেখা। লেখা শেষ করেন প্রথম ও তার শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক পুস্তক 'সত্যের সন্ধান' বাংলা ১৩৫৯ সালে (১৯৫২)। কিন্তু অচিরেই এ ধরনের পুস্তক লেখার অপরাধে তাকে কারাবন্দি করা হয়, পুস্তকটি

প্রকাশনা থেকে তাকে বিরত রাখা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে মুক্ত বাতাসে তিনি মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে সমর্থ হন, এবং দীর্ঘকাল পর ১৯৭৩ সালে 'সত্যের সন্ধান' প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় সংরক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী লেখার কারণে সারা জীবন তাকে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। তার আর দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা হল 'সৃষ্টি রহস্য', রচনা কাল ১৯.৪.১৩৭২-২৫.৪ ১৩৭৭. প্রকাশকাল ১৩৭৮ (১৯৭১) এবং 'অনুমান', রচনা কাল ১৩.৪.১৩৮৮-৮.৩.১৩৮৯ ও প্রকাশকাল ১৩৯০ (১৯৮৩)।

মৃত্যুর আগে তিনি তার চোখ দুটি ও নশ্বর দেহকে ঢাকা মেডিকেল কলেজকে দান করে গিয়েছিলেন একাডেমিক গবেষণার উদ্দেশ্যে। বাংলা ১৩৯২ (১৯৮৫) সালের ১লা চৈত্র তারিখে এই ক্ষণজন্মা মানুষটি মৃত্যুবরণ করেন।

যে ঘটনা আরজ আলীকে যুক্তিবাদের পথে ঠেলে দেয়

কৌতূহলী পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে সাধারণ মানুষ আরজ আলীর জীবনে এমন কি ঘটেছিল যা তাকে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের চলার পথ থেকে তাকে সেকুলার যুক্তিবাদী দর্শনের পথে চালিত করল। সব বড় মানুষের জীবনেই হয়তো এ ধরনের কিছু ঘটনা ঘটে যেখান থেকে তারা এক ব্যক্তিক্রমী পথে চলতে শুরু করেন। গৌতম বুদ্ধ নির্বাচনের খোঁজে পথে নামার আগে দেখেছিলেন অসহায় জরাগ্রস্ত মানুষের যন্ত্রণা, মৃত মানুষের শোকে মানুষের অসহায় ক্রন্দন রোগে যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের অসহায়ত্ব...। আরজ আলীর জীবনেও ঘটেছিল এমনই এক মর্মন্তুদ ঘটনা। আপাত দৃষ্টিতে ঘটনাটি অনেকের কাছে সামান্য মনে হলেও তরুণ আরজ আলীর জীবনে তা অসামান্য হয়ে দেখা দেয়।

বাংলা ১৩৩৯ সালে (১৯৩২) আরজ আলীর মা মৃত্যুবরণ করলে ভালবাসার মানুষটির স্মৃতি ধরে রাখতে মৃত মায়ের কয়েকটি ছবি তুলিয়েছিলেন শহর থেকে আনা ফটোগ্রাফার দিয়ে। এতে বিক্ষুব্ধ গ্রাম্য টাউট-মাতব্বরেরা ও মৌলভীরা ফতোয়া দেন যে, মৃত ব্যক্তির বিশেষ করে জেনানার ছবি তোলা হারাম, এবং এ কারণে মৃতের জানাজায় শরীক হতে ও ইসলামী রীতি মোতাবেক শেষকৃত্য দাফন-কাফন করায় তারা আপত্তি জানায়। হতবুদ্ধি তরুণ আরজ আলী মাতব্বরদের কাছে মিনতির সুরে আবেদন জানায়– অন্যায় যদি হয়ে থাকে তিনি করেছেন, তার ধর্মনিষ্ঠ মৃত মা তো কোন পাপ করেন নি– ছেলের অপরাধে মৃত মাকে শাস্তি দেওয়া কেন। কিন্তু মোল-া পুরুতেরা কবে কখন যুক্তির কথা শুনেছেন? দলপতিরা ফতোয়া ঘোষণা করে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। অনেক দুঃখ ও কষ্ট মনে ধারণ করে দু'একজন বন্ধুর সহায়তায় ইসলামী রীতি নীতি ও শেষকৃত্য ছাড়াই বাস্তভিটার অঙ্গনেই মাকে সমাধিস্থ করা হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনাই তাকে ধর্ম সম্পর্কে নতুন

করে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে, কালক্রমে তিনি হয়ে ওঠেন আমাদের কালের একজন শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী ইহজাগতিক দার্শনিক। এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা তিনি পরবর্তীকালে এভাবে স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন : "১৩৩৯ সালে মার মৃত্যু হলে তার ছবি তুলেছিলাম। সেখানে মার দাফনের জন্য সমবেত মুন্সি, মৌলানা ও মুসল-ীবৃন্দ ফতোয়া জারী করলেন যে, ছবি তোলা হারাম। এ কথা বলে তারা চলে গেলেন, জানাজা ও দাফন শেষ না করেই। হতবুদ্ধি আমি মায়ের নামে শপথ নিয়ে মাকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলেছিলাম, 'মা! আজীবন তুমি ছিলে ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ সাধিকা। তুমি কখনো নামাজ কাজা করনি, কখনো তছবিহ তেলাওয়াত ও তাহাজ্জুদ নামাজে গাফিলতি কর নি। আর আজ সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে একদল মুসলি- তোমাকে করতে চাইল শেয়াল কুকুরের ভক্ষ্য, তাদের কাছে হলে তুমি তুচ্ছ, অবহেলিতা ও বিবর্জিতা, হলে নিন্দা ও ঘৃণার পাত্রী। সমাজে আজ সর্বত্র বিরাজ করছে ধর্মের নামে 'কুসংস্কার'। তুমি আমায় আর্শীবাদ কর– আমার জীবনের ব্রত হয় যেন 'কুসংস্কার দূরীকরণ অভিযান'। আর সে অভিযান সার্থক করে আমি যেন তোমার কাছে আসিতে পারি":

'তুমি আর্শীবাদ কর, মোরে মা,
আমি যেন বাজাতে পারি
সেই 'অভিযানের দামামা।'

মাতার প্রতি অন্ধ সমাজের আবমাননাই এই সরল কৃষক বালককে জ্ঞান সাধনায় অদম্য করে তোলে, তাকে পরিণত করে একজন লোকায়ত দার্শনিকে ও বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক মানুষে। মার এ অবদানের কথা তিনি আজীবন মনে রেখেছেন, "... আমার লিখিত যাবতীয় পুস্তক পুস্তিকাই হচ্ছে আমার মায়ের মৃত্যুদিনে আকাঙ্ক্ষিত 'দামামা'র অঙ্গবিশেষ।"

প্রকাশনা

তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের বিষয় ছিল ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ একজন বিশ্বাসী মুসলমান বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়ে থাকে সে সব বিষয় সম্পর্কে তার চিন্তাধারা ও গভীর অনুধ্যান-অনুশীলন। গ্রন্থটির নাম :

সত্যের সন্ধান (লৌকিক দর্শন)
রচনাকাল : ১৩৫৯ সন (১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ)
প্রথম প্রকাশ কাল : ১৩৮০ সন (১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ)

দীর্ঘ বিশ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল প্রকাশ করতে। তার অপ্রথাগত ও

খোলামেলা লেখার জন্য তিনি তার সামাজিক পরিমণ্ডলে খ্যাত হয়েছিলেন মুক্তচিন্তাবিদ হিসেবে, গ্রামের সমাজে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন 'সত্য সন্ধানী' নামে। সমাজে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল মুক্তমনের অধিকারী একজন জ্ঞান সাধক হিসেবে। কিন্তু এই খ্যাতি বয়ে আনল তার জন্য বিড়ম্বনা, তার প্রতি কোপ দৃষ্টি নিপতিত হল পাকিস্তানি শাসক আর গোয়েন্দা বিভাগের। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন নানাভাবে তাকে হয়রানি ও উত্যক্ত করে তুলল তার সরল জীবন। এক সময় তাকে কারারুদ্ধ করাও হল। পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে তিনি অভিহিত হলেন 'অধার্মিক ও কম্যুনিস্ট'।

অবশেষে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে তিনি ভাবলেন যে এখন সময় এসেছে তার পুস্তকটি প্রকাশের, যা এতদিন অনেক কষ্টে রক্ষা করে আসছিলেন। নিজে অঙ্কন করলেন প্রচ্ছদ, কোন পেশাজীবী চিত্রশিল্পীর কাছে যেতে সাহস করেননি, আর নিজ অর্থব্যয়ে প্রকাশ করলেন গ্রন্থটি। মুখবন্ধে লিখলেন,

'এলোমেলোভাবে মনে যখন যে প্রশ্ন উদয় হইতেছিল, তখন তাহা লিখিয়া রাখিতেছিলাম, পুস্তক প্রণয়নের জন্য নহে, স্মরণার্থে। ওগুলি আমাকে ভাসাইতেছিল অকুল চিন্তা-সাগরে এবং আমি ভাসিয়া যাইতেছিলাম ধর্মজগতের বাহিরে।'

বইটি লেখার পেছনে ছোট্ট একটি ঘটনা রয়েছে। ১৩৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের পহেলা তারিখে (১৯৫১) বরিশাল থেকে জনৈক ল'ইয়ার মেজিস্ট্রেট আরজ আলীর গ্রামে গিয়েছিলেন এবং তাকে তার তবলীগের দলে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আরজ আলী তার হাতে একপ্রস্থ প্রশ্নাবলী গছিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি তার দলে যোগ দেবেন যদি মেজিস্ট্রেট সাহেব তার প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন। মেজিস্ট্রেট প্রশ্নতালিকা নিয়ে শহরে প্রত্যাবর্তন করে আরজ আলীর নামে ধর্মদ্রোহিতার মোকদ্দমা দায়ের করে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। মোকদ্দমা চলাকালে আত্মরক্ষার স্বার্থে তিনি যেসব প্রশ্ন মেজিস্ট্রেটের কাছে উত্থাপন করেছিলেন সেগুলোর উত্তর ও ব্যাখ্যা লিখতে শুরু করেছিলেন।

'ফৌজদারী মামলার জবাবদিহি করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে প্রশ্নগুলির কিছু বাক্য লিখিতে হয়।' বলেছেন আরজ আলী মাতুব্বর, –সেই ব্যাখ্যা লিখাই হইল এই পুস্তক রচনার মূল উৎস। নির্দোষ প্রমাণে মামলা চূড়ান্ত হইলে ঐগুলিকে আমি পুস্তক আকারে গ্রন্থিত করিলাম।'

তিনি কেন কতগুলি 'তথাকথিত সত্য' বা ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন সে সম্পর্কে আরজ আলী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পুস্তকটির 'মূলকথা' শিরোনামের প্রথম অধ্যায়ে প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

'অজানাকে জানার স্পৃহা মানুষের চিরন্তন। বাক্যস্ফূরণ আরম্ভ হইলেই শিশু

প্রশ্ন করিতে থাকে, এটি কি? ওটি কি? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে কলেজে ও কাজে-কর্মে অনুরূপ প্রশ্ন চলিতে থাকে, এটি কি? ওটি কি? এরূপ কেন হইল, ওরূপ কেন হইল না ইত্যাদি। এই রকম 'কি' ও 'কেন'র অনুসন্ধান করিতে করিতেই মানুষ আজ গড়িয়া তুলিয়াছে বিজ্ঞানের অটল সৌধ।

প্রশ্নকর্তা সকল সময়ই জানিতে চায়– সত্য কি? তাই সত্যকে জানিতে পারিলে তাহার আর কোন প্রশ্ন থাকে না।' তিনি আরও বলেছেন,

> জগতে এমন বিষয় আছে, যেসব বিষয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক কথা বলে না। আবার ধর্মজগতেও মতানৈক্যের অন্ত নাই। ... ... অর্থাৎ সত্যতা বিচারের মাপকাঠি (Criterion of truth) কি? সত্যতা প্রমাণের উপায় (Test of truth) কি এবং সত্যের রূপ (Nature of truth) কি?
> আমরা ঐ সকল দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবিষ্ট হইব না, শুধু ধর্মজগতের মতানৈক্যের বিষয় সামান্য কিছু আলোচনা করিব।'

আরজ আলী বলেছেন যে, বিশ্বমানবের একটি সহজাত বৃত্তি রয়েছে যাকে তার 'স্বভাবধর্ম' বলা যেতে পারে। তবে এটিই সব নয়। তার মতে সাধারণভাবে মানুষ যাকে ধর্ম নামে ভাবে, অভিহিত করে থাকে তা হল মানুষের 'কল্পিত ধর্ম'। এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য হল,

> '... ... যুগে যুগে মহাজ্ঞানীগণ এই বিশ্বসংসারের স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ... তাহারা তাহা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু মানুষের সমাজ ও কর্মজীবনের গতিপথও দেখাইয়া দিলেন সেই মহাবিজ্ঞানীগণ। এইরূপে হইল কল্পিত ধর্মের আবির্ভাব। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মনীষী বা ধর্মগুরুদের মতবাদ হইল ভিন্ন ভিন্ন।'

তিনি আমাদের অঙ্গুলি নির্দেশ করে বরং দেখিয়ে দিয়েছেন যে সকল ধর্মের যাজক ও পুরোহিতেরা তাদের নিজ নিজ ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম বলে প্রচার করে থাকেন। তিনি আরও বলেছেন যে এত মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও কোন ধর্মই কিন্তু বিলুপ্ত হচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে তিনি বলতে চান,

> 'রাষ্ট্রের ন্যায় ধর্মসমূহের আয়ত্তে তোপ-কামান-ডিনামাইট বা এ্যটম বোম নাই, যারা দ্বারা একে অন্যের ধ্বংস সাধন করিতে পারে। ধর্মের হাতে আছে মাত্র দুটি অস্ত্র– আশীর্বাদ ও অভিশাপ। এহেন অস্ত্রসমূহ ব্যক্তিবিশেষের উপর ক্রিয়াশীল কিনা, জানি না, কিন্তু কোন সম্প্রদায় বা জাতির উপর একেবারেই অকেজো।'

আরজ আলী মনে করেন যে 'প্রত্যক্ষ ও অনুমানের' উপর ভিত্তি করেই জ্ঞানের পথে

অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এ প্রসঙ্গে তার স্পষ্ট বক্তব্য হল, 'বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আমাদের সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান যাহা বলে, তাহা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বিশ্বাস করি। কিন্তু অধিকাংশ ধর্ম এবং ধর্মের তথ্য অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।'

ইহজাগতিকতার ধারণা তার অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত। অলৌকিক কোন বিষয়ে তার আস্থা নেই। আল-ার উদ্দেশ্যে মহাশূন্য ভ্রমণের নবীদের অলীক কাহিনীতে বিশ্বাস রাখা তার পক্ষে শক্ত। এ প্রসঙ্গে তিনি যৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, যেহেতু আল-াহতালা সর্বশক্তিমান এবং সব অসম্ভবের বাস্তবায়নক্ষম, তাহলে তিনি তো হযরত সোলায়মান নবীর মত নিজ আসনে বসিয়ে যে কোন পরমভক্ত ও বিশ্বাসী অভিলাষকারীকে শূন্যের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করাতে পারেন, যান জটের যুগে পীর সাহেবদের জন্য এতো চমৎকার নিখরচায় পরিবহণ ব্যবস্থা। এই সব ভক্তদের উদ্দেশ্যেই আরজ আলী প্রশ্ন রেখেছেন, আল-াহতালা ইচ্ছা করিলে জায়নামাজশুদ্ধ আমাকেও নিমেষের মধ্যে মক্কায় পৌঁছাইতে পারেন– এইরূপ বিশ্বাস কোন কোন পীর ছাহেবের আছে কি? থাকিলে একবারও তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কি? না দেখিয়াই বা উড়োজাহাজ চড়িবার কারণ কি? উড়োজাহাজে চড়িবার বিপদ আছে, ভাড়া আছে, আর সময়ও লাগে যথেষ্ট। তবুও উহার উপর জন্মিয়াছে বিশ্বাস।'

তিনি এক জায়গায় বলছেন, 'ধর্মজগতে এমন কতকগুলি বিধি-নিষেধ, আচার-অনুষ্ঠান ও ঘটনাবলীর বিবরণ পাওয়া যায়, যাহার যুক্তিযুক্ত কোন ব্যাখ্যা সাধারণের বোধগম্য নহে। তাই সতঃতই মনে কতগুলি প্রশ্ন উদয় হয় এবং সেই প্রশ্নগুলির সমাধানের অভাবে ধর্মের বিধি-বিধানের উপর লোকের সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মে।'

এভাবেই আরজ আলীর মনে ধর্মের অনেক সাধারণ ঘটনা যা আমরা সাধারণেরা বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়েছি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আর অনুসন্ধিৎসার পাহাড় সৃষ্টি করেছেন আমাদের জিজ্ঞাসায় ও মননে। এভাবেই তিনি সাধারণের মন থেকে অন্ধ বিশ্বাসের ও কুসংস্কারের স্থানে আনতে চেয়েছেন যুক্তি ও বিজ্ঞানকে। এর পরেই তিনি ধর্মজগৎ নিয়ে সাধারণের মনে সতত জাগ্রত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছেন চমৎকার ভঙ্গিতে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকেই। তার প্রথম পুস্তক 'সত্যের সন্ধানে'র মধ্য দিয়ে, আমার ধারণায়, আরজ আলী মাতুব্বরের মৌলিক যুক্তিবাদী দর্শনের সম্যক প্রকাশ ঘটেছে। এই দর্শন একজন জিজ্ঞাসু মানুষের কতিপয় মৌলিক এবং প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধিৎসার সাথে সংশি-ষ্ট যা এই জিজ্ঞাসু মানুষটিকে তার জীবন সম্পর্কে, তার ধর্ম সম্পর্কে, এবং সর্বোপরি তার সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি সম্পর্কে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। তার বইটি ছয়টি প্রস্তাবে

বিভক্ত: ১মটি আত্মাকে নিয়ে ৮টি প্রশ্ন, ২য়টির আলোচ্য ১১টি প্রশ্নের সমষ্টি মূলত ঈশ্বর ও আল-াহকে নিয়ে, ৩য়টি হল পরলোক সম্পর্কীয় ৭টি প্রশ্ন নিয়ে, ৪র্থ প্রস্তাবের ২২টি প্রশ্ন সমষ্টি ধর্মের নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত, ৫ম প্রস্তাবের বিষয় হল প্রকৃতি, মানুষ, জীব, আকাশ, পৃথিবী, সূর্য, ভূমিকম্প, দিন রাত্রি... ইত্যাদি বিষয়কে ঘিরে ১১টি প্রশ্নসমষ্টি, ৬ষ্ঠ বা শেষ প্রস্তাবে রয়েছে বিবিধ জিজ্ঞাসা ৯টি প্রশ্নের আকারে। বলাই বাহুল্য, আমাদের দার্শনিকের এই চিত্তাকর্ষক প্রশ্নগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ এই প্রবন্ধে নেই। তবুও দু'একটি প্রশ্নের উপর, যেমন প্রথম প্রস্তাবে উলি-খিত, দৃকপাত করা যেতে পারে : আমি কে, প্রাণ কি অরূপ না স্বরূপ, মন ও প্রাণ কি এক, প্রাণের সহিত দেহ ও মনের সম্পর্ক কি, প্রাণ চেনা যায় কি, আমি কি স্বাধীন, অশরীরী আত্মার কি জ্ঞান থাকবে, প্রাণ কিভাবে দেহে আসা-যাওয়া করে?

বস্তুগত দৃষ্টি থেকে প্রতিটি প্রশ্ন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম প্রশ্নটি শুধু কেবল অনুসন্ধিৎসু দার্শনিকদের আলোড়িত করে না, বিজ্ঞানীদেরও করে, বিশেষ করে জীব বিজ্ঞানীদের। প্রাণের রহস্য নিয়ে আমাদের পরিপূর্ণ উত্তর আজও জানা নেই, কিন্তু সকল গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম মনে করে এই 'উত্তর' তাদের জানা। ধর্মবাদীদের এই আত্মশ-ঘাকেই মাতুব্বর সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁর এই প্রশ্নটির বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে আমাদের শরীরে রয়েছে রক্ত, মাংস, চর্বি ইত্যাদি বস্তু উপাদান এবং মৃত্যুর পর এসব জড় উপাদানগুলি যখন রাসায়নিক রূপান্তরের মাধ্যমে জড় উপাদানে পরিণত হয় তখন, 'কি আমার আমিত্ব থাকিবে না? যদি নাই থাকে, স্বর্গ-নরকের সুখ-দুঃখ ভোগ করিবে কে? নতুবা 'আমি' কি আত্মা? যদি তাহাই হয়, তবে আত্মাকে 'আমি' না বলিয়া 'আমার'– ইহা বলা হয় কেন?' মাতুব্বর প্রশ্ন তুলেছেন, 'যখন কেহ দাবি করে যে, দেহ আমার, প্রাণ আমার এবং মন আমার, তখন দাবিদারটি কে?' সত্যি বলতে কি ধর্মবাদীদের কাছে এর কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া অতীতেও যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবে না।

'আত্মার' স্বরূপ নিয়েও আমাদের দার্শনিক কৌতূহলি প্রশ্ন রেখেছেন। সব ধর্মেই আত্মাকে একটি 'অবিনশ্বর সত্তা' রূপে, যাকে ভৌত জগতের উপাদানে সৃষ্টি করা যায় না, কল্পনা করা হয়েছে, এমনকি দর্শনেও। ধারণা করা হয় যে, যখন মহান সৃষ্টিকর্তা বস্তুময় দেহে এই আত্মা স্থাপন করেন তখন শরীরে প্রানের সঞ্চার হয়। কিন্তু মূল প্রশ্ন হল তাহলে, আত্মা কি একটি চৈতন্যময় সত্তা, না কি চেতনাহীন? আরও প্রশ্ন রয়েছে আত্মার কি নিজস্ব জ্ঞান আছে, নাকি দেহের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করে থাকে? সুতরাং মৃত্যুর পর, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস সাধনের পরও "শরীর ও ইন্দ্রিয়বিহীন আত্মার জ্ঞান থাকিবে কি? থাকিলে কিরূপে থাকিবে?" –আমাদের দার্শনিক প্রশ্ন রেখেছেন। এ ধরনের বিব্রতকর প্রশ্নে

আমাদের বড় বড় ধর্মগুলি নিশ্চুপ।

আমরা যদি সজ্ঞানী ও চৈতন্যময় আত্মায় প্রত্যয় রাখি তাহলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, গড, ঈশ্বর বা আল-াহর মত আত্মাও সর্বজ্ঞ। অন্যদিকে আমরা যদি ধরে নিই যে, আত্মার কোন চেতনা নেই শরীরে অবস্থান কালে বা অশরীরী অবস্থায়, তাহলে এ ধরনের ব্যবহারহীন একটি নিরাসক্ত সত্তার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এ প্রসঙ্গে আমার একটি গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। একদিন এক ষাটোর্ধ্ব অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোক প্রখ্যাত বেদান্ত দার্শনিক শহীদ অধ্যাপক পণ্ডিত গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'স্যার আপনি কি মনে করেন আত্মা চৈতন্যময়?' বিজ্ঞ দার্শনিক ইতিবাচক উত্তর দিলে উক্ত ভদ্রলোকের পুনরায় জিজ্ঞাসা, 'তাহলে স্যার, আত্মা কি যৌন মিলনে অংশগ্রহণ করে, এবং মিলনে সুখ ও চরম পুলকানন্দ অনুভব করে থাকে?' বলাই বাহুল্য পণ্ডিত দেব যতপরোনাস্তি বিরক্ত হয়েছিলেন এবং প্রশ্নকারীকে 'দেহাত্মবাদী' বলে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন।

আমি মাতুব্বরের আর দু'একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব মাত্র এবং এর মাধ্যমে দেখাবার চেষ্টা করব আমাদের আলোচ্য দার্শনিকের বিশে-ষণী মন কীভাবে ক্রিয়া করে। আমরা সত্যিই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাই যখন তার সামাজিক পটভূমি ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় রাখি। তার পুস্তকটির ২য় প্রস্তাবে তিনি আল-াহতালার প্রকৃতি ও রূপ নিয়ে আলোচনা তুলেছেন। এটি একটি ভয়ঙ্কর বিপদজ্জনক ও স্পর্শকাতর বিষয় যখন আমরা আমাদের সমাজে বিরাজমান ধর্মীয় উন্মাদনার কথা মনে আনি। প্রশ্নটি হল : আল-াহর রূপ কি?

আরজ আলী প্রশ্নটির আরও বিশদ ব্যাখ্যায় গিয়ে বলেন, সর্বধর্মমতানুসারে যদি সৃষ্টিকর্তা 'অদ্বিতীয়, নিরাকার এবং সর্বব্যাপী' হয়ে থাকেন তাহলে তো বিষয়টি বেশ সহজ ও সরল। 'কিন্তু যখন হিন্দুদের মুখে শোনা যায় যে, সৃষ্টি পালনের উদ্দেশ্যে ভগবান মাঝে মাঝে সাকারও হইয়া থাকেন ও যুগে যুগে অবতারূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া লীলা প্রকাশ করেন', বলেন মাতুব্বর, 'এবং যখন খৃষ্টানদের নিকটে শোনা যায় যে, পরম সত্তা– 'ভগবান' মশীহ্, পরমাত্মা– এই ত্রিত্বে প্রকাশ পাইতেছে; আবার যখন মুসলিম ধর্মযাজকদের নিকট শোনা যায় যে, আল-াহতালা আরশে কুরছির উপর বসিয়া রেজওয়ান নামক ফেরেস্তার সাহায্যে দোজখ, জেব্রাইলের সাহায্যে সংবাদ ও মেকাইলকে দিয়া খাদ্য বন্টন ও আবহাওয়া পরিচালনা করেন– ... মনে প্রশ্ন জাগিতে থাকে– নিরাকার সর্বশক্তিমান ভগবানের সৃষ্টি পালনে সাকার হইতে হইবে কেন? অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহত্ত্ব প্রকাশে ত্রিত্বের আবশ্যক কি?' ধর্মবেত্তাদের অবশ্যই এসব বেমক্কা প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে হবে।

৯ম প্রশ্নটিতে স্থান কাল এবং শক্তির অবতারণা করা হয়েছে। তিনি জানতে চেয়েছেন বিজ্ঞান যাদেরকে স্থান, কাল এবং শক্তি নামে অভিহিত করেছে এ সকল সত্তার অস্তিত্ব কি সবসময় ছিল, নাকি এরা ঈশ্বর সৃষ্ট? যদি এরা ঈশ্বর সৃষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে এর আগে ঈশ্বর কোথায় অবস্থান করতেন 'স্থান' সৃষ্টির আগে, তিনি কোথায় ছিলেন সময়ের সৃষ্টির পূর্বে? আমাদের দার্শনিক তিনটি সরল প্রশ্নের অবতারণা করেছেন : (১) ঈশ্বর কোন স্থানে অবস্থান করে 'স্থান' সৃষ্টি করলেন? (২) তিনি কোন মুহূর্তে 'কাল' সৃষ্টি করলেন, এবং (৩). তিনি কোন শক্তি বলে 'শক্তি' সৃষ্টি করলেন?

সন্দেহ নেই আমাদের ধর্মচর্চাকারী পণ্ডিতদের কাছে এসব বিষয় উত্থাপন বেমক্কা ও বিব্রতকর প্রশ্ন। কিন্তু আমরা জানি তারা ক্রমাগত বলতে থাকবেন যে, সব সমস্যার সমাধান ও এসব প্রশ্নের উত্তর ঐ পবিত্র গ্রন্থগুলিতেই রয়েছে, কেবল কতিপয় ধর্মব্যবসায়ী মেকী বিজ্ঞানীর পুনরাবিষ্কারের অপেক্ষা। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত 'সত্যের সন্ধান' বইটিতে উত্থাপিত প্রশ্নাবলী ছাড়াও তিনি বেশ কিছু সম্পূরক প্রশ্ন পরবর্তীকালে প্রস্তাব করেছিলেন যেগুলি তার অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার করা গেছে।

বিজ্ঞানমনস্ক আরজ আলী মাতুব্বর

তাঁর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল 'সৃষ্টি রহস্য' যেটির আলোচ্য বিষয় হল সৃষ্টির বিজ্ঞান অর্থাৎ মহাবিশ্ব সৃষ্টির এবং প্রাণ সৃষ্টির কাহিনী। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নয় নিয়ে গভীর অনুধ্যায়নের ফসল হল এই জ্ঞানগর্ভ পুস্তকটি– লিখেছেন সরল সুললিত ভাষায় সাধারণ পাঠকের জন্য।

আরজ আলী কেবল সাধারণ একজন দার্শনিক নন যিনি কেবল জ্ঞানচর্চা করেছিলেন তত্ত্বীয় বিশে-ষণ আর মননশীলতাকে ভিত্তি করে, যা সাধারণ একজন দার্শনিক করে থাকেন ব্যবহারিক বা পরীক্ষণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থেকে। কিন্তু মাতুব্বরের ছিল বিস্ময়কর বিজ্ঞান মন এবং তিনি ছিলেন বাস্তববাদী মানুষ (Pragmatic man)।

'সৃষ্টি রহস্যে' অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলি একজন স্বশিক্ষিত বিজ্ঞানীর মননশীলতার ও তার উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় সুন্দর করে তুলে ধরেছে। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি তার পড়ার গভীরতা দেখে– পদার্থবিদ্যা থেকে জীব বিজ্ঞানের আধুনিকতম উন্নতির পর্যায় পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব অবধি পরিব্যাপ্ত। তিনি কেমন করে এসব জটিল বিষয়ের মূল সুরটিকে আত্মস্থ করতে পারলেন, যা

কিনা অনেক সময় অনেক গবেষকের কাছেও বোধগম্য হয় না কারণ আমরা বিজ্ঞানীরা এমন এক ভাষায় কথা বলি যা কিনা সহকর্মী বা সহযোগী বিজ্ঞানীরাই বুঝতে পারেন। মাতুব্বর কেবল জটিল বিষয়গুলোকে আত্মস্থ করেননি, তার পাঠকদের ধর্মীয় সামাজিক পটভূমির কথা মনে রেখেই তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন সুললিত ভাষায় সূক্ষ্মতর বিশদাদি পরিহার করে। তিনি তার গোঁড়া উগ্রপন্থীদের কথা ভুলে যাননি যারা সতত উদ্যত রয়েছে তার উপর ঝাপিয়ে পড়তে। তাই তিনি বিজ্ঞানের তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ধর্মপুস্তক উলি-খিত বিবরণের তুলনামূলক কোন বক্তব্য বা প্রস্তাবনা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করে সিদ্ধান্ত* টানেনি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার সুধী পাঠকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। এটিই ছিল গ্যালিলিও অনুসৃত শৈলী– সরাসরি মুখোমুখি হওয়া পরিহার করার কৌশল।

পুস্তকটির ভূমিকায় তিনি বিনীতভাবে লিখেছেনঃ

> 'মানব সমাজে কুসংস্কারের বীজ উত্তপ্ত হইয়াছিল হাজার হাজার বছর পূর্বে। এখন উহা প্রকাণ্ড মহীরূহের আকার ধারণপূর্বক অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া এবং ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া বিস্তীর্ণ জনপদ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। আর তাহারই কালাতিপাত করিতেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। অতীতে বহু মনীষী কুসংস্কাররূপী মহীরূহের মূলে যুক্তিবাদের কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন, যাহার ফলে বহু মানুষ উহার ছায়াতল হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইয়াছে মুক্তমনের খোলা মাঠে আর তরুণ-তরুণীরা ভিড় জমাইতেছে দর্শন-বিজ্ঞানের পুষ্পোদ্যানে।
>
> এই পুস্তকখানির আদ্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে সুধী পাঠকবৃন্দ বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে মানবমনের ধারাবাহিক চিন্তা গবেষণা ও সর্বশেষ যুক্তিসম্মত মতবাদের বিষয় জানিতে পারিবেন।
>
> এই পুস্তকখানি প্রণয়নে প্রণেতা হিসেবে তত্ত্বমূলক অবদান আমার কিছু নাই। তত্ত্ব যাহা পরিবেশিত হইয়াছে তাহা সমস্তই সংকলন, আমি সংগ্রাহক মাত্র। ইহা প্রণয়নে আমি যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তাহার গ্রন্থাকারগণের নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ।'

তার বৈজ্ঞানিক মনের এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য উপস্থাপনের তার চিত্তাকর্ষক পদ্ধতির সাথে পাঠকের কাছে তুলে ধরার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বইটিতে দেয়া সূর্য সম্পর্কে কিছু কথা'র উদ্ধৃতি দিতে চাই। বিভিন্ন ধর্ম থেকে কৌতুকাবহ গল্পকথা শুনিয়ে তিনি

---

* এসব প্রশ্নাবলী 'ভাবি প্রশ্ন' (সত্যের সন্ধান : '১লা কার্তিক, ১৩৭৯) ও 'না বুঝের প্রশ্ন' (সত্যের সন্ধান : ১৬ই বৈশাখ ১৩৫৮– ২৯শে ভাদ্র, ১৩৫৯) শিরোনামে পাঠক সমাবেশ প্রকাশিত আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র–১ সঙ্কলনটি স্থান পেয়েছে।

সূর্য সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। সূর্যের গতি সম্পর্কে মুসলিম ধারণার কথা নিয়ে লিখেছেন:

> 'মুসলমানগণ বলিয়া থাকেন যে, সূর্যের বাহন নৌকা (বোধ হয় যে, ইহা প্রাচীন মিশরীয়দের অনুকরণ)। মুসলমানগণ আরও বলিয়া থাকেন যে, চতুর্থ আসমানে একখানা সোনার নৌকায় সূর্যকে রাখিয়া ৭০ হাজার ফেরেশতা সূর্যসহ নৌকাখানা টানিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে লইয়া যায়। সারারাত সূর্য আরশের নিচে বসিয়া আল-হর এবাদত করে এবং প্রাতে পুনরায় পূর্বদিকে উদিত হয়।'

এ ধরনের বর্ণনার পর তিনি অগ্রসর হয়েছেন সূর্য সম্বন্ধে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠকের উপহার দিতে। আর একটি উদাহরণ টানা যাক– মহাবিশ্ব সৃষ্টি নিয়ে। তিনি বলেছেন:

'সনাতন ধর্মীয় মতে– পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত, যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে বৃহত্তম বস্তুপিণ্ড এবং মানুষ জীবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরের শখের সৃষ্টি এক বিশেষ জীব। মানুষ ঈশ্বরের শখের সৃষ্টি এক বিশেস জীব কি না, সেই আলোচনা পরে হইবে; এখন দেখা যাক– পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত ও বৃহত্তম পদার্থ কি না।'

তার পরে বলে চলেছেন,

> 'কোন স্থানের কেন্দ্রবিন্দু ঠিক করিতে হইলে উহার পরিধি জানা দরকার। পরিধি নির্ধারণ না করিয়া কেন্দ্র নির্ধারণ অসম্ভব। কিন্তু ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বের পরিধি নির্ধারণ না করিয়াই পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে।'

আমরা যদি ধরে নিই যে, আমাদের মহাবিশ্ব সীমীত এবং বর্তুলাকার, তাহলে এর আয়তন আমাদের জানতে হবে এর কেন্দ্রের অবস্থান চিহ্নিত করতে হলে আর যদি মহাবিশ্ব অসীম হয়, তাহলে মহাবিশ্বের প্রতিটি বিন্দুই হবে এর কেন্দ্র, ফলে পৃথিবীর আর কোন বিশেষত্ব থাকে না। ধর্মীয় বিশ্বাস মতে মহাবিশ্ব হল অনন্ত। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে 'পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র'– এই বাক্যটি হয়ে পড়ে অর্থহীন।

তিনি পুস্তকটিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূল কথাগুলির পর বিশ্ব সৃষ্টির বিবর্তন, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলী, উল্কা, ধূমকেতু ইত্যাদি জ্যোতিষ্ক, ... প্রাণের বিকাশ, প্রাণ এবং জীবজগতের বিবর্তন, বংশগতি, মানুষের অভ্যুদয় প্রভৃতি নানা চমকপ্রদ বিষয়ের অবতারণা করেছেন বিজ্ঞানের নির্মোহ দৃষ্টি থেকে– আলোচিত হয়েছে সভ্যতার

বিকাশ, সংস্কার কুসংস্কার, ধর্ম, প্রলয় ও পুনঃসৃষ্টি ইত্যাদি বিচিত্র প্রসঙ্গ। এটি অতি অবশ্য একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ, যা পাঠে উপকৃত হবেন ধর্মবাদীরা– যুক্তিবাদীরাও।

আরজ আলী মাতুব্বরের অন্যান্য রচনাবলী

তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে :

১। অনুমান, প্রকাশ কাল, বাংলা ১৩৯০ (১৯৮৩)
২। স্মরণিকা, প্রকাশ কাল, বাংলা ১৩৯০ (১৯৮৩)

অপ্রকাশিত রচনাবলী

১. বেদের অবদান, রচনাকাল ২১শে আশ্বিন, ১৩৮৩
২. ম্যাকগে-সান চুলা, রচনাকাল ২৭শে কার্তিক, ১৩৭৫
৩. কৃষকের ভাগ্য 'গ্রহ', রচনাকাল ৫ই শ্রাবণ ১৩৫৯- ১১ই ভাদ্র ১৩৬৩
৪. সীজের ফুল, রচনাকাল ১৬ই আশ্বিন, ১৩৩২-২৭শে চৈত্র ১৩৪০
৫. সংক্ষিপ্ত জীবন বাণী, রচনাকাল ২৪শে আষাঢ়- ৭ই শ্রাবণ ১৩৭২
৬. ভাষণ সংকলন, ১লা মাঘ ১৩৮৪- ৩রা পৌষ ১৩৯২
(জানুয়ারি ১৯৭৮- ডিসেম্বর ১৯৮৫)
৭. ভাবি প্রশ্ন (সত্যের সন্ধান), রচনাকাল ১লা কার্তিক ১৩৭৯
৮. নাবুঝের প্রশ্ন রচনাকাল ১৬ই বৈশাখ ১৩৫৮- ২৯শে ভাদ্র ১৩৫৯

অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি : টুকিটাকি ১৩৮১-১৩৯১

১. স্মরণিকা, রচনাকাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১
২. আমার জীবন দর্শন, রচনাকাল ১২ই কার্তিক ১৩৯১

এছাড়া তার পাওয়া পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার করা গেছে পাঁচ খণ্ডে লেখা অসমাপ্ত 'ভিখারীর আত্মকাহিনী' শিরোনামে আত্মচরিত। এটি শুরু করেছিলেন ৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ থেকে আর লেখাটি শেষ হয়েছে ১৯শে ভাদ্র ১৩৮২। আরজ আলীর আর একটি বৈশিষ্ট্য যে, মনে প্রাণে দার্শনিক হলেও বিজ্ঞানের প্রয়োগিক বৈশিষ্ট্য কখনও বিসর্জন দেন নি, লভ্য মাল মশলার মধ্য দিয়ে তার মত করে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান চর্চার চেষ্টা করেছেন অল্প বয়স থেকেই। আমরা এখানে একটি পরীক্ষার কথা উলে-খ করব দৃষ্টান্ত হিসেবে। তিনি বাংলা ১৩৫৭ সালে ম্যাকগে-সান চুলা নির্মাণ করে দেখিয়েছিলেন কৃষকদের প্রয়োজনে, কৃষকদের কল্যাণে। আখের রস থেকে গুড় তৈরিতে কৃষকরা দেশীয় চুলা বা আখা ব্যবহার করে থাকে– এ ধরনের চুলার ত্রুটি হল জ্বালানি অপচয়, তাপশক্তির উৎপাদন কম এবং সময় ক্ষেপণ বেশি হয়। তাছাড়া এই চুলায় অঙ্গার থেকে তাপ উৎপাদন সম্ভব হয় না। এসব অসুবিধা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ম্যাকগে-সান নামের জনৈক ইংরেজ এক নতুন ধরনের চুলা

উদ্ভাবন করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে 'ম্যাকগে-সান চুলা' নামে পরিচিতি লাভ করে। মাতুব্বর সাহেব জীবনে এই অভিনব চুলা না দেখেও কেবলমাত্র নকসা অনুকরণে এ ধরনের চুলা নির্মাণ করে দেখান যা থেকে কৃষককুল প্রভূত উপকৃত হয়েছিল (১৩-১১-১৩৫০)।

এসব প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনাবলীর মাধ্যমে আমাদের যুক্তিবাদী লোকায়ত দার্শনিক মানুষের মনের অতীব তাৎপর্যময় ও মৌলিক প্রশ্নাবলীই উত্থাপন করেননি, তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন কী ভাবে কোন সমস্যা সমাধানে যুক্তির সাথে বৈজ্ঞানিক পন্থায় অগ্রসর হওয়া উচিত। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সকল সমস্যার উত্তর পাওয়া বর্তমান বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব এবং যুক্তিবাদী চিন্তার দ্বারা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু এটিই হল বৈজ্ঞানিক পথ যার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্ট হবে, অথবা পুরাতন জ্ঞানের নবায়ন ঘটবে, নতুন সত্যের উদঘাটন হবে। আর সভ্যতা সংস্কৃতি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আমরা পেছনের দিকে হাটব না, ফিরে যাব না কোরানের কালে বা বৈদিক যুগে, প্রত্যাবর্তন করতে চাই না মুহম্মদ, ঈশা অথবা মুসার কালে।

ঈশ্বরাদিষ্ট ধর্ম ও ধর্ম প্রবর্তকদের প্রতি ছিল তার সম্মানবোধ, কখনও কোন অশ্রদ্ধেয় মনোভাব প্রকাশ করেননি, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসও তার ছিল না। এ প্রসঙ্গে তার মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে যুক্তিবাদী মনোভাব পোষণের কারণে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়েরকারী জনৈক সরকারি কর্মচারীর 'আপনি মুসলমান কি না; এবং আপনি কোরান মানেন কি না'– এ জাতীয় প্রশ্নের জবাবে মাতুব্বর অসম সাহসিকতার সাথে বলেছিলেন,

'জাতি বা সম্প্রদায় হিসেবে আমি মুসলমান, যেহেতু আমার মা ও বাবা মুসলমান।' আর কোরান মানা না মানা প্রসঙ্গে তার উত্তর ছিল,

'কোরান আমি মানি কি না, তাহা জানি না, যেহেতু আমি কোরান বুঝি না। তবে ইহা সত্য যে, আমি যাহা বুঝি না, তাহা মানি না।'

আর এক স্থানে ধর্মবেত্তাদের সম্পর্কে তার বিনয়ী পর্যবেক্ষণ ছিল:

> 'মানব সমাজে ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যই। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ধর্মগুলো মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই করছে বেশি, অবশ্য জাগতিক ব্যাপারে। ধর্মবেত্তারা সকলেই ছিলেন মানবকল্যাণে আত্মনিবেদিত মহাপুরুষ। কিন্তু তারা তাদের দেশ ও কালের বন্ধনমুক্ত ছিলেন না।'

আমরা বলেছি মাতুব্বর ছিলেন মানবতাবাদী ও লোকায়তবাদী দার্শনিক যার আদি

উৎস হল মানবতাবাদ ও মানবকল্যাণ। তার মতে বিজ্ঞান সাধনাই হোক আর দর্শন চর্চাই হোক সবই হতে হবে মানব হিতে। সারাটি জীবন তিনি এরই সাধনা করেছেন মানব হিতৈষণা। তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন:

> 'আমি দার্শনিক নই, এমন কি কোন পুঁথিগত দর্শন আমার আয়ত্ত্বে নেই, কতকটা লালন শাহের মতোই। তবে দর্শনকে ভালবাসি, দার্শনিকদের শ্রদ্ধা করি এবং তাদের সংসর্গ লাভে আনন্দিত হই। কিন্তু আমি ভাববাদী দর্শনে অনুরক্ত নই।'

তিনি পুনরায় বলেছেন:

> '... যদিও দার্শনশাস্ত্রটি সর্বজনীন, তথাপি হিন্দু দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, মুসলিম দর্শন, ভারতীয় দর্শন, গ্রীক দর্শন ইত্যাদি দর্শন যেমন স্বতন্ত্র, বর্তমান বাঙালির জাতীয় দর্শনেও তেমনটি বাঞ্ছনীয়। আর আমার ব্যক্তিগত অভিমত থেকে বলছি, তা হওয়া উচিত মানবতাবাদী দর্শন। কেননা সর্বদেশে এবং সর্বকালে মেহনতী মানবতার প্রত্যাশী, পুঁজিপতিরা নয়। আর দুনিয়ার দরিদ্রতম দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ, যেখানে মেহনতী মানুষের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৯০। তাই এই বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনদর্শনই হওয়া উচিত বাঙালির জাতীয় দর্শন তথা মানবতাবাদী দর্শন।'*

তিনি চাইতেন সমাজে যেন বৈষম্য না থাকে, ভাবতেন বৈষম্যহীন সমাজের কথা, কোন পথে তা আসতে পারে? ভেবেছেন সমাজতন্ত্রের কথা :

> '... আর এই বৈষম্যরোধ ও সমতা আনয়নের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে 'সমাজতন্ত্র'। তাই 'সমাজতন্ত্র' তথা সাম্যবাদ হচ্ছে বিশ্ব মানবের মঙ্গল বিধানের একমাত্র মাধ্যম। এছাড়া শুধুমাত্র রকেট- রোবট ও স্বর্গ-নরকের স্বপ্ন দর্শনের দ্বারা সমাজ উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা, তা ভেল্কি বই আর কিছু নয়।'

দেশসেবা নিয়ে তার কোন অহমিকা ছিল না, নিজের মত করেই তিনি তার মাতৃভূমির ও জনগণের সেবা করেছেন মানব হিতৈষণার চেতনা নিয়ে। তিনি বলতেন :

> 'ভেকের কাছে ডোবাই তার 'দেশ', কৃষকের কাছে দেশ তার পল্লী এবং রাষ্ট্র নেতার কাছে 'দেশ' তার গোটা রাষ্ট্র। আমার ' দেশসেবা মানে 'রাষ্ট্র সেবা নয়', পল্লীসেবা।'

'জীবন বাণী' শিরোনাম আর একটি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন কিন্তু

---

* বাংলাদেশ দর্শন সমিতির ৬ষ্ঠ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৯৮৪

১। আরজ আলী মাতুব্বর সংগ্রহ–৩, পাঠক সমাবেশ, ১৯৯৭, ঢাকা।

আর হাত দিতে পারেননি, ১৩৯২ সালের ১লা চৈত্রে তার প্রয়াণ এই সম্ভাবনার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়।[২]

আরজ আলী মাতুব্বর দুজন মানুষের কাছে অসীম ঋণে আবদ্ধ একজন তার পরম স্নেহাস্পদ বরিশাল বিএম কলেজের বাংলার অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হক, বর্তমানে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর অন্যজন তার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী বরিশাল বিএম কলেজের দর্শনশাস্ত্রের কৃতি অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির।

আমি আমার অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধটির সমাপ্তি টানতে চাই এই মহান দার্শনিকের পাদপদ্মে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে।

তথ্যপঞ্জী

১। Ajoy Roy, Aroj Ali Matubbar, A rationalist philosopher of rural Bangladesh, a paper presented at the Intenational Conference on Secularism, Rationalism and Human Rights, Organised by Rationalist International 2002, New Delhi, (also see http://www.muktomona.com/ Articles/ajoy/

২। আরজ আলী মাতুব্বরের স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদক মোজাফফর হোসেন, বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ, ২০০১, ঢাকা।

৩। আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র, ১ম-৩য় খণ্ড, পাঠক সমাবেশ, ১৯৯৪-৯৭, ঢাকা

৪। আইয়ুব হোসেন, আরজ আলী মাতুব্বর, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, ঢাকা।

বাংলাদেশে চেতনা-মুক্তির লড়াই

অভিজিৎ রায়

১

যে সমাজ আর সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আমরা, তার সবটুকুই যে নির্ভেজাল তা বলা যায় না। এতে যেমন প্রগতিশীল বস্তুবাদী উপাদান রয়েছে, তেমনি রয়েছে আধ্যাত্মবাদ, বুজরুকি, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর অপবিশ্বাসের রমরমা রাজত্ব; রয়েছে অমানিষার ঘোর অন্ধকার। এই অন্ধকার সুদীর্ঘকাল ধরে বংশ পরম্পরায় আমাদের চিন্তা চেতনাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে এই 'চেতনার দাসত্ব' থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়– বরং বাস্তবিকই কঠিন ব্যাপার। রাহুল সাঙ্কৃত্যায়ন একবার তার একটি লেখায় বলেছিলেন :

> 'মানুষ জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মঞ্চে যাওয়াটাকে বিরাট হিম্মত মনে করে। সমাজের গোঁড়ামিকে ভেঙে তাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মঞ্চে ওঠার চেয়ে ঢের বেশী সাহসের কাজ।'

কথাটি মিথ্যে নয়। তাই ইতিহাসের পরিক্রমায় দেখা যায়, খুব কম মানুষই পারে আজন্ম লালিত ধ্যান ধারণাকে পরিত্যাগ করে স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে, খুব কম মানুষই পারে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। খুব কম মানুষের মধ্যে থেকেই শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে একজন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, দীনবন্ধু, ভূদেব, বেগম রোকেয়া, আরজ আলী মাতুব্বর, প্রবীর ঘোষ, হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা নাসরিন কিংবা আহমদ শরীফ। শাসক আর শোষক শ্রেণী আর তাদের নিয়ন্ত্রিত বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা কখনও চায় না জনগণ প্রথা ভাঙুক, কুসংস্কারের পর্দা সরিয়ে বুঝতে শিখুক, জানতে শিখুক অজ্ঞতা, শোষণ আর অসাম্যের মূল উৎসগুলো কোথায়। জনগণের 'জ্ঞান চক্ষু' খুলে গেলেই তো বিপদ, তাই না! আর সেজন্যই জনগণকে অন্ধকারে রাখতে চলে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরে ধর্মকে পরিবেশন, লাগাতার অধ্যাত্মবাদী প্রচারণা, পত্রপত্রিকায় ঢাউস আকারে রাশিফল, সর্পরাজ আর অধ্যাত্মবাদী গুরু আর কামেল পীরের বিজ্ঞাপন, মন্ত্রী আর নেতানেত্রীদের মাজার

আর দরগায় সিন্নি দেওয়া অথবা নির্বাচন উপলক্ষে হজে যাওয়া, মাথায় টুপি ও কাল-পট্টিসহ বিচিত্র লেবাস ধারণ। মুক্তমনাদের লড়াই এই সামগ্রিক অসততার বিরুদ্ধে, অন্ধবিশ্বাস আর অপবিশ্বাসকে উস্কে দেয়া এই সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে। এ লড়াই কামান-বন্দুক হাতে মামদোবাজি নয়, এ লড়াই বৌদ্ধিক, এ লড়াই সাংস্কৃতিক। এ লড়াই সমাজকে প্রগতিমুখী করবার ব্রত নিয়ে সামগ্রিক অবক্ষয় আর অন্ধকার ভেদ করে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করবার লড়াই। এ লড়াই আক্ষরিক অর্থেই আমাদের কাছে চেতনা মুক্তির লড়াই।

চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্ত করার লড়াইয়ের ময়দানটি একদিনে গড়ে উঠেনি। আজ ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বাস এবং যুক্তির সরাসরি সংঘাতের ভিত্তিতে যে সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন ফোরামগুলোতে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে, তা আমরা মনে করি প্রাচীনকালের ব্রক্ষবাদী বনাম চার্বাকবাদীদের লড়াইয়ের একটি বর্ধিত, অগ্রসর ও প্রায়োগিক রূপ। এ এক অভিনব সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বাঙালির এক নবজাগরণ যেন। এর প্রেক্ষাপট সূচিত হয়েছিলো আজ থেকে পাঁচ বছর আগে– ২৫শে মে, ২০০১এ। কুসংস্কার, ভাববাদ, অধ্যাত্মবাদ, নিয়তিবাদ ও অলৌকিকতা-মুক্ত এক স্পর্ধিত বাঙালি প্রজন্ম গড়ে তুলতে মাত্র ৩০ জন সদস্য নিয়ে এ দিনটিতে সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম ওয়েবভিত্তিক কুসংস্কারবিরোধী মননশীল বাঙালি আলোচনাচক্র- 'মুক্তমনা'। প্রথম দিকে মূলত বাংলাদেশী সদস্যদের নিয়ে গঠিত হলেও এটি দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে যায় খুব তাড়াতাড়িই। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ফ্রিথিংকারদের এক মিলন মেলায় পরিণত হয় মুক্তমনা। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ইরাক, সৌদি আরব, দুবাই, জার্মানি, সিঙ্গাপুর, নেদারল্যান্ড, ইংলন্ড, আমেরিকা, কানাডা, ইরানসহ নানা দেশ থেকে সদস্যরা ভিড় করতে শুরু করেন, মুক্তমনা আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠে এক 'আন্ত র্জাতিক' প্রগতিশীল সংগঠন।

কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর শাস্ত্রানুগত্য মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার দরকার যে আছে তা তো আর নতুন করে বলে দেবার প্রয়োজন নেই। প্রাচীন ভারতের সেই যুক্তিবাদী চার্বাকরা অনেক আগেই তা বুঝেছিলেন। তারা তাদের মত করে যুদ্ধ করে গেছেন। আত্মাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই সম্ভবত চার্বাকদের লড়াইটা শুরু হয়েছিল। আত্মাই যদি না থাকবে তবে কেন অযথা স্বর্গ নরকের কেচ্ছা-কাহিনীর আমদানি। কাজেই আত্মা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে করতে শেষ পর্যন্ত ঠোঁট কাটা চার্বাকেরা ঈশ্বর-আত্মা-পরলোক-জাতিভেদ-জন্মান্তর সব কিছুকেই তারা নাকচ করে দিয়েছিলেন। তারাই প্রথম বলেছিলেন বেদ 'অপৌরুষেয়' নয়, এটা একদল স্বার্থান্বেষী মানুষের রচনা। জনমানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া সেইসব স্বার্থান্বেষী ব্রাক্ষণদের

চার্বাকেরা ভণ্ড, ধূর্ত, চোর, নিশাচর বলে অভিহিত করেছিলেন। এ হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কথা– তখনো শ্রেণী শোষণ বুঝাবার জন্য মার্ক্স-এঙ্গেলসের জন্ম হয়নি। চার্বাকেরা তাদের মত করেই শ্রেণী শোষণের মর্মবাণীটুকু বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। তারা বলেছিলেন ধূর্ত স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণেরা শোষণের সুবিধার্থে বেদের শে-াকগুলো ঈশ্বরের বাণী হিসেবে প্রচার করেন। এখানে শ্রেণীচেতনার বিষয়টি কিন্তু স্পষ্ট। ব্রাহ্মণ পাণ্ডারা যে লোক ঠকানোর ব্যবসা ফেঁদেছে, আর ধর্ম জিনিসটাই যে শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা চার্বাকেরা তাদের লেখায় প্রথম থেকেই স্পষ্ট করেই বলেছেন। ফলে দেখা যায় যে, এই চার্বাক দর্শন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে কেবল বৈপ-বিক ভূমিকাই পালন করেনি, পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে আরো অনেক প্রগতিশীল ও বস্তুবাদী মতপ্রকাশের ক্ষেত্র তৈরিতে একটি দৃঢ়ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে সাংখ্য দর্শনের কথাও বলা যায়। সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা কপিল যীশু খ্রীষ্টের ছ'সাতশ বছর আগে জন্মেছিলেন। সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা ছিল না। এই দর্শনের আচার্যরা ঈশ্বরীয় শক্তির মাধ্যমে সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার কিংবা ঈশ্বরকে 'আদি কারণ' ভেবে নেবার পক্ষে কোন যৌক্তিক সমর্থন খুঁজে পাননি।

চার্বাক ও সাংখ্যদর্শনের প্রভাবে পরবর্তীতে বৌদ্ধ ও জৈন– এই দুই বিখ্যাত ধর্মমত জন্মলাভ করেছিল। বৈদেক যুগের আচার সর্বস্বতা, তুক তাক, যাগযজ্ঞ, কুসংস্কার, জাতিভেদসহ নানা ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহী মতবাদ' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এ দুই মতবাদ। এ দুটি দর্শনের স্রষ্টা গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর মূলত আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। ঈশ্বর আছেন কি নেই, সেটাকে তারা গৌণ মনে করেছেন। বৌদ্ধ দর্শন ও জৈন দর্শন উভয়েই প্রথম দিকে নাস্তিক্যবাদী দর্শন হিসেবে আবির্ভূত হলেও পরবর্তীতে এর অনুসারিগণ একে একেবারে 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম' বানিয়ে ফেলেন। প্রবর্তকদের দার্শনিক মর্মবাণী ভুলে গিয়ে এদের অনুসারীরা পূজা-অর্চনা, নানা ধরনের তুকতাক আর আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। অথচ বুদ্ধদেব আর মহাবীর দুজনই বৈদেক ধর্মের অমানবিকতা, নিস্প্রাণ আনুষ্ঠানিকতা, আর অপ্রয়োজনীয় আচার আচরণের বিরুদ্ধেই মূলত বিদ্রোহ করেছিলেন। চার্বাক, কপিল, বৌদ্ধ কিংবা জৈন ধর্মের অনুসারী ছাড়াও প্রাচীন ভারতে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকেই মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেছিলেন। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে থেকেই ভারতে মুক্তবুদ্ধির চর্চা, সংশয়াবাদ আর যুক্তিবাদ বিকাশ লাভ করে। বৃহস্পতি, ধীষণ, পরমেস্তিন, ভৃগু, কশ্যপমুনি, ঋষি জাবালি, মসকরী গোষল, পুরন্দর, চানক্য, রাজাবেন, বাৎসায়ন, ভাগুরী প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা খ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগেই ভারতে যুক্তি আর মুক্তবুদ্ধির আলো ছড়িয়েছিলেন সাধারণ

মানুষের মধ্যে। উদ্দালোক অরুণী, অজিতকেশকাম্বলী প্রমুখেরা বুদ্ধের সমসাময়িক মুক্তমনা। প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে এ ধরনের বাষট্টি জন বিদ্রোহী মুক্তমনাদের কথা জানা যায় যাঁরা সে সময় যুক্তির নিরিখে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মশাস্ত্র ও ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন।

মোতাজিলারা ছিল প্রথম সম্প্রদায় যারা ইসলামের মধ্যে থেকে যুক্তিবাদের চর্চা শুরু করেছিলেন। তাদের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল বসরাতে। তারা সংশয়বাদী দৃষ্টি নিয়ে আল-াহ, কোরান আর পয়গম্বরদের বাণী ও কার্যাবলিকে বিচার করতেন। এমন কি হযরত মুহম্মদের জীবিতকালেই অনেকে আল-াহ, কোরান আর মুহম্মদের নবুওত নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করেছিলেন, এমনকি কেউ কেউ ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করেছিলেন। কোরানের কোন কোন আয়াতে এ সম্পর্কে ইঙ্গিতও দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে গ্রীক ও রোমান দর্শনে প্রভাবিত হয়ে মোতাজিলারা নিজেদের মুক্তবুদ্ধির চর্চায় নিয়োজিত করেন। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে তারা কোরানের অলৌকিকতাকে অস্বীকার করেন। তারা মনে করতেন কোরান কোন অনাদি ও অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ নয়। আল-াহর তার বান্দাদের বিপথে চালনা করা কিংবা অযথা নরকের ভয় দেখানোকেও মোতাজিলারা অযৌক্তিক ও বালখিল্য বলে মনে করতেন। খলিফা হারুন-অর-রশীদ আর আল মামুনের শাসনকাল (৭৮৬-৮৩৩খ্রিঃ) ছিল মোতাজিলা সম্প্রদায়ের জন্য আক্ষরিক অর্থেই এক সুবর্ণ যুগ। এ দুই খলিফা মোতাজিলা সম্প্রদায়কে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন আর জ্ঞান চর্চাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করতেন। মোতাজিলাদের মুক্তবুদ্ধির চর্চা আর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রগতিতে প্রেরণা যুগিয়েছিলো। কিন্তু নবম শতাব্দীর শেষে এসে ইসলামের ভিতর মৌলবাদী ধারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে আর মোতাজিলা সম্প্রদায় আর সে সময়কার অন্যান্য মুক্তমনারা নির্যাতন আর নিপীড়নের শিকার হন নিদারুণভাবে। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে যান মোতাজিলাবিরোধী আল আশারী, আল গাজ্জালীর মত গোঁড়াপন্থীরা। তারা মোতাজিলাদের এতোদিনের গড়ে তোলা অনুসন্ধিৎসু মননকে সমূলে বিনাশ করতে সচেষ্ট হন আর 'ধর্মীয় জোশে' প্রচার করেন–

> 'তনুকিদ্ (যুক্তিবাদ ও জ্ঞান বিজ্ঞান) নয়, তকলিদ্ই (অন্ধবিশ্বাসের অনুসরণ ও অনুকরণ) মুক্তির একমাত্র পন্থা। তকুনিদ্ হারাম, অধর্ম, কুফর আর কবিরা গুনাহ্।'

ইসলামের প্রথম দিকে তুলনামূলক সহনশীল পরিবেশে জ্ঞান চর্চার যে সুযোগ তৈরি হয়েছিল তা নবম শতাব্দীর শেষভাগে এসে গাজ্জালীদের হাতে পড়ে কূপমণ্ডুকতায় রূপান্তরিত হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাকে প্রতিহত করে মুক্তমনাদের উপর আক্রমণ

সে সময়কার ইসলামে কট্টরপন্থীদের এক নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আগেই আবু যার গিফারীকে খাদ্য আর পানীয় থেকে বঞ্চিত করে মরুভূমিতে বেঁধে রেখে হত্যা করা হয়। ইবনে সিনা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, পালিয়ে দেশ ত্যাগ করে কোন রকমে বাঁচলেন। ইবনে রুশদেরও প্রায় একই দশা হয়। প্রগতিশীল যুক্তিবাদী ইবনে যিরহামকে ৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে আর আল-দিমিস্কিকে ৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করা হয়। শুধুমাত্র যুক্তিবাদী মোতাজিলারাই নন, ইসলামে মরমীয়া চিন্তাধারাসহ সমস্ত সনহশীল মতাদর্শকে নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিলো। কূপমণ্ডুকতার চর্চা আর 'ফ্রিথিঙ্কার' শুনলেই ফতোয়া দিয়ে হত্যা করার যে রীতি নবম শতাব্দীতে চালু হয় মূলত গাজ্জালী গংদের হাত দিয়ে, তার অভিশাপ থেকে ইসলাম আজো মুক্ত হতে পারে নি। কট্টর মোল-াদের কাছে মুক্তবুদ্ধির চর্চা আর বিরুদ্ধ মতবাদ কী দারুণভাবে অসহনীয় তা দেখতে পাই আজকের সালমান রুশদী, তসলিমা নাসরিন কিংবা হুমায়ুন আজাদের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মনোভাবে।

২

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আর উনবিংশ শতকের শুরুতে বাংলার চিন্তা-চেতনার জগতে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয় রেঁনেসার সাথে তুলনা করে কেউ কেউ একে 'বাংলার রেঁনেসা' বলেও অভিহিত করেন। এ জারগণের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজের পশ্চাৎপদ যুক্তিবিরোধী আচার প্রথা, কুসংস্কার ও নিশ্চল স্থবির সমাজ কাঠামোতে কাঁপন ধরিয়েছিলো। এ রেঁনেসার দু'জন পুরোধা পুরুষ হলেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। এঁদের প্রভাব প্রসঙ্গে সুহাস চট্টোপাধ্যায় তার মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব বইয়ে বলেন,

> 'রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদ পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যে আরো বেশি বস্তুবাদী চেতনার বিকাশ ঘটালো এবং তা মাইকেল দীনবন্ধুর সময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে রীতিমত বৈপ-বিক লড়াইয়ে পরিণত হল।'

রামমোহন রায়কেই (১৭৭২-১৮৩৩) 'বাংলার রেঁনেসা'র পথিকৃৎ বলে মনে করা হয়। ব্রিটিশদের সংস্পর্শে এসে তিনি ইউরোপীয় উদারনৈতিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। তার আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মসংস্কারভিত্তিক। সনাতন ধর্মের বহু যুক্তিবিরোধী আচার আচরণকে শাস্ত্র থেকেই যুক্তি উত্থাপনের মাধ্যমে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু ধর্মের নানা দেব দেবীর পূজা-অর্চনাকে অযৌক্তিক প্রমাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন এই বলে– 'মূর্তিপুজো সমাজের বিন্যাসটা ধ্বংস করে দেয়।' তিনি নিরাকার ঈশ্বরভিত্তিক একেশ্বরবাদের পক্ষে তার যুক্তিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। তার এই ভাবনার পেছনে ইসলামের প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

একেশ্বরবাদী ধারণাটা আসলে রামমোহনের সময় নতুন কিছু ছিলো না। রামমোহনের জন্মের অনেক আগেই ভারতবর্ষে নিরাকার একেশ্বরবাদী তত্ত্ব নিয়ে আসেন মুসলমানেরা– সেই সপ্তম শতাব্দীতে মুহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের মধ্য দিয়ে। তারপর অষ্টম শতাব্দী থেকে উপমহাদেশে খুঁটি গাড়া মুসলিম মরমী সাধকেরা একেশ্বরবাদের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন। রামমোহন নিজেও পাটনায় থাকাকালে ইসলামের উদারনৈতিক মোতাজিলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদী চিন্তায় প্রভাবিত হন। এ প্রেক্ষিতেই রামমোহন ও তাঁর অনুসারীরারা ১৮২৮ সালের ২০শে আগস্ট গঠন করলেন 'ব্রাহ্মসভা'। এই ব্রাহ্মসভার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল রামমোহনের ধর্মীয় চিন্তাভাবনার সর্বোচ্চ রূপ। তারপরও বলা যায়, ব্রাহ্মসভার উদ্দেশ্য মোটেও সফল হয়নি। রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ তার কিছু গুণমুগ্ধ কিছু অনুগামী (যারা ছিলেন মূলত নব্য ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং রাজা-মহারাজা ও জমিদার) ছাড়া সাধারণদের মধ্যে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। ১৮৩৩ সালে রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের গতি ঝিমিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মধর্মে পরিণত করে কিছুটা প্রাণের জোয়ার আনতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের এই 'ব্রাহ্মধর্ম' হিন্দু ধর্মের বিশাল পরিসরে বিলীন হয়ে যায়।

তবে রামমোহনের সবচাইতে বড় অবদান হল সতীদাহের মত একটা অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। তিনি শাস্ত্র ঘেটে সতীদাহের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং সাথে সাথে মানুষের স্বাভাবিক বিবেক ও বিচারশক্তিকে এই প্রথার বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। প্রথম দিকে ইংরেজরা সতীদাহের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে সাহসী না হলেও, রাজা রামমোহন সতীদাহ বন্ধ করার জন্য প্রবল জনমত গড়ে তুললে ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথাকে বিস্তারেও রামমোহনের ভূমিকা ছিল। তিনি নিজ উদ্যোগে এ্যাংলো হিন্দু বিদ্যালয়, বেদান্ত মহাবিদ্যালয়সহ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং সেখানকার পাঠ্যসূচিতে বলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা আর পাশ্চাত্য দর্শন অন্তর্ভুক্ত করেন।

সমাজ সংস্কারে রামমোহনের ব্যাপক অবদান থাকা সত্ত্বেও জমিদারী প্রথার সাথে রামমোহনের সরাসরি সম্পর্ক থাকার ফলে তিনি সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি। এ ধরনের সীমাবদ্ধতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) ছিল না। জমিদারী প্রথার সাথে সরাসরি সম্পর্ক না থাকায় তিনি বহুক্ষেত্রেই বলিষ্ঠভাবে সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পেরেছিলেন। ধর্ম আর ঈশ্বরের প্রতি তার আস্থা ছিল না বলেই মনে হয়। তিনি পুরাতন ও প্রথাগত শাস্ত্রানুগত্যকে সরাসরি মিথ্যা বলেছেন। সামন্ততান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণু আচার আর সাংস্কৃতিক আচার আচরণের বিরুদ্ধে তিনি রামমোহনের

তুলনায় অনেক বেশি নিঃশঙ্কচিত্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে অব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি। শিক্ষা প্রসারের জন্য নিজেও অনেকগুলো বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন তিনি। মেয়েদের বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যেমনি সরব ছিলেন তিনি, পুরুষদের বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও ছিলেন প্রতিবাদমুখর। তবে সবকিছু ছাপিয়ে বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল হিন্দুদের বিধাবিবাহের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। আর এ ধরনের সনাতন প্রথা ভাঙতে তিনিও রামমোহনের মতোই ধর্মগ্রন্থ ঘেটে অনেক যুক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন, এবং গোড়া ধর্মাবলম্বীরা অনেকেই তার ক্ষুরধার যুক্তির আক্রমণে পিছু হটেছিলেন। ফলে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ ও বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হয়।

রামমোহন আর বিদ্যাসাগরের চেয়ে চিন্তাচেতনায় ঢের বেশি 'র‍্যাডিক্যাল' ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)। কিশোর বয়সেই ফরাসী বিপ-বের সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের বাণী আর মুক্তবুদ্ধি চর্চার বাঁধভাঙা জোয়ার তাকে আলোড়িত করেছিলো। শিক্ষক ড্রামন্ডের 'সেক্যুলার' চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি। 'ভিনদেশী' হলেও ডিরোজিও ভারতবর্ষকে নিজেরদেশ বলেই মনে করতেন। ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজে (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজ) শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ডিরোজিও। প্রচলিত পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে তিনি ছাত্রদের যুক্তিনিষ্ঠা ও বস্তুবাদী চিন্তাধারায় আগ্রহী করে তুললেন। তাঁর যুক্তিবাদী মনমানসিকতা ও মুক্তমন ছাত্রদের চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছিল। শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাদান যথেষ্ট মনে না হওয়াতে তিনি ছাত্রদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হতেন। এই বৈঠকের একটা গালভরা নামও ছিল– 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'। সত্যবাদিতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভায় আলোচনা হত, অনেকটা আমাদের 'মুক্তমনা' ফোরামের মতই। তিনি ছাত্রদের এ ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে তাদের স্বাধীনভাবে তর্ক-বিতর্ক করার উপযোগী করে গড়ে তুলতেন।

খুব তাড়াতাড়িই ডিরোজিওর প্রভাব ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কলেজের সেরা ছাত্ররা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। মূলত ডিরোজিওর নেতৃত্বেই সে সময় কলকাতায় 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত সেই সব 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান'রা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল। এরা অস্বীকার করল উপনয়ন, সান্ধ্য আহ্নিক ছাড়ল, প্রাচীন প্রথাকে অমান্য করল, নারী শিক্ষার দাবি তুলল। তারা প্রতিদিনের আহ্নিকে মন্ত্রোচ্চারণের বদলে ইলিয়ড থেকে আবৃত্তি করতে লাগল; তুলে আনতে লাগলো ভয়ঙ্কর সব স্পর্শাতীত বিষয় সতীদাহ, কুলীন ও বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ সব প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধেই তারা সোচ্চার হয়েছিল।

নিজেদের সংস্কারমুক্ত প্রমাণ করতে এমনকি গোমাংস খাওয়া এবং মদ্যপান করাও তারা শুরু করল, প্রকাশ্যে। ভারতীয় অন্ধ বিশ্বাসের অচলায়তনে সে সময় এক নবমন্ত্রের ঝড় তুলেছিলেন এই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামের ডিরোজিওর এই ভাবশিষ্যরা। রামমোহন যা পারেননি, ডিরোজিও তাই করে দেখাতে চাইলেন। রামমোহন পুরনো প্রথাকে ভাঙার লড়াই শুরু করেছিলেন ঠিকই কিন্তু মূল উৎসে গিয়ে সেই গোঁড়াই রয়ে গিয়েছিলেন। পারেননি তিনি পুরোপুরি কুসংস্কার মুক্ত হতে, পারেননি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ী হতে। ধর্ম সংস্কার করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই আরেকটি ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন। প্রবীর ঘোষ তার 'অলৌকিক নয় লৌকিক' (তৃতীয় খণ্ড) গ্রন্থে তাই বলেন :

> 'ধর্মান্ধতার ঊর্ণজাল কে ছিন্ন করেছিলেন? রামমোহন রায়? রামমোহন রায় তো স্বয়ং ধর্মমতের স্রষ্টা। ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মন্দির ও দেবমন্দির ভাঙে কালের করাল গ্রাসে। অথবা নিশ্চিহ্ন হয় কেউ নিশ্চিহ্ন করে দিলে। নিরাকার ঈশ্বরকে ওভাবে মুছে ফেলা যায় না। এমনই এক ঈশ্বর চিন্তা জনমানসে প্রথিত করতে চেয়েছিলেন রামমোহন, যেখানে ঈশ্বর থাকবেন অনেক নিরাপদে।'

'ইয়ং বেঙ্গল'রা বরং এদিক দিয়ে অনেক অগ্রসর ছিল, তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে বসলো, ফলে আনুষঙ্গিক ছোটখাটো কুসংস্কারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা তাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। তারা ধর্মকে আশ্রয় না করেই মুক্তচিন্তাকে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন। তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন পাশ্চাত্যের লক, বেকন প্রমুখ দার্শনিকদের যুক্তিবাদী চিন্তা দিয়ে।

সমাজের কুসংস্কার ও কুপ্রথা খণ্ডনে রামমোহন যেখানে বেদ পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রকে ব্যবহার করেছিলেন, সেখানে ডিরোজিও নিখাঁদ নির্ভেজাল যুক্তিবাদকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রনির্ভর সমাজকে পাল্টাতে গিয়ে যে জ্ঞান এবং যুক্তির আলো জ্বালিয়েছিলেন, তাতে প্রমাদ গুণলেন সমাজের কর্তাব্যক্তিরা। তারা উঠে পড়ে লাগলেন এই 'নাস্তিক'কে সমাজের কচি কচি ছেলেগুলোর 'মাথা খাওয়া' থেকে বিরত করতে। ডিরোজিওর অপরাধ তিনি ছেলেদের 'অবান্তর প্রশ্ন' করতে শেখাচ্ছেন। এ ধরনের অভিযোগ সক্রেটিসের বিরুদ্ধেও উঠেছিলো। সেই যে এথেন্সের যুবকদের প্রথাবিরোধী চিন্তায় প্রভাবিত করে মাথা খাওয়ার অভিযোগ। পরিণতিতে সক্রেটিস তুলে নিয়েছিলেন হেমলকের পাত্র। ডিরোজিওর পরিণতিও অনেকটা সেরকমই। ১৮৩১ সালে হিন্দু কলেজ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভার পরে ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। তিনি পদত্যাগ করলেন। কলেজ কমিটির সদস্য ডা. এইচ উইলসনকে তিনি চিঠিতে লিখলেন :

'...তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্পর্কে মুক্তমন নিয়ে আলোচনা যদি অপরাধ হয় তবে নিজেকে অপরাধী হিসেবে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই; কিন্তু একথা স্বীকার করতে আমি ভীত অথবা লজ্জিত নই যে দার্শনিকদের এই বিষয়ক সন্দেহের সাথে আমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, এবং তা সমাধানের কথাও বলেছি।...
এই শিক্ষার ফলে ছাত্রদের ধর্মবিষয়ক গোঁড়ামির মূল যদি নড়ে থাকে তবে আমি কি অপরাধী?... ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা করলে নাস্তিক ও নরাধম আখ্যা পেতে হয়, একথা আমি জানি।'

ডিরোজিও যে কেবল দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ-বী ছিলেন তা নয়, তার রাজনৈতিক দর্শনও ছিল প্রগতিশীল। ১৮২৭ সালে ডিরোজিও দাসত্বের বিরুদ্ধে মুক্তির জয়গান গেয়ে 'ক্রীতদাসের মুক্তি' রচনা করেন। জমিদারদের সঙ্গে কিংবা জমিদার সভার সঙ্গে ডিরোজিও পারতপক্ষে কোন সম্পর্ক রাখতেন না, বরং জমিদারদের নানা রকম শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতেন। নীলচাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সোচ্চার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করে তিনি বলেন :

'Whatever tendency the permanent settlement of Lord Cornwallis might have to spirited and large improvement of the country, it is certain, that but a small part of his golden prospects has yet been realized. Wealth and but a small part of his golden prospects has yet been realized. Wealth and happiness were the sum of those prospects, but little of these is visible anywhere.'

ইংরেজরা উপনিবেশ স্থাপন করে 'জংলি ভারতবাসী'কে একেবারে উদ্ধার করে দিয়েছেন বলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আর তাদের মোসায়েবের দল যেখানে নগ্নভাবে উপনিবেশবাদের সাফাই গেয়েছেন, সেখানে ডিরোজিও শুনিয়েছেন অন্যকথা, অন্যগান। তিনি 'ক্যালকাটা মানথলি জার্নালে' লেখেন :

'ইংরেজরা ভারতবর্ষ জয় করার আগে এদেশ বর্বরতার স্তরে ছিল, এ কথা মনে করবার অধিকার ইংরেজদের কে দিয়েছে? ভারত ছিল একটি শিল্পসমৃদ্ধ, উন্নত ও সভ্য দেশ এবং আমেরিকার দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, ইংরেজদের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলে, তবেই ভারতবাসীর দুর্গতি মোচন সম্ভব।'

কলেজ থেকে পদত্যাগের বছরেই ডিরোজিওর মাত্র ২২ বছর বয়সে অকাল প্রয়াণ ঘটে। শ্রীপল-ব সেনগুপ্ত লিখেছেন 'দৈত্যাকার মিথ্যার তাণ্ডব নৃত্যের দাপটে একজন

তরুণ শিক্ষকের জীবন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।' তার পরও প্রায় এক যুগ ধরে তার শিষ্যদের মধ্যে ডিরোজিওর প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিলো।

সমাজ বদলের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর কিংবা ইয়ং বেঙ্গলদের যথেষ্ট অবদান থাকলেও সে সময়টাকে ইউরোপীয় রেঁনেসার আদলে সত্যই 'বাঙলার রেঁনেসা' বলা যায় কি না এ প্রশ্ন থেকেই যায়। ইউরোপের রেঁনেসা ছিল সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আর্থ সামাজিক ও সমাজ সাংস্কৃতিক পরিবেশ পাল্টানোর আন্দোলন। এই আন্দোলন শুধু শহরে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিলো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। এ ব্যাপারটা কিন্তু বাঙলার রেঁনেসার ক্ষেত্রে সেভাবে প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে 'সমাজ পরিবর্তনের' সুফল ঘরে তুলেছিলো কেবল বঙ্গীয় জমিদার সম্প্রদায়, শহরের বণিক সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। বাংলার রেঁনেসা আন্দোলনের প্রাণপুরুষদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজদের সহযোগী অথবা ইংরেজ সহযোগীদের সন্তান। রেঁনেসার নায়কদের এই শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে তাদের আন্দোলন ব্যাপক গণজাগরণে রূপ নিতে পারেনি। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ চাকরি বা ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকলেও অর্থনৈতিকভাবে জমিদারির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ব্রিটিশদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়ায় রেঁনেসার পথিকৃতেরা ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও লুণ্ঠনকে দেখতে পাননি (এদের মধ্যে ডিরোজিওই ছিলেন ব্যতিক্রম)। বরং ব্রিটিশদের সংস্পর্শে এসে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। রামমোহন তো খোলাখুলি বলেছেন : 'ভারতবাসীর পরম সৌভাগ্য যে ভগবৎকৃপায় তাহারা ইংরেজদের রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে।' যে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, সেই নীলকরদের সাফাই গেয়েছিলেন রামমোহন। তার মতে, 'নীলকর সাহেবেরা এ দেশে অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণই করেছেন বেশি।' লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে লংঘন করা উচিত নয়।' বঙ্কিমচন্দ্রও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাফাই গেয়ে বলেছেন, এটি বন্ধ করলে 'ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে।' তিনি জমিদার দর্পণ নাটকের প্রচার বন্ধ করতে বলেছিলেন, 'নীল দর্পণ' নাটকের তো সরাসরি বিরোধিতাই করেছেন। রামমোহন ব্যক্তিগত জীবন কাটিয়েছেন আর দশটি জমিদারদের মতই ভোগ-বিলাসে। সোফিয়া ডবসন কলেটের 'Life and letters of Raja Rammohun Roy' থেকে জানা যায় এমনকি রামমোহন ব্যক্তিজীবনে জাতপাত মানতেন, অহিন্দু বা অন্য জাতের সাথে কখনও একসাথে আহার করতেন না। হিন্দুদের প্রচলিত সামাজিক আচরণগুলো পরিবর্তনের বিপক্ষে ছিলেন রামমোহন। তার কাঁধের উপবীত তিনি মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত বহাল রেখেছিলেন। আর সাম্রাজ্যবাদ তোষণ তো ছিলই। আবদুল

মতিন খান 'ব্রাহ্মধর্ম : প্রকরণ ও প্রেক্ষাপট প্রবন্ধে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে রামমোহনের যে 'ফতোয়া'গুলো লিপিবদ্ধ করেছেন তা নিম্নরূপ :

১. ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিভাকত্ব মেনে নাও। তার মত হবার চেষ্টা কর।
২. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ঈশ্বরের অফুরন্ত করুণার ধারা।
৩. ইংরেজি ও ইংরেজিয়ানা ভাল করে রপ্ত কর। ইংরেজদের অধীনে একটি চাকরি লাভের আপ্রাণ চেষ্টা কর।
৪. স্বাধীন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী হবার কখনো চেষ্টা করো না। ইংরেজদের দালালি করলেই অভীষ্ঠ সিদ্ধ হবে।
৫. ইংরেজকে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসে উৎসাহ যোগাও। তাহলে ব্রিটিশদের উন্নত ও উদার সাহচর্যে থেকে দেশকে স্বর্গ বানাতে পারবে।
৬. সভা সমিতি গড়ে তোল এবং সেগুলোর মাধ্যমে যখন তখন ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য দেখাও। মনে রেখ ইংরেজদের খুশিতে তোমার মঙ্গল।
৭. সংবাদপত্র প্রকাশ কর, তাতে ব্রিটিশ শাসনের সুফল তুল ধর।
৮. ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে ও বিদ্বেষভাব পোষণ করে তাদের কঠোর ভাষায় নিন্দা কর। তাদের নির্মূলে ইংরেজদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কর।
৯. ইংলন্ড কাঁচামাল রপ্তানি ও সেখান থেকে তৈরি সামগ্রী আমদানির অবাধ বাণিজ্য সমর্থন কর। কারণ তাতে ভারতের সার্বিক কল্যাণ নিহিত।
১০. রাজনৈতিক সুবিধাধি লাভ ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ধর্মাচরণে পরিবর্তন সাধন কর। এটা করলেই ইংরেজদের অনুমোদন পাবে।

বিদ্যাসাগর ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে নির্মোহ হলেও সামাজিক বৈষম্য ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারেননি। তিনি নিজের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে কোন মুসলমান ছাত্রকে ভর্তি করাতে পারেননি। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি কোন আন্দোলন পরিচালনা করেননি। তিনি শিক্ষাকে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে ছিলেন। তিনি 'Downward filtration theory' নামের আদ্ভুতুড়ে তত্ত্বের উপর আস্থা রেখে ভাবতেন, সমাজের উপরের স্তরে বিদ্যা ঢেলে দিলে তা এমনিতেই চুইয়ে নীচের স্তরে নেমে আসবে।

বাংলার রেঁনেসার কর্ণধারদের সমস্যা ছিল এই যে, তারা প্রগতিকে ব্রিটিশ প্রগতির সমার্থক হিসেবে গণ্য করেছেন এবং ব্রিটিশরা যে আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে তা বলতে বরাবরই সজ্ঞানে এড়িয়ে গেছেন। একটি পরাধীন দেশে ঔপনিবেশিক প্রভুর বিরোধিতা করাটাই কোন আন্দোলনের পক্ষে বা ব্যক্তির পক্ষে প্রগতিশীল হিসেবে চিহ্নিত করার মাপকাঠি হওয়া উচিত। ঔপনিবেশিক প্রভুর দালালি করাটা কখনই প্রগতিশীল মুক্তমনাদের কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

বাঙালি রেঁনেসার আরেকটি বড় সীমাবদ্ধতা ছিল, রেঁনেসার সাথে সম্পর্কিত বেশিরভাগ সমাজ সংস্কারই তদানীন্তন মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ছিল অর্থহীন। ইসলামে সতীদাহ কখনও ছিল না। মুসলিম বিধবারা সব সময়ই বিয়ে করতে পারে– ধর্মীয় কোন বাধা কখন ছিল না। ক'নের পূর্ণ সম্মতিতে বিয়ে করতে হয় বলে এতে একটা চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপার থাকে। অতএব মুসলিম সমাজে বাল্যবিবাহ থাকতে পারে না (বাস্তবে যেটুকু আছে তা বিভিন্ন আর্থ সামাজিক কারণে।) মুসলমানরা সব সময়ই গো-মাংস খেতেন, ফলে ইয়ং বেঙ্গলদের এত ঘটা করে গো-মাংস খাওয়ার মধ্যেও তারা কোন অভিনবত্ব খুঁজে পাননি। অর্থাৎ যে কয়টি বিষয়কে ঘিরে বাংলায় রেঁনেসাস বা সমাজ সংস্কারের ঝোঁক দেখা গেছে, তার প্রায় সবক'টি সংস্কারেরই উর্ধ্বে ছিল বাংলার মুসলিম সমাজ। কিন্তু তাতে করে কি বাংলার মুসলিম সমাজের কোন অগ্রগতি ঘটেছে? শোষণমুক্তি ঘটেছে? না ঘটেনি। বাংলার মুসলিমদের সংখ্যাগুরু অংশ বরাবরই ছিলেন হিন্দু সংখ্যাগুরু অংশের চেয়ে পিছিয়ে পড়া, অনেক অনেক বেশি শোষিত।

৩

১৯২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আত্মপ্রকাশ করে 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী আনোয়ারুল কাদির, কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবদুল কাদির, আবুল ফজল প্রমুখ তরুণ লেখকেরা ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজকে ঘিরে যে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' গড়ে তুলেছিলেন, তা চিন্তার জগতে আলোড়ন তুলেছিল। নামে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' হলেও কেবল 'ইসলামী সাহিত্য' সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য ছিলো না। বরং মুসলিমদের পশ্চাৎপদতা ও কূপমণ্ডুককতাকে আঘাত করাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। তাঁদের লেখার মধ্যে দিয়ে মুক্ত চিন্তার যে স্ফুরণ ঘটেছিল তা সত্যই অভিনব। প্রচলিত ধর্মমতের সাথে তাদের লেখালেখি কথাবার্তার মিল না থাকায় তারা বারবারই গোঁড়াপন্থীদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। 'শিখা'র মাত্র পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু স্বল্পকালীন আত্মপ্রকাশের মধ্যে দিয়েই 'শিখা' নামটি অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই পত্রিকাটি হয়ে উঠেছিল পূর্ববাংলার শাস্ত্র, প্রথা, আনুগত্য আর অন্ধকার ভেদ করা এক উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা, যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল চিন্তার নবজাগরণ। 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'– এ ছিলো শিখার স্লোগান। মোতাজিলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ আর ডিরোজিও-রামমোহনের উদারনৈতিক চিন্তা দিয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন মুসলিম সাহিত্যসমাজের

লেখকেরা। শিখার লেখকেরা চিন্তা চেতনায় কত অগ্রসর ছিলেন, তা দু'একটি নমুনা উলে-খ করলেই বোঝা যাবে। আমি আবুল হুসেনের 'মুসলিম কালচার ও উহার দার্শনিক ভিত্তি' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> 'কাজের পেছনে চিন্তা চাই। ... চিন্তাই Philosophy. Religion (ধর্ম) বলছে : 'চোখ বুজে মেনে চল'। Philosophy (দর্শন) বলছে 'চোখ খুলে চেয়ে দেখ।' একটার বাহন হল ভক্তি, অন্যটার বাহন হল জ্ঞান।'

কাজী আবদুল ওদুদের এমনি একটি লেখা থেকে উদাহরণ টানা যাক :

> 'বিজ্ঞানই হচ্ছে চিন্তার পরশমনি; এর অভাবে ব্রহ্মবিদ্যাও যাদু-বিদ্যায় পরিণত হতে পারে। একালে ধর্ম বলতে জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব সাধনই মুখ্যভাবে বুঝতে হবে-ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের দিক তার তুলনায় গৌণ।'

এ ধরনের অসংখ্য উদ্ধৃতি হাজির করে দেখানো যায় যে, সে সময়কার মুসলিম সাহিত্য সমাজের লেখকরা যথেষ্ট পরিমাণেই প্রথাবিরোধী, শাস্ত্রবিরোধী ও যুক্তিবাদী মননের পরিচয় দিয়েছেন। আজ থেকে সাত-আট দশক আগেকার পরিস্থিতি বিবেচনা করলে, লেখকদের সাহসিকতার নমুনা দেখে সত্যই অবাক হতে হয়। আজকের দিনেও কি অমন সাহসিকতার সাথে বাংলাদেশে কিছু বলা সম্ভব? একবার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম সাহিত্য সমাজের একটি বার্ষিক সভায় যোগ দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন:

> 'বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়েছে। এতদিন মনে করতাম আমি একাই কাফের, কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলুম যে, মৌঃ আনোয়ারুল কাদীর-প্রমুখ কতকগুলি গুণী ব্যক্তি দেখছি আস্ত কাফের। আমার দল বড় হয়েছে এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আমি চাই না।'

স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত স্বঘোষিত কাফেরদের 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন নির্বিঘ্ন ছিল না। এতো স্বাভাবিকই; ইতিহাস খুঁড়লে দেখা যায়, যখনই সমাজে একদল প্রথাবিরোধী মানুষ সাহসিকতার সাথে সত্য উচ্চারণ করেছে, শাসক শ্রেণীর তল্পিবাহক আর ধর্মান্ধরা তাদের উপর হা-রে-রে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মুসলিম সাহিত্য সমাজের ক্ষেত্রেও তাই হল। কাজী আবদুল ওদুদের 'সম্মোহিত মুসলমান' আর আবুল হুসেনের 'নিষেধের বিড়ম্বনা' প্রবন্ধ দু'টি প্রকাশিত হলে মুসলিম সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিখার লেখকদের শক্তিশালী লেখনী থামানোর জন্য নানা ধরনের ভয় ভীতি আর পেছনে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। ১৯২৯ সালের ৮ ডিসেম্বর আহসান মঞ্জিলে 'ইসলামিয়া আঞ্জুমান' অফিসে এক বিচার সভার আয়োজন করে আবুল হুসেনকে এক স্বীকারোক্তিপত্র লিখতে বাধ্য করা হয়, যাতে

বলা হয়- 'ঐ প্রবন্ধের ভাষা দ্বারা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মনে যে আঘাত দিয়াছি সে জন্য আমি অপরাধী।' আধুনিক যুগের ইনকুইজিশনের বিচার!

ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের কাছে মুক্তমনা আবুল হুসেনের এই অসহায় আত্মসমর্পণ কি গ্যালিলিওর কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় না, যিনি চার্চের চাপে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁর নিজের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ভুল, আসলে সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে! গ্যালিলিওর মতই আত্মগ-ানিতে ভোগা আবুল হুসেন এ ধরনের স্বীকারোক্তি দিয়ে এতই ব্যথিত হলেন যে, সাহিত্য সমাজের সম্পাদকের পদ তো বটেই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় পাড়ি জমালেন।

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) ছিলেন এ দেশে নারী জাগরণের পথিকৃৎ। রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল এক মুসলিম পরিবারে জন্ম। ১৯০২ সাল থেকে মূলত রোকেয়ার সাহিত্যচর্চা শুরু। বিভিন্ন প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি কখনো সরাসরি, কখনোবা ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে সমাজের গোপন ক্ষতগুলোকে উন্মোচন করেছেন। তৎকালীন সময়ে বেগম রোকেয়া সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে যে মুক্তচিন্তা ও মননশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সত্যই অভাবনীয়। রোকেয়া 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধে বলেন :

> 'যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। ... আমরা প্রথমত যাহা মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি।... আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।'

রোকেয়ার লেখা আমাদের মনে করিয়ে দেয় পাশ্চাত্যের এলিজাবেথ স্ট্যান্টনকে যিনি পাঁজরের হার থেকে নারী জন্মের উপাখ্যানকে স্রেফ রূপকথা বলে ঘোষণা করে অবশেষে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন পুরো বাইবেলটিকেই। কারণ পুরো বাইবেলটিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে ইভের পাপের উপর। স্ট্যান্টন এবং রোকেয়া দু'জনের বক্তব্যেই প্রথাবাদীরা চিৎকার করে ওঠে যার যার মত। রক্ষণশীলদের উন্মত্ততায় রোকেয়া শেষ পর্যন্ত ধর্মবিদ্বেষী 'আপত্তিকর অংশ'গুলো (পাঁচটি অনুচ্ছেদ) বাদ দিতে বাধ্য হন। ওই বাদ দেয়া পাঁচটি অনুচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে রোকেয়ার যুক্তিবাদী মুক্তমন দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। ড. হুমায়ুন আজাদের মতে, ওই আপত্তিকর নিষিদ্ধ অংশটুকুই রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ রচনা।

রোকেয়া ধর্মকে অস্বীকার করতে পারেননি। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো আপোষ করেছেন। অনেক সময় অপ্রিয় সত্য বলে ফেলেছেন, কিন্তু তাকে পশ্চাদপসারণও

করতে হয়েছে। রোকেয়া পর্দা প্রথার সরাসরি বিরোধিতা করেননি, বরং প্রকারান্তরে সমর্থনই করেছেন :

> 'প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠনসহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈলবিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে। বোরকা পরিয়া চলাফেরায় কোন অসুবিধা হয় না।'

যে যুগে নারীর ঘরের বাইরে আসাটাই ছিল কঠিন, সে যুগে বোরকায় আবৃত করে হলেও অন্তত বাইরে বের করে আনাটা জরুরি মনে করেছিলেন। রোকেয়া চাইছিলেন নারী বোরকা পরে হলেও বাইরে আসুক, সামাজিক কাজকর্মে অংশ নিক, শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হোক, তাহলে হয়ত অপ্রয়োজনীয় পর্দার বাহুল্য এমনিতেই ঘুঁচে যাবে। মুসলিম সাহিত্য সমাজের বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন, আর বেগম রোকেয়ার নারীবাদেরই সার্থক উত্তরসূরী তসলিমা নাসরিন, আহমদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদের মতো মুক্তমনারা। তারা তিনজনই স্বঘোষিত নিরীশ্বরবাদী। তিন জনের কথা একসাথে বলা হলেও চিন্তা চেতনা আর কাজে তিনজনই ভিন্নধর্মী, কিন্তু আবার স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এ তিনজনই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন নিজেদের মত করে। একজনকে মৌলবাদীদের আক্রোশে দেশত্যাগ করতে হয়েছে, আরেকজন 'মুরতাদ' উপাধিবরণ করে নিয়েই মারা গেছেন, আর শেষোক্তজন তো সরাসরি ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন মৌলবাদীদের চাপাতির আঘাতে।

যে মুক্তবুদ্ধির চর্চা আর প্রগতিশীলতাকে এতদিন কেবল 'শিক্ষিত এলিট শ্রেণীর' কর্মকাণ্ড বলে মনে করা হত, সে মিথটির গালে সজোরে আঘাত করেছেন এক গ্রাম্য কৃষক- আরজ আলী মাতুব্বর। যে মানুষটির দু'হাতে কড়া পড়েছিল লাঙ্গলের হাল ধরতে ধরতে, যার সারা দেহে ছিল পলিমাটির সোঁদো গন্ধ, কে জানত তিনি একদিন স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের কর্ণধারদের অহমিকার ফানুস ফুটো করে দেবেন, হয়ে উঠবেন সারা বাংলার সত্য সন্ধানীদের আরাধ্য? আরজ আলীর দর্শনের ভিত্তি রামমোহন, ডিরোজিও কিংবা মুসলিম সাহিত্য সমাজের সদস্যদের মত উপর তলা থেকে নেমে আসেনি, বরং তা উঠে এসেছিল লামচরি গ্রামের মত নীচু (আক্ষরিক অর্থেই) জায়গা থেকে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা বিজ্ঞানমনস্কতা যাদের কাছে কেবল 'প্রগতিশীলতার বিলাস', সেই সব এলিট শ্রেণীর মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারীদের সাথে আরজ আলী মাতুব্বরের পার্থক্যটি অতি স্পষ্ট। গ্রামীণ মেহনতি কৃষক আরজ আলীর মুক্তবুদ্ধিচর্চা নাগরিক মধ্যবিত্তদের মত কেবল মানসিক ব্যায়াম ছিল না। বুদ্ধিবিলাসের আত্মরতিতে মগ্ন থেকে 'আঁতেল' সাজার মানসিকতাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি। সামাজিক দায়িত্ববোধই তাকে মুক্তবুদ্ধি চর্চায় প্ররোচিত করেছে। তার মা মারা গিয়েছিল। মার শেষ স্মৃতিচিহ্ন

ধরে রাখার চেষ্টায় এক ক্যামেরাম্যান ডেকে ছবি তুলেছিলেন তিনি মায়ের মৃতদেহের। এ 'নাফরমানির' অপরাধে গ্রাম্য মোল-ারা আরজ আলীর মায়ের জানাজা পড়েননি। আরজ আলীর 'জ্ঞানচক্ষু' খুলে গেল। তিনি নামলেন সমাজ ও মনের কোণে লুকিয়ে থাকা অন্ধবিশ্বাস, সঙ্কীর্ণতা আর কুসংস্কার দূর করতে। প্রশ্নের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন প্রথাগত সমাজকে। হাত পা ছুঁড়ে অনর্থক চিৎকার করেননি, বরং শান্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে গেছেন একের পর এক। অনেকটা সক্রেটিসের (৪৬৩-৩৯৯ খ্রীঃ পূঃ) মতই। সক্রেটিসের সাথে আরো অনেকদিকেই তার মিল ছিল। সক্রেটিস নিজেও ছিলেন শ্রমজীবী। অট্টালিকা ও ভাস্কর্যে ব্যবহারের জন্য মার্বেল পাথর কাটতেন। শক্ত পেশীতে টান পড়ত। টান পড়ত আরজ আলীর পেশীতেও– দিনের বেলা শক্ত হাতে লাঙ্গল চালিয়ে। তারপরও রাত জেগে করতেন জ্ঞান সাধনা। স্ত্রী অনুযোগ করেন 'দিনে এত খাটেন, আবার রাত জেগে পড়াশুনা করেন। কষ্ট হয় না?' আরজ আলী হাসতেন, 'না কষ্ট হবে কেন!' চাষাবাদের অর্থ জমিয়ে তৈরি করলেন পাঠাগার। দশ বছরের চেষ্টায় সংগ্রহ করলেন ৯৬৬ খানা বই। কিন্তু প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় পুরোটাই হারালেন। আবার আঠারো বছরের সাধনায় আস্তে আস্তে সংগ্রহ করলেন ৪০০টি বই। কিন্তু আবারো ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সবকিছু হারালেন। আরজ আলী হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন, সন্তান হারানোর ব্যথায় শোকে পাথর হলেন যেন। কিন্তু তারপরও জ্ঞান সাধনা আর লাইব্রেরি গড়বার প্রচেষ্টায় কখনই বিরত হননি।

আরজ আলী মাতুব্বর বাংলাদেশে আধুনিক যুক্তিবাদী দর্শনের পথিকৃৎ। তিনি সত্যের সন্ধান বইটিরও আদি নাম দিয়েছিলেন– 'যুক্তিবাদ'। কোন সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধ না ধরে পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিবিচারের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়ার আরোহী (Inductive) পদ্ধতিকেই তিনি সঠিক মনে করেছেন। আরজ আলীর কাছে তাই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস কিংবা সংস্কারের কোন কিছুই সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকেনি। তিনি আত্মা, স্বর্গ-নরক, ভাগ্যলিপি, ফেরেস্তা, গোর আজাব, পাথর চুম্বন, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি অসংখ্য ধারণাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন। সহজ সরল প্রশ্ন করেই তিনি আঘাত করেছেন অন্ধবিশ্বাসের অচলায়তনে। আরজ আলী নিজেই বলেছেন :

'সত্যের সন্ধান দিয়ে আমি কুসংস্কারের ডালপালা ছেঁটে দিয়েছি। আর সৃষ্টিরহস্য দিয়ে কুসংস্কারের মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলেছি।'

প্রকৃতপক্ষে আরজ আলী যা পেরেছেন, এদেশের অনেক বড় বড় ডিগ্রীধারী দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীরাও তা পারেননি। সেইসব বুদ্ধিজীবীদের একাংশ আবার আরজ আলীর রচনা নিয়েই সন্দিহান ছিলেন– এগুলো আদপেই এক 'গ্রাম্য কৃষকের' রচিত কিনা। ঔপন্যাসিক হাসনাত আবদুল হাই তাই সঠিকভাবেই

বলেছেন :

'আরজ আলী মাতুব্বর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের অহঙ্কার ও আত্মতৃপ্তিকে শক্তহাতে নাড়িয়ে দিয়েছেন।'

৪

আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০০১ সালে প্রশ্ন আর তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা এবং ধর্মান্ধতা আর মৌলবাদের বিরুদ্ধে মুক্তমনার প্রাথমিক লড়াই সূচিত হলেও পাশাপাশি সারা পৃথিবী জুড়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত ফ্রিথিঙ্কারদের সহযোগী মানবতাবাদী সংগঠন হিসেবে কাজ করার সচেতন প্রয়াস নেয়া হয়। আসলে মানবিক দিকটি শুরু থেকেই মুক্তমনা কখনও অগ্রাহ্য করেনি। আমরা খবর পাই পাকিস্তানে ইউনুস শায়িখ নামের এক চিকিৎসক ব্লাসফেমি আইনের শিকার হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর অপরাধ, তিনি শ্রেণীকক্ষে লেকচার দিতে গিয়ে নাকি ছাত্রদের বলেছেন মহানবী হযরত মুহম্মদ তার নবুওত প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত মুসলিম ছিলেন না। পাকিস্তানের মত ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোতে ধর্ম এবং ধর্মপ্রচারক সম্পর্কে সামান্য বিপরীত কথাবার্তা সহ্য করা হয় না। শাস্তি একটাই, মৃত্যুদণ্ড। ইউনুস শায়িখ বন্দি হলেন এবং যথারীতি কারাগারে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। মুক্তমনা এই ভাগ্যহত ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলো। আমরা পিটিশন আর প্রতিবাদলিপির বন্যায় পাকিস্তান সরকারের মেইলবক্স একেবারে ভর্তি করে ফেললাম। আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো আইএইচইইউ এবং র‍্যাশনালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল। আর অন্যদিকে ঢাকাতে ইউনুস শায়িখের মুক্তি এবং ব্লাসফেমি আইন বিলোপের দাবিতে 'সেভ ড. ইউনুস শায়িখ' ব্যানারে প-াকার্ড, পোস্টার হাতে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করলেন ড. অজয় রায়ের নেতৃত্বে অন্যান্য মুক্তমনা সদস্যরা। তারা সভা-সমিতি-সেমিনার করেছেন, রাস্তায় নেমেছেন আর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন পাক দূতাবাসের সামনে; স্মারকলিপি দিয়েছেন পাক প্রেসিডেন্টের কাছে। মুক্তমনার শুভানুধ্যায়ী এবং হোস্ট ড. অ্যালেন লেভিন চারিদিকে নেটওয়ার্ক তৈরি করে মানবতাবাদী সংগঠনগুলোকে উদ্বুদ্ধ ও এক ছাতার নিচে নিয়ে আসলেন। এমনিভাবে সারা বিশ্বব্যাপী মানবতাবাদীদের প্রবল চাপে পাকিস্তান সরকার এক সময় গোপনে ড. শায়িখকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, ড. শায়িখও সাথে সাথে দেশত্যাগ করলেন। ড. শায়িখ ক'দিন পরেই আমার সাথে যোগাযোগ করে মুক্তমনাকে তার পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন। এর পরপরই তিনি মুক্তমনায় যোগদান করেন এবং বেশ ক'বছর ধরেই মুক্তমনায় লিখছেন।

ড. শায়িখের প্রোজেক্টটি মুক্তমনার প্রথম দিককার অন্যতম সফল প্রজেক্টগুলোর একটি। এটি সফল হওয়ায় আমাদের উৎসাহ অনেক বেড়ে যায়।

আমরা ইতিমধ্যেই বহু জায়গায় পিটিশন করেছি। আমিনা লাওয়াল নামের এক মহিলাকে 'শারিয়ার রজম' থেকে বাঁচানোর জন্য মুক্তমনা উদ্যোগী হয়, এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়। তারপর থেকে মুক্তমনা আন্তর্জাতিকভাবে নানা ধরনের পিটিশন করেছে, আবেদন করেছে, কখনও প্যালেস্টাইনে নির্বিচারে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে, কখনও গুজরাটে গণহত্যার বিচারের দাবিতে, কখনও ভারতে নদী সংযোগ প্রকল্পের বিরোধিতা করে, কখনও তথাকথিত 'বাংলাভাই'কে গ্রেফতারের দাবিতে, কখনও বা কানসাটে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে।

বিগত নির্বাচনের পর জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে যখন নির্বিচারে সংখ্যালঘুদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার নিপীড়ন শুরু হল, তখন এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে সচেতনতা তৈরি করতে শুরু করেছিল এই মুক্তমনাই। আসলে শুধুমাত্র 'অত্যাচার' আর 'নিপীড়ন' বললে বোধ হয় ভয়াবহতার মাত্রাটা বোঝা যাবে না। নির্বাচনের পরবর্তী কয়েক মাসে ঠিক কি হয়েছিল, তা বোঝা যাবে গার্ডিয়ানে প্রকাশিত জন ভাইদালের 'Rape and torture empties the villages' (July 21, 2003) একটি প্রবন্ধ পড়ে নিলেই। প্রবন্ধটিতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে পূর্ণিমা রানীর মত হতভাগ্যদের উপর সে সময় কিরকম ভাবে গণধর্ষণের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিলো। শুধুমাত্র পূর্ণিমা রানীই একমাত্র শিকার নন, ভাইদালের মতে নির্বাচনোত্তর তিন মাসে ডজনকে ডজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, অন্তত এক হাজার মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে আর কয়েক হাজার লোকের জমিজমা কেড়ে নেয়া হয়েছে। এ ধরনের রিপোর্ট শুধু গার্ডিয়ানে বা হিন্দুস্থান টাইমসে নয়, পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছিল ডেইলি স্টার, প্রথমআলো, সংবাদ, জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজসহ দেশের সকল শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলোতে। এমনকি মৌলবাদী আর সরকার সমর্থিত পত্রিকা ইনকিলাব আর সংগ্রামও একেবারে বাদ যায়নি। মুক্তমনার ঢাকা নিবাসী সদস্যরা 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটির' ব্যানারে দেশের বিভিন্ন সংখ্যালঘু উপদ্রুত অঞ্চলে ছুটে গিয়েছেন– তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। নাগরিক অধিকার কমিটির উদ্যোগে গঠিত হয় অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে 'গণতদন্ত কমিশন'– যা প্রকাশ করে 'সংখ্যালঘু নির্যাতন' শিরোনামে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত সংখ্যালঘুদের ওপর লোমহর্ষক নির্যাতন-অত্যাচারের প্রতিবেদন (২০০২, ডিসেম্বর) (http://www.mukto-mona.com/human-rights/report.htm) তখন থেকে মুক্তমনায় উপদেষ্টা সদস্য ড. অজয় রায় সংখ্যালঘু উপদ্রুত অঞ্চলগুলো পরিদর্শন করছেন আর তুলে আনছেন তাদের অসহায় নির্যাতনের কাহিনী– প্রকাশ করে চলেছেন 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। তবে পর্যবেক্ষণই শুধু উদ্দেশ্য ছিলো না, সেই সাথে কর্মসূচি নেয়া হয়েছিলো যারা সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের শিকার হয়েছে তাদের আর্থিক ও

মানসিকভাবে সহায়তা প্রদান করা। আমরা দৃষ্টিপাত নামের একটি সংগঠনের সাথে মিলে ভোলা জেলায় অন্নদা প্রসাদ গ্রামের শত পরিবারকে পুনর্বাসনে সহায়তা করতে সম্মত হই। সরকার পক্ষ থেকে আমাদের কাজকর্মকে ভাল চোখে দেখা হল না। বক্তব্য দেয়া হল এই বলে যে দেশের বাইরে এক 'বাংলাদেশ বিরোধী কুচক্রী মহল' দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়ে বেশকিছু জ্বালাময়ী ভাষণও দিলেন। রটিয়ে দেয়া হল যারা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে তারা হয় ভারতের 'র' এর এজেন্ট, নয়ত ইহুদীদের 'মোসাদ'র আর না হয় আমেরিকার সিআইএর! আমি সে সময় মুক্তমনায় 'যুক্তির আলোয় দেশের ভাবমূর্তি এবং দেশপ্রেম' নামের একটি প্রবন্ধ লিখি, বাংলায়। সে প্রবন্ধে আমি তুলে ধরেছিলাম দেশপ্রেমের যৌক্তিক সংজ্ঞা। বলেছিলাম, দেশ মানে দেশের মাটি নয়, দেশপ্রেম মানে কখনই দেশের মাটির প্রতি বা প্রাণহীন নদীনালা আর পাহাড়-পর্বতের জন্য ভালবাসা হতে পারে না। দেশপ্রেম মানে হওয়া উচিত দেশের মানুষের প্রতি প্রেম; লাঞ্ছিত, বঞ্চিত অবহেলিত গণমানুষের প্রতি ভালবাসা। রাষ্ট্রের একটি প্রধানতম উপাদান হল জনসমষ্টি। এই জনসমষ্টিকে বাদ দিয়ে শুধু কতকগুলো প্রাণহীন নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত আর মাটির প্রতি ভালবাসা সৃষ্টিকে আর যাই বলা হোক, 'দেশপ্রেম' বলে অভিহিত করার কোন যৌক্তিকতা নেই। উদ্ধৃতি হাজির করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের, আইনস্টাইনের আর হাল আমলে যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের। দেখিয়েছিলাম প্যাট্রিওটিজমও শেষ পর্যন্ত কিন্তু একটা ডগমাই। শুধু আমি নই, মুক্তমনার অন্যান্য সদস্যরাও এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি করেছেন। দেশপ্রেম নিয়ে মুক্তমনাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সে সময় সচেতন মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিলেন, কোন সরকারের অন্ধ আনুগত্যই দেশপ্রেম নয়। দেশে অরাজকতা, হত্যা নিপীড়নের কাহিনী যে কোন মূল্যে কার্পেটের নিচে পুরে রেখে দেশকে আকাশে তুলে রাখার নামই দেশপ্রেম নয়, বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের বিবেক জাগিয়ে তোলাটাও দেশপ্রেমের অংশ। সংকীর্ণ দেশপ্রেমের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে এসে যুক্তিবাদী দৃষ্টি দিয়ে 'দেশের ভাবমূর্তি' দেখবার এই মানসিকতার উত্তরণ একদিনে হয়নি। এর কৃতিত্ব মুক্তমনার দাবি করতেই পারে।

মুক্তমনার সবচাইতে বড় অবদান সম্ভবত ইন্টারনেটে (এবং পরবর্তীতে প্রিন্টেড মিডিয়ায়) বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার প্রসার। আমার 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' সে উদ্দেশ্যেই লেখা। বন্যা আহমেদের লেখা সাম্প্রতিক বিবর্তনের সিরিজটির উদ্দেশ্যও একই। প্রায় একই উদ্দেশ্য নিয়ে অবিরত লিখছেন অপার্থিব, অনন্ত, ফরিদ আহমেদ, জাহেদ আহমেদ, জাফর উল-হ, অজয় রায়, বিপ-ব পাল এবং আরো অনেকেই। এই 'বিজ্ঞানমনস্কতা' ব্যাপারটি আমাদের কাছে সবসময়ই

ভিন্ন অর্থ বহন করে। 'বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার' বলতে আমরা এটি বোঝাই না যে গ্রামে গঞ্জে বিদ্যুৎ পৌঁছিয়ে দেয়া; কিংবা উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা। ওগুলোর প্রয়োজন আছে কিন্তু তা করার জন্য রাষ্ট্র এবং সরকারই আছেন। আমরা বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার বলতে বোঝাই কুসংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানমুখী সমাজ গড়ার আন্দোলন। আমার ঢাকা কলেজের প্রিয় শিক্ষক আবদুল-াহ আবু সাইদের ভাষায় আমাদের আন্দোলন হচ্ছে 'আলোকিত মানুষ' গড়ার আন্দোলন। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেই সে 'বিজ্ঞানমনস্ক' হয় না, হয় না আলোকিত মানুষ। তাই দেখা যায় এ যুগের অনেকেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেও বা বিজ্ঞানের কোন বিভাগকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেও মনে প্রাণে বিজ্ঞানী হতে পারেননি, পারেননি মন থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করতে। বাংলাদেশের এক বিখ্যাত 'ইসলামী পদার্থ বিজ্ঞানী' আছেন যিনি একবিংশ শতাব্দীতে এসেও শতাব্দী প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'আধুনিক বিজ্ঞানের' সন্ধান পান, মহানবীর মিরাজকে 'আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি' দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চান। ভারতের এক স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানী আবার বেদ আর গীতার মধ্যে 'বিগ-ব্যাং' আর 'টাইম-ডায়ালেশন' খুঁজে পান। এরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছেন ঠিকই, চাকরি ক্ষেত্রে সফলতাও হয়তো পেয়েছেন, কিন্তু মনের কোণে আবদ্ধ করে রেখেছেন সেই আজন্ম লালিত সংস্কারগুলোকে, আঁকড়ে ধরে রেখেছেন যুক্তিহীন ধর্মীয় ধ্যান ধারণা। এই 'বিজ্ঞানী' তকমাধারী কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোই বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে সবচেয়ে বড় বাধা। বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী 'বিজ্ঞানী' নামধারী মানুষগুলোর কুসংস্কারের সাথে যেমন আমরা পরিচিত হয়েছি, ঠিক তেমনি আমাদের দেশে আরজ আলী মাতুব্বর বা রঞ্জিত বাওয়ালীর মত স্বল্পশিক্ষিত, ডিগ্রীহীন, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী মনমানসিকতার নির্লোভ মানুষও আমরা দেখেছি। এরাই আমাদের শক্তি।

মুক্তমনাদের বিরুদ্ধে কারো একটি বড় অভিযোগ মুক্তমনারা দেশের মানুষের জন্য খুব বেশি কিছু করে না, যতটা না ঈশ্বর, আধ্যাত্মিকতার বিরোধিতা কিংবা ডারউইন ডে উদযাপনে ব্যয় করে। এ ধরনের অভিযোগ যারা করেন তারা ভুলে যান এ ক'বছরে মুক্তমনাদের সফল প্রোজেক্টগুলোর কথা। হ্যাঁ মুক্তমনা ঘটা করে ডারউইন ডে, হিউম্যানিস্ট ডে, র‍্যাশনালিস্ট ডে, আর্থ ডে দিবস ব্রুনো– ইত্যাদি পালন করেছে ঠিকই, কিন্তু যখন প্রয়োজন হয়েছে দেশের মানুষের প্রয়োজনে মুক্তমনা সচেতনভাবেই এগিয়ে এসেছে। অন্নদাপ্রসাদ গ্রামে সাহায্যের ব্যাপারটিই কেবল নয়, সাংবাদিক মানিক সাহার পরিবারকে সাহায্য করা, প্রয়াত ড. হুমায়ুন আজাদের পরিবারের অনুরোধে তার গ্রামের বাড়িতে লাইব্রেরি তৈরির জন্য 'আজাদ ফান্ড' গড়ে তোলা এগুলো সময় সুযোগ মত মুক্তমনারা করেছে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শাহরিয়ার কবির, সাংবাদিক বিভুরঞ্জন দাসসহ দেশের বরেণ্য কয়েকজন

'সেক্যুলার অ্যাক্টিভিস্ট' জীবনের জন্য লড়ছিলেন, তখন তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে মুক্তমনাই। ফোরামে চাঁদা তুলে তাদের সাহায্য করেছে মুক্তমনার সাধারণ সদস্যরা। এছাড়াও বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্নভাবে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করেছে সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের শিকার পুরঞ্জিত দাস, মনিকা বালা দাস, স্বাতী দাস, পূর্ণিমা শীলকে। পড়াশোনার করার জন্য সামান্য খরচ দিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রী অনীমা চক্রবর্তীকে। এই তো সেদিন রৌমারীর বয়োবৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য সেমিনারের আয়োজন করেছে শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের সাথে মিলে। তারও আগে রৌমারীতে একটি প্রাইমারী স্কুল পুনর্নির্মাণ করলেন মুক্তমনারা। এগুলো কি দেশের মানুষের জন্য করা নয়? তারপরও একটি বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যারা যুক্তিবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের চেতনামুক্তি আর সেই পথ ধরে শোষণ মুক্তির স্বপ্ন দেখেন তাদের কিন্তু একটা বিষয়ে সচেতন থাকতেই হবে। উপলক্ষ যেন লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে না যায়। কুসংস্কার মুক্তির লক্ষে পৌঁছুতে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম কেবল উপলক্ষ্যই হতে পারে, এ বিষয়ে অতি সচেতনতার প্রয়োজন। স্পষ্টই মনে রাখতে হবে এই সত্যটি- জনসেবা করে আর যাই করা যাক, সমাজ ব্যবস্থা পাল্টানো যায় না, সার্বিক শোষণমুক্তি ঘটতে পারে না। শোষণ মুক্তি ঘটতে পারে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের সচেতনাবোধ থেকে। সচেতনতাবোধ যেন তৈরি না হয় সে জন্য শোষিতের ক্ষোভ ভুলিয়ে রাখে শাসকশ্রেণী। গরিবের ক্ষোভ ভুলিয়ে রাখতে ধনীর অর্থে চলে 'দরিদ্র নারায়ণসেবা।' দরিদ্র-নারায়ণের সেবাই যাদের কেবল লক্ষ্য তারা আসলেই কখনই চায় না সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর হোক, কেননা দারিদ্র্য দূর নয়, বরং দারিদ্রকে পুঁজি করে জনগণের 'মগজ ধোলাই'ই তাদের অন্তিম লক্ষ্য। এ ধরনের সেবামূলক কাজে দু'একটি দরিদ্রের তাৎক্ষণিক লাভ হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জন্য পড়ে থাকে অনন্ত বঞ্চনাময় জীবন। অর্থনৈতিকভাবে দেশকে স্বাবলম্বী করার চাইতে মগজ ধোলাই করে জনচিত্ত জয় করার পদ্ধতিটি সফলভাবে কাজে লাগায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। সেজন্যই মাদার টেরেসা, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবা সংঘ, তবলীগ জামাত, প্রমুখ নানা সংগঠন নানা কৌশলে জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে নিজেদের জড়িত রেখেছে। গড়ে উঠেছে ইসলামী এনজিও। কৌশলে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ঠিকমত দান খয়রাত করলে, জাকাত দিলে দারিদ্র্য নাকি এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। কিন্তু ইতিহাস বলে অন্য কথা। এ ধরনের দান খয়রাত, জাকাত আর সমাজসেবার মাধ্যমে সমাজের শোষণ মুক্তি ঘটেছে এমন একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাসে নেই। হাজারটা রামকৃষ্ণ মিশন, সেবাসংঘ, তবলীগ জামাত, হাজারজন মাদার টেরেসা, হাজি মুহম্মদ মুহসিন বাংলাদেশের কিংবা ভারতের জনতার শোষণ মুক্তি ঘটাতে পারবে না। আমরা সমাজসেবার বিরুদ্ধে নই, কিন্তু 'উদ্দেশ্যমূলক' জনসেবার মাধ্যমে মগজ ধোলাই

করে মানুষকে অন্ধ রাখার অভিসন্ধির বিরুদ্ধে।

মুক্তমনাদের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ মুক্তবুদ্ধি, নাস্তিক্যবাদ, মানবতাবাদ এগুলোর চর্চা করে তারা গণবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। এর জবাবে প্রবীর ঘোষের মত বলা যায়, যে কোন অসুস্থ সমাজে সুস্থ সচেতন, যুক্তিবাদী মানুষ বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে গ্যালিরিও, প্যারাসেলস, ব্রুনো, বিদ্যাসাগরসহ বহু চিন্তাবিদের নাম করা যায় যারা প্রত্যেকেই ছিলেন সমাজে একাকী। একাকী ছিলেন আরজ আলী মাতুব্বর বা আহমদ শরীফও। কিন্তু এইসব বিদ্রোহী মানুষগুলো প্রথাগত স্থবিরতাকে চূর্ণ করতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, সে সময়কার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে। সেকালের বিচ্ছিন্ন বিশাল ব্যক্তিত্বদের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা ছিল না তৎকালীন মানব গোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের এবং মগজ বেচা বুদ্ধিজীবী তকমাধারী ফেউদের। আজ সেসব বিচ্ছিন্ন মানুষেরাই হয়ে উঠেছেন এক একজন মহামানব, শ্রদ্ধেয় আদর্শ ও প্রেরণার উৎস। যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ পচনধরা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সংস্কারমুক্ত করা, যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ শোষণের অবসানমুখী সংগ্রাম, যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে সুস্থ সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে আনা, সে বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই কাম্য। একটা সময় আমরা দেখেছি ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসানের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদের বিকাশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা একে একে দেখেছি ভারতীয় লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন, গ্রীসের আয়োনিয়ার বস্তুবাদী দর্শন, পশ্চিম এশিয়ার মুসলিমদের মোতাজিলা দর্শন, গ্রীসের আয়োনিয়ার বস্তুবাদী দর্শন, পশ্চিম এশিয়ার মুসলিমদের মোতাজিলা দর্শন, ইউরোপের দার্শনিকদের (বেকন, লক, হবস, হিউম প্রমুখ) ইহজাগতিক দর্শন, ফরাসী বিপ-ব, ইউরোপের রেঁনেসা এবং উনিশ শতকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিওদের কল্যাণে বাঙালিদের নবজাগরণ; আমরা সেই ঐতিহ্যের অনুসারী, জাতীয়ভাবে আমরা সহজিয়া, বাউলিয়ানার মত বিভিন্ন অজ্ঞেয় লোকজ মতবাদ, বিভিন্ন সমমনা ইহজাগতিক সংগঠন ও ব্যক্তির যুক্তিবাদী ভাবধারার উত্তরসুরী।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, কুপমণ্ডূকতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিনিষ্ঠ এক প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনগণের মধ্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি ভারতে প্রবীর ঘোষের নেতৃত্বে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' সেদেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। তার সুযোগ্য নেতৃত্বেই 'যুক্তিবাদী' চিন্তা আজ সেখানে ব্যক্তিগণ্ডি অতিক্রম করে আন্দোলনের রূপ পেয়েছে : আন্দোলনে আন্দোলিত হয়েছে লক্ষ কোটি মানুষ, আন্দোলিত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাট্য সংস্থা বিজ্ঞান ক্লাবসহ বহু সংগঠন; এরা অংশ নিয়েছে যুক্তিবাদী চিন্ত

ার বাতাবরণ সৃষ্টিতে। কুসংস্কার, ভাববাদ, অধ্যাত্মবাদ, নিয়তিবাদ ও অলৌকিকতা-মুক্ত এক স্পর্ধিত বাঙালি প্রজন্ম গড়ে তুলতে অবদান রেখে চলেছে 'মুক্তমনা'। প্রত্যাশা বেড়েছে অনেক। তৈরি হয়েছে নতুন নতুন প্রতিশ্রুতিশীল লেখক। আমাদের দেশে 'বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ', 'জনবিজ্ঞান আন্দোলন', 'মুক্ত চিন্তা চর্চা কেন্দ্র', 'বাংলাদেশ যুক্তিবাদী সমিতি' বিভিন্ন নামে সংগঠন গড়ে উঠেছে প্রায় একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে। এ মুক্তমনার কারণেই অনন্তের মত প্রতিশ্রুতিবান লেখকেরা দায়বদ্ধের দেনা পরিশোধ করতে পেরেছেন, গ্রামীণ মেহনতি মুক্তমনা রঞ্জিত বাওয়ালীকে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

- মফিজুর রহমান রুননু, যুক্তিবাদ- চেতনামুক্তির লড়াই। বাংলাদেশ যুক্তিবাদী সমিতি, ঢাকা (২০০১)।
- প্রবীর ঘোষ, অলৌকিক নয়, লৌকিক (১ম ও ৩য় পর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা।
- যতীন সরকার, মুক্তবুদ্ধিচর্চা ও বাঙালির লৌকিক ঐতিহ্য। আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক বক্তৃতা, ঢাকা, ১৪০৭ (২০০০)।
- শফিকুর রহমান, হিউম্যানিজম, প্রমিথিউস পাবলিশার্স, ঢাকা (১৯৮৯)
- শফিকুর রহমান, পার্থিব জগৎ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা (১৯৮৭)
- যুক্তিবাদীর চোখে ধর্ম, সম্পাদনা : প্রবীর ঘোষ, অগ্রণী বুক ক্লাব, কলিকাতা (১৯৯২)
- আরজ আলী মাতুব্বর, আরজ আলী রচনা সমগ্র-১। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা (২০০০)
- লোকায়াত দর্শন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলিকাতা (বাং ১৩৬৩)
- রাহুল সংস্কৃত্যায়ন, চেতনার দাসত্ব, অনুবাদ কমলেশ সেন, রবীন্দ্রগুপ্ত ও মলয় চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা (১৯৯৩)
- আবুল হুসেন, নির্বাচিত প্রবন্ধ, ঢাকা (২০০০)
- Mukto-mona : A Secular site for Bengali humanists & freethinkers (www.mukto-mona.com)

ইসলাম যেভাবে নিজের পথ থেকে সরে গেছে

পারভেজ আমির আলী হুডবয়
অনুবাদ : শামসুজ্জামান খান

ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা যাকে 'সন্ত্রাসের শতাব্দী' বলে আখ্যায়িত করতে পারেন তারা একটা রূপরেখা তৈরি করতে হলে আমাদেরকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী একগুঁয়েমী ও ইসলামিক ধর্মীয় মতান্ধতার মতো বিপজ্জনক উভয় সঙ্কটের গতিপথ নির্ধারণ করতে হবে। এই জটিল ঘটনাস্রোতের মধ্যে যত্নের সঙ্গে পথ করে আমাদের এগুতে হবে একটি যুক্তিশীল, গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী ও সেক্যুলার ভবিষ্যতের দিকে। তা না হলে জাহাজের দুর্ঘটনা ও ধ্বংস অনিবার্য।

প্রায় চার মাস হতে চলল* যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম কম্যুনিটির নেতৃবৃন্দ এবং প্রেসিডেন্ট বুশ পর্যন্ত রুটিন মাফিক জোরালো ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছেন যে 'ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম–১১ই সেপ্টেম্বর ধর্মান্ধরা তাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে।'

এই দুই দাবিই অসত্য।

প্রথমত খ্রিষ্ট, ইহুদি, হিন্দু বা যে কোন ধর্মের মতোই ইসলাম শান্তি সংক্রান্ত কোন বিষয় না। যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারও না। প্রত্যেক ধর্মের মূল কথাই হল এর নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং সত্য সম্পর্কে স্বকীয় ভাষাকে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার স্বর্গীয় অধিকার। মধ্যযুগে ক্রুসেড ও জিহাদ দুই-ই রক্তে ভিজে গেছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেসব খ্রিষ্টান মৌলবাদী রয়েছে তারা গর্ভপাত বিষয়ক ক্লিনিকে আক্রমণ চালাচ্ছে এবং ডাক্তারদের হত্যা করছে; মুসলিম মৌলবাদীরা তাদের ধর্মের নানা তরিকার মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে; ইহুদি দখলদার অভিবাসীরা একহাতে ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং কখনও অন্য হাতে

* প্রফেসর পারভেজ আমির আলী হুডবয় : পাকিস্তানের ইসলামাবাদস্থ কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের পারমাণবিক ও উচ্চ শক্তি পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। প্রবন্ধটি ২০০১ সালের শেষের দিকে ইংরেজিতে লেখা শিরোনাম : How Islam lost its way. yesterday achievements were golden; today, reason has been eclipsed.

ইসরাইলি সাবমেশিনগান উজিস (Uzis) তুলে ধরে জলপাই বাগান পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং প্যালেস্টাইনিদের তাদের পৈতৃকভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছে এবং ভারতে হিন্দুরা প্রাচীন মসজিদ ধ্বংস ও গীর্জা ভস্মীভূত করছে।

দ্বিতীয় দাবিটি সত্য থেকে আরো দূরবর্তী। যদি কিছুটা প্রতীকী অর্থে ধরে নিই যে ইসলাম সত্যিই ছিনতাই হয়ে গিয়েছে তাহলে সে ঘটনাতো মাত্র তিনমাস আগে ঘটেনি। সাতশ বছরের বেশ আগে ইসলাম এক গুরুতর আঘাতের মুখে পড়ে এবং তার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

মুসলমানদের বর্তমান অবস্থান কোথায়? লক্ষ্য করুন, আমি ইসলাম সম্পর্কে এ প্রশ্ন করছি না; কারণ ইসলাম একটা বিমূর্ত ব্যাপার। পাকিস্তানের অগ্রগণ্য সমাজকর্মী মওলানা আবদুস সাত্তার ইদাই এবং তালিবানের মোহাম্মদ ওমর দুজনই ইসলামের অনুসারী, কিন্তু আগের জনের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ায় ব্যাপারটি অনেক আগেই ন্যায্য হয়ে গেছে; অন্যদিকে পরেরজন অজ্ঞ, মানসিক রোগগ্রস্ত এক নিষ্ঠুর লোক। অন্যদের মধ্যে প্যালেস্টাইনের লেখক এডওয়ার্ড সাইদ বেশ জোরালোভাবে দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন লোকের জন্য ইসলাম ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। আমার নিজের পরিবারের মধ্যেই ব্যাপক ভিন্নতাধর্মী ইসলামের অনুশীলন করা হয়। এ মর্মে বিশ্বাসী এবং এর অনুসরণকারীরা যেমন বহু বিচিত্র, এ ধর্মটিও তাই। সত্যিকারের ইসলাম বলে আলাদা করে কিছু নাই।

বর্তমানে মুসলমানের সংখ্যা একশ কোটি। পুরো বা কাছাকাছি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্পন্ন ৪৮টি দেশের কোনটিই এখন পর্যন্ত টেকসই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেনি। প্রকৃতপক্ষে সকল মুসলিম রাষ্ট্রেই আত্মস্বার্থক সেবক দুর্নীতিবাজ আভিজাতদের আধিপত্য; এরা নিরাশা তাড়িত হয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি এবং জনগণের সম্পদ চুরি করে। এসব দেশের কোনটিতেই সুস্থিত শিক্ষাপদ্ধতি অথবা আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন একটি বিশ্ববিদ্যালয় নেই।

যুক্তিবিচারকেও আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে।

আপনি কোন বিজ্ঞান-বিষয়ক জার্নালে চোখ বুলালে কদাচিৎ কোন মুসলিম নাম দেখবেন। যদি দেখেন তাহলে তার পশ্চিমের কোন দেশে বাস করারই সম্ভাবনা। এর অল্প কটি ব্যতিক্রম আছে, পাকিস্তানের আবদুস সালাম এবং আমেরিকান স্টেভেন ইউনবার্গ ও শেলডন গ্লাসহাও একত্রে ১৯৭৯-' নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। আমি সালামকে বেশ ভাল করেই জানতাম, আমরা এমনকি একসঙ্গে একটা বইয়ের ভূমিকাও লিখেছি। তিনি একজন অসামান্য লোক ছিলেন। নিজ দেশ ও ধর্মের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল প্রগাঢ়। তবু তিনি প্রচণ্ড দুঃখ নিয়ে মারা গেছেন, কারণ পাকিস্তান তাকে অবজ্ঞা করেছে এবং ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানি

পার্লামেন্টের এক আইনে তাকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। সালাম সাহেবের আহমদি সম্প্রদায়কে খারেজি বলে গণ্য করে বর্তমানে তাদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালানো হচ্ছে। (সাত বছর আগে আমার বাড়ির পরের বাড়ির প্রতিবেশী এক আহমদি পদার্থবিদকে ঘাড়ে ও বুকে গুলি করা হয় এবং আমার গাড়িতে করে হাসপাতালে নেয়ার সময় গাড়িতেই তিনি মারা যান। তার একমাত্র দোষ ছিল ওই 'ভুল' সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করা)।

যদিও খাঁটি বৈজ্ঞানিক অর্জন সমকালীন মুসলিম সমাজে বিরল তবে ছদ্ম বিজ্ঞানের সরবরাহ প্রচুর। আমার বিভাগের এক সাবেক চেয়ারম্যান বেহেশতের গতির হিসেব কষে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন : আলো যে গতিতে পৃথিবী থেকে সরে যায় তার চেয়ে প্রতি সেকেন্ডে এক সেন্টিমিটার কম গতিতে বেহেশত পৃথিবী থেকে সরে গেছে। তার উদ্ভাবনাময় পদ্ধতি ইসলামের পবিত্র গ্রন্থের একটি আয়াতের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেছে। ওই আয়াতে বলা হয়েছে যে-রাতে ওই পবিত্র গ্রন্থ নাজিল হয়েছে সে রাতের উপাসনা অন্য যেকোনো সাধারণ রাতের উপাসনার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি মূল্য বহন করে। তিনি বলেন : এতে সময়কে ১ হাজার গুণ প্রসারিত করার উৎপাদক বিদ্যমান বলে ধরা যায়। একে তিনি আইনস্টাইনের বিশেষ রিলেটিভিটির ফর্মুলায় ফেলে হিসেব বের করে ফেলেছেন। আর একটি অধিকতর সর্বজনীন উদাহরণ : তালেবানদের কাছে পারমাণবিক গোপন তথ্য সরবরাহের সন্দেহে সম্প্রতি যে দু'জন পাকিস্তানি পারমাণবিক প্রকৌশলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের একজন আগে পাকিস্তানের এনার্জি সমস্যার সমাধানের জন্যে জ্বিনের (Genic) শক্তি ব্যবহার করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি ইসলামী বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে বলেছিলেন যে, ঈশ্বর মানুষকে মাটি থেকে তৈরি করেছেন এবং ফেরেশতা ও জ্বিনকে আগুন থেকে; তাই ওই উচ্চপদস্থ প্রকৌশলী জ্বিনদের পাকড়াও করে তাদের শক্তি (Energy) বের করে নেবার প্রস্তাব করেন।

আজকে দুঃখজনক পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনায় বিগত দিনের ইসলামের একেবারেই ভিন্ন চিত্র মিলে। নবম থেকে ত্রয়োদশ শতকে ইসলামের স্বর্ণযুগে বিজ্ঞান, দর্শন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে যারা চমৎকার কাজ করেছিলেন তারা ছিলেন মুসলিম। মুসলমানেরা শুধু প্রাচীন জ্ঞানের সংরক্ষণই করেনি, তারা বিপুল পরিমাণ উদ্ভাবনাও করেছে। সেই ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলা মুসলমানদের জন্য এক ট্রাজিক ঘটনা হিসেবে এখন প্রমাণিত। 'মুতাজিলা' নামে খ্যাত একটি মুসলিম চিন্তক গ্রুপ যুক্তিবাদী ও উদার ঐতিহ্যের এক শক্তিশালী ধারাকে বহন করে চলার কারণেই ইসলামের স্বর্ণযুগে বিজ্ঞানের অমন সমৃদ্ধি ঘটেছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতকে আরব ধর্মগুরু ইমাম আল গাজ্জালির সৈনাপত্যে মুসলিম রক্ষণশীলতার পুনর্জাগরণ ঘটে।

আল গাজ্জালী অলৌকিকভাবে প্রকাশিত বিষয়কে যুক্তির ওপরে এবং নিয়তিবাদকে মুক্তচিন্তার ওপরে স্থান দেন। তিনি গণিত শাস্ত্রকে ইসলামবিরোধী বলে নিশ্চিত করে বলেন এ বিষয়টি মনে উন্মত্ততা জাগিয়ে বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়।

এভাবে রক্ষণশীলতার পাপচক্রে আবদ্ধ হয়ে ইসলামের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে মুসলমান খ্রিষ্টান এবং ইহুদি জ্ঞানীগুণীরা কোনো রাজসভায় সমবেত হয়ে আর একত্রে কাজ করতে পারেননি। এভাবেই মুসলিম বিশ্বে সহিষ্ণুতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধা এবং বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটে। সর্বশেষ মুসলিম চিন্তাবিদ আবাদ-আল-রহমান ইবনে খলদুন প্রমুখ ছিলেন চতুর্দশ শতকের মানুষ।

ইতোমধ্যে পৃথিবীর বাকি অংশ এগিয়ে চলেছে। রেনেসাঁ পশ্চিমী বিশ্বে এনেছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের এক বিস্ফোরণ। আরবদের দ্বারা গ্রিক রচনাবলীর অনুবাদ এবং মুসলমানদের অন্যান্য অবদানের কাছে এদের ঋণ আছে। তবে তা এমন কিছু নয়।

বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি পশ্চিমী দেশসমূহকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং যাত্রাপথ ছিল নিষ্ঠুর এমনকি কখনো কখনো গণহত্যামূলক। এবং এভাবে তারা ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বকে উপনিবেশে পরিণত করে। অচিরেই অন্তত কিছু সংখ্যক মুসলিম এলিটের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্লেষণাত্মক উপাদান উপকরণ ও আধুনিক সংস্কৃতির সামাজিক-রাজনৈতিক মূল্যবোধকে আত্মস্থ না করার ফলেই তাদেরকে খুব বড়ো রকমের মূল্য দিতে হচ্ছে– আর এ দুটো বিষয়ই তাদেরই উপনিবেশকারীর ক্ষমতার মূল উৎস।

রক্ষণীল ও গোঁড়া মতাবলম্বীদের ব্যাপক প্রতিরোধের মুখেও ১৯ শতকের আধুনিক যুক্তিবাদ মুসলিম অনুগামী খুঁজে পায়। কেউ কেউ জাতি-রাষ্ট্রের আধুনিক ধারণাকে সাগ্রহে লুফে নেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বিংশ শতকের এমন কি একজন জাতীয়তাবাবাদী মুসলিম নেতাও মৌলবাদী নন।

যাহোক, গোটা তৃতীয় বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বৃহৎ উপনিবেশবিরোধী স্রোতধারার অংশ হিসেবে মুসলিম ও আরব জাতীয়তাবাদের মধ্যে জাতীয় সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার দেশীয়ভাবে করার ইচ্ছাটাও অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমের লোভের সঙ্গে এখানেই সংঘর্ষ অনিবার্য। প্রথমে বৃটেন ও পরে আমেরিকার সামাজিক স্বার্থ স্বাধীন জাতীয়তাবাদকে ভয় করতে থাকে। যে কেউ সহযোগিতা করতে চায় তাকেই তারা পছন্দ করতে থাকে, এমনকি সৌদি আরবের রক্ষণশীল শাসনকেও। ১৯৫৩ সালে ইরানের মোহাম্মদ মেসাদ্দেককে সি.আই.এ এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করে তার জায়গায় শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভীকে ক্ষমতায় বসায়। বৃটেন মিশরের জামাল আবদুন নাসেরকে নিশানা করে। ইন্দোনেশিয়ায় শত শত লোককে হত্যা করে এক রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সুকর্ণের স্থানে সুহার্তকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে।

বাইরের চাপ আর ভেতরের দুর্নীতিপরায়ণতা ও অক্ষমতায় সেক্যুলার মুসলিম সরকারসমূহ জাতীয় স্বার্থ রক্ষা অথবা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রদানে অসমর্থ হয়। নিজেদের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণের জন্যে তারা গণতন্ত্রকে বানচাল করতে শুরু করে। এই ব্যর্থতায় যে শূন্যতা সৃষ্টি তার পূরণের জন্যই ইসলামী আন্দোলন দানা বাধতে থাকে– এর মাত্র সামান্য কটি উল্লেখ করি, যেমন ইরান, পাকিস্তান ও সুদান।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ১৯৭৯-এ আফগানিস্তান অধিকৃত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র অবিবেচনা ও ক্ষমতার উদগ্র বাসনায় মুসলিম বিশ্বের এই কালান্তক স্রোতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। আমেরিকার সর্বপ্রধান মিত্র পাকিস্তানের মোহাম্মদ জিয়াউল হকের সহায়তায় সিআইএ প্রকাশ্যেই মিশর, সৌদি আরব, সুদান এবং আলজেরিয়া থেকে পবিত্র ইসলামী যোদ্ধা রিক্রুট করতে থাকে। বিজ্ঞ পরামর্শদাতা ও মিত্র পরাশক্তির সমর্থনে মুজাহিদীন বাহিনী উগ্র রূপ ধারণ করে। রোনাল্ড রেগান হোয়াইট হাউজের লনে তাদের নিয়ে আনন্দ ফূর্তি করেন।

বাকী যা কিছু তাতো এখন সবারই জানা। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমেরিকা এক বিশৃঙ্খল আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে আসে। তালেবানদের উদ্ভব ঘটে, ওসামা বিন লাদেন ও তার আল কায়েদা আফগানিস্তানকে তাদের ঘাঁটি বানায়।

এই পরিপূর্ণ বয়ান থেকে চিন্তাশীল মানুষ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন? মুসলমানদের এখন আত্ম-করুণায় গড়াগড়ি দেয়া বন্ধ করা উচিত। মুসলমানেরা অমিত ক্ষমতাধর ও বিদ্বেষভাবাপন্ন পশ্চিমের ষড়যন্ত্রের অসহায় শিকার নয়। সত্য এই যে বাণিজ্য পুঁজির যুগ শুরু হওয়ার বহু পূর্বে ইসলামের মহত্ত্বের পতনের সূত্রপাত। এর কারণ মূলত অভ্যন্তরীণ, তাই মুসলমানদের অবশ্যই নিজ অন্তরের কাছে জিজ্ঞাসা করা দরকার ভুলটা কোথায় হয়েছে।

মুসলমানদের অবশ্যই এটা স্বীকার করতে হবে যে, ১৪০০ বছর আগের আরবের সমগোত্রীয় উপজাতীয় সমাজের তুলনায় এখনকার মুসলমান সমাজ অনেক বড়ো, বহু বিচিত্র এবং জটিল। অতএব এই ধারণাটা এখন পরিত্যাগ করার সময় হয়েছে যে ইসলাম কেবলমাত্র শরিয়া বা ইসলামি আইনের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের মাধ্যমে টিকে থাকবে বা সমৃদ্ধি লাভ করবে।

মুসলমানদের এখন একটি ইহজাগতিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দরকার যে রাষ্ট্র ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদাকে শ্রদ্ধা করবে। যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, 'জনগণই ক্ষমতার উৎস' এই নীতির ওপর ভিত্তি করে। এর অর্থ হলো রক্ষণশীল ইসলামী পণ্ডিতদের দাবির মর্ম অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব আল্লাহ প্রতিনিধি বা ইসলামী আইনবেত্তাদের ওপরে, জনগণের ওপর নয়, এই মতবাদের সঙ্গে বিরোধ হেতু তা বাতিল করা।

মুসলমানদের অবশ্যই বিন-লাদেন ধরনের কারো দিকে তাকানোর দরকার নেই; ওই সমস্ত লোকের কাছে কোনো প্রকৃত উত্তর নেই এবং তারা কোনো বাস্তবসম্মত বিকল্পও দিতে পারে নাই। তাদের সন্ত্রাসবাদকে মহিমান্বিত করা এক ভয়ঙ্কর ভুল : পাকিস্তানে শিয়া, খ্রিষ্টান ও আহমদীদের তাদের ধর্মীয় উপাসনাস্থানে অবিরাম হত্যা এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে সে দেশের সংখ্যালঘুদের একই পরিণতি প্রমাণ করে যে সকল সন্ত্রাস অধিকারচ্যুতদের বিপ্লবজাত নয়।

যুক্তরাষ্ট্রকেও তিক্ত সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। জর্জ ডবিস্নউ বুশ ও টনি বেস্নয়ারের বাণী ধুলায় গড়াগড়ি গেলেও– লাদেন জীবিত মৃত যাই হোক না কেন, তার বাণী মুসলিম বিশ্বে প্রবলভাবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বিন-লাদেনের ধর্মীয় চরমপন্থা বহু মুসলমানকে নিরুৎসাহিত করে, কিন্তু তারা তার রাজনৈতিক বাণীকে নিজস্ব চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত করে নিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই প্যালেস্টাইনিদের অধিকারচ্যুত করার ব্যাপারে ইরাইলীদের সাহায্য বন্ধ করতে হবে। শুধুমাত্র নিজস্ব স্বার্থ হাসিল করে বলেই বিশ্বের দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বৈরাচারী শাসকদের টিকিয়ে রাখার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হবে।

আমেরিকানদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাদের আত্যন্তিক বিজয় গর্ব এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি অবজ্ঞা শুধু মুসলমানদের মধ্যেই নয়– সর্বত্র শত্রুর সৃষ্টি করেছে। অতএব তাদের আরো কম একগুঁয়ে এবং বিশ্বের অন্য মানুষের মতো হতে হবে।

আমাদের সমবেতভাবে টিকে থাকা এই সত্য স্বীকারের ওপর নির্ভর করে যে সন্ত্রাসবাদেকোন সমাধান নেই, জাতীয়তাবাদেও নয়। আমাদের মাত্র একটাই পছন্দ আছে : যুক্তবাদের পদ্ধতি ও যুক্তির ওপর নির্ভরশীল সেক্যুলার মানবিকতার পথ। শুধুমাত্র এই পথই এই বিশ্বের সকলকে জীবনের নিশ্চয়তা, স্বাধীনতা এবং সুখের সন্ধান দিতে পারে।

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা বনাম কোরানিক বিজ্ঞান

জাহেদ আহমদ

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে
আমরা রয়েছি বসে,
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি
ফেকাহ্ ও হাদীস চষে।

বাহিরের দিকে যত মরিয়াছি
ভিতরের দিকে তত
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি
গরু-ছাগলের মত।

– কাজী নজরুল ইসলাম

এক.

ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে কলেজের ইংরেজি এন্থলজিতে পড়া একটি গল্প আমার মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল। অনেকেই গল্পটির কথা জেনে থাকবেন। আমেরিকান লেখিকা মারজারি কিনান রাওলিন্স-এর 'এ মাদার ইন ম্যানভিল' (A Mother in Manville)। কাহিনী এরকম লেখালেখি বিষয়ক একটা এসাইনমেন্টের কাজে লেখিকা মারজারি নর্থ ক্যারোলিনার পাহাড়ে অবস্থিত একটি অনাথ বাচ্চাদের আশ্রমে কিছুদিন কাটান। সেখানে জেরি নামে একটা বাচ্চার সাথে তার পরিচয় ঘটে। জেরি লেখিকাকে প্রতিদিন আগুন পোহানোর কাঠ কেটে দিত। সে ছিল প্রত্যয়ী, পরিশ্রমী এবং অত্যন্ত মেধাবী। জেরি আলাপ প্রসঙ্গে লেখিকাকে জানায়, তার মা জীবিত এবং মাঝে মাঝে তাকে দেখতেও আসেন এটাসেটা উপহার নিয়ে। গল্পের শেষ পর্যায়ে লেখিকা আশ্রমে চাকরিরত জনৈক মহিলার কাছ থেকে জানতে পারেন যে, জেরীর মা-বাবা কেউই আসলে জীবিত নেই এবং তাকে কেউ দেখতে

আসার কথাও ঠিক নয়। এখানেই গল্পের সমাপ্তি ঘটলেও পাঠক-পাঠিকার মনে কাহিনীটি একাধিক প্রশ্নের জন্ম দেয়। জেরী কি তাহলে মিথ্যুক? কেন সে ফাঁদিয়ে ওরকম একটি গল্প লেখিকাকে বলতে গেল? সম্ভাব্য ব্যাখ্যা একাধিক, জেরী অনাথ বালক হিসেবে কারো করুণা বা সহানুভূতি নিতে চায়নি। অথবা, লেখিকাকে দেখে তার মায়ের কথা মনে পড়েছে; তাই নিজের একাকিত্ব ও অসহায়ত্বকে চেপে রাখতে কল্পনায় সে একজন মাকে সৃষ্টি করেছে। তা না হলে সম্ভবত তার আত্ম পরিচয়ের সঙ্কট দেখা দিত।

উপরের গল্পটি বিশেষভাবে মনে পড়ল সম্প্রতি যখন পত্রিকার পাতায় একটি 'বিশেষ' লেখার ওপরে চোখ বুলাচ্ছিলাম। উক্ত লেখাটিতে লেখক মরিয়া হয়ে উঠেছেন দেখাতে যে, আল- কোরানের সাথে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের বিস্ময়কর(?) মিল রয়েছে। বেশ কিছু দেশি-বিদেশি রেফারেন্সও তিনি টেনে এনেছেন যা বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান গবেষণার পদ্ধতির সাথে অপরিচিত পাঠক-পাঠিকাদের খুব সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারবে; তারা মনে করতে পারেন, কোরান বোধ হয় এক ধরনের বিজ্ঞান গ্রন্থ। হয়ত এও ভাবতে পারেন (বা ভাবেন) প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগেই বিজ্ঞানের এমনসব তথ্য পবিত্র কিতাবে লেখা হয়েছিল, যা আধুনিক জগতে বিজ্ঞানীরা পরিশ্রমলব্ধ গবেষণার মাধ্যমে মাত্র জানতে শুরু করেছেন! তবে এসব বিশ্বাস মুসলমানদের মাঝে একেবারে নতুন নয়। সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, 'আমাদের কোরানেই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে। এগুতে পারছি না কেবল শয়তানের ওয়াসেওয়াসে।' কিংবা 'কাফির-নাসারারা যে এত উন্নতি করছে, তা আসলে আমাদের কোরান গবেষণা করে, অথচ আমরা নিজেরা পারছি না সঠিক আমলের অভাবে। কিন্তু আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ কোনদিন বলে দিতে পারলেন না, 'সঠিক আমল' জিনিসটি আসলে কী কিংবা, বক্তা নিজেই বা কেন 'সঠিক আমল'টি অভ্যাস করে কোটি কোটি মুসলমানদের দুর্দশা লাঘব করতে সক্ষম হচ্ছেন না। একজন শিক্ষিত মুসলমানের কলম দিয়ে যখন এসব বালখিল্যতায় ভরা কথা বা লেখা বেরিয়ে আসে, তখন পাঠকের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি বৈকি। কারণ এরা আবার নিজেদের একই সাথে 'আধুনিক' এবং 'পাক্কা মুসলিম' লেবাসে ঢাকতে পারঙ্গম। কেউ কেউ ভাবেন, ঐসব লেখা মুসলমানদের সামনে এগোনোর পথে অনুপ্রাণিত করবে। কিন্তু আসলে কি তাই? জবাবে বলব, জ্বী-না। বাস্তবতা বড়ই রূঢ়। কোরানে যদি বিজ্ঞানের ব্যাপারে এতই ইঙ্গিত থেকে থাকত, তাহলে প্রশ্ন আসে পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মুসলমান হলেও বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমান বিজ্ঞানীদের সংখ্যা কেন এক-শতাংশেরও কম? কিংবা কেন পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশে যত বিজ্ঞানী রয়েছে, অমুসলিম ইসরাইলের একা রয়েছে তার

চাইতে দ্বিগুণ সংখ্যক বিজ্ঞানী?[১] তবে অর্বাচীণ শ্রেণীর যেসব লেখকদের কথা বলছি অর্থাৎ যারা কিনা ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খুঁজে পান, তাদের মধ্যে সবাই যে কেবল মুসলমান, তা নয়। খ্রিষ্টানদের মধ্যেও একদল মূর্খ রয়েছে যারা একইরকমভাবে বাইবেলে বিজ্ঞানের সূত্র সন্ধান করে বেড়ায়। ঠিক তেমনি, হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে তথাকথিত 'বৈদিক সাইনস'-এর একদল প্রবক্তা। গত বিজেপি সরকারের আমলে বেদকে বিজ্ঞান শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে পুরো ভারতে এরা রীতিমত ঝড় তুলেছিল। এদের অনেকে এখনও সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আমি এই লেখায় মূলত 'কোরানে বিজ্ঞান' খোঁজার বিষয়টির অন্তঃসারশূন্যতা এবং যুক্তিহীনতার দিকেই মনোনিবেশ করব। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খোঁজার বিষয়ে ইন্টারনেটে সার্চ করলে প্রচুর লেখা পাওয়া যাবে। আমাদের 'মুক্তমনা' হিউম্যানিস্ট ফোরামেও এই বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লেখা রয়েছে (উৎসাহীরা ইন্টারনেটে এই ঠিকানায় ব্রাউজ করতে পারেন : www.mukto-mona.com)

দুই

কোরানে কি সত্যি বিজ্ঞান লুকায়িত?

মনে মনে চিন্তা করছিলাম ব্যাপারটি নিয়ে। এমনটি কেন হয়, বিজ্ঞানীরা যখন কোন কিছু আবিষ্কার করে ফেলেন, কেবল তখনি কতিপয় অন্ধ মুসলমান, খ্রিস্টান ও হিন্দু মূর্খ এটি তাদের নিজ ধর্মগ্রন্থে আছে বলে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, কিন্তু উল্টোটি কখনোই দেখা যায় না, অর্থাৎ কোরান-বেদ- বাইবেলের তথাকথিত লুক্কায়িত সূত্র ধরে কেউ আজ পর্যন্ত একটিও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে পারেনি? আমাকে কেউ কি মাত্র একটা স্ট্যান্ডার্ড সায়েন্স জার্নাল (যেমন– Science, Nature, etc)-এর নাম বলতে পারবেন যেখানে বিজ্ঞানী তার রেফারেন্সের তালিকায় কোরান, বেদ, বাইবেলকে উল্লেখ করেছেন? (আমি গবেষণাধর্মী বিজ্ঞান জার্নালের কথা বলছি; 'বাইবেল- কোরান ও বিজ্ঞান' বা 'মহাগ্রন্থ কোরান ও বিজ্ঞান' জাতীয় স্থূল কোন গ্রন্থের কথা বলছি না) উত্তর খুঁজতে গিয়ে 'এ মাদার ইন ম্যানভিল' গল্পের কথা মনে পড়ল। আমার কাছে ব্যাপারটা বেশ মজার বলে মনে হল। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, যে সব মুমিন-মুসলমান লেখক কোরানে বিজ্ঞান বলে চেঁচামেচি করেন, তাদের সাথে উপরে উল্লিখিত গল্পের মূল চরিত্র জেরীর মননের অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে, অন্তত মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তাই মনে হয়। আপন অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বিনয়ী, প্রত্যয়ী এবং বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জেরী যেমন কল্পনায় একজন মাকে সৃষ্টি করেছে– যিনি সন্তানকে ভালবাসেন, উপহারসহ দেখতে আসেন, তার সাথে সময় কাটান; ঠিক তেমনি কতিপয় মুসলমান লেখক–লেখিকা আত্মপরিচয়ের সঙ্কট থেকে আপন 'উম্মাহ'র পরিত্রাণের উপায় হিসেবে

একর পর এক সৃষ্টি করে চলেছেন কোরানে বিজ্ঞানে অস্তিত্বের গল্প। এই প্রবণতা একজন মানুষের মধ্যে তখনই ততো বেশি দেখতে পাবেন, তার স্বীয় অস্তিত্ব ও পরিচয়ের সঙ্কট যখন যত বেশি হবে। উপরের গল্পে লেখিকার মাতৃসম স্নেহ, ভালবাসা জেরীকে কল্পনায় মা আবিষ্কারের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অমুসলিমদের বিশাল কর্তৃত্ব কতিপয় মুসলমান লেখক- লেখিকাদের ঠেলে দিচ্ছে কোরানে বিজ্ঞান খোঁজার দিকে। এই শ্রেণীর কিছু শিক্ষিত মুসলমানদের ভয়াবহ অজ্ঞতার কিছু বাস্তব উদাহরণ দেয়া যাক।

মুসলিম আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে আমাকে নিয়ে আক্ষেপ করেন। জানতে চান, ধার্মিক মুসলমান পরিবারে জন্ম নিয়েও আমি কেন ধর্মে বিশ্বাস করি না। কেউ কেউ রেফারেন্স দিয়ে আমাকে ইম্প্রেস করার চেষ্টা করেন। যেমন– আরে ভাই, এত বই পড়েন অথচ এটাও জানেন না, স্বয়ং আমেরিকার একজন মনীষী (?) পর্যন্ত গবেষণা করে রায় দিয়েছেন, মহানবি মুহম্মদ (স.) হচ্ছেন সর্বকালের(!) সর্বশ্রেষ্ঠ(!) মহামানুষ(!)। বিশেষণের ভুল প্রয়োগ দেখে আমি অবাক হই। বুঝতে পারি, অজ্ঞতার চেয়ে ভয়াবহ মানসিক অসুখ ধরনীর বুকে খুব কমই আছে। কারণ আমেরিকার সেই তথাকথিত 'মনীষী'র বইটির সরাসরি ইংরেজি ভার্সন আমি পড়েছি আর এদের বেশির ভাগই পড়েছেন এর অসম্পূর্ণ এবং ভুল বাংলা অনুবাদ (যা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়া হয়েছে)। বইটি লিখেছেন মাইকেল এইচ. হার্ট (Michael H. Hart) নামের আমেরিকান একজন সাংবাদিক। বইটির তিনি নাম দিয়েছেন The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History। মাইকেল হার্ট নিজেই বইটির ভূমিকায় (যা অবৈধ বাংলা ভার্সনে অনুপস্থিত) পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছেন, তিনি যা করতে চেষ্টা করেছেন, তা হচ্ছে ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী (The most influential) লোকজনের একটি তালিকা তৈরি করতে, যার সাথে যে কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন এবং যা কোনো ক্রমেই 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ' বা The greatest human beings-এর তালিকা নয়। যেমন– বইটিতে ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী মানুষ হিসেবে সর্বপ্রথমে যেমন মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.)কে স্থান দেয়া হয়েছে, তেমনি একই তালিকায় ৩৯ নং-এ আছেন স্বয়ং হিটলার! অন্যান্য র‍্যাংকিং-এ এসেছে স্ট্যালিন, চেঙ্গিস খানদের নাম। মজার ব্যাপার, বইটির অবৈধ বাংলা সংস্করণের সংখ্যা একাধিক এবং টাইটেল বইয়ের নাম এসেছে বিকৃত আকারে, 'ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের তালিকা।' বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে অনেকে বইটির কেবল বাংলা অনুবাদ পড়েছেন, আর ইংরেজিটা ছুঁয়ে দেখলেও খুব সম্ভবত The most influential এবং The greatest men in the human history এর মধ্যে পার্থক্য বোঝার মত বুদ্ধিমত্তা

এদের নেই! তারা অহেতুক রেফারেনসে আপ্লুত হন। কমবেশি একই রকম অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটায় অনেক শিক্ষিত মুসলমান যখন তারা মরিস বুকাইলি নামের সৌদি রাজপরিবারে চাকরি করা একজন খ্রিষ্টান ডাক্তারের (কোন বিজ্ঞানী নয়) একটি বইয়ের বিষয়বস্তুতে। বইটির নাম : 'Bible, Quran and Science' (বাইবেল, কোরান এবং বিজ্ঞান)। মজার ব্যাপার বাইবেল, কোরান এবং বিজ্ঞানের মধ্যে কোরানকে চূড়ান্ত সত্য(?) বললেও মরিস বুকাইলি নিজে কিন্তু মুসলমান হননি! হওয়ার অবশ্য দরকারও নেই, কারণ জানা গেছে, কোরানকে আধুনিক পাঠক-পাঠিকার কাছে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সৌদি শাসকরা বুকাইলিকে এই দায়িত্ব দিয়েছিল যে তিনি যেন একটি ইম্প্রেসিভ বই লিখে দেন। বিনিময়ে বুকাইলি পেয়েছেন বিরাট অঙ্কের পেট্রোডলার!

তিন
একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নমুনা

বিজ্ঞান কার্য-কারণ (cause and effect) নীতি, অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নিবিড় গবেষণার ভিত্তিতে এগোয়, কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মূল্য নেই এখানে। আর ধর্মগ্রন্থের পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে অগাধ এবং প্রশ্নহীন বিশ্বাস। তেলে জলে কি আর মেশে? বিজ্ঞানীদের এক একটি আবিষ্কার প্রকৃত অর্থে বহু বছরের নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন, মৌলিক গবেষণা এবং পূর্বসূরিদের একই বিষয়ে রেখে যাওয়া তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এখানে অলৌকিক গ্রন্থাবলীর কোন স্থান নেই। আর তা বলা মানে, একজন বিজ্ঞানীর কৃতিত্বকে খাটো করা। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছি, ডি-এন-এ (DNA) আবিষ্কারের কথা। ডি-এন-এ অণুর পুরো নাম ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড। একে বলা হয় 'জীব দেহের প্রধান অণু' (the master molecule of life)। কেউ কেউ আদর করে ডি-এন-এ'কে ডাকেন 'প্রচার মাধ্যমের প্রেয়সী' (The Darling of the media)। যারা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী না, তারাও জিন থেরাপি, ক্লোনিং, মানব জিনোম প্রকল্প (Human Genome Project) ইত্যাদির নাম শুনে থাকবেন। এসবগুলি কাজ ও গবেষণার মূল টার্গেট বা অস্ত্র হচ্ছে ডি-এন-এ (যার সাথে জিনের পার্থক্য হচ্ছে, বিশাল দৈর্ঘ্যের একেকটি ডি-এন-এ অণুতে রয়েছে অনেকগুলি আলাদা আলাদা অংশ, যা জিন (Gene) বলে পরিচিত)। এই ডি-এন-এ'র উপাদান ও গঠন আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানীদের সময় লেগেছে প্রায় একশ বছর। যদিও ১৯৫৩ সালের জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক-এর ডাবল হেলিক্স মডেল ডি-এন-এ আবিষ্কারের ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বায়োলজি বা মলিকুলার বায়োলজির যে কোনো ছাত্র/গবেষক মাত্রই জানেন– পূর্ববর্তী

বিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের সূত্র ছাড়া ১৯৫৩ সালের যুগান্তকারী ঘটনাটি সম্ভব ছিল না। আমি নিচে ডি-এন-এ আবিষ্কারের ক্রোনোলজিকাল স্তরগুলো উল্লেখ করছি– (সূত্র : nature, human genome issue)

- ১৮৬৯ সাল– সর্বপ্রথম জীব কোষ থেকে ডি-এন-এ পৃথক করা হয়।
- ১৮৭৯ সাল– মাইটোসিস কোষ বিভাজন পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- ১৯০০ সাল– জোহান ম্যান্ডেলের মটরশুঁটি বিষয়ক গবেষণার সন্ধান লাভ।
- ১৯০২ সাল– বংশগতি (Hereditary) বিষয়ে ক্রোমোজোম তত্ত্বের ধারণার উদ্ভব।
- ১৯০৯ সাল– সর্বপ্রথম 'জিন' শব্দটি চালু হয় (এটি কোরানে বর্ণিত কোন 'জিন' নয়– লেখক)।
- ১৯১১ সাল– ফ্রুট ফ্লাই (Drosophila melanggaster) নিয়ে গবেষণা ক্রোমোজোম তত্ত্বের ধারণাকে শক্তিশালী করে।
- ১৯৪১ সাল– এক জিন এক এনজাইম তত্ত্বের ধারণা।
- ১৯৪৩ সাল– এক্সরে ডিফ্রেকশন (Xray diffraction) টেকনিকের প্রয়োগ করে ডি-এন-এর উপর গবেষণা করা হয়।
- ১৯৪৪ সাল– ডি-এন-এ ট্রান্সফরমেশন (Transformation) নীতির আবিষ্কার।
- ১৯৫২ সাল– জিন যে আসলে ডি-এন-এ দিয়ে তৈরি, তা জানা যায়।
- ১৯৫৩ সাল– জেমস ওয়াটসন, ফ্রান্সিস ক্রিক এবং উইলকিনস ডাবল হেলিক্স মডেল-এর মাধ্যমে ডি-এন-এ'র গঠন ও উপাদান ব্যাখ্যা করেন (সে সময় ওয়াটসনের বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর– লেখক)। ১৯৬৩ সালে সে জন্য তাদেরকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, ওপরের উদাহরণ দ্বারা আশা করি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, কোরান- বেদ- বাইবেলের সাথে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সামঞ্জস্য খোঁজা একধরনের অজ্ঞতা ও আহাম্মকি বৈ অন্য কিছু নয়। অথচ কেউ কেউ তাই করছেন। আর এ হীন কাজে তাদের সঙ্গী হচ্ছেন স্বার্থান্বেষী, লোভী এবং নামসর্বস্ব প্রচারপ্রিয় বিজ্ঞানী। যেমন– বাংলাদেশে ড. শমসের আলী 'Scientific Indications in The Holy Quran' নামক বইটির তৃতীয় কভার পেজে কোরানের একটি আয়াত উল্লেখ করে তার সাথে বড় করে ডি-এন-এ অণুর ছবি জুড়ে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে, কোরানে ডি-এন-এ ব্যাপারে পর্যন্ত ইঙ্গিত রয়েছে। আয়াতটি এ রকম– 'এবং তোমাদের এবং পৃথিবীর প্রাণীদের গঠন-প্রকৃতিতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে সংবাদ' (৪৫ঃ৪)।

বলুন তো, এর সাথে ডি-এন-এ অণুর সম্পর্কটা কোথায়? এই মূর্খতা (নাকি, শঠতা?) শেষ হবে কবে? এবার ভ্রুণতত্ত্বের সাথে কোরানের তথাকথিত মিলের ব্যাপারে একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

ভ্রুণতত্ত্ব (Embroyology) কি কোরান থেকে এসেছে?

কোরানের বহু জায়গায় বলা হয়েছে, জমাট রক্ত থেকে মানুষের সৃষ্টি করা হয়েছে (২৩ঃ১৪; ৭৫ঃ৩৮; ৯৬; ২); যার সাথে বিজ্ঞানের অমিল ছাড়া কোন মিল নেই।

'জমাট রক্ত' প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে বার বার কেন কোরানে আসল? এরকম প্রশ্ন মনে আসতেই পারে। এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের একটুখানি দৃষ্টি দিতে হবে হজরত মুহম্মদের পূর্ববর্তী সমাজ ও ইতিহাসের দিকে। মুহম্মদের জন্ম (৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ) গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের জন্মের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪) প্রায় এক হাজার বছর পরে। দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান তখনও (এমনকি এর পরেও) এরিস্টটলের চিন্তা-চেতনার মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছিল। স্বাভাবিক কারণেই এরিস্টটলীয় এসব ধারণা কম বেশি মুহম্মদকেও প্রভাবিত করেছিল। এক্ষেত্রে মুহম্মদের নিরক্ষরতা বড় কোন বাধা হওয়ার কথা নয়। জমাট বাঁধা রক্ত (আলাক্বা, আরবিতে) জীব সম্পর্কিত তার অনেক তত্ত্বই কালক্রমে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যেমন– মানব প্রজনন সম্পর্কে এরিস্টটল এই ভ্রান্ত ধারণাতে বিশ্বাস করতেন যে, যৌবনবতী মহিলার ঋতুস্রাব (menstrual blood) এর ওপর পুরুষের বীর্যের ক্রিয়ার ফলেই মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম হয়ে থাকে! জমাট-বাঁধা রক্ত থেকে জন্মের কোরানিক তত্ত্বে এরিস্টটলের এই ভ্রান্ত ধারণারই প্রতিফলন ঘটেছে। সন্দেহ নেই, কোরানের এই ধারণাটি মারাত্মকভাবে ভুল। অথচ অনেক মুমিন এই সত্যকে মেনে নেবেন না কেবলমাত্র এই অন্ধবিশ্বাসের কারণে– 'কোরান আল্লাহর বাণী, কাজেই ভুলত্রুটির উর্ধ্বে।' মূলত ভ্রূণের পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরে এমন কোন পর্যায় নেই, যেখানে ভ্রুণকে জমাট রক্ত সদৃশ মনে হতে পারে, যখন মিসকারেজ (miscarrige) বা প্রাকৃতিক উপায়ে গর্ভপাত ঘটে। তর্কের খাতিরেও যদি মেনে নেই ভ্রুণটি জমাট রক্ত সদৃশ, তাহলেও ভুলে যাওয়া চলবে না– এটি কেবল মৃতভ্রুণের ক্ষেত্রে ঘটে অর্থাৎ যেটির আর পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে রূপান্তরিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

জমাট রক্ত আসলে কী, সে সম্পর্কে প্রাণ রাসায়নিক (Biochemical) ব্যাখ্যাটা এখানে জেনে নেয়া ভাল, যাতে তথাকথিত ধর্মীয় বিজ্ঞানের সমর্থকরা মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা বারবার আমাদের বিভ্রান্ত করার সুযোগ না পান। আঘাত বা দুর্ঘটনার ফলে রক্তক্ষরণ ঘটলে শরীরে স্বাভাবিক নিয়মেই ক্ষত বা আঘাতের স্থানে রক্ত জমাট বাধে। কৈশিক রক্তনালীর (capillary vessles) চাইতে বড় যেকোন রক্তনালী থেকে রক্তক্ষরণ ঘটলে জখম বা আঘাতের স্থানে রক্ত জমাট বাধে যাতে অতিরিক্ত ক্ষরণ আর না ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে অনুচক্রিকা বা প্লেটলেট (তিন প্রকার রক্তকোষের একটি) এর ভূমিকা সর্বপ্রধান এবং সর্বপ্রথম। যখন শরীরে কোথাও কোন জখম বা আঘাত ঘটে, স্বাভাবিক অনুচক্রিকাগুলি তখন সক্রিয় অনুচক্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এগুলির তখন আকৃতির পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং এরা আঠালো হয়ে রক্তনালীর দেয়ালে জমা হয়ে প্লাগ (plug) তৈরি করে। এই সক্রিয় অনুচক্রিকাগুলি থেকে একই সময়ে রক্তপ্লাজমায় বিশেষ এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ ঘটে থাকে। অনেকগুলি জটিল প্রাণরাসায়নিক

বিক্রিয়ার সাহায্যে ফাইব্রিনোজেন তখন ফ্রাইব্রিনে পরিণত হয়। ফ্রাইব্রিন হচ্ছে এক ধরনের অদ্রবণীয় প্রোটিন বা ফাইব্রিল নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুতা জাতীয় বস্তুর সমন্বয়ে জটিল জালিকার সৃষ্টি করে। রক্তকোষ এবং প্লাজমা (উভয়ের সমন্বয়েই রক্ত গঠিত) তখন ফাইব্রিলের এই জালে আটকা পড়ে গিয়ে ক্লক বা জমাট রক্তের সৃষ্টি করে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং কোরান

গ্রহ-নক্ষত্র এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে 'আল-কোরানের' ব্যাখ্যা একটু পর্যালোচনা করা যাক; কেননা ভ্রূণবিদ্যার মত এটিও 'ধর্মীয়-বিজ্ঞানী' এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক মুমিন বান্দদের আরেকটি অতি প্রিয় বিষয়। সন্দেহ নেই, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) অনেক মুসলিম-মনীষীর মৌলিক গবেষণা এবং অধ্যয়নের নিকট প্রভূতভাবে ঋণী। উদাহরণস্বরূপ আল-সুফী, আল-বিরুনি, আল-জারকালি প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নাম করা যায়। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, এসব মনীষী কোরান বা অন্য কোন ধর্মীয়গ্রন্থের সূত্র ধরে কিছুই আবিষ্কার করেননি। কেননা ক্লাসিক্যাল ইসলাম বা স্বর্ণযুগে মুসলমান মনীষীরা যতটা না ছিলেন আচারসর্বস্ব মুসলমান, তার চাইতে অধিক তাদের পরিচিতি ছিল 'যুক্তিবাদী' মনীষী হিসেবে। এদের সম্পর্কে পাকিস্তানের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী এবং কায়েদ-এ আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পারভেজ হুডবয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য[২] : '.... ইসলামের স্বর্ণযুগে বিজ্ঞান অগ্রগতি লাভ করেছিল কারণ– ইসলামের অভ্যন্তরে তখন ছিলেন মুতাজিলা নামধারী শক্তিশালী যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের ধারক একদল চিন্তাবিদ। সবকিছুই পূর্ব-নির্ধারিত এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ব্যাতীত মানুষের অন্য কোন উপায় নেই।' নিয়তিবাদীদের এ মতবাদের তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করে মুতাজিলারা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মুতাজিলারা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিলেন, জ্ঞান তখন সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে গোঁড়া ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল-গাজ্জালির নেতৃত্বে ইসলামি রক্ষণশীলতার পুনরাবির্ভাব ঘটে। আল-গাজ্জালী যুক্তির স্থলে দৈববাণী এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির স্থলে নিয়তিকে তুলে ধরেন। কার্য এবং কারণ (cause and effect) সম্পর্ককে তিনি অস্বীকার করেন এই বলে যে, মানুষের ভবিষ্যৎ জানার শক্তি নেই, কেবল সৃষ্টিকর্তা এ বিষয়ে অবগত। গণিতশাস্ত্রকে আল-গাজ্জালি 'ইসলামবিরোধী' এবং 'মানব মনের জন্য ক্ষতিকারক' বলে মন্তব্য করেন। গোঁড়ামির জালে ইসলামের সমৃদ্ধি আটকা পড়ে যায়। মহামতি খলিফা আল-মামুন এবং হারুন-আল-রশিদ এর শাসনামলে রাজদরবারে মুসলিম, খ্রিষ্টান এবং ইহুদী মনীষীদের একত্রে জড়ো হয়ে জ্ঞান-চর্চা এবং মত-বিনিময় করার যে প্রবণতা বহাল ছিল, তা পরবর্তীকালে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বে সহিষ্ণুতা, মেধা এবং

বিজ্ঞানের মৃত্যু ঘটে। যুক্তিবাদী ধারার সর্বশেষ মুসলিম মনীষী হচ্ছেন চতুর্দশ শতাব্দীর আবদাল রাহমান ইবনে খালদুন।'

ক্ল্যাসিক্যাল ইসলাম যুগের অনেক মুসলমান মনীষীর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ কোরানের অনেক আয়াতকে 'অযৌক্তিক' এবং 'অবৈজ্ঞানিক' প্রমাণ করেছে। যেমন : কোরানের বর্ণনা অনুযায়ী, সূর্য অস্তমিত হয় একটি 'পঙ্কিল জলাশয়ে' বা muddy spring-এ (১৮:৮৬), তেমনি উদিত হয় একটি বিশেষ স্থান থেকে (১৮:৯০)। আমরা জানি, খালি চোখে সূর্য পূর্বাকাশে উদিত হয় এবং পশ্চিমাকাশে অস্ত যায় বলে মনে হলেও বিজ্ঞানের বিচারে তা আসলে সত্য নয় কেননা মহাশূন্যে অবস্থিত রয়েছে আমাদের সৌরজগতটি এবং সূর্য সেটির কেন্দ্র। পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন অবিরত ঘুরছে, ঠিক তেমনি এরা নিজেদের কক্ষপথে হচ্ছে আবর্তিত অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান লাটিমের বেলায় যেমনটি হয়। প্রায় ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী নিজস্ব কক্ষপথে একবার ঘুরে। এই কারণে সৌর জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্যের সকল আলো একই সাথে এসে গোলাকার ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবী গায়ে এসে পড়তে পারে না। যেখানে পড়ে, সেখানটায় হয় দিন; বাকি জায়গায় অন্ধকার অর্থাৎ রাত। কিন্তু কোরানে বর্ণিত গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত বক্তব্যের সাথে বিজ্ঞানের এসব তথ্যের কোনো মিল নেই। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। গ্রীক ধারণার বশবর্তী হয়ে সে সময় প্রায় সকলে অজ্ঞতাবশত বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীর আকার গোলাকৃতি নয়, বরং চ্যাপ্টা; এবং পৃথিবী হচ্ছে মহাবিশ্বের কেন্দ্র (একে বলা হয় এরিস্টটলের ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব সম্পর্কিত মতবাদ বা Geocentric theory of universe)। তবে মুসলিম গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ আল-বিরুনি সে সময়ও (মৃত্যু ১০৪৮ সাল) বিশ্বাস করতেন যে, ঘূর্ণনশীল পৃথিবীর আকৃতি হচ্ছে গোল এবং মোটেও চ্যাপ্টা নয়। তাই বিজ্ঞানী বলতে হলে আল-বিরুনিকে বলা উচিত, কোনো পয়গম্বরকে নয়।

উপরের তথ্যগুলি দ্বারা এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা হয় যে, কোরান আসলে বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, ধর্মীয় গ্রন্থই (কেউ কেউ আবার দাবি করেন এটি আসলে মানুষেরই তৈরি একটি গ্রন্থ)। তাদের যুক্তি, তা না হলে মহাজ্ঞানী আল্লাহ কী করে সক্রেটিসের ভ্রান্তমতবাদগুলি পবিত্র আল-কোরানের পাতায় নিয়ে আসলেন? কোরানে এরকম অবৈজ্ঞানিক এবং অসামঞ্জস্যে ভর্তি বর্ণনার আরও কিছু উদাহরণ রয়েছে। কোরানের একটি আয়াত (২:২৯) অনুযায়ী, আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর দিন-রাত এবং সবশেষে পৃথিবী। আরেক জায়গায় বেহেস্ত এবং পৃথিবী তৈরির মোট সময় সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ ভুল করে ফেলেছেন! যেমন: কোরানে কিছু কিছু আয়াত (৭:৫৪, ১০:৩, ২৫:২৯) অনুযায়ী আল্লাহ সর্বমোট ছয় দিনে বেহেস্ত ও পৃথিবী বানিয়েছেন; কিন্তু একই কোরানের

৪১:৯ আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ দুই দিনে পৃথিবী তৈরি করেছেন এবং সেখানে প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরিতে সময় লেগেছে আরও চারদিন (আয়াত ৪১:১০)। সবশেষে বেহেস্ত ও পৃথিবী সৃষ্টিতে মোট ব্যায়িত সময় হচ্ছে (২+৪+২) সর্বমোট ৮ দিন। তাহলে বেহেস্ত ও পৃথিবী সৃষ্টিতে সর্বমোট ব্যয়িত সময়ের ক্ষেত্রে মহাসত্য গ্রন্থ আল কোরানের কোন বিবরণটি আসলে সত্য–ছয় (৬) দিন, নাকি আট (৮) দিন?

চার

বেদ চার-পাঁচ হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে আছে, কোরানের বয়সও দেড় হাজার বছরের কাছাকাছি; সেই তুলনায় আধুনিক বিজ্ঞানের বয়স মাত্র কয়েকশ বছর। অথচ দেখুন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, টেলিভিশন, রেল-কার উড়োজাহাজ, কম্পিউটার- সবই কিন্তু গত দু'তিনশ বছরেই আবিষ্কৃত হয়েছে। কেন আমাদের এতো 'মহাজ্ঞানী' পয়গম্বররা এগুলির একটিও আবিষ্কার করতে পারেনি? চিন্তা করে দেখুন, সামান্য একটা মোটরযান সে সময় থাকলে সংবাদবাহককে উটের পৃষ্ঠে চড়ে কষ্ট করে রোদ-বৃষ্টি পোহায়ে নবির সংবাদ নিয়ে এখানে- সেখানে যেতে হত না। রিমোর্ট কন্ট্রোলড ফাইটার প্লেন বা মিসাইল থাকলে ঘর থেকেই শত্রু নাশ করা যেত, অকারণে সাহাবিরা মারা যেতেন না; কেউ নিজের দন্তগুলিও খোয়াতেন না শত্রুর পাথরের আঘাতে! তথাপি, বিশেষ বাহনে চড়ে সাত আসমানের ওপরে বেহেস্ত-দোযখ দেখার কাহিনী শুনে আবেগে অনেকের চোখে জল চলে আসে, কিন্তু মস্তিষ্কে কোনো প্রশ্ন আসে না! কাজেই কার্যকারণ (cause and effect) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে কোরান- বেদ- বাইবেলকে না মেলানোই উত্তম।

কোনটি বিজ্ঞান আর কোনটি ভুয়া বিজ্ঞান?

এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও অনেক মুসলিম মনে করেন, আমাদের নবি সাধারণ রক্তমাংসের কোন মানুষ ছিলেন না, ছিলেন নূরের তৈরি (এই কারণে বাংলাদেশে একবার কেউ কেউ দাবি তুলেছিল, হাইস্কুলের বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লিখিত 'মানুষ মুহম্মদ' প্রবন্ধটি নিষিদ্ধ করার জন্য;' যদিও লেখাটি নবী মুহম্মদের সম্পূর্ণ পক্ষে ছিল), নবীর আঙুলের ইশারায় চাঁদ দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। দেশে তো বটেই, এমনকি প্রবাসেও বাঙালি মুসলমানরা এরকম বয়ান শোনার জন্য অল্পশিক্ষিত মোল্লাদের হাজার হাজার পাউন্ড-ডলার খরচ করে দেশ থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসেন। সম্প্রতি আমরা জেনেছি, কেবল সৌরজগতের একা (মিলিয়ন মিলিয়ন সৌরজগৎ নিয়ে তৈরি এক-

একটি গ্যালাক্সি আর মহাবিশ্বে এরকম বহু বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে। আমাদের সৌরজগত মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে অবস্থিত) রয়েছে কমপক্ষে ২১টি উপগ্রহ বা চাঁদ (সূত্র : ন্যাশনাল জিওগ্রাফি)। নিশ্চয় সে সময় এই ২১টি চাঁদের খবর জানা থাকলে, আজ হয়তোবা আমরা শুনতাম কোনো মহাপুরুষের আঙুলের ইশারায় ২১টি চাঁদ দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তখন নিশ্চয় কারো-কারো সারাজীবন চোখের জল ফেলতে হত ভাবাবেগের ঠেলায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোন বিষয়টি বিজ্ঞান আর কোন বিষয়টি বিজ্ঞান নয়– এ ব্যাপারটি একজন সাধারণ মানুষ বুঝবেন কি করে? বিষয়টি সুরাহার জন্য বিশ্বজনীন পবিজ্ঞান গবেষণার অনেকগুলি নীতিমালা (criteria) চালু আছে। এদের একটি, যাকে ইংরেজিতে replicability বলা হয়, বাংলা হচ্ছে– গবেষণার ফলাফলের অভিন্নতা। ব্যাপারটি হাইপোথেটিক্যালি একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ধরুন, কেউ একজন দাবি করে বসলেন, তিনি ক্যান্সার বা এইডস নিরাময়ের একটি ওষুধ পেয়ে গেছেন এবং সেটি ১০০% কার্যকরী। এখন লোকটির সেই দাবি কি একজন বিজ্ঞানী মেনে নেবেন, নাকি স্রেফ পাগলামি বলে বাতিল করে দিবেন? এই ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণা ছাড়া কোন মন্তব্যই করার অধিকার রাখেন না। কিন্তু প্রশ্ন হল, পরীক্ষা করতে হলে তাকে কিভাবে এগুতে হবে? এই ক্ষেত্রে যিনি ওষুধটি আবিষ্কার করেছেন, তাকে প্রয়োজনীয় তথ্যের যোগান দিতে হবে। তবে গোপনে তা করলে হবে না। যেকোন স্ট্যান্ডার্ড সায়েন্স জার্নালে তিনি ওষুধটি আবিষ্কারের পদ্ধতি এবং কার্যকারিতা বিষয়ে যেসব রোগীদের ওপর গবেষণা চালিয়েছেন, সেসবের সংশ্লিষ্ট বিবরণ এবং উপাত্ত (statistical data) ছাপাবেন। এখন অন্য আরেকজন বিজ্ঞানী (পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের) একই পদ্ধতি এবং পরিবেশে গবেষণা করে যদি ওষুধটির কার্যকারিতার বিষয়ে একইরকম বা প্রায় কাছাকাছি রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন, কেবল তখনই একজন বিজ্ঞানী বলতে পারেন ক্যান্সার বা এইডসের ওষুধটি আসলেই একটি নতুন আবিষ্কার এবং ১০০% কার্যকরী। এরই নাম replicability। কথিত 'মিরাজ' এর কাহিনী, বা যীশুর 'পুনরুত্থান' এর কাহিনী বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত নয়, কারণ এটি কখনোই কোন বিজ্ঞানী কর্তৃক তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক– কোনভাবেই প্রদর্শন বা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। একইরকম কথা বলা যায়– 'স্বপ্নে পাওয়া গাছ দিয়ে চিকিৎসা' জাতীয় পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত পীর-তান্ত্রিক-বাবাদের প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন সম্পর্কে। নর্থ আমেরিকার বিখ্যাত ম্যাজিসিয়ান (যিনি 'মুক্তমনা'র একজন লেখকও বটে) জেমস র‍্যান্ডির এ বিষয়ে একটি মজার চ্যালেঞ্জ আছে। যে কেউ বিজ্ঞানের নীতিমালা মেনে নিয়ে অলৌকিকত্ব বা সুপার ন্যাচারাল বিষয়ে প্রমাণ দিতে পারলে নগদ এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কার পাবেন।[৩] আমাদের দেশের তথাকথিত 'পীর' এবং 'আধ্যাত্মিক সাধক-সাধিকারা' চাইলে র‍্যান্ডির সাথে যোগাযোগ করতে

পারেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রবীর ঘোষও অনুরূপ চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছেন বহুদিন থেকে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ম্যাজিশিয়ান জুয়েল আইচেরও এ ব্যাপারে একটি ঘোষণা আছে। ল্যাবরেটরিতে কেউ অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারে অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারলে তাকে লক্ষ টাকা (রিয়েল ফিগারটা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না– লেখক) পুরস্কার দেয়া হবে। বাংলাদেশে হাজার-হাজার পীল-ফকির-তান্ত্রিকদের কেউই আজ অবধি জুয়েলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন বলে আমার জানা নেই। অথচ প্রতিনিয়ত পত্রিকায় প্রতারণামূলক বিজ্ঞানের মাধ্যমে হতাশাগ্রস্ত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন পাবলিকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

প্রশ্ন আসতে পারে, বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষায় কি ভুল হতে পারে না? কিংবা বিজ্ঞানের কথাই কি সর্বদা ধ্রুব সত্য বলে মানতে হবে? উত্তরে বলব : বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবশ্যই ভুল হতে পারে, অনেক সময় হয়ও; কিন্তু একজন বিজ্ঞানী বা তার তত্ত্বকে যদি অন্য আরেকজন বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (পরীক্ষা-নিরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা) দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ভুল প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে প্রথম বিজ্ঞানীকে নতুন তথ্য উপাত্ত-ফলাফলের ভিত্তিতে তার থিওরি অবশ্যই পর্যালোচনা করতে হবে, তা তিনি প্রফেসর স্টিফেন হকিংনস বা ড. কদম আলী, যেই হোক না কেন। বিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্যটি যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদীদের বেশি আকৃষ্ট করে থাকে, তা হচ্ছে এই ব্যাপারটি। সে জন্যই বলেছি, বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত মতামতের মূল্য নেই। ধর্মগ্রন্থের সাথে বিজ্ঞানের এটিই মূল তফাৎ। কোরান অপরিবর্তনীয়, অলংঘনীয়; বিজ্ঞান তা নয়, কেননা পরিবর্তনশীলতা হচ্ছে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য আর সতত পরিবর্তনশীল। সেই প্রকৃতির রহস্যের উন্মোচন হচ্ছে বিজ্ঞানের মহান লক্ষের একটি।

শেষ কথা

ধর্ম সম্পর্কীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং অতি-প্রাকৃতিক কাহিনী সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করলে অনেকে আমাকে প্রায়শই এই বলে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন, ভাই যার যার বিশ্বাস তার কাছে। কেন খামোখা মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করে তাদের কষ্ট দেন? বলতে ইচ্ছে হয়, মানুষকে অহেতুক কষ্ট দিয়ে যারা চিত্তে সুখ অনুভব করেন, তারা স্যাডিস্ট এবং আমি মোটেও তাদের একজন নই। তবে কেন আমি কোরান এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে এতসব কথা লিখছি? এতে কি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে আঘাত লাগতে পারে না? প্রশ্ন আসতেই পারে। আর তার জবাবও রয়েছে।

মুসলমানরা সংখ্যায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। মোটেও চাট্টিখানি কথা নয়। এক বিলিয়নের মত মুসলমানদের ঘরে শিশু-কিশোরদের সংখ্যা কত হতে পারে? নিশ্চয়ই তা সংখ্যার মাপে বিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ। এখন

এই কয়েক শত কোটি কিশোরেরা কি করে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হবে যদি তাদের মাতা-পিতা, গুরুজনদের সকলেই বিশ্বাস করেন যে, আল কোরানেই রয়েছে সকল বিজ্ঞান? তারা কি জবাব দেবেন (বা দিচ্ছেন) যদি তাদের স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানের ক্লাশ শেষ করে এসেই জিজ্ঞাস করে : আচ্ছা, আব্বু-আম্মু, বিজ্ঞানের কার্য-কারণ (cause and effect) নীতির সাথে ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আদম-হাওয়া-শয়তান, ফুঁক দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি কি মেলে? কিংবা, ঝড়-বৃষ্টিতো প্রাকৃতিক কারণে ঘটে থাকে, এর সাথে ফেরেস্তা মিকাইলের কি সম্পর্ক? আমার খুব জানতে ইচ্ছা হয়,' মুসলমান বাবা-মায়েরা এসব প্রশ্নের উত্তরে কি বলেন তাদের সন্তানদের। তারা কি বলেন, 'বিজ্ঞানের ক্লাশে যা শিখেছো সব মিথ্যে আর ধর্মগ্রন্থের বর্ণনাই সত্যি?' নাকি, 'বিজ্ঞান এবং ধর্মগ্রন্থ দুটোই সত্যি?' এই দুটো উত্তরই মিথ্যা। আমার বিশ্বাস, সকলে না হলেও মুসলমান মাতা-পিতার অন্তত কেউ কেউ সন্তানদের সামনে সত্য গোপন করাটাকে প্রশ্রয় দেন না এবং সরাসরি বলে দেন, 'কার্য-কারণ নীতি'র উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে ধর্মগ্রন্থের কোন মিল নেই। মিল খোঁজার চেষ্টা করা বৃথা। এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়। যেসব মাতা-পিতা এই সত্যটি তাদের সন্তানদের কোন রাখ-ঢাক ছাড়াই বলার ক্ষমতা রাখেন, তারা কেবল নিজেদের সন্তানদের সত্য, সুন্দর এবং বিজ্ঞানধর্মী মানসিকতা বিকাশের পথটিই সুগম করেন না, তারা এ ক্ষেত্রে মানবতারও একটি উপকার করছেন। কেননা, আমরা সবাই জানি আগামীদিনের সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি আমরা আজই শুরু করতে পারি, তা হচ্ছে– আমাদের নতুন প্রজন্মকে সত্য, সুন্দর এবং বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা।

তথ্য তালিকা

১ Islam and Science : Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality by Pervez Hoodbhoy

২ Pervez Hoodbhoy, "Muslims and the West After September 11", Washington Post (2002)

৩ www.randi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্ম ও নৈতিকতা

ধর্মানুভূতির উপকথা

হুমায়ূন আজাদ

একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় আজকাল, কথাটি হচ্ছে 'ধর্মানুভূতি'। কথাটি সাধারণত এককভাবে উচ্চারিত হয় না, সাথে জড়িয়ে থাকে 'আহত' ও 'আঘাত' কথা দু'টি; শোনা যায় 'ধর্মানুভূতি আহত' হওয়ার বা 'ধর্মানুভূতিতে আঘাত' লাগার কথা। আজকাল নিরন্তর আহত আর আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে মানুষের একটি অসাধারণ অনুভূতি, যার নাম ধর্মানুভূতি। মানুষ খুবই কোমল স্পর্শকাতর জীব, তার রয়েছে ফুলের পাপড়ির মতো অজস্র অনুভূতি; স্বর্গচ্যুত মানুষেরা বাস করছে নরকের থেকেও নির্মম পৃথিবীতে, যেখানে নিষ্ঠুরতা আর অপবিত্রতা সীমাহীন; তাই তার বিচিত্র ধরনের কোমল অনুভূতি যে প্রতিমুহূর্তে আহত রক্তাক্ত হচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যখন সুদিন আসবে, সে আবার স্বর্গে ফিরে যাবে, তখন ওই বিশুদ্ধ জগতে সে পাবে বিশুদ্ধ শান্তি; সেখানে তার কোনো অনুভূতি আহত হবে না, ফুলের টোকাটিও লাগবে না তার কোনা শুদ্ধ অনুভূতির গায়ে। অনন্ত শান্তির মধ্যে সেখানে সে বিলাসে যাপন করবে জীবন। কিন্তু পৃথিবী অশুদ্ধ এলাকা, এখানে আহত হচ্ছে, আঘাত পাচ্ছে, রক্তাক্ত হচ্ছে তার নানা অনুভূতি– এটা খুবই বেদনার কথা; এবং সবচেয়ে আহত হচ্ছে একটি অনুভূতি, যেটা পুরোপুরি পৌরাণিক উপকথার মতো, তার নাম ধর্মানুভূতি। মানুষ বিশ্বকে অনুভব করে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে; ইন্দ্রিয়গুলো মানুষকে দেয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শ্রুতির অনুভূতি; কিন্তু মানুষ, একমাত্র প্রতিভাবান প্রাণী মহাবিশ্বে, শুধু এ পাঁচটি ইন্দ্রিয়েই সীমাবদ্ধ নয়, তার আছে অজস্র ইন্দ্রিয়াতীত ইন্দ্রিয়। তার আছে একটি ইন্দ্রিয়, যার নাম দিতে পারি সৌন্দর্যেন্দ্রিয়, যা দিয়ে সে অনুভব করে সৌন্দর্য; আছে একটি ইন্দ্রিয়, নাম দিতে পারি শিল্পেন্দ্রিয়, যা দিয়ে সে উপভোগ করে শিল্পকলা; এমন অনেক ইন্দ্রিয় রয়েছে তার, সেগুলোর মধ্যে এখন সবচেয়ে প্রখর প্রবল প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তার ধর্মেন্দ্রিয়, যা দিয়ে সে অনুভব করে ধর্ম, তার ভেতরে বিকশিত হয় ধর্মানুভূতি, এবং

আজকের অধার্মিক বিশ্বে তার স্পর্শকাতর ধর্মানুভূতি আহত হয়, আঘাতপ্রাপ্ত হয় ভোরবেলা থেকে ভোরবেলা। অন্য ইন্দ্রিয়গুলোকে পরাভূত করে এখন এটিই হয়ে উঠেছে মানুষের প্রধান ইন্দ্রিয়; ধর্মেন্দ্রিয় সারাক্ষণ জেগে থাকে, তার চোখে ঘুম নেই; জেগে জেগে সে পাহারা দেয় ধর্মানুভূতিকে, মাঝে মাঝেই আহত হয়ে চিৎকার করে ওঠে এবং বোধ করে প্রচণ্ড উত্তেজনা। এটা শিল্পানুভূতির মতো দুর্বল অনুভূতি নয় যে আহত হওয়ার যন্ত্রণা একলাই সহ্য করবে। এটা আহত হলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ধর্মানুভূতির উত্তেজনা ও ক্ষিপ্ততায় এখন বিশ্ব কাঁপছে।

আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া সুখকর অনুভূতি নয়; শরীরে আঘাত পেলে আমরা চিৎকার করে উঠি। শরীরের থেকেও মনোরম যেসব ইন্দ্রিয় আছে আমাদের, সেগুলো আহত হলেও চিৎকার করে ওঠার কথা; তবে সেগুলোর চিৎকারের স্বর আমরা শুনতে পাই না।

আমার অজস্র অনুভূতি দিনরাত আহত হয়; পত্রপত্রিকায় গ্রন্থে গ্রন্থে নিকৃষ্ট শিল্পকলাহীন কবিতার মতো ছোটো বড়ো পংক্তির প্রাচুর্য দেখে আহত হয় আমার কাব্যানুভূতি, নিকৃষ্ট লঘু উপন্যাসের লোকপ্রিয়তা দেখে আঘাত পায় আমার উপন্যাসানুভূতি; রাজনীতিবিদদের অসততা ভণ্ডামিতে আহত হয় আমার রাজনীতিকানুভূতি; এবং আমার এমন অজস্র অনুভূতি নিরন্তর আহত ও রক্তাক্ত হয়, আমি ওগুলোর কোনো চিকিৎসা জানি না, ওগুলো নিয়ে আমি কোন জঙ্গলে, কোন রাস্তায় চিৎকার করবো, তাও জানি না। রাষ্ট্র এগুলোকে অনাহত রাখার কোনো ব্যবস্থা করেনি, রাষ্ট্রের মনেই পড়েনি এগুলোর কথা।

রাষ্ট্রের কি দায়িত্ব নয় আমার এসব অমূল্য অনুভূতিকে অনাহত রাখার সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেয়া? সবাই বলবে এটা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে তাকে খুলতে হবে একটি বিকট 'অনুভূতি মন্ত্রণালয়', যার কাজ হবে কোটি কোটি মানুষের কোটি কোটি অনুভূতির হিসেব নেয়া, সেগুলোর আহত হওয়ার সূত্র বের করা, এবং সেগুলোকে সব ধরনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা।

আমার শিল্পানুভূতি সৌন্দর্যানুভূতি রাজনীতিকানুভূতি কাব্যানুভূতি প্রভৃতি পাহারা দেয়া রাষ্ট্রের কাজ নয়, কিন্তু এখন রাষ্ট্র এক উদ্ভট দায়িত্ব নিয়েছে, মনে করছে ধর্মানুভূতি পাহারা দেয়া তার কাজ; তাই রাষ্ট্র দেখে চলছে কোথায় আহত হচ্ছে কার ধর্মানুভূতি।

আমার শিল্পানুভূতি সৌন্দর্যানুভূতি রাজনীতিকানুভূতি কাব্যানুভূতিকে কেনো রাষ্ট্র পাহারা দিচ্ছে না, কেনো আইন তৈরি করছে না এগুলোকে অনাহত রাখার? তার কারণ রাষ্ট্র শিল্পানুভূতি সৌন্দর্যানুভূতি প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে না, শিল্পানুভূতি সৌন্দর্যানুভূতি হাস্যকর রাষ্ট্রের কাছে, বা রাষ্ট্র মনে করে শিল্পানুভূতি সৌন্দর্যানুভূতি ব্যক্তিগত ব্যাপার, তা যতোই আহত বা নিহত হোক, রাষ্ট্রের কিছুই করার নেই।

কিন্তু ধর্মানুভূতি এমন তুচ্ছ হাস্যকর ব্যাপার নয়, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; রাষ্ট্র এতে বিশ্বাস করে, তাই রাষ্ট্র একে অক্ষত রাখার জন্যে ব্যগ্র।

কিন্তু ধর্মানুভূতি কী বস্তু, যাকে অনাহত অক্ষত রাখার জন্যে রাষ্ট্র এতো তৎপর? বিজ্ঞান, গত কয়েক শতাব্দীতে, এগিয়েছে অনেক, এবং মহাবিশ্বের রূপ এখন আমরা জানি বৈজ্ঞানিকভাবে, যাতে কোনো অলৌকিক পুরাণ নেই; তবু আজো পৃথিবীকে আবৃত করে আছে পৌরাণিক সংস্কৃতি। আমরা মানসিকভাবে আজো বাস করছি পৌরাণিক বিশ্বেই, যে-বিশ্ব প্লাতো, আরিস্ততল, টলেমি ও বিভিন্ন পৌরাণিক বইয়ের। মহাবিশ্বের পৌরাণিক রূপ বদলে দিয়েছেন কোপারনিকাস কেপলার গ্যালিলিও নিউটন আইনস্টাইন হকিং, যার সাথে কোনো মিল নেই, পৌরানিক বইগুলোর বিশ্বের, তবে আমাদের কল্পজগতে তার কোনো স্থান নেই, আমাদের কল্পজগত জুড়ে আছে সেই পৌরাণিক বিশ্ব। ওই বিশ্ব চলে পৌরাণিক বিশ্বাসের নিয়মে, যদিও তা সম্পূর্ণ অবাস্তব অবৈজ্ঞানিক বা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের কল্পজগত ও বাস্তব জগতের মধ্যে চলছে বিরোধ; মানুষ এখন বাস করছে পুরাণ ও বিজ্ঞানের নিরন্তর বিরোধিতার মধ্যে। ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিলো পৌরাণিক মানুষের বিস্ময়বোধ, ভয় ও লোভ থেকে; তারা কল্পনা করেছিলো বহু দেবতা, বহু বিধাতা, এক সময় অসংখ্য দেবতায় তারা ভরে ফেলেছিলো আকাশমণ্ডলকে। ওইসব দেবতাকে তারা ধ্রুব বলে মনে করতো যারা মানতো না ওইসব দেবতা, তাদের পীড়ন করা হতো। তারপর মানুষ উদ্ভাবন করতে থাকে নতুন নতুন দেবতা বা বিধাতা, আগের দেবতা বা বিধাতাদের অসত্য বলে বাতিল করে দেয়, যদিও এক সময় তারাই পূজিত হতো চরম সত্য বলে। দেবতা বা বিধাতায় বিশ্বাস, তার পুজো-আরাধনা ধর্মের একটি বড়ো ব্যাপার; তার চেয়েও বড়ো ব্যাপার হচ্ছে ঐ সব বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে বিশেষ ধরনের সমাজ কাঠামো তৈরি করা। তবে বিশেষ কোনো ধর্ম কোনো অবিনশ্বর ব্যাপার নয়; গত পাঁচ হাজার বছরে পৃথিবীতে বিস্তর ধর্ম প্রস্তাবিত হয়েছে, অনেক ধর্ম কয়েক হাজার বছর ধরে প্রচলিত থেকে নতুন ধর্মের আক্রমণে লুপ্ত হয়ে গেছে।

ধর্ম কি যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ধার্মিকেরাই স্বীকার করেন যে যুক্তি দিয়ে ধর্ম চলে না, ধর্ম চলে যুক্তিরহিত অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে; ধর্মে কোনো প্রশ্ন নেই, নতুন কোনো উত্তর নেই; সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়ে গেছে পুরোনো বইগুলোতে, সব সত্যের আকর হচ্ছে ঐ বইগুলো।

তবে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের বইয়ে বিশ্বাস করে না, সাধারণত প্রচণ্ড বিরোধিতা করে, এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষকে ধর্মহীন বলেই গণ্য করে; আর সব ধর্মের মানুষই মনে করে ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপার, সেখানে যুক্তি অচল। পৃথিবীতে সব কিছুই চলে যুক্তির সাহায্যে : গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি

থেকে শুরু করে সব কিছুই চলে যুক্তির সাহায্যে, কোনো জ্ঞানই যুক্তি ছাড়া সম্ভব নয়, কোনো সত্যই যুক্তি ছাড়া উদ্ঘাটন করা যায় না। অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে আমরা ধান উৎপাদন করতে পারি না, বিশ্বাস দিয়ে আমরা গাড়ি চালাতে পারি না, বা খালের ওপর একটি বাঁশের সাঁকোও তৈরি করতে পারি না; কিন্তু বিশ্বাস দিয়ে আমরা একটি অসামান্য কাজ করতে পারি;– মৃত্যুর পর যেতে পারি চিরসুখের জগতে।

মানুষের শুধু একটি এলাকাই আছে, যেখানে যুক্তি চলে না; সেটি খুবই ভিন্ন রকম এলাকা, সেখানকার সব সত্য লাভ করা যায় অযুক্তি আর অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে। মানুষের এই অন্ধ বিশ্বাসই অভিহিত হয়ে থাকে ধর্মানুভূতি নামে।

মানুষের ধর্মানুভূতিগুলো অভিন্ন নয়, যেহেতু ধর্ম একটি নয়; বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসে পৃথিবী বিব্রত। একেক ধর্মের মানুষের ধর্মানুভূতি একেক রকম, আবার একই ধর্মের ভেতরে রয়েছে বহু উপগোত্র, এবং বিভিন্ন উপগোত্রের ধর্মানুভূতি বিভিন্ন। প্রতিটি ধর্মেই দেখা যায় সাধারণ বিশ্বাসীরা ধর্মের মূলকথাগুলো ঠিকমতো জানে না, তারা ধর্মে সংযোজিত করে নানা নতুন বিশ্বাস, যেগুলোর সাথে ধর্মের মূল বিশ্বাসগুলোর সম্পর্ক নেই। অজস্র ব্যাপার জড়ো হয়ে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় এক ধরনের যুক্তিরহিত বোধ, যাকে বলা হয় ধর্মানুভূতি। এই ধর্মানুভূতিই আহত হয়, এর গায়েই সাধারণত আঘাত লাগে।

ধর্মানুভূতিতে যে আঘাত লেগেছে, তা যে আহত হয়েছে, তা বোঝারও পরিমাপ করার কোনো উপায় নেই। অযৌক্তিক ব্যাপারকে যুক্তির সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না। বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্র এখন যেভাবে চলছে, তাতে প্রতিটি ধার্মিকের ধর্মানুভূতি প্রতিমুহূর্তেই আহত হতে পারে, এবং হচ্ছে।

পৃথিবীতে সম্ভবত এখন বিশুদ্ধ ধার্মিক নেই, থাকলে তাদের ধর্মানুভূতি খুবই আহত হতো। যেমন, মন্দির দেখে আহত হতে পারে একজন ধার্মিক মুসলমানের ধর্মানুভূতি, কেননা তার বিশ্বাসের জগতে মন্দির থাকতে পারে না; আবার মসজিদ দেখে আহত হতে পারে একজন ধার্মিক হিন্দুর ধর্মানুভূতি, কেননা তার বিশ্বাসে মসজিদ অবাঞ্ছিত। একজন খাঁটি মুসলমান যদি দাবি করে যে মন্দির দেখে তার ধর্মানুভূতি আহত হয়েছে, তাই মন্দিরটিকে ধ্বংস করতে হবে, তখন রাষ্ট্র কি করবে? একজন খাঁটি হিন্দু যদি দাবি করে যে মসজিদ দেখে তার ধর্মানুভূতি আহত হয়েছে, তখন কি করবে রাষ্ট্র? খাঁটি ধার্মিকের কোমল ধর্মানুভূতি আহত হতে পারে প্রতিমুহূর্তেই। টেলিভিশন, সিনেমা, বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের, সংসদে নারীদের দেখে আহত হতে পারে তার ধর্মানুভূতি, এবং সে এসব নিষিদ্ধ করার জন্যে আবেদন জানাতে পারে। পৃথিবী ও গ্রহগুলো ঘোরে সূর্যকে কন্দ্র করে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে 'বিগ ব্যাং' বা মহাবিস্ফোরণের ফলে, সেটি হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে আজ

থেকে এক হাজার থেকে দু'হাজার কোটি বছর আগে, তারপর থেকে সম্প্রসারিত হয়ে চলছে, সূর্য আর গ্রহগুলো উদ্ভুত হয়েছে সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে, মানুষ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে আসেনি, বিবর্তনের ফলে বিকশিত হয়েছে বিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ বছর আগে, পাহাড়গুলো পেরেক নয় ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক সত্য বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়;– এগুলোতে প্রচণ্ডভাবে আহত হতে পারে ধার্মিকদের ধর্মানুভূতি, তারা এগুলো নিষিদ্ধ করার জন্যে দাবি জানাতে পারে। তখন রাষ্ট্র কি করবে? রাষ্ট্র কি নিষিদ্ধ করবে বিজ্ঞান? তারপর ধর্মানুভূতি যেহেতু সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক, তাই তা কতটা আহত হলো, তা পরিমাপ করার উপায় নেই। যুক্তি দিয়ে অযুক্তিকে মাপা যায় না।

কোনো পৌরাণিক বিশ্বাস বা ভাবাদর্শ পোষণ, লালন, সংরক্ষণ কি রাষ্ট্রের দায়িত্ব? রাষ্ট্র যদি কোনো ভাবাদর্শ চাপিয়ে দেয় তার অধিবাসীদের ওপর, তাহলে তা হবে ভাবাদর্শগত স্বৈরাচার। সব ধরনের ভাবাদর্শই সন্দেহজনক ও পীড়নমূলক, আর পৌরাণিক ভাবাদর্শগুলো শুধু পীড়নমূলকই নয়, সেগুলো মানুষকে করে রাখে অন্ধ, তার মননশীলতাকে ব্যাহত করে তাকে বিকশিত হতে দেয় না। জ্ঞানের যে-বিকাশ ঘটেছে গত কয়েকশ' বছরে, তা সহজে ঘটেনি; পৌরাণিক ভাবাদর্শগুলো পদে পদে বাধা দিয়েছে জ্ঞানের বিকাশে; বহু জ্ঞানীকে পীড়ন করেছে, পৌরাণিক ভাবাদর্শবাদীরা হত্যা করেছে বহু জ্ঞানীকে। পরে দেখা গেছে জ্ঞানীরাই ছিলেন ঠিক পথে, ভুল ছিলো পৌরাণিক ভাবাদর্শ, কিন্তু তা ছিলো শক্তিমান ও নির্মম। পৌরাণিক ভাবাদর্শের যদিও কোনোই বাস্তব ভূমিকা নেই মানুষের জীবনে, তবু তা আজো শক্তিমান হয়ে আছে রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোর পাহারায়। জ্ঞানীর জ্ঞানের চাইতে রাষ্ট্রের কাছে বেশি মূল্যবান হয়ে আছে অন্ধের ভুল বিশ্বাস। আজকের বিজ্ঞানের যুগেও পৌরাণিক বিশ্বাসগুলোকে প্রবল করে তোলা হচ্ছে, মাতিয়ে তোলা হচ্ছে মানুষকে পৌরাণিক বিশ্বাস দিয়ে; এবং পরিহাসের বিষয় হচ্ছে অসামান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোই ব্যবহৃত হচ্ছে পৌরাণিক বিশ্বাসগুলোর প্রচারে। পৌরাণিক বিশ্বাসগুলোর পক্ষে যেকোনো অসত্য প্রচার করা যায়, এবং প্রচার করা হচ্ছে নিয়মিত, কিন্তু চরম সত্যও বলা যায় না, যা বিরুদ্ধে যায় পৌরাণিক বিশ্বাসের। আজকাল বই, পত্রপত্রিকা, বেতারে ও টেলিভিশনে নিরন্তর প্রচারিত হচ্ছে পৌরাণিক বিশ্বাস, যার কোনো যুক্তিগত ভিত্তি নেই, যেগুলোর অধিকাংশই হাস্যকর নিরর্থক কথা; কিন্তু পৌরাণিক বিশ্বাসের বিপক্ষে একটি কথাও বলা যায় না বেতার ও টেলিভিশনে।

জ্ঞানের বিকাশের অর্থই হচ্ছে পুরোনো পৌরাণিক বিশ্বাসগুলোকে আহত করা, শুধু আহত নয় সেগুলোকে সম্পূর্ণ বাতিল করা; কিন্তু রাষ্ট্রগুলো জ্ঞানের সুবিধাগুলো নিচ্ছে, কিন্তু পরিহার করছে তার চেতনাকে এবং পোষণ ও পালন করে চলছে পৌরাণিক বিশ্বাস।

মানুষ কোনা ধর্ম বা ধর্মানুভূতি নিয়ে জন্ম নেয় না। কিন্তু জন্মের পরই তার ওপর সক্রিয় হয়ে ওঠে পরিবারের ধর্ম বা ধর্মানুভূতি, এবং সে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় পরবারের ধর্মগোষ্ঠীতে। মা বাবা, আত্মীয় স্বজন, এলাকা, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা, বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠ্যপুস্তক, পত্রপত্রিকা, রাষ্ট্রযন্ত্র তার ভেতরে ঢোকাতে থাকে ধর্ম ও ধর্মানুভূতি, পুলিশের মতো পাহারা দিতে থাকে তাকে, এবং তার মননশীলতাকে নষ্ট করে সেখানে বিকাশ ঘটাতে থাকে যুক্তিহীনতা। সে যে-ধর্মের সদস্য সেটি যদি হয় রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষিত ধর্ম, তাহলে তার ধর্মানুভূতি উগ্র থেকে উগ্র হয়ে উঠতে থাকে। একটি প্রশ্ন ওঠে মাঝেমাঝেই যে যারা শিক্ষিত, জ্ঞানের বিভিন্ন এলাকায় যাদের অনেকেই অর্জন করেছে সাফল্য, তারা কেন ধর্মের মতো অযৌক্তিক বিশ্বাস পোষণ করে? তারা যে ধর্মবিশ্বাস পোষণ করে, এটাকেই মনে করা হয় ধর্মের সঠিকত্বের প্রমাণ। কিন্তু এটা কোনো প্রমাণ নয়। এ ধরনের শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাও জন্ম নেয় বিশেষ পরিবারে, বাল্যকালে তাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয় ভয় ও লোভ, তা থেকে তারা কখনো মুক্ত হতে পারে না; তারা যুক্তি ও অযুক্তির বিরোধিতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। তারা বিরোধিতাটা বুঝতেও পারে না, কেননা মানুষ এমন অদ্ভুত প্রাণী, যে একই সাথে পোষণ করতে পারে পরস্পরবিরোধী চেতনা। ধর্ম যে শুধু পারলৌকিক অনন্ত সুখের লোভ দেখায়, তাই নয়, বাস্তব জগতেও নানা সুবিধা দেয়। প্রথা মেনে নিলে সুবিধা অনেক, না মানলে বিপদ অনেক। তাই সে ইহজাগতিক ও পরজাগতিক দু'রকম সুবিধার কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাই শিক্ষিত, এমনকি বিখ্যাত মানুষদের ধর্মানুরাগও ধর্মের অভ্রান্ততার প্রমাণ নয়। ধর্ম যেহেতু ভাল বলে স্বীকৃত, তাই আশা করতে পারি যে ধার্মিক মানুষেরা সৎ মানুষ হবে; কিন্তু আমরা কি নিয়মিত দেখি না ধার্মিকদের শোচনীয় অসততা?

বাংলাদেশ এখন একটি প্রবল ধার্মিক দেশ; প্রার্থনালয়ে দেশ ছেয়ে গেছে, চারপাশ উপচে পড়ছে ধার্মিকে, উদ্দাম নাচগানের মধ্যে টেলিভিশন ব্যস্ত থাকছে ধর্মপ্রচারে, নেতানেত্রীরা তীর্থযাত্রার পর তীর্থযাত্রা করছেন, দিকে দিকে চলছে ধর্মের অলৌকিক উদ্দীপনা; তাই বাংলাদেশ ভরে ওঠার কথা সততায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্যাপক অসততা, অতুলনীয় দুর্নীতি, সীমাহীন ধর্ষণ-পীড়ন। ধর্ম ও সততা হওয়া উচিত ছিলো সমানুপাতিক; কিন্তু দেখা যাচ্ছে ধর্ম ও অসততা, দুর্নীতি, ধর্ষণপীড়ন হয়ে উঠেছে সমানুপাতিক। তাহলে ধর্মানুভূতি কী দিচ্ছে আমাদের শুধু একরাশ অযৌক্তিক বিশ্বাস ছাড়া?

ধর্মানুভূতি কোনো নিরীহ ব্যাপার নয়, তা বেশ উগ্র এবং এর শিকার অসৎ কপট দুর্নীতিপরায়ণ মানুষেরা নয়, এর শিকার সৎ ও জ্ঞানীরা; এর শিকার হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞানের সাথে ধর্মের বিরোধ চলছে কয়েক সহস্রক ধরে, উৎপীড়িত হতে

হতে জয়ী হচ্ছে জ্ঞান, বদলে দিচ্ছে পৃথিবীকে; তবু আজো পৌরাণিক বিশ্বাসগুলো আধিপত্য করছে, পীড়ন করে চলছে জ্ঞানকে। ধর্মানুভূতির আধিপত্যের জন্যে কোনো গুণ বা যুক্তির দরকার পড়ে না, প্রথা ও পুরোনো বই যোগায় তার শক্তি, আর ঐ শক্তিকে সে প্রয়োগ করতে পারে নিরঙ্কুশভাবে। উগ্র অন্ধ ধর্মানুভূতি বিস্তারের পেছনে কাজ করে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্নীতি ও রাজনীতি। দরিদ্রের শিক্ষালাভের সুযোগ নেই, তাই জ্ঞানের সব এলাকাই তার অজানা; তার জ্ঞানহীন মনের ভেতর প্রতিবেশ সহজেই সংক্রামিত করে অযুক্তি ও অপবিশ্বাস; আর তাতে সে খুঁজে পায় শান্তি ও শক্তি। তার কিছু নেই বলে তার সাথে থাকে এক অলৌকিক মহাশক্তি, যা তাকে বাস্তবে কিছু দেয় না, কিন্তু মানসিকভাবে সবল করে রাখে। দুর্নীতি ধর্মের পক্ষে কাজ করে; দুর্নীতিপরায়ণ মানুষেরা নিজেদের অপরাধ ঢেকে রাখার জন্যে জাগিয়ে তোলে ধর্মীয় উগ্রতা। তাই সমাজে যতো দুর্নীতি বাড়ে ততো বাড়ে ধর্ম। রাজনীতিবিদেরাও ব্যবহার করে ধর্মকে; তারা দেখতে পায় ক্ষমতায় যাওয়ার সহজ উপায় ধর্মের উদ্দীপনা সৃষ্টি; তাদের কল্যাণ করতে হয় না মানুষের, বিকাশ ঘটাতে হয় না সমাজের– এগুলো কঠিন কাজ; সবচেয়ে সহজ হচ্ছে ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাওয়া ও থাকা। কিন্তু এতে সমাজ নষ্ট থেকে নষ্টতর হতে থাকে, যা এখন ঘটছে বাঙলাদেশে।

রাষ্ট্রকে মুক্ত হওয়া দরকার পৌরাণিক আবেগ থেকে, কেননা পৌরাণিক আবেগ গত কয়েক সহস্রকে মানুষের কল্যাণ বিশেষ করেনি, ক্ষতিই করেছে বশি; এবং আজো ক্ষতি করে চলছে।

মানুষের ধর্ম– মানবতা

সুমিত্রা পদ্মনাভন

ধর্ম নিয়ে আমি একটা খুব সহজ লেখা লিখতে চাই, যেটা সবাই পড়ে বুঝতে পারবে। ধর্ম যেহেতু সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকেই প্রভাবিত করে, তাই ধর্মকে একটা কঠিন গবেষণার বিষয় হিসেবে দেখা উচিত নয়। জন্ম, মৃত্যু বা ভালোবাসার মত বিশ্বজনীন এবং সর্বজনগ্রাহ্য বিষয় হিসেবেই দেখা উচিত, দেখান উচিত।

কিন্তু সব সময় তো তা হয় না। আমরা প্রায়শই দেখি ধর্মবিষয়ক আলোচনা হয় কিছুটা গবেষণামূলক, কিছুটা উপদেশমূলক। তার ভাষাও হয় সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এই দুর্বোধ্যতাই ধর্মতত্ত্বকে সাধারণের চোখে রহস্যময় (mystic) করে তোলে। ধর্মগুরুদের করে দেয় অতিমানাব। মন্ত্রোচ্চারণের আলো-আঁধারি যে ধর্মীয় বাতাবরণ তৈরি করে, তাতে সাধারণ মানুষের মনে যে ভয়-ভক্তির সঞ্চার হয়, তার অনেকটাই না বোঝার কারণে। অর্থাৎ একটা বিষয়কে ভালো করে জানি না, বুঝি না বলেই তাকে ভক্তি করি তাতে আকৃষ্ট হই। এই যে উল্টো কারণে আকৃষ্ট হওয়া এতেই যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষের আপত্তি। এখানেই বিজ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিবাদের বিরোধ। একটি সহজ উদাহরণ দেই : একেক পূজোর প্রচলিত সংস্কৃত মন্ত্র যদি সোজা বাংলায় অনুবাদ করে গড় গড় করে পড়ে যাওয়া যায়– তাহলেই তার সব রহস্যময়তা ঘুচে যাবে। তখন তার আকর্ষণ কমে যেতে বাধ্য। অনেক সময় কিছুটা হাস্যকর ও অপ্রাসঙ্গিকও মনে হতে পারে। আবার তার মধ্যে কিছু চিরন্তন সত্যও পাওয়া যেতে পারে। আর সেটি জেনে বেছে নেয়ার জন্যেই দরকার আগে বুঝে নেয়া। প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অপ্রয়োজনীয় বাহ্যিক রীতি নীতিকে বাদ দিতে হলে তাই প্রথমে ধর্ম কি ও কেন এটা সহজ ভাবে বুঝতে হবে। এখানে আমি ধরে নিচ্ছি আমরা সবাই বর্তমান সামাজিক অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের যে ভূমিকা তাতে খুশি তো নইই বরং কিছু পরিবর্তন ও বিকল্প চাইছি। চাইছি যুক্তিবোধ ও ন্যায়বিচার।

প্রথমে দেখা যাক ধর্ম কথাটার অর্থ কি? চলন্তিকা বাংলা অভিধানে এর মানে করা হয়েছে সৎকর্ম, সদাচার, পুণ্যকর্ম, কর্তব্যকর্ম, সমাজ হিতকর বিধি।

আরেকটি অর্থ হল– পরম্পরাগত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতি, সংস্কার রীতিনীতি এবং ঈশ্বর পরকাল ইত্যাদি বিষয়ক মতামত।

তৃতীয় অর্থে বস্তু বা ব্যক্তি নির্বিশেষে– স্বভাব, গুণ বা শক্তি।

এই শেষ প্রসঙ্গটি বস্তুর উপর যেভাবে প্রযোজ্য অর্থাৎ পদার্থের ধর্ম, আগুনের ধর্ম, তরল বা মৌলিক পদার্থের ধর্ম, সেই অর্থে মানুষের উপর প্রয়োগ করলে পাই মানুষের বিশেষ স্বভাব বা গুণ। যদিও আমরা জানি মনুষের গুণের বদলে মেলা দোষও থাকতে পারে- আমরা তাকে ধর্ম বলবো না। ধর্ম বলবো সেই সব বিশেষত্বকে যা আদর্শ মানুষের গুণাবলী, যা মানুষকে সভ্যতার পথে এতদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছে-মানুষকে মানুষ করেছে। অর্থাৎ প্রথম সংজ্ঞানুযায়ী সৎকর্ম, সদাচার, কর্তব্যকর্ম সমাজহিতকারিতা ইত্যাদি।

ধর্মের এই বিস্তৃত সংজ্ঞা থেকে এসেছে দ্বিতীয় সংজ্ঞা, যাকে আমরা বলতে পারি ধর্মের সংকীর্ণ সংজ্ঞা। সংকীর্ণ কারণ এটা স্থান কাল ভেদে পাল্টেছে, পাল্টাচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মের উপাসনা পদ্ধতি আচার অনুষ্ঠান কতটা আলাদা তা তো আমরা জানি, ঈশ্বর সম্পর্কে মতও হরেক রকম। বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বর নেই। হিন্দুদের আছে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর ব্রাহ্মধর্মে পরমপিতা হচ্ছে নিরাকার ব্রহ্ম। তাহলে এই দ্বিতীয় সংজ্ঞা থেকেই আমরা পাচ্ছি বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রূপগুলো। অথচ 'সমাজহিতকর পুণ্যকর্ম বা কর্তব্যকর্ম' সংজ্ঞাটি কিন্তু বিশ্বজনীন রূপ নিতে পারতো– হতে পারতো সকলের জন্য এক ধর্ম। কিন্তু তা তো হয়নি। স্থানকাল ভেদে আচার অনুষ্ঠান পরম্পরাগত বিশ্বাস পাল্টে গেছে। কারণ প্রতিটি আলাদা গোষ্ঠীপতি বা গ্রামের মোড়ল যেমন তার নিজের মতো করে নিয়মাবলী তৈরি করে, ধর্মের প্রবর্তকরাও তাই করেছে। প্রতিষ্ঠাতার রচনায় ও প্রচারে তাই পৃথক পৃথক রূপ নিল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো। আর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হল ধর্মের মোড়লরা ও তাদের অনুসরণকারীরা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে। প্রতিটি ধর্মগুরু তাই আজও সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা ও উদার প্রগতিবাদী কথার ফাঁকে ফাঁকে নিজের ধর্মমতটির শ্রেষ্ঠত্বের কথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেন না। অনুগামীরা ক্রমশই ভুলে যেতে থাকলো ধর্মের আসল সমাজহিতকর উদ্দেশ্য। প্রকট হতে থাকল আচার বিচার প্রকরণ পদ্ধতি। মাঝে মাঝে প্রতীকী সমাজসেবা করে পুণ্যার্জন করার মধ্যে আবদ্ধ রইলো তাদের সদাচার। বাড়তে লাগল বিভেদ। শুরু হল মৌলবাদীদের তাণ্ডব বিশ্বজুড়ে। মৌলবাদীরা তো ধার্মিকই। অতিমাত্রায় ধার্মিক।

এখন আর পৃথিবী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত নয়। এখন তাই আলাদা আলাদা নিয়মকানুনগুলো সমন্বয়ের চেয়ে বেশি সংঘর্ষের কারণ হয়ে উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই।

শিক্ষিত মহলের একটি প্রিয় উক্তি হচ্ছে– 'কেন? সব ধর্মেই তো ভালোবাসার কথা, সহনশীলতার কথা বলা হয়েছে– তাহলে ধর্ম কি দোষ করলো? থাক না প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো মিলেমিশে।' তারপর একটু গভীরে গেলেই উদারতার মুখোশ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে আসল চেহারা। তখন দেখা যায় প্রতিটি তথাকথিত ধার্মিক মানুষই কি মমতায় আঁকড়ে থাকে বাপ ঠাকুর্দার ধর্মটিকে, কি সযত্নে এড়িয়ে যায় বা ভুলে যায় জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মটির দোষত্রুটিগুলোকে। কি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে পরধর্মের ত্রুটি বা ভ্রান্তিবিশ্বাসকে। ভুলে যায় তার ধর্মটি সে নেহায়তই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে– দেখে শুনে বেছে নেয়নি। তাই শ্রেষ্ঠ বলে গর্ব করা সাজে না।

অর্থাৎ বিরোধ যতো তা সবই মূলত আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতি, ঈশ্বর সম্পর্কিত মতামত- এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। মিল যেখানে তা হলো ন্যায়বোধ, কর্তব্যকর্ম, সৎগুণ, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে। তাহলে আজ এই বিজ্ঞানের যুগে দাঁড়িয়ে আমরা কেন ভুলে যাবো ধর্মের আসল উদ্দেশ্য? কেন আচার-অনুষ্ঠান, বাহ্যিক পদ্ধতি প্রকরণকে ছেঁটে ফেলতে পারব না? কেন মেনে নেব না মানবিক গুণকেই ধর্ম বলে?

নিশ্চয়ই পারব। পুরোনো ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মগুরুদের আদেশকে অভ্রান্ত বলে মেনে না নিলেই পারব। সমাজবিজ্ঞানে, প্রকৃতিবিজ্ঞানে যা পরীক্ষিত সত্য তা নিয়ে খোলা মনে পড়াশোনা করে নিলেই পারব ন্যায়-অন্যায়ের, ঠিক-ভুলের বিচার করতে। বেরিয়ে আসতে পারব ভয় ও অজ্ঞতাজনিত অন্ধভক্তির গণ্ডি থেকে। তখন আর মন্ত্রকে যাদুশক্তি বলে ভুল হবে না, কষ্টকর অমানবিক আচার বিচারকে আদর্শ ধর্মাচরণ বলে ভুল হবে না। সত্যকে এড়িয়ে না গিয়ে তাকে জানার চেষ্টাই সঠিক ধর্মাচরণ। এই জানার চেষ্টায়ই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মানবধর্ম।

১৯৮২ সালের জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করেছে– 'প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা আছে ব্যক্তিগতভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে নিজের পছন্দমত বিশ্বাস বা ধর্মকে অনুসরণ করার।' অর্থাৎ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তার নিজের পছন্দমত ধর্মমত বা বিশ্বাস গ্রহণ করতেই পারেন। পিতামাতার ধর্মকেই মেনে নিতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অথচ অনেকেই এই সহজ কথাটা জানেন না। সেই ছোট বেলায় চাপিয়ে দেয়া, না বুঝে মন্ত্রোচ্চারণ করা, ভয়-ভক্তি মেশানো ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে তাই অনেকেই এখনও মনে করেন অসম্ভব বা অন্যায়।

প্রথম মানবধর্ম সমাজের ধারণা অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৯ সালে নিউইয়র্কে। অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের অধিকার ঘোষণার অনেক আগে। তাই মানবধর্মীরা তখন ধর্মগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু আজ UNO-এর ধারা অনুযায়ী স্বীকৃতি না পাওয়ার কোন কারণ নেই। ১৯২৯ এ পাশ্চাত্যে 'Humanism' নামে যে নতুন

মতবাদের জন্ম হয়েছিলো সেটি ছিলো ইহুদী-খ্রিস্টান কট্টরপন্থীদের অবিরাম সংঘর্ষের একটা ফলস্বরূপ। তখনকার গণ্যমান্যরাই ছিলেন এই দলে। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন একজন ইহুদী (জন্মসূত্রে) ধর্মযাজক ও কয়েকজন একেশ্বরবাদী পাদ্রী। তখনকার সমাজে সমস্ত ব্যাপারে ধর্মীয় ধ্বজাধারীদের খবরদারির অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এই নতুন আদর্শ, নতুন জীবন দর্শন উঠে এসেছিল। এরা মানবধর্মকে অন্য সমস্ত প্রচলিত ধর্মের বিকল্প হিসাবে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। এদের উপদেষ্টামণ্ডলীতে ছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন, উইল ডুরান্ট, থেমাস ম্যান, জুলিয়ান হাক্সলি প্রমুখ জ্ঞানী গুণী বোদ্ধারা। এদের পথপ্রদর্শক ছিল আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞান। এদের আস্থা ছিল, প্রত্যয় ছিল। ছিল না অন্ধবিশ্বাস। এদের আস্থা ছিল গণতন্ত্রে, বিজ্ঞানে, সব মানুষের সমান অধিকারে। সে যুগে ধর্ম হিসেবে এটি স্বীকৃতি পায়নি।

এখন এই ধর্মীয় স্বাধীনতার যুগে অনেক বিশ্বাস যা Cult বা ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে উঠে এসেছে, তার আলাদা স্বীকৃতি চাইছেন। যেমন রামকৃষ্ণ–ভক্তরা রামকৃষ্ণপন্থী (Ramkrishnaite) হিসেবে আলাদা ধর্মীয় স্বীকৃতি চাইছিলেন বেশ কিছু বছর ধরেই, কিন্তু তারা মূলত হিন্দু বলেই তাদের এই আবেদন বাতিল করে দেয় সরকার।

অবাক লেগেছিল যখন একজন সফল আবেদনকারীর চাকুরীতে ঢোকা নাকচ হয়ে যায় শুধু 'ধর্ম' কলামে 'মানবতাবাদ' লেখার জন্য। যেন মানবিক হওয়াটা খুব গর্হিত কোন ব্যাপার। সেটা ১৯৯২-১৯৯৩ সাল। তখন যুক্তিবাদী আন্দোলন তুঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা আবেদনপত্রে 'ধর্ম' কলাম তুলে দেয়ার দাবি জানাচ্ছে। 'ধর্ম' যেহেতু ব্যক্তিগতব্যাপার তাই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মীয় পরিচয় জানানো জরুরি নয়। যারা কোন ধর্ম মানেন না তারা কলামটা খালি রাখতে চাইলেও আপত্তি উঠেছে নানা জায়গায়। ফর্ম বাতিল করা হয়েছে অসম্পূর্ণ বলে। সেই সময় বহু মানুষ দ্বারস্থ হয় মানবতাবাদী সমিতির। এ সময় Humanists Association of India, সংস্থাটি সক্রিয় হয় মানবতাকে ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে। দেশের রাজনৈতিক. নেতাদের কাছে ও সংবাদপত্রের দপ্তরে যোগাযোগ করে ঘটনাটি জানানো হয়। যাতে একজন মানুষ নিজের ধর্ম 'মানবতা' বলতে পারে তার জন্য সরকারি কোনও নিয়মাবলী বা Guideline আছে কি না তা স্পষ্টভাবে জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে রামকৃষ্ণ মিশনের ঘটনার উল্লেখ করে সবাই বলেন যে এভাবে নতুন ধর্ম তৈরি করা সম্ভব নয়।

তারপর মানবতাবাদী সমিতি সরাসরি চিঠি পাঠায় রাষ্ট্রসংঘের অফিসে। উত্তর আসে দেরি না করেই। UNO তাদের Human rights এবং Religious rights সংক্রান্ত যাবতীয় বই ও কাগজপত্র পাঠিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় '১৯৮১' এর

জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করেছে প্রতিটি মানুষের যে কোন ধর্মমত গ্রহণ ও চর্চা করার স্বাধীন অধিকার আছে।

তারপরই এই আইনি লড়াইতে যৌথভাবে নেমে পড়ে মানবতাবাদী সমিতি ও যুক্তিবাদী সমিতি। রাষ্ট্রসংঘকে চিঠি দিয়ে জানানো হয় যে ভারত UNO-র সদস্য দেশের অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মকে এখানে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। মানবতাকেও (Humanism)ধর্ম বলে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু UNO তার Guideline পাঠিয়ে দিয়েছে, আমরা UNO এর অন্তর্গত দেশ হিসেবে মনে করি মানবতা আমাদের ধর্ম হতে কোন বাধা নেই। এবং আইনিভাবে এই ধর্মমতকে গ্রহণ করার অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠা করব। এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিদেশী দূতাবাসগুলোতেও। তারপর ভারতের মানবতাবাদী সমিতির সহায়তায় কোর্টে গিয়ে ঘোষণা দিয়ে (affidavit) দলে দলে ছেলেমেয়ে মানবতাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে (১৯৯৩, ১০ ডিসেম্বর)।

১৯৯৩ এর ১০ ডিসেম্বর 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' এ প্রথম ৫৪ জন সদস্য সদস্যা আইনিভাবে মানবধর্মী বা (Humanist) হন। এই কঠিন লড়াইটা জেতার পর এখন আর কোন বাধা নেই যে কোন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশে এই একইভাবে যে কেউ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। আইনি কাগজে মানবধর্ম (Humanism) ঘোষিত হওয়ার পর তাকে অস্বীকার করার অর্থ কোর্টের অবমাননা করা। তারা মানবতাবাদীদের (Humanist) কার্যকলাপ শাখা বিস্তার করেছে নানাভাবে। বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব ও সাংস্কৃতিক সংস্থা স্বাধীনভাবে মানবতাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। মানবতাবাদীদের সংখ্যা এখন আর কম নেই। তারা যেহেতু প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি মানেন না, 'মরণোত্তর দেহদান' কর্মসূচি তারাই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। মৃত্যুর পর দেহটাকে প্রচলিত প্রথায় সৎকার না করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যবহারে কাজে লাগানোর জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন স্বাস্থ্যদপ্তরের নিয়ম মত।

তবু এখনও লক্ষ কোটি মানুষ আছেন যাঁরা এই আন্দোলন থেকে শতযোজন দূরে। অনেকে আছেন যাঁরা এতসব জানার পরও মনে করেন এই প্রচলিত ধর্মকে বাদ দেয়াটা এখনও সম্ভবপর নয়। চেষ্টা করাটা সময়ের অপচয়। মানবতাবাদী আন্দোলনের সাফল্যই তাদের সংশয়ের জবাব। অনেক শুভানুধ্যায়ী আছেন যারা মনে প্রাণে সত্যিকারের মানবতাবাদী কিন্তু খাতায় কলমে মানবধর্মী হননি। হয়তো তাদের কিছু দ্বিধা আছে। হয়তো আত্মীয় বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন মনে করে এগিয়ে আসতে সংকোচ বোধ করছেন। এরকম মানুষদের কাছ থেকে দুটো

সুচিন্তিত মতামত বা প্রশ্ন পেয়েছি যেগুলোর উত্তর দেয়াটা জরুরি। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে- এত ধর্ম থাকতে আবার একটা নতুন ধর্ম 'মানবধর্ম'? তাহলে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব না তো? মানবিক হতে হলে আবার কাগজে সই করতে হবে কেন?

আবার একটি নতুন ধর্ম কেন?

এর উত্তরে একটা কথা বুঝতে হবে, প্রথম যারা মানবতাবাদী হয়েছেন– তারা সবাই জন্মসূত্রে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু সেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধর্মটিকে তারা ত্যাগ করেছেন। যতটা নিরপেক্ষতা তাদের আছে পিতামাতার ধর্মের প্রতি ততটাই নিরপেক্ষতা আছে অন্যান্য সব ধর্মের প্রতি তাই তারা বিচার করে নির্দ্বিধায়, পক্ষপাতহীনভাবে। তারা কিন্তু কেউ সমাজবিচ্ছিন্ন নন। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ছড়িয়ে আছেন এমন মানুষ যারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ত্রুটি ও বিভ্রান্তিগুলোর সঠিক নিরপেক্ষ বিচার করেন নির্দ্বিধায়। নাকচ করেন হাসিমুখে। অসততা বা ভণ্ডামির গন্ধ পেলে বাতিল করেন সহজেই। এমন নিরপেক্ষ সৎ সাহসী মানুষেরা সর্বত্রই আছেন। তারা আত্মীয় বন্ধু পরিবৃত্ত হয়ে আছেন। তারা শারদীয় উৎসবে আনন্দ করেন, কিন্তু অঞ্জলি দেবার প্রয়োজন বোধ করেন না। ঈদের উৎসবে খাওয়া দাওয়া করেন, কোরবানির ধার ধারেন না। পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখতে কেদারনাথের পথে পাড়ি দেন, মন্দিরে পুজো দেন না। তারা কেউ আলাদা হননি। তারা নিজেদের পরিচয় দেন মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ বলে। তারা প্রভাবিত করেন বন্ধুদের। নিজেরা বর্জন করেন সমস্ত রকম অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানকে। ধর্মপরিচয় বহনকারী পদবী বা পোশাক বা স্টাইল বর্জন করেন। এদের অনেকেই পদবী ত্যাগ করেছেন, বিয়ে করেছেন Special Marriage Act-এর আইনে, মেয়েরা বিয়ের পরও স্বামীর পদবী নেননি, স্টাইল করেন নিজের রুচি অনুযায়ী, তবে কোথাও কোনা বাধ্যবাধকতা নেই। মানবতাধর্মী হতে গেলে কোন কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় না, দীক্ষা নিতে হয় না, কোনও পুস্তক বা ধর্মগুরুর প্রতি আনুগত্য দেখাতে হয় না। কাজটা তাই খুব কঠিন নয়। চাই শুধু মানসিক দৃঢ়তা, সোচ্চার ঘোষণা– 'আমি মানবতায় বিশ্বাসী। কোনও প্রচলিত ধর্ম মানি না।'

এই 'মানি না' বলাটা সকলের পক্ষে সহজ হয় না। কারণ মেনে চলারাই দলে ভারি, তারা সংগঠিত। তাই মানবতাবাদীদেরও সংগঠিত হওয়ার সময় এসেছে। যাঁরা প্রতিকূল পরিবেশে একা লড়ছেন, তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেই এই সংগঠিত আন্দোলন আজ দানা বাধছে। তাদেরকে শুধু 'নাস্তিক' পরিচয় আশ্রয় দিতে পারে না। তাই যতদিন না ধর্ম পরিচয় অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হচ্ছে ততদিন বিকল্প হিসেবে মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্মমত। সমস্ত বঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে, সমাজে মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে এই মানবতাবাদীদের একজোট হতে হবে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে দেখা

যাবে সমস্ত পৃথিবীতে যত মানবতাবাদী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তারা সম্মিলিতভাবে অন্য সব ধর্মাবলম্বীদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যেদিন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী হয়ে উঠবেন– সেদিন আর প্রয়োজন হবে না সংগঠন গড়ার বা সই করে 'মনুষ্যধর্মাবলম্বী' হওয়ার।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে- ধর্মকে ঘিরেই আমাদের যত উৎসব, শিল্প, সংস্কৃতি, আনন্দানুষ্ঠান। প্রচলিত ধর্মকে বাদ দিয়ে কি করে হবে উৎসব? ছুটি হবে কি উপলক্ষে? একেবারে যান্ত্রিক হয়ে যাবে যে সমাজজীবন!

এখন দেখা যাক ধর্মাচরণকে বাদ দিয়ে কী কী উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করা যায়? রবীন্দ্রনাথ তার বিশ্বভারতীতে তো আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেলেন প্রচলিত মূর্তিপূজা আচার-বিচার বাদ দিয়ে কিভাবে উৎসবে মাতিয়ে রাখা যায় আশ্রমিকদের। আজকের মানবতাবাদীদেরও তাই বারো মাসে তেরো পার্বণ না থাকলেও চৌদ্দরকম কর্মসূচি থেকেই যায়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, তাছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিজ্ঞানমেলা রক্তদান-চক্ষুদান-দেহদান শিবির তো আছেই বছরের যেকোনও সময়ে।

সত্যিই কি ধর্ম ছাড়া অনুষ্ঠান হয় না? ছুটি হয় না?

ভেবে দেখুন তো? শিশুর জন্মের পর তার নাম হবে। সে প্রথম ভাত খাবে। তার হাতেখড়ি হবে। এগুলো সবই তো আনন্দের একেকটা উপলক্ষ। সবাই মিলে উৎসব করাই যায়, তার জন্য ঈশ্বর বিশ্বাস, পূজা প্রার্থনা, মন্ত্রোচ্চারণের কি প্রয়োজন? তাছাড়া জন্মদিন, পরীক্ষা পাস, বিবাহ (অবশ্য আইনি মতে) এ সবেই তো সাধ্য মতো আনন্দ উৎসব করা যায়। কিন্তু যুক্তিবাদী, মানবধর্মীদের কাছে কোনটাই বাধ্যতামূলক নয়। না করলেই সাংঘাতিক কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে না। আর সময়মতো মরণোত্তর দেহদানকে সার্থক করতে হলে যথেষ্ট কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। শ্মশান যাত্রা নাই বা হলো- আত্মীয় বন্ধুদের ডাক পড়বেই দেহ দানের ব্যবস্থাপত্র করতে। তারপর সবাই মিলে স্মরণসভার আয়োজন করাটাই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সবচেয়ে ভাল উপায় নয় কি? একটা ছুটির দিন বেছে নিয়ে প্রয়াত মানুষটির ছবি ও স্মৃতিকে ঘিরে গান, আলোচনা, জীবনী পাঠ সবই চলতে পারে। দিনক্ষণ দেখে গঙ্গাস্নান, যজ্ঞ, মন্ত্র, মাথা নেড়া করে অদ্ভুত পোষাক পরে কৃচ্ছ্রসাধন– এ সবই অর্থহীন আর হাস্যকর। আত্মাই যেখানে নেই সেখানে 'আত্মার শান্তি' ইত্যাদি অর্থহীন কল্পনা। মৃত্যুতেই জীবনের শেষ তাতে কী জীবন অর্থহীন হয়ে যায়? এক শ্রদ্ধেয় মানুষের স্মৃতি, কর্ম ও শিক্ষাই তো তাকে অমর করে। তাহলে স্মৃতিচারণই তো সবচেয় ভালো উপায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের। আর সাধ্য না থাকলেও কারুর মৃত্যু উপলক্ষে বহু মানুষকে ডেকে ভুরিভোজন করানোও একরকমের অশ্লীল মূর্খতা মনে কর মানবধর্মীরা। তাদের প্রতিবাদকে সোচ্চার

করতে তাই মানবতাবাদীরা সবচেয়ে মারাত্মক আর অর্থহীন দুটো ভুরিভোজের নিমন্ত্রণকে সামাজিকভাবে বয়কট করে। একটি শ্রাদ্ধের খাওয়া, আরেকটি পৈতে বা উপনয়ন। একটি কিশেরাকে পৈতে পরিয়ে তাকে দ্বিজত্বে উত্তীর্ণ করা হচ্ছে জঘন্য জাত প্রথাকে স্বীকার করে নেয়ার অমানবিক প্রথা। এই অনুষ্ঠান শিক্ষিত সমাজের লজ্জা। বাকি সব প্রচলিত অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার পালন বাদ দিয়ে প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করতে মানবধর্মীদের আপত্তি নেই। তবে কেন বিবাহে পণের ব্যাপার জানা থাকলে তাও অবশ্যই বর্জনীয় হবে।

এইভাবে সমাজে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে থেকেও মানবতাবাদীরা আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে এবং সুযোগ মত মানবতার প্রচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে থাকে। মানুষের সাম্যে বিশ্বাসী যুক্তিবাদী আন্দোলনও তো আনন্দ উৎসব।

এতক্ষণ তো গেল পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলো, এরপর দেখা যাক সামাজিক অনুষ্ঠান। সমস্ত রকম পুজো প্রার্থনা মন্ত্রোচ্চারণ, অলীক ঈশ্বর ভক্তি, অমানবিক ব্যয়সাপেক্ষ আচার বিচার ও পুরোহিত-নির্ভরতা বাদ দিয়ে অর্থাৎ যুক্তিহীন সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আনন্দের উৎসবগুলোর একটা তালিকা করলে আমরা কি পাই?

নতুন ধান কাটার সময় ঘরে ঘরে পিঠেপুলির উৎসব দিয়ে শুরু করা যাক। কোন ধর্মীয় গন্ধ ছাড়াই এটি সারা ভারতে ও দুই বাংলায় জনপ্রিয় উৎসব। শীতের পর যুক্তিবাদী দিবস ১লা মার্চ, গ্রীষ্মে নববর্ষ। বর্ষায় বৃক্ষরোপণ, তারপর শরতে আকাশ পরিষ্কার হতেই শারদীয় মেলা। তারপর ঝকঝকে আকাশে ঠাণ্ডার ছোঁয়া লাগতেই বাজি আর আলোর খেলা। মূর্তিপুজো আর পুরোহিতন্ত্র বাদ দিয়ে কি এগুলো উপভোগ করা যায় না? ১০ই ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস আর তারপরই বই মেলার তোড়জোড়। এটা একটা উদাহরণ কলকাত আর তার আশেপাশের মনুষের জন্য। এই ভাবে সময় ঋতু ও আবহাওয়া ভেদে প্রচলিত সব অনুষ্ঠানই রাখা যায়, মানুষের ঈশ্বর ভীতিকে বাদ দিয়ে। যে অর্থ ব্যয় হয় শুধু দুর্গাপূজায় তাই দিয়ে বিগত বর্ষায় বন্যা পীড়িতদের সাহায্য করেও খরচ করা যায়, প্রতি এলাকায় স্থায়ী কিছু গঠনমূলক কাজ করতে পার্ক, লাইব্রেরি, হাসপাতাল ইত্যাদি। নতুন কিছু মানেই তো কিছু মানুষের কর্ম সংস্থান, কিছু প্রতিভার বিকাশ। ছুটির দিনগুলোকে একটু অদল বদল করে নিলে কতগুলো নতুন ছুটি পাওয়া যাবে যেমন বিজ্ঞান দিবস, যুক্তিবাদী দিবস, মানবাধিকার দিবস। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেশ শুদ্ধ সকলের ছুটি চলবে না। তার বদলে আপৎকালীন বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে ছুটি ঘোষণা করা হবে। যেমন বন্যাত্রাণে সাহায্য করার জন্য শহরের মানুষের ছুটি, মহামারী বা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটলেও ছাত্রছাত্রীদের স্বেচ্ছাসেবক

হওয়ার জন্য ছুটি। তাছাড়া খুব বর্ষা বা খুব শীত বা খুব গরমে টানা ক'দিন ছুটি দিলে কাজের একঘেঁয়েমি কাটে- সময় ও শক্তির অপচয় বন্ধ হয়। অথবা রক্তদানের ছুটি, বিশ্বকাপ খেলা দেখার ছুটি ইত্যাদি কিছু নতুন যোগ করা যায় যেগুলো ধর্মনিরপেক্ষভাবে প্রতিটি মানুষই কাজে লাগাতে পারে। অবাঞ্ছিত রীতিনীতি বাদ দিলে বাদ হয়ে যাবে অনেক কিছুই, বাদ হয়ে যাবে নিষ্ঠুর বলি প্রথা, যা কোন সুস্থ মনের মানুষের অঙ্গ হতে পারে না। বাদ হয়ে যাবে দিনের পর দিন চলতে থাকা বিসর্জনের হামলা, যানজট, বাদ হয়ে যাবে অনাবশ্যক উপবাস- এটা খেও না, সেটা খেতে নেই যা অধিকাংশ ভারতীয় মহিলার পেটের রোগের গোপন রহস্য, বাদ হয়ে যাবে বহু অর্থ ও সময়ের অপচয় যে অর্থ ও সময় কাজে লাগবে সুস্থ পরিবেশ গড়তে- শিক্ষার প্রসার ঘটাতে। তাই টানা সাত দিন ছুটি বরাদ্দ থাকে বইমেলা আর সাক্ষরতা প্রসারের কাজে।

এসবই কি মানবতাবাদীদের দিবাস্বপ্ন? নাঃ, বোধহয় এরকম দিন আসতে আর বেশি দেরি নেই।

দেরি যে নেই, তারই সংকেত মিলছে '৯৯ এর শিশু অধিকার সপ্তাহতে। হায়দ্রাবাদের পঞ্চাশটি স্কুলের পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা সমীক্ষা চালিয়েছিল 'দিব্য দিশা' ও 'প্রেরণা' নামের দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং স্কুলগুলোর মিলিত উদ্যোগ। তাতে ৬৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী জানিয়েছে, ধর্মভিত্তিক অনুষ্ঠানের জন্য ছুটি বাতিল করা উচিত, সে ক্রিসমাসই হোক বা গণেশ পুজোই হোক। তাদের এই মতামত জমা পড়েছে স্কুল শিক্ষিকা দফতরের অধিকর্তা মনমোহন সিং এর কাছে।

জীবিত ইসলামের মৃত গৌরবের কথা

[উৎসর্গ– দ্বীন-ই-ইলাহি খ্যাত মহান মুসলিম সম্রাট আকবরকে]

জাহেদ আহমেদ

১

রেডিও টিভিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশের মুখে মাঝে মাঝে মুসলিম নাম শোনা যায় এবং তা সঙ্গত কারণে। তবে ঐসব মুসলমানদের জন্য গৌরব বয়ে নিয়ে আসে না। বরং তা শুনে বিশ্বব্যাপী বেশিরভাগ মুসলমানদের মাথা হেঁট হয় স্বজাতির লজ্জা ও অপমানের গ্লানিতে। মজার বিষয়, আরেক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানও কিন্তু একজন মুসলমানের নাম নিয়েছেন একাধিকবার তার বক্তৃতায়। তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। রিগান বক্তৃতায় 'ট্যাক্স কাট' এবং মুদ্রাস্ফীতির মধ্যকার সম্পর্ক বোঝাতে মধ্য যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষী ইবেন খালদুনের উদ্ধৃতি দিতেন।[১] ওসামা বিন লাদেন আর ইবেন খালদুন– দুটো নামই নয় কেবল। বলা যায়, এ দু'টি নামের মধ্যে ফুটে ওঠে আত্মপরিচয়ের সংকটে আবর্তিত আজকের মুসলমানদের গ্লানিময় বর্তমান এবং গৌরবমণ্ডিত অতীত। ইতিহাসের দুটো জ্বলজ্যান্ত কিন্তু বিপরতিমুখী দিক।

প্রশ্ন হল, কেমন করে এমন হল? যেমন এটি আজ মুসলমানদের প্রশ্ন, তেমন পশ্চিমা বিশ্বের লোকজনেরও প্রশ্ন। আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক এবং মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলামের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ বার্নাড লুইস নাইন ইলেভেন (৯/১১) পরবর্তী পরিস্থিতিতে লেখা একটি বইয়ের শিরোনাম তাই দিয়েছেন ভুলটা আসলে কি ছিল (What Went Wrong?) লুইসকে অনেক কট্টরপন্থী মুসলমান 'আমেরিকার দালল' ও কেবলমাত্র একজন 'মুসলিম বিদ্বেষী

ইহুদী' ভাবলেও সমসাময়িক সময়ে লেখা তার আর একটি বই 'ইসলামের সংকট' (The Crisis of Islam)– ইতিহাসের আলোকে মুসলমানদের পরাজয়ের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লুইস যা বলেছেন, তার সাথে খুব কম সচেতন মুসলমানই দ্বিমত পোষণ করবেন। নিচের উদ্ধৃতিটির দিকে তাকালেই ব্যাপারটা খোলাসা হবে।

> প্রাচীন রোমান ও গ্রীক সভ্যতার পতন এবং আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যবর্তী সময়– যেটিকে ইউরোপের ইতিহাসবিদগণ 'অন্ধকার যুগ' বলে থাকেন– সেই সময়ে বিশাল ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য, প্রাচুর্যময় শিল্প-বাণিজ্য এবং মৌলিক ও মননশীল বিজ্ঞানে ইসলাম ছিল পৃথিবীর শীর্ষ স্থানীয় সভ্যতা। খ্রিস্টান সভ্যতার চাইতে বহু গুণে বেশি ইসলামই ছিল প্রাচীন ও প্রাচ্য ও আধুনিক পশ্চিমের মধ্যবর্তী ধাপ। এবং এই আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতায়ও রয়েছে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কিন্তু গত শতাব্দীতে ইসলাম হারিয়েছে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব; আধুনিক পশ্চিম ও উদীয়মান প্রাচ্য– উভয়ের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে ইসলাম। পরাজয়ের এই বিশাল শূন্য সৃষ্টি করেছে বাস্তব এবং আবেগগত উভয় রকমের সমস্যা, যে বিষয়ে মুসলমান শাসককুল, চিন্তাবিদ এবং বিদ্রোহীরা আজও কোন কার্যকরী সমাধান খুঁজে পাননি।[২]

ভাবার বিষয় বৈকি। দশ, বিশ কিংবা পঞ্চাশ বছর হলে না হয় কথা ছিল। নয়শ' শতাব্দী থেকে তেরশ' শতাব্দী– পুরো পাঁচ শত বছর ধরে মুসলমানরাই পৃথিবীতে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিল, আজকের সমস্ত ইউরোপ যখন কুসংস্কার ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন! নিউইয়র্ক টাইমসের ডেনিস ওভারবাইয়ের ভাষায়:

> প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি ও জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে কোরানের নির্দেশ এবং সেই সাথে প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও জ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মধ্য যুগে মুসলমানরা এমন একটি সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল যা ছিল সেই সময় সমস্ত পৃথিবীতে বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। পাঁচ শত বছরব্যাপী আরবী ভাষা ছিল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমার্থক একটি বিষয়। স্বর্ণযুগের সেই সংস্কৃতিই বলতে গেলে এ কালের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়, এলজেবরা এলকেমি বা কিমিয়া নক্ষত্রাবলির নাম, এমন কি পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিদ্যা হিসেবে বিজ্ঞানের পরিচিত– এ ধারণাগুলোর জন্ম দিয়েছে।[৩] যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. জামিল রাগেপের ভাষায়, 'ষোল শতাব্দী সময় অবধি মুসলিম বিশ্বের ধারে কাছেও ছিল না ইউরোপ।৪ মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে যারা জ্ঞান রাখেন, তারা জানেন, ড. জামিলের এই উক্তিটি মোটেও অতিকথন নয়। কী পদার্থ বিদ্যা, কী চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন, স্থাপত্যশিল্প জ্ঞান ও মননশীলতার প্রতিটি শাখায় মুসলিম মনীষীদের খ্যাতি ছিল সে সময় জগৎব্যাপী। ব্যাপারটা ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

মুসলিম মনীষীরা মিসরের লাইব্রেরিগুলোতে দীর্ঘদিনের ফেলে রাখা ও পুরোনো গ্রীক পুস্তক ভাণ্ডারের সন্ধান পেলে তারা তখন খ্রিস্টান অনুবাদকদের দ্বারস্থ হন। খ্রিস্টান অনুবাদকরা গ্রীক বইগুলোকে প্রথমে তাদের স্থানীয় সিরিয়াক (Syriac) ভাষায় এবং পরবর্তীতে আরবিতে অনুবাদ করেন। ইহুদী, মুসলমান ও খ্রিস্টান মনীষীদের পাশাপাশি বসে জ্ঞান চর্চা করার যে উৎকর্ষময় সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সে সময় বিরাজমান ছিল, আজকের বাস্তবতায় তা রূপকথা বলে মনে হতে পারে। জ্ঞানচর্চার মূল্যায়ন মুসলমানদের মাঝে সে সময় এত বেশি ছিল যে, প্রচলিত আছে– খলিফা আল মামুন তার সময়ের সেরা অনুবাদক খ্রিস্টান ধর্মী হুনায়িন বন ইশাকের পারিশ্রমিক দিতেন অনুবাদকৃত বইয়ের সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ দ্বারা। কালক্রমে এইসব আরবি পুস্তকগুলো সিরিয়া, সিসিলি ও স্পেন হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে। এগুলো তখন আরবি থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ করা হয়। অর্থাৎ অনুবাদের ক্রম ছিল গ্রীক> সিরিয়াক> আরবি> ল্যাটিন> ইংরেজি। কথাটি তাই মোটেও অতিরঞ্জিত নয় যে, ইউরোপীয়রা মূলত আরবদের মাধ্যমেই গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনের স্বাদ আস্বাদন করার সুযোগ পায়। মধ্যযুগের ইউরোপীয় মনীষীদের কাছে অ্যারিস্টটলীয় দর্শন ও ধারনার প্রধান উৎস ছিল বিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইবনে রুশদের (আবু রুশদ) রচনাবলী। একইভাবে অ্যারিস্টটল ও অন্যান্য প্রশ্নে ল্যাটিন মনীষীদের কাছে কদর ছিল মনীষী ইবনে সিনার, যিনি পরিচিত ছিলেন একাধারে চিকিৎসক ও দার্শনিক হিসেবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবনে সিনার প্রণীত দশ লক্ষ শব্দ সম্বলিত তথ্যকোষ, বা এনসাইক্লোপ্লেডিয়া সতেরো শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে বাইবেলের মত ব্যবহৃত হয়েছে। একই সময়ের পদার্থবিদ আল-হাইতামকে* যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান বিষয়ক ইতিহাসের অধ্যাপক ডেভিড লিন্ডবার্গ তুলনা করেছেন 'আর্কিমিডিস, কেপলার এবং নিউটন এর সাথে।'[৫] সে সময়কার মুসলিম মনীষীদের মত আরব ইহুদী মনীষীরাও ছিলেন গ্রীক দর্শনে অনুরক্ত এবং ব্যাপকভাবে তদ্বারা প্রভাবিত। ফলে মুসলমানদের পাশাপাশি তারাও তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা দাঁড় করার চেষ্টা চালান। তারা গ্রীক গ্রন্থগুলোর আরবি অনুবাদকে হিব্রু ভাষাতে রূপান্তরিত করেন। ইহুদী মনীষী বেন জাবিরলের ইয়ানবু আল হাইয়া প্লেটোনিক চিন্তাধারাকে মুসলিম স্পেন এবং ইউরোপে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মধ্যযুগের আরবের আরেক মহান ইহুদী মনীষী হচ্ছেন স্পেনের করদবার মশেহ বিন মেমন** যিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা দার্শনিক এবং একই সাথে

* যিনি টলেমীর আলোকতত্ত্ব বা optics বিষয়ক কাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং নিজে দৃষ্টিশক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

** আরবীত মুসা ইবনে মেমন, ল্যাটিন ভাষায় মেইমনাইডস।

সম্রাট সালাউদ্দিনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক।

কাগজের ব্যবহার আরবরা শিখে চীনাদের কাছ থেকে যে সম্পর্কে পরবর্তীতে ইউরোপীয়রা (স্পেনের মাধ্যমে) আরবদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে। গণিতশাস্ত্র মুসলিম মনীষীদের চর্চায় অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। নবম শতাব্দীতে আল-খাওয়ারিজমি গ্রীক ও রোমান অক্ষরের বদলে (আরবী) সংখ্যা এবং শূন্য বা জিরোর ব্যবহারের সূচনা করেন উচ্চতর গণিত শাস্ত্রে।*** বার শতাব্দীতে আল-খাওয়ারিজমি আরবী গ্রন্থ হিসাব আল জাবের ওয়াল মুকাবালার মাধ্যমে সর্ব প্রথম আজকের এলজেবরা বা বীজগণিতের সূত্রপাত ঘটান। গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হলে পশ্চিমারা বীজগণিত সম্পর্কে জানতে পারে। লগরিদমেরও সূচনা ঘটে আল-খাওয়ারিজমির হাতে। একই সময়ে আল বাত্তানি ত্রিকোণমিতির (trigonometry) উন্নতি সাধন করেন। গণিত শাস্ত্রের পাশাপাশি জ্যোতির্বিজ্ঞানের (astronomy) উন্নতির ক্ষেত্রে মুসলিম মনীষীদের রয়েছে ব্যাপক অবদান। গণিতবিদ ও জ্যোতর্বিদ আল-বিরুনি (মৃত্যু ১০৪৮ সাল) এই মতবাদ পোষণ করতেন যে, ঘূর্ণনশীল পৃথিবীর আকৃতি হচ্ছে গোল এবং মোটেই চ্যাপ্টা নয়, যা সেই সময়ে অনেক বিশ্বাস করতেন। এছাড়া আল-বিরুনি নির্ভুলভাবে পৃথিবীর নানা স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের হিসাব বের করেন। একই রকমভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন আল-সুফী, আল-জারকালি প্রমুখ মুসলিম মনীষীরা।

২

খলিফা আল মামুন, খলিফা হারুন উর রশিদের শাসনামলে বাগদাদের পরিচিতি ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যা মন্দির হিসেবে। খ্রিস্টান-ইহুদী-মুসলমান মনীষীরা পাশাপাশি বসে জ্ঞানচর্চা করতেন। যুক্তিবাদী ধারার সমস্ত মুসলিম মনীষীরা পরিচিত ছিলেন মুতাজিলা নামে। এদের সম্পর্কে পাকিস্তানের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী এবং কায়েদ-এ-আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পারভেজ হুদবইয়ের মন্তব্য[৬] প্রণিধানযোগ্য :

"... ইসলামের স্বর্ণযুগে বিজ্ঞান অগ্রগতি লাভ করেছিল কারণ– ইসলামের অভ্যন্তরে তখন সক্রিয় ছিলেন মুতাজিলা নামধারী শক্তিশালী যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের ধারক একদল চিন্তাবিদ।" সবকিছুই পূর্ব নির্ধারিত এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ব্যতীত মানুষের অন্য কোন উপায় নেই'– নিয়তিবাদীদের এ মতবাদের তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করে মুতাজিলারা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য

*** ০-৯ এই দশটি প্রতীকে সংখ্যার দশমিক পদ্ধতিতে প্রকাশের জ্ঞান খলিফা আল মনসুরের সময় ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে আরবে পৌছায়।

দিয়েছেন। মুতাজিলারা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিলেন, জ্ঞান তখন সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে গোঁড়া ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল-গাজালির নেতৃত্বে ইসলামী রক্ষণশীলতার পুনরাবির্ভাব ঘটে। আল-গাজালি যুক্তির স্থলে দৈব বাণী এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির স্থলে নিয়তিকে তুলে ধরেন। কার্য এবং কারণ (cause and effect) সম্পর্ককে তিনি অস্বীকার করেন এই বলে যে, মানুষের ভবিষ্যৎ জানার শক্তি নেই, কেবল সৃষ্টিকর্তা এ বিষয়ে অবগত। গণিতশাস্ত্রকে আল-গাজালি 'ইসলামবিরোধী' এবং 'মানব মনের জন্য ক্ষতিকারক' বলে মন্তব্য করেন। গোঁড়ামির জালে ইসলামের সমৃদ্ধি আটকা পড়ে যায়। মহামতি খলিফা আল-মামুন এবং হরুন-আল-রশিদের শাসনামলে রাজদরবারে মুসলিম, খ্রিস্টান এবং ইহুদী মনীষীদের একত্রে জড়ো হয়ে জ্ঞানচর্চা এবং মতবিনিময় করার যে প্রবণতা বহাল ছিল, তা পরবর্তীকালে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বে সহিষ্ণুতা, মেধা এবং বিজ্ঞানের মৃত্যু ঘটে। যুক্তিবাদী ধারার সর্বশেষ মুসলিম মনীষী হচ্ছেন চতুর্দশ শতাব্দীর আবদাল রাহমান ইবনে খালদুন।

স্বর্ণ যুগের ইসলাম যে কতটা গভীর ও ব্যাপকভাবে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল তা ভাল করে বোঝার জন্য নিচে সেই সময়ের চারজন বিখ্যাত প্রথাবিরোধী মুসলিম মনীষীর জীবন ও দর্শনের উপর আলোকপাত করা হল :

আল-রাজী (৮৬৯খ্রী:-৯২৫খ্রী:)

পুরো নাম আবু বাকর মোহাম্মদ বিন জাকারিয়া আল-রাজী। পি. ক্রাউস এবং পাইনস আল-রাজী সম্পর্কে Encyclopedia of Islam-এ মন্তব্য করেছেন : 'খুব সম্ভবত সমস্ত ইসলামী ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী মনীষী।' ম্যাক্স মেরফ আল-রাজীকে 'ইসলামী বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক' এবং 'পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক' বলে উল্লেখ করেছেন।

আল-রাজী তেহরানের নিকটস্থ রেই (Rayy) নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। সেখানে তিনি গণিতশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, সাহিত্য এবং আল-কেমি অধ্যয়ন করতেন। পরবর্তীতে বাগদাদে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আল-রাজী বাগদাদের যে হাসপাতালে কাজ করতেন সেখানে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাত চব্বিশ জন চিকিৎসক কাজ করতেন। উল্লেখ্য, খলিফা হারুন-আল-রশিদ খ্রিস্টান চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে বাগদাদে সর্ব প্রথম হাসপাতাল চালু করেছিলেন। অনেক হাসপাতালে সে সময় শ্রেণী কক্ষ, লাইব্রেরি ও মানসিক রোগের ওয়ার্ড ছিল। দশম শতাব্দীর শুরুর দিক থেকেই বাগদাদে চিকিৎসা শাস্ত্র চর্চার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার নিয়ম চালু হয়ে যায়।

সে সময় রাষ্ট্রই জনসাধারণের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করত। তের শতাব্দীতে মিসরের কায়রোতে নির্মিত মনসুরি হাসপাতালে আজ অবধি অন্ধত্বের চিকিৎসা চলছে।

আল-রাজী বহু বিষয়ে অধ্যয়ন ও লেখালেখি করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– চিকিৎসাশাস্ত্রে সুদীর্ঘ পনেরো বছর অধ্যয়নের মাধ্যমে রচিত বিশাল জ্ঞান কোষ (encyclopedia) যা 'আল-হাউই' নামে পরিচিত। ১২৭৯ সালে এই গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এছাড়া আল-কেমি বিষয়ে আল-রাজী রচিত 'কিতাব আল-আসরার' বার শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় যা আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের উন্মেষে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

আলরাজী আপাদমস্তক একজন যুক্তিবাদী মনীষী ছিলেন। জেবরিইলি[৭] তাকে মধ্যযুগ, প্রাচ্য এবং ইউরোপীয় যুক্তিবাদী ধারার সমস্ত অজ্ঞেয়বাদীদের (agnostics) মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মন্তব্য করেছেন। আল-রাজীর ব্যক্তিগত দর্শনের মূল সুর হচ্ছে : কোন কর্তৃত্বই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। প্রচলিত ঐতিহ্য এবং কর্তৃত্বকে সর্বদা যুক্তির মাপকাঠিতে বিচার করার পক্ষপাতি ছিলেন তিনি। মানব মনন ও যুক্তিবোধের প্রতি আল-রাজীর অপরিসীম আস্থা ফুটে উঠেছে নীতিশাস্ত্র বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থ আধ্যাত্মিক প্রতিকার[৮] (Spiritual Physick) এর নিম্নলিখিত বক্তব্যে (ভাবানুবাদ) :

> "যুক্তিবোধ হচ্ছে মানুষের প্রতি সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। যুক্তিবোধই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করেছে। নিজের এবং সমাজের মঙ্গল সাধন করতে যুক্তিবোধের বিকল্প অন্য কিছু নাই। ...যা আমাদের জীবনকে সুন্দর এবং মহিমান্বিত করে তোলে, যুক্তিবোধের মাধ্যমে আমরা সেটির নাগাল পেতে পারি। এর মাধ্যমেই আমরা মনের ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারি। যেমন- যুক্তি প্রয়োগরে মাধ্যমে মানুষ জাহাজ তৈরি ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে, যাতে সে সমুদ্র কর্তৃক সৃষ্ট দূরত্বকে অতিক্রম করতে পারে। যুক্তিবোধের ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা শরীরের অসুখ নিরাময়ে ঔষধ এবং অন্যান্য উপকারী শিল্প উদ্ভাবন করেছি... এর দ্বারাই আমরা জ্ঞানলাভ করেছি পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে। জানতে পেরেছি চন্দ্র, সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রসমূহের তথ্য সম্পর্কে...'

আল-রাজী সৃষ্টি সম্পর্কিত ইসলামী ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেন নাই। তার মতে মহাকালের সসীম মুহূর্তে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে; তবে শূন্য থেকে নয়। আল-রাজী পাঁচটি শাশ্বত মূলনীতিতে বিশ্বাস করতেন : সৃষ্টিকর্তা, আত্মা, বস্তু, সময় এবং মহাশূন্য। আল-কোরান এবং হযরত মুহম্মদ সংশ্লিষ্ট অলৌকিক কাহিনীতে তিনি কখনোই বিশ্বাস স্থাপন করেননি। আল-রাজী বিশ্বাস করতেন, যুক্তি দৈব বাণী

অপেক্ষা শ্রেয় এবং কেবলমাত্র দর্শনের মাধ্যমে মুক্তি (salvation) সম্ভব। রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বাস করতেন– ধর্মীয় আইনসমূহের ভয়ভীতি ব্যতিতই মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে সমাজে বসবাস করতে সক্ষম।

আল-মারি (৯৭৩-১০৫৮খ্রী)

পুরো নাম আবুল আলা আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন সুলাইমান আল-মারি। অসাধারণ কবিত্ব ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাকে বলা হয় 'প্রাচ্যের লুক্রেটিয়াস'। বলাবাহুল্য, লুক্রেটিয়াস ছিলেন বিখ্যাত গ্রীক কবি ও দার্শনিক। সিরিয়াতে জন্মগ্রহণকারী এই মনীষী বাল্যবস্থায় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং এতে সম্পূর্ণ রূপে অন্ধ হয়ে যান। নিজ শহরে 'মারাত আল-নুমানে' প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি লেপ্পো, এন্টিয়সসহ সিরিয়ার অন্যান্য শহরে অধ্যয়ন করেন। কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের সূচনাতে আল-মারি বাগদাদের বিখ্যাত জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং ১০০৮ সালে সেখানে গমন করেন। কিন্তু মাত্র আঠারো মাস অবস্থানের পর মারি বাগদাদ ছেড়ে একেবারে চলে আসেন এবং নিজ শহরে জীবনের বাকি সময় কাটান।

বাগ্মিতার জন্য আল-মারির এমনই খ্যাতি ছিল যে, দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে লোক 'মারাত আল-নুমানে' এসে জড়ো হত কবিতা ও ব্যাকরণ বিষয়ে তার বক্তৃতা শুনতে। আল-মারির কবিতার মূল সুর হচ্ছে– ব্যাপক দুঃখবাদ। আগাগোড়া যুক্তিবাদী এই কবি বিশ্বাস করতেন, যুক্তির স্থান হচ্ছে সব ধরনের প্রথা, ঐতিহ্য এবং কর্তৃত্বের উর্ধ্বে। প্রতিটি ধর্মকে আল-মারি 'যুক্তি ও মননের বিরুদ্ধে' বলে মনে করতেন। ধর্ম হচ্ছে, আল মারির মতে, 'প্রাচীন লোকজন কর্তৃক আবিস্কৃত পৌরাণিক উপকথা, যার মূল্য কেবল তাদের কাছে রয়েছে, যারা সহজ বিশ্বাসী মানুষকে ঠকিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করতে চায়।' ধর্মীয় মহাগ্রন্থগুলো মারির দৃষ্টিতে, 'এমন কিছু আষাঢ়ে গল্পের সমাহার যা যে কোন যুগের মানুষই সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে এবং করেছেও।' ধর্ম যুগে যুগে মানসিক অন্ধত্ব এবং মানুষে মানুষে কলহ সৃষ্টি করেছে বলে আল-মারির ধারণা। ধর্মীয় অনেক আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথার সমালোচনায় তিনি ছিলেন মুখর। যেমন– হজরে আসাওয়াদ বা কালো পাথর চুমাকে আল-মারি একটি অযৌক্তিক কুসংস্কার বলে মনে করতেন।

প্রাণী বধ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন আল মারি। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে নিরামিষ ভোজী হয়ে যাবার পর তার কবিতাতেও তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করতেন যে, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং মধু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে মানুষ হিসেবে আমরা সংশ্লিষ্ট প্রাণীগুলোর উপর অবিচার করছি। যেহেতু প্রাণীদেরও ব্যথা উপলব্ধির ক্ষমতা রয়েছে, তাদেরকে অহেতুক কষ্ট দেয়া অনৈতিক, এই যুক্তিতে

তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। আল-মারি সম্পর্কে আলফ্রেড ভন ক্রেমার (Von Kermer) যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, আল-মারি তার সময়ের চাইতে বহু শতাব্দী এগিয়ে ছিলেন।

ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১খ্রী.)

গন্তব্যবিহীন এ পথের একজন পথিকও আসে না ফিরে,
জানায় না আমাদের, কোথায় পথের শেষ।
... ...
পৃথিবী এগোবে তার পথে, আমরা প্রস্থান করার পরেও
একদা হেথায় কেউই ছিলাম না আমরা,
চিনত না কেউ আমাদের;
চলে গেলেও আমরা
পৃথিবীর ঘটবে না কোন বিচ্যুতি।
(Of all the travelers on this endless road
Not one returns to tell us where it leads.
... ...
Long will the world last after we are gone,
When every sign and trace of us are lost.
We were not here before, and no one knew;
Though we are gone, the world will be the same.)

জীবনের চূড়ান্ত পরিণতির নির্মম ও অবধারিত সত্য সম্পর্কে ওমর খৈয়ামের উপরের পংক্তিগুলো আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় খৈয়ামের প্রায় পাঁচশত বছর পরের আরেক মহান মনীষী সেক্সপীয়ারের নাটকের অমর ক'টি লাইন :

জীবন– যেন একটি চলন্ত ছায়া, একজন অভাগা অভিনেতা–
যে বৃথা অহংকারের ধ্বনিতে মঞ্চে তোলে কাঁপন,
অতঃপর করে চির প্রস্থান।
এটি তখন হয়ে যায়–
নির্বোধের মুখে শোনা চিৎকার চেঁচামেচিতে পূর্ণ
কেবলই একটি অসার কাহিনী।
(Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more: it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.)
(Macbeth)

কবি ও দার্শনিক হিসেবে তার মূল পরিচিতি থাকলেও জর্জ সার্টনের মতে, ওমর খৈয়াম হচ্ছেন 'মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের একজন।'[৯] এছাড়াও যেসব বিষয় খৈয়াম অধ্যয়ন করেছিলেন বলে জানা যায়, সেগুলো হচ্ছে : পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, সঙ্গীত, দর্শন ও ইতিহাস। ওমর খৈয়ামের জীবন ও কবিতা বিষয়ক আদি উৎস বলে বিবেচিত 'মিরছাদ আল-ইবাদ' গ্রন্থে মহান এ মনীষীর পরিচয় বিধৃত হয়েছে একজন নিরীশ্বরবাদী ও প্রকৃতিবাদী দার্শনিক হিসেবে।

যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে ওমর খৈয়ামের বেশির ভাগ কবিতা ও দর্শন আবর্তিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে : মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা, পরকাল সম্পর্কে অস্বীকৃতি, উত্তরবিহীন প্রশ্নের জিজ্ঞাসা সম্পর্কে অসারতা, মহাবিশ্বের বিরাট রহস্যময়তা এবং বর্তমানকে উপভোগ করে বেঁচে থাকার আদর্শ বা ভোগবাদ। নিচের কটি পংক্তিতে তারই প্রমাণ পাই আমরা :

যদি শুনতে পাও ফুটন্ত গোলাপের ধ্বনি
জেনে নিও, প্রিয়া মোর, সুরা পানের সময় এখনি।
হুর-পরী, হারেম, জাহান্নাম আর জান্নাত
এসবইতো রূপ কথা, ভুলে যাও তার সবই।

(When once you hear the roses are in blomm,
Then is the time, my love, to pour the wine;
Houris and palaces and Heaven and Hell-
These are but fairy-tales, forget them all.)

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফার্সী ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখক সাদেগ হেদায়াত হচ্ছেন ওমর খৈয়ামের দর্শন ও চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত মনীষীদের একজন। সাদেগের বর্ণনায়, 'যৌবনকাল থেকে শুরু করে আমৃত্যু ওমর খৈয়াম ছিলেন একজন বস্তুবাদী, দুঃখবাদী এবং সংশয়বাদী ভাবধারার মনীষী।' হেদায়াত আরও বলেছেন, সবগুলো ধর্মীয় প্রশ্নকে খৈয়াম সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং ধর্মীয় উন্মাদনা, গোঁড়ামি ও মোল্লাদের আধিপত্যকে এই মহান মনীষী ঘৃণা করতেন।

ইবনে খালেদুন (মৃত্যু ১৪০৬ খ্রী.)

মধ্য যুগের মুসলিম মনীষীদের কৃতিত্ব কেবলমাত্র গ্রীক সাহিত্যদর্শন সংরক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; মুসলিম মনীষীদের অনেকেই ইতিহাসের পাতায় প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন এমন সব মৌলিক রচনাবলীর জন্য যা আধুনিক যুগে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া ও গবেষণার সূচনা ঘটাতে স্মরণীয় ভূমিকা রেখেছে। ইবনে খালেদুন তেমনি একজন মনীষী। পারভেজ হুদবইয়েরের ভাষায় 'চতুর্দশ শতাব্দীর আবদাল রাহমান

ইবনে খালেদুন হচ্ছেন যুক্তিবাদী ধারার সর্বশেষ মুসলিম মনীষী।' খালদুন ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন অনেকগুলো কারণে। আরব, বেদুঈন ও পারসীয়ানদের ইতিহাসের উপর তার রচিত মুকাদ্দিমাহকে মনে করা হয় ইতিহাস বিষয়ে রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যা পরবর্তীতে আধুনিক নৃবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও অর্থনীতির বিদ্যার বিকাশ সাধনে ভূমিকা রেখেছে।[১০] ঐতিহাসিক আরনলড টয়েনবি তাই মুকাদ্দিমাহ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

স্বধারা ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে এখন পর্যন্ত রচিত একমাত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।[১১] বলা যায়, সঙ্গত কারণেই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিগান খালেদুনের উদ্ধৃতি দিতেন।

মানুষের উন্নতির উপর ঐতিহাসিক শর্তাবলীর প্রভাব সম্পর্কে কার্ল মার্কসের পর্যবেক্ষণ, তার মূলসুর সে সময়ই ধ্বনিত হয়েছে খালেদুনের বক্তব্যে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন সম্পর্কে বুঝতে হলে আমাদেরকে আগে রাজনৈতিক নীতিসমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে- ইবেন খালেদুন এ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজনৈতিক নীতিসমূহ বলতে খালেদুন বুঝাতেন কোন একটি অঞ্চলের লোকজনের জীবিকা নির্বাহ করার উপায়, তাদের শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কৃতি, তাদের বসবাসের পরিবেশ গ্রামীণ না শহুরে এবং তারা কিভাবে নিজেদের শাসন করে। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের প্রতি খালেদুনের বার্তা ছিল : প্রতিটি ঘটনাকে যেন সংশ্লিষ্ট কারণের ভিত্তিতে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয় কেননা, শূন্য বা ভ্যাকুয়াম কিছুই ঘটে না।

যুক্তি ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান এই মহান মনীষী সেই সব পণ্ডিতদের সমালোচনা ও অবজ্ঞা করতেন যারা যে কোন জ্ঞান বা বিদ্যাকে কোন রকম প্রশ্ন ব্যতিরেকেই অন্ধের মত মেনে নেয় এবং নতুন তথ্যের আলোকে সেগুলোর উপযোগিতা যাচাই করেন না। এছাড়া তিনি রাজনৈতিক পক্ষপাত দুষ্ট লেখকদেরও অপছন্দ করতেন।

৩

ঘড়ির কাঁটাকে এবার বর্তমানে নিয়ে আসা যাক। আজকে মুসলমানদের যে দৈন্য চলছে তা বহুমুখী। প্রাচুর্যের দীনতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দীনতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দীনতা এবং সর্বোপরি সহিষ্ণুতা ও মননের দীনতা। পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ মুসলিম হলেও বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের সংখ্যা এক শতাংশেরও কম! আরও হতাশার খবর এই পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশে যত বিজ্ঞানী রয়েছে, কেবল ইসরাইলের রয়েছে তার চাইতে দ্বিগুণ সংখ্যক বিজ্ঞানী! আফসোস আমার নিজের নয়; হতাশার এই বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরেছেন পাকিস্ত

ানের অধ্যাপক পারভেজ হুদবই তার ১৯৯১ সালে প্রকাশিত বইয়ে(১২) যারা বিশ্বের পরিবর্তন ও অগ্রগতির খবর রাখেন, তারা জানেন ড. পারভেজ হুদবই একটুও বাড়িয়ে বলেননি। শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ইউরোপ-আমেরিকা তো দূরের কথা, মুসলিম দেশগুলোকে আজ ছাড়িয়ে যাচ্ছে ভিয়েতনাম, তাইওয়ানের মত দেশগুলোও। বই বিক্রির ভিত্তিতে নির্ধারিত জাতিসংঘের সাতাশটি দেশের (যেখানে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে এবং ভিয়েতনাম সর্বশেষে রয়েছে) তালিকায় একটিও মুসলিশ দেশের নাম নেই! 'সমস্ত আরব বিশ্ব বছরে বর্তমানে প্রায় ৩৩০টি বই অনুবাদ করে থাকে যা বছরে কেবলমাত্র গ্রীস কর্তৃক অনূদিত বইয়ের এক-পঞ্চমাংশ। খলিফা মামুন (নবম শতাব্দী)এর আমল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আরব দেশগুলো কর্তৃক অনূদিত বইয়ের সর্বমোট সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ (১০০,০০০) যা ইউরোপে স্পেন একাই প্রতিবছরে অনুবাদ করে থাকে।' অথচ মুসলিম উমাইয়া শাসনাধীন স্পেনের রাজধানী কর্ডোবা (Cordoba) কেবল আদালতের গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা ছিল চার লক্ষ (৪০০,০০০) যখন ইউরোপের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থাগার বলে পরিচিত সুইডেনের মঠ লাইব্রেরিতে বই ছিল মাত্র ছয় শত (৬০০)।[১৩] এবার অর্থনীতির দিকে তাকানো যাক। ১৯৯৯ সালে সকল আরব দেশগুলোর সম্মিলিত জিডিপি ($)৫৩১.২ বিলিয়ন) ছিল একা স্পেনের জিডিপির (৮৫৯৫.৫ বিলিয়ন) চাইতেও কম! ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ ইস্রাইলের per capita জিডিপি আরব লেবানন ও সিরিয়ার জিডিপির সাড়ে তিন গুণ, জর্ডানের চাইতে বার গুণ এবং মিসরের তুলনায় সাড়ে তের গুণ বেশি। এসব ভয়াবহ চিত্র ফুটে এসেছে আরব দেশগুলোরই বুদ্ধিজীবীদের তৈরি করা জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত আরব বিশ্বের মানব উন্নয়ন বিষয়ক রিপোর্টে (The Arab Human Development Report 2002)। উৎসাহী পাঠকরা বিনা মূল্যে এটি অনলাইনে পড়ে দেখতে পারেন। নিচে ভারত, ইস্রাইল, যুক্তরাষ্ট্রসহ আরও কয়েকটি দেশের তুলনায় মুসলিম মিশর, কুয়েত, সউদী আরব ও আলজেরিয়ায় বিজ্ঞানীদের সংখ্যার একটা তুলনা দেয়া হল[১৪]:

দেশের নাম	বিজ্ঞানীর সংখ্যা (চল্লিশ বা ততোধিক রেফারেন্স-এ উল্লিখিত)	প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা	সর্বাধিক উল্লিখিত গবেষণা (এক মিলিয়ন লোকের মধ্যে)
যুক্তরাষ্ট্র	৪৬৬,২১১	১০,৪৮১	৪২.৯৯
ভারত	২৯,৫০৯	৩১	০.০৪
অস্ট্রেলিয়া	২৪,৯৬৩	২৮০	১৭.২৩
সুইজারল্যান্ড	১৭,০২৮	৫২৩	৭৯.৯০
চায়না	১৫,৫৫৮	৩১	৭৯.৯০
ইস্রাইল	১১,৬১৭	১৬৯	৩৬.৬৩
মিশর	৩,৭৮২	১	০.০২

দঃ কোরিয়া	২,২৫৫	৫	০.১২
সউদী আরব	১,৯১৫	১	০.০৭
কুয়েত	৮৮৪	১	০.৫৩
আলজেরিয়া	৩৬২	১	০.০১

৪

ফিরে আসি মূল প্রশ্নে : কেমন করে এমন হল? আল্লাহতে বিশ্বাসী মুসলমানদের সংখ্যা তো বেড়েছে বৈ কমেনি (মুসলমানরা সংখ্যায় বর্তমানে ১.৩ বিলিয়ন, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ)। তেমনিভাবে একই রকম আছে কোরান। তাহলে গলদটা কোথায়? কেউ কেউ একে ইহুদি-খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র হিসেবে চালিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা অনুভব করেন। এসব যুক্তি ধোপে টিকে না, অন্তত ইতিহাস তাই বলে। রাজনীতি ও ক্ষমতার লোভ থেকে কোন ধর্ম ও জাতির শাসকদল কোন কালেই মুক্ত ছিল না। মুসলমানরাও মুক্ত ছিল না, মুক্ত নয় আজও। মুসলমান বাদশাহ-সম্রাট হত্যা করেছে মুসলমান সহোদর-পুত্র-কন্যাকে, মুসলমান রাষ্ট্র বছরের পর বছর লড়াই করেছে আরেক মুসলমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা, কাদিয়ানীদের ওপর মুসলমান মোল্লাদের অকথ্য নির্যাতন– এসবও কি ইহুদী-খ্রিস্টানদের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের ফল? পাকিস্তানে আজ অবধি পাসপোর্টের দরখাস্তে লিখতে হয় যে, দরখাস্তকারী মনে করেন– কাদিয়ানীরা মুসলিম নয়। ইহুদী-খ্রিস্টান ছাড়াও মুসলমানরা নিকট অতীতে কখনো তুর্কী, কখনো বা মোঘলদের ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তাছাড়া তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই যে ষড়যন্ত্রের কারণেই আজকে মুসলমানদের এই দুর্দশা, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, তথাকথিত ষড়যন্ত্রকারীরা কি করে সফল হল? এটা কি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতারই প্রকাশ নয়? আসলে স্বীয় ব্যর্থতাকে আড়াল করতে 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' (blame game) অনেক সময় মনে ক্ষোভের প্রশমন ঘটালেও তা মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে না। আবার আরেকদল মুসলমান এই বিশ্বাস করে সুখ অনুভব করে যে, কোরানেই রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান। কেউ কেউ– যাদের মধ্যে অনেক উঁচু ডিগ্রীধারা লোকও রয়েছেন– আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন : বিজ্ঞানের বড় বড় সকল আবিষ্কারের মূল সূত্র কোরানেই নিহিত রয়েছে। জ্ঞানের অভাব(!) বলেই আমরা সেটির মর্ম উদ্ধার করতে অপারগ! আত্মপ্রবঞ্চনার এমন নজির সত্যি সত্যি পৃথিবীতে বেশি নেই। এ যেন মরুভূমির বালুতে মাথা গোঁজা উট পাখি আজ মুসলমানের রূপ ধারণ করেছে! আমরা দেখেছি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিতে মধ্য যুগে মুসলমানদের সাফল্যের পিছনে কোন অলৌকিকত্ব ছিল না। ছিল না কোরানের কোন লুক্কায়িত সূত্র। আমি বলছি না যে, মধ্যযুগের মুসলমান মনীষীদের কেউই আল্লাহ-নবী ও কোরানে

বিশ্বাস করতেন না। অনেক করতেন, অনেকে করতেন না। কিন্তু লক্ষ করার মত মিল হচ্ছে– তাদের অধিকাংশই ছিলেন জ্ঞান, সত্য, যুক্তিবোধ ও উদার চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত। মুসলমানদের গৌরবময় সাম্রাজ্যের পতন কেবল একটি কারণে হয়নি। রাজনীতি, সমরনীতি, অর্থনীতি বিষয়ক কারণ ছাড়াও ইউরোপে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিল্প বিপ্লবের সূচনা– এসবই মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুক্তিবোধ ও উদার চেতনার বদলে রক্ষণশীলতা ও পশ্চাৎমুখী চিন্তাচেতনাকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতাও যে মুসলমানদের সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম প্রধান কারণ সে বিষয়ে ইতিহাসবিদদের মাঝে খুব একটা দ্বিমত নেই। আজকাল যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের কথা বললে অনেক মুসলমান মনে করেন, এগুলো পশ্চিমাদের শেখানো মন্ত্র, অথচ সত্য হচ্ছে মানবতাবাদ, যুক্তিবোধ, চিন্তার উদারতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা– এইসব মানবীয় গুণাবলীর পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। এগুলো সকল কালের সকল ধর্ম ও জাতির আলোকিত মানুষদের মূল মন্ত্র।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালবাসার ক্ষমতা হারিয়ে মুসলমানরা মুফতি, মাওলানা হয়েছে, শায়খুল হাদীস হয়েছে, কিন্তু আলোকিত সভ্যতার জন্ম দিতে পারেনি। সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মুফতি ফজলুল হক আমিনী (সাবেক এমপি ও চারদলীয় জোট সরকারের শরিকদার) একবার বলেছিলেন, 'তসলিমার কোন বই আমি পড়িনি তবে তার ফাঁসি চাই।' একজনের লেখা একেবারে না পড়ে, না বুঝেই ফাঁসি দাবি করার ঘটনার নজির বিশ্বে আর কোথাও আছে কি? আর থাকলেও আমার বিশ্বাস, সেটি আরেকটি মুসলিম দেশেই হবে। দেশে থাকাকালীন একবার এক দল মাদ্রাসার ছাত্রকে দেখলাম দল বেধে যাচ্ছে এনজিও বিরোধী হরতালের কর্মসূচি পালন করতে। একজন পরিচিত ছিল বিধায় তাকে একটু থামালাম। 'আচ্ছা এনজিও মানে কি, তুমি জান?' প্রশ্ন করলাম। তার উত্তরে জানতে পারলাম 'এনজিওরা ইসলামবিরোধী এবং খ্রিস্টান আমেরিকার দালাল।' ধর্মান্ধ এবং একই সাথে দরিদ্র সমাজে মানুষকে বিপথগামী করা যে কত সহজ তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

অমৃতানন্দময়ী নামে ভারতের এক ধর্মীয় মাতা সাংবাদিকদের কোন এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, মানুষ ধর্মের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ধর্মের জন্য তারা বেঁচে থাকতে প্রস্তুত নয়। আমাদের সমাজে শায়খুল হাদীসের সংখ্যা একেবারে কম নয়। চল্লিশ হাজার হাদীস মুখস্থ করে শায়খুল হাদীস হতে হয়। কাজটা কষ্টের হলেও অসম্ভব নয়। কিন্তু কঠিন কাজ হচ্ছে চল্লিশ হাজারের মধ্যে মাত্র একটা হাদীসের সত্যিকার প্রতিফলন ঘটানো নিজেদের জীবনে। আমরা জানি,

হাদীসে আছে, যার দ্বারা মানবতা উপকৃত হয়, মানুষের মধ্যে তিনিই উত্তম। কয় জন শায়খুল হাদীস দাবি করতে পারবেন যে, তিনি সারা জীবনে এমন একটা হলেও কাজ করেছেন যা দ্বারা মানবতা উপকৃত হয়েছে? মসজিদ-মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা-পূজা আদায় করা যত সহজ, পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর দিকে ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকানো তত সহজ নয়। আর যারা তা পারেন, আল্লাহ-ভগবানের সন্ধানে তাদের মসজিদ মন্দিরে ছুটাছুটি করার প্রয়োজন হয় না। বিখ্যাত ইরানী কবি হাফিজ তাই বলেছিলেন, 'আমি মসজিদে গিয়ে আল্লাহর সন্ধান করলাম, আল্লাহকে পেলাম না; অতপর আমি মন্দিরে গেলাম, সেখানেও পেলাম না; চার্চ ও প্যাগোডাতে নিরাশ হওয়ার পর অবশেষে আল্লাহকে আমি আবিষ্কার করলাম আমারই মনের মধ্যে। যেন নজরুলের সেই কবিতার লাইন :

"মিথ্যা শুনিনি ভাই
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই"

কিংবা, স্বামী বিবেকানন্দের সেই অমর বাণী :

"জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

সোয়া এক বিলিয়ন মুসলমান আগামী দিনগুলোত পৃথিবীকে আলোকিত করবে, নাকি পৃথিবীর বোঝা হয়ে থাকবে– এই সিদ্ধান্ত মুসলমানদের নিজেদের নিতে হবে। তাদের সামনে একাধারে রয়েছে আবু রুশদ, ইবনে খালেদুন, ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, আল-রাজি, আল-মারি, আল হাইতামদের গৌরবোজ্জ্বল উদাহরণ; অন্যদিকে রয়েছে বিন লাদেন, খোমেনী, মওদুদী, ফজলুল হক আমিনী, শায়খুল হাদীস, বাংলাভাইয়ের মত মানব বিদ্বেষী ও পশ্চাৎমুখী চিন্তাধারার ব্যক্তিবর্গ। মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধরণ এবং এগুলোর বাহ্যিক প্রতিফলনই ভবিষ্যতে নির্ধারণ করবে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও ধর্মের মানুষেরা মুসলমানদের কার উত্তরসুরি হিসেবে বিবেচনা করবে– ইবনে খালেদুন, নাকি বিন লাদেনের।

তথ্যসূত্র

1. Ronald Reagan, Public Papers of the Presidents of the United States: 1981 (Washington, DC: United States Government Printing Office, 1982), pp. 745,871.
2. Bernard Lewis, The Crisis of Islam (New York: The Modern Library, 2003) p.4.
3. Dennis Overbye, How Islam Won, and Lost, the Lead in Science, New York Times (October 30, 2001).
4. Ibid
5. Ibid
6. Pervez Hoodbhoy, Muslims and the West After September 11, Washington Post (2002).
7. F.Gabrieli, La Zandaqa an 1er Siecle Abbasiole," in L'Elaboration de I'Islam (Paris, 1961)
8. Al-Razi The Spiritual Physick", trans, A. J. Arberry (London : John Murray, 1950) pp. 20-21.
9. G. Sarton, Introduction to the History of Science (Washington, DC: Williams & Wilkins, 1927), Vol. 1, pp. 759-61.
10. Tamara Sonn, A Brief History of Islam (Blackwell Publishing, 2004) p. 56.
11. Ibid
12. Pervez Hoodbhoy, Islam and Science : Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality.
13. Tamara Sonn, A Brief History of Islam (Blackwell Publishing, 2004), p.48.
14. Arab Human Development Report 2002.

রামায়ণ কাহিনীর ঐতিহাসিকতা একটি একাডেমিক আলোচনা

অনন্ত বিজয়

ভূমিকা

আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় নানা কারণে অনেক বিশ্বাস-অপবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, জড়তাবোধ আর বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে অপজ্ঞান এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসে আছে, যা কোনোভাবেই তুলে ফেলা যাচ্ছে না। হাজার বছর ধরে অযৌক্তিক চর্চার ফলে এই সকল অপজ্ঞানের শিকড় আমাদের মতো সাধারণ মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে মিশে গেছে, রক্তের হিমোগ্লোবিনের মতো আমাদের শরীরে অবস্থান করছে। যা আমাদেরক আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। প্রতিমুহূর্তে পিছনে টেনে ধরছে।

প্রথম পর্ব : রাম জন্মভূমি

ভারতীয় দুই কালজয়ী মহাকাব্য হচ্ছে রামায়ণ এবং মহাভারত। যুগ যুগ ধরে অগণিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই মহাকাব্য দু'টি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। মহাকাব্য রামায়ণে বিধৃত পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, সীতার দুঃখময় জীবন, রামভক্তি, হনুমানের বীরত্ব, রাবণ ও মেঘনাদের বীরত্ব, রাবণের অহংকারি মনোভাব, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, বিভীষণের ভূমিকা, বালী বধ ও শম্বুক বধ ইত্যাদি ঘটনা আজ ভারতীয় প্রচার মাধ্যম দূরদর্শনের কল্যাণে হিন্দু ধর্মালম্বীদের মুখে মুখে। ১৯৮৮-৯০ সালে ভারতের দূরদর্শনে প্রথমে রামায়ণ এবং পরে মহাভারত ধারাবাহিকভাবে দেখানো হয়। টিভি সিরিয়াল দু'টি অসম্ভব জনপ্রিয়তা পায়। এ দু'টি কালজয়ী মহাকাব্যকে দূরদর্শনে পরিবেশন দোষণীয় কিছু নয়, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে যেভাবে ধর্মের লেবাস পরিয়ে উথাপন করা হয়েছে, এবং এর মাধ্যমে সনাতন ধর্মের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে সেটি দোষণীয়। এর ফলে

ভারতের সেক্যুলার চরিত্র ক্ষুণ্ন হয়েছে। এতে হিন্দু ধর্মবাদীদের প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। হিন্দু মৌলবাদীদের সংখ্যা বাড়ছে, অবশ্য এর সঠিক পরিসংখ্যান আজও জানা যায়নি। আদৌ জানা যাবে কিনা সন্দেহ?

যেই রাম, রামায়ণ, রাম জন্মভূমি অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে এতো কাণ্ড হল এবং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে– গুজরাটের ভয়াবহ দাঙ্গাকে ভারতের কলঙ্ক বলে সে সময় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী অভিহিত করছিলেন– সেই রাম, রামায়ণ, রাম জন্মভূমি অযোধ্যার কি কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে? ভারতবর্ষে? না কি স্রেফ গ্রীক মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' এর মতো কল্পনার মহাকাব্য মাত্র। প্রবন্ধটিতে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে নিরাসক্তভাবে।

রামায়ণের রচয়িতারা

ঋষি বাল্মীকি রামায়ণ মহাকাব্যের রচয়িতা বলে পরিচিত। তার প্রকৃত নাম রত্নাকর। এক সময় পেশায় দস্যু ছিলেন। জীবনে এক পর্যায়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে তপস্যাবলে সরস্বতীর কৃপায় কাব্যশক্তি অর্জন করেন। বিশ্বাস করা হয় তিনি নারদের কাছ থেকে রামের বৃত্তান্ত শুনেন এবং পরবর্তীতে ব্রহ্মার নির্দেশে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। বাংলাভাষীদের কাছে জনপ্রিয় হল কৃত্তিবাস ওঝার বাংলা রামায়ণ। তার রচনায় বেশ কিছু নতুন সংযোজিত হয়েছে যেমন, রামের দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ। এদিকে তুলসীদাসের রামচরিতমানসের (বাংলা রামায়ণ) সঙ্গে বাল্মীকি রামায়ণের বেশ অমিল রয়েছে। প্রশ্ন হল বাল্মীকির রামায়ণ কতটা শুদ্ধ। বিশেষ করে যখন এ মহাকাব্যটি কয়েকশ বছর ধরে রচিত হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন ভাষায় রামায়ণ রচিত হয়েছে যেমন, বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়া রয়েছে দশরথ জাতক রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, উত্তর ভারতীয় রামায়ণ, দক্ষিণ ভারতীয় রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবৈশিষ্ট্য রামায়ণ, ভূষণ্ডি রামায়ণ, রামচরিত মানস বা তুলসী রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি। এদের মধ্যে বেশ তারতম্য লক্ষিত হয়। তবে মূল কাহিনীটি ঠিক রয়েছে।

রামায়ণ রচনা কাল

বিশেষজ্ঞের মতে বাল্মীকি রামায়ণ পাঁচ কাণ্ডে (অযোধ্যাকাণ্ড থেকে লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত) সম্পূর্ণ ছিলো। অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড (যুদ্ধকাণ্ড) এবং পরবর্তীকালে আরও দুটি কাণ্ড জুড়ে দেয়া হয় প্রথমে বালকাণ্ড ও শেষে উত্তর কাণ্ড। বাল্মীকি রামায়ণে রামকে একজন যুদ্ধবিশারদ রাজা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। রামায়ণ রচনার কয়েকটি ধাপ রয়েছে। প্রথম

পর্যায় ছিলো খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী ও খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী। এ সময়ে রামায়ণের পরম্পরা ছিলো মৌখিক অর্থাৎ অলিখিত– সূত (পাঠক) কিংবা কুশীলবেরা (চারণকবি) তখন রামায়ণ গান করে বেড়াতো। এই সময়ে অর্থাৎ প্রায় দুশো বছর ধরে প্রচলিত ছিলো শুধুমাত্র অযোধ্যাকাণ্ড থেকে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত পাঁচকাণ্ডের অধিকাংশ ভাগ। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিসর ছিলো খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চারশ' বছর। এ সময়ে প্রথম দুশো বছরের মৌখিক পরম্পরার যে পাঁচকাণ্ড রচিত হয়েছিলো তা লিখে ফেলা হয়, আর লিখবার সময় এই পাঁচ কাণ্ডের মূল কাহিনীতে বেশকিছু প্রক্ষেপণ ঘটে থাকে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী, প্রায় তিনশ বছরে ছিলো তৃতীয় পর্যায়! অনুমান করা হয় এই পর্যায়েই বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড সংযোজিত হয়।* এভাবে প্রায় সাত আটশো বছরের পরিসরে মহাকাব্যটি বহু লেখকের সংযোজনে পুষ্ট হয়েছিল– এরপরও বাল্মীকি-রামায়ণে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এ এল বাশামের মতে গুপ্তযুগে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে রামের অবতারতত্ত্ব বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড রামায়ণে সংযোজিত হয়।[১] উক্ত যুগে বর্তমানে প্রচলিত রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুটি সুসংহত রূপ লাভ করে। এর ফলে রামায়ণ মহাকাব্য থেকে হিন্দুদের একটি ধর্মগ্রন্থে উন্নীত হয়–

হতে পারে ইসলাম ধর্মের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের মধ্যে যে ভক্তি আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিলো পয়গম্বর মোহাম্মদের বিপরীতে রামকে অবতার রূপে প্রচার এবং জনমনে অধিষ্ঠিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। রামকে বিষ্ণুর অবতারের আসনে স্থাপন করার পেছনে খ্রিস্টীয় পনেরো শতকে রচিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও খ্রিস্টীয় ষোল শতকে রচিত তুলসী রামায়ণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বস্তুত ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দিভাষায় রামকাহিনী তুলসীদাস কর্তৃক লিখিত হওয়ার পরই অযোধ্যাতে রামকথা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এবং অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে রামের নামে হিন্দু মঠ মন্দির নির্মিত হতে থাকে।

রামায়ণের আকার

আদি বাল্মীকি রামায়ণে পাঁচকাণ্ডে ২৪,০০০ শ্লোক ছিলো। বর্তমানে সপ্তকাণ্ড বিন্যাস করা রামায়ণে ৪০,০০০ এর বেশি শ্লোক আছে।

রামায়ণের চরিত্রগুলোর পরিচয় : বর্তমানে প্রচলিত রামায়ণের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে উল্লেখ করা হলো–

---

* উভয় কাণ্ডেই প্রথমে রামের বিষ্ণু অবতার প্রসঙ্গটি আনা হয়। – সম্পাদকমণ্ডলী

১. **ইক্ষাকু :** রামের পূর্বপুরুষ। অযোধ্যার রাজা। ইক্ষাকু বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বৈবস্বত মনুর ছেলে।

২. **উর্মিলা :** লক্ষ্মণের স্ত্রী। মিথিলার রাজা জনকের নিজের মেয়ে এবং সীতার বোন।

৩. **কুম্ভকর্ণ :** রাবণের মেজভাই।

৪. **কৈকেয়ী :** রামের অনুজ ভরতের মা। দশরথের দ্বিতীয় স্ত্রী। কেকয়রাজ অশ্বপতির মেয়ে, তাই তার নাম কৈকেয়ী।

৫. **জনক :** মিথিলার রাজা। প্রকৃত নাম 'সীরধ্বজ'। 'জনক' একটি উপাধি। সীতার পালক পিতা।

৬. **দশরথ :** রামের পিতা এবং অযোধ্যার রাজা। অজ ও ইন্দুমতীর পুত্র। রঘু বংশের আদি পুরুষ রঘুর নাতি। এর তিন স্ত্রী : কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা।

৭. **নারদ :** বিখ্যাত দেববি। দেববাণী বাহক, জিব্রাইলের কাউন্টার পার্ট। ব্রহ্মার মানসপুত্র। তিনি প্রথম ঋষি বাল্মীকিকে রামের কথা শোনান।

৮. **বালী :** দক্ষিণ ভারতের কিস্কিন্ধ্যা দেশের বানর রাজা। সুগ্রীবের অগ্রজ।

৯. **বাল্মীকি :** আদি কবি। বলা হয়ে থাকে রামায়ণের রচয়িতা। প্রথম জীবনে দস্যু ছিলেন। নাম ছিলো রত্নাকর। তিনি দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে তপস্যা বলে কাব্যশক্তি অর্জন করেন।*

১০. **বিভীষণ :** রাবণের ছোট ভাই সদাচারী ও সত্যনিষ্ঠ। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় রামের পক্ষে চলে আসেন।

১১. **বিশ্বামিত্র :** ব্রহ্মর্ষি নামে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে ছিলেন ক্ষত্রিয়, কিন্তু কঠোর তপস্যায় তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

১২. **ভরত :** দশরথ ও কৈকেয়ীর পুত্র। রামের একদিনের ছোট ভাই। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের একদিনের বড়। জনকের ভাই কুশধ্বজের মেয়ে মাণ্ডবীর সাথে তার বিয়ে হয়।

১৩. **মেঘনাদ :** রাবণ ও মন্দোদরীর বীর পুত্র।

১৪. **রাম :** রামায়ণের নায়ক। বিষ্ণুর অবতার বলে কথিত। দশরথের বড় পুত্র। মাতা কৌশল্যা। মিথিলার রাজা জনাকর পালক কন্যা সীতার স্বামী।

১৫. **রাবণ :** লঙ্কার রাজা। বিশ্রবা এবং নিকষার পুত্র। এক মতে ব্রহ্মার নাতির

---

* রত্নাকর সম্পর্কে আধুনিক বাল্মীকি মধুসূদনের উক্তি :

"নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যেরত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি।" (মেঘনাদ বধ কাব্য)

পুত্র। দশমাথা ছিলো বলে আরেক নাম দশানন। লঙ্কেশ বা লঙ্কেশ্বরও বলা হয়ে থাকে। ত্রিভুবন বিজয়ী বীর যোদ্ধা।

১৬. **লক্ষ্মণ :** দশরথ ও সুমিত্রার দুই যমজ ছেলে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের একজন। রামের একনিষ্ঠ অনুসারী।

১৭. **লব-কুশ :** রাম ও সীতার দুই যমজ সন্তান। এদের জন্ম বাল্মীকির আশ্রমে।

১৮. **শত্রুঘ্ন :** দশরথ ও সুমিত্রার যমজ সন্তানের একজন।

১৯. **সীতা :** জনকের পালিত কন্যা। রামের স্ত্রী ও লব-কুশের মা। রামায়ণের নায়িকা। জনকের মেয়ে বলে 'জানকী', মিথিলা রাজ্যের মেয়ে বলে 'মৈথিলা' বলে ডাকা হয়ে থাকে। সীতা মানে লাঙলের দাগ। ক্ষেতে লাঙলের ফলায় টানা 'সীতা'য় এঁকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন বলে জনক এর নাম রাখেন 'সীতা'।

২০. **সুগ্রীব :** বানর রাজা। বালীর ছোট ভাই।

২১. **সুমিত্রা :** দশরথের তৃতীয় স্ত্রী। মগধ রাজের মেয়ে। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মাতা।

প্রচলিত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

রামায়ণ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া আছে বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর রামায়ণ (আনন্দ পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা-১৯৯৮) গ্রন্থে। নিম্নে এটি উল্লেখ করা হলো–

(ক) বালকাণ্ড : অযোধ্যার ইক্ষাকু বংশীয় রাজা দশরথ-এর তিন রানী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা। কোনও ছেলে হয়না। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন দশরথ। চার ছেলে হলো। কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত, আর সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

রাক্ষস মারীচ আর সুবাহুকে বধ করার জন্য রামকে নিয়ে যেতে দশরথের রাজসভায় এলেন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বশিষ্ঠের পরামর্শে সম্মতি দিলেন দশরথ। রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে চললেন বিশ্বামিত্র। পথে ভয়ঙ্কর তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করলেন রাম। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যজ্ঞে বাধা দিতে এসে রামের বাণে ধরাশায়ী হলেন সুবাহু। মারীচ গিয়ে পড়লেন একশো যোজন দূরের সমুদ্রে। মিথিলায় ঢুকেই, গৌতম মুনির আশ্রমে শাপগ্রস্তা পাষাণভূত অহল্যাকে শাপমুক্ত করলেন রাম তার পদস্পর্শে।

মিথিলার রাজা জনক ঘোষণা করেছিলেন যে, 'হরধনু'তে শর জুড়তে পারবে, তার গলায় সীতা মালা দেবে। রাম ভাঙলেন সেই হরধনু। রামের গলায় মালা দিলেন সীতা। জনকের নিজের মেয়ে উর্মিলার সঙ্গে বিয়ে হলো লক্ষ্মণের। জনকের ভাই কুশধ্বজের দুই মেয়ে মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি মালা দিলেন যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের গলায়। সবাই মিলে ফিরে এলেন অযোধ্যায়। রাম অযোধ্যার সবার নয়নের মণি হয়ে উঠলেন।

(খ) অযোধ্যাকাণ্ড : দশরথের আদেশ, রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করার আয়োজন শুরু হলো। কৈকেয়ী ইতোপূর্বে দশরথের কাছে প্রাপ্য দুই বরের এক বরে চাইলেন ভরতকে রাজা করতে হবে, দ্বিতীয় বরে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে।

রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা বনবাসে চলে গেলেন। ভরত আর শত্রুঘ্ন ছিলেন মামার বাড়িতে। ফিরে এসে সব শুনে রেগেই আগুন। চিত্রকুটে গিয়ে ভরত কেঁদে জড়িয়ে ধরলেন রামের দু পা। রাম কিছুতেই ফিরতে রাজি হলেন না। অবশেষে রামের পাদুকা মাথায় নিয়ে এসে অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়ে রামের প্রতিনিধি হয়ে রাজকার্য দেখাশোনা করতে লাগলেন ভরত।

(গ) অরণ্যকাণ্ড : দণ্ডকারণ্যে এলেন রাম, সীতা, লক্ষ্মণ। রাক্ষস বিরাধকে বধ করলেন রাম অগস্ত্য মুনির পরামর্শে, চললেন পঞ্চবটীতে। পথে দশরথের বন্ধু জটায়ুর সঙ্গে পরিচয়।

লঙ্কার রাজা রাবণের বিধবা বোন শূর্পণখা সুন্দরী নারীর রূপ ধরে এসে প্রথমে রামকে এবং পরে লক্ষ্মণকে বিয়ে করতে চাইলেন। শূর্পণখার নাক আর কান কেটে দিলেন লক্ষ্মণ। প্রতিশোধ নিতে শূর্পণখা ছুটলেন দাদা রাবণের কাছে। রাবণের আদেশ খর, ত্রিশিরা আর দূষণ নামের রাক্ষস মহাবীর ছুটে এলেন পঞ্চবটীতে। তিনজনকেই যমালয়ে পাঠালেন রাম। রাক্ষস অকম্পের পরামর্শে, সীতাকে অপহরণ করার চক্রান্ত করলেন রাবণ। মারীচকে মায়ামৃগের রূপ ধারণ করে পঞ্চবটীতে ঘুরে বেড়ানোর আদেশ দিলেন রাবণ। রাবণের ফাঁদে কাজ হলো। 'সোনার হরিণ চাই' বায়না ধরলেন সীতা।

রাম চললেন হরিণ ধরতে। মারীচ রামের গলা নকল করে আর্ত চিৎকার করলেন। রামের বিপদ আশঙ্কায় সীতা লক্ষ্মণকে পাঠালেন রামকে ফেরাতে। সেই সুযোগ সন্ন্যাসীর ভেক ধরে রাবণ এসে হরণ করলেন সীতাকে। লঙ্কায় নিয়ে চললেন। পুষ্পক রথে করে পথে জটায়ুর সঙ্গে রাবণের ঘোরতর লড়াই হল। রাবণ জটায়ুর ডানা কেটে দিলেন। রাম-লক্ষ্মণ সীতার খোঁজে বেরিয়ে জটায়ুর কাছে সব শুনলেন।

শুরু হলো পাগলের মতো সীতাকে খোঁজা। পথে কবন্ধকে বধ করলেন রাম। কবন্ধ দিলেন সুগ্রীবের খবর। পম্পা সরোবরের তীরে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে রামের প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলেন বৃদ্ধা তাপসী শবরী। তাকে দেখা দিলেন রাম। তারপর চললেন সুগ্রীবের খোঁজে।

(ঘ) কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড : বানররাজ সুগ্রীবের সাথে বন্ধুতত্ত্ব হলো রামের। সুগ্রীব কথা দিলেন, সীতাকে খুঁজে বার করবেন। রাম কথা দিলেন সুগ্রীবের দাদা বলীকে বধ

করে, তার কাছ থেকে রাজ্য আর সুগ্রীবের স্ত্রী রুমাকে আবার ফিরিয়ে দেবেন সুগ্রীবের কাছে। কথা রাখলেন রাম। শুরু হলো সীতা অন্বেষণ। জটায়ুর দাদা সম্পাতির কাছ থেকে সীতার সুলুক-সন্ধান পেলেন বালীর ছেলে অঙ্গদ। ঠিক হলো হনুমান যাবেন লঙ্কায়।

(ঙ) সুন্দরকাণ্ড : মহেন্দ্র পর্বতের মাথা থেকে এক লাফে হনুমান সাগর পার হয়ে এলেন লঙ্কায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সীতাকে দেখতে পেলেন অশোক বর্নে। সীতাকে প্রণাম করে, রাম লেখা রামের আংটি সীতার হাতে তুলে দিলেন হনুমান। সীতা আঁচল থেকে একটি গয়না বের করে দিলেন রামকে দেয়ার জন্যে। সীতাকে উদ্ধারের নিশ্চিত আশ্বাস দিয়ে হনুমান ফিরে এলেন। সীতার খবর পেয়ে আশ্বস্ত হলেন রাম-লক্ষ্মণ সাথে বানররাও আনন্দে হইচই শুরু করে দিল।

(চ) লঙ্কাকাণ্ড (যুদ্ধকাণ্ড) : যুদ্ধযাত্রার তোড়জোড় শুরু করলেন রাম। এদিকে রাবণের ধর্মভীরু ভাই বিভীষণ সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করলেন, কিন্তু ব্যর্থ ও অপমানিত হয়ে যোগ দিলেন রামের পক্ষে।

বানরের দল বড় বড় পাথরের চাঁই আর গাছ দিয়ে লঙ্কা পর্যন্ত সেতু তৈরি করে ফেললেন। শুরু হলো যুদ্ধ। একে একে রাবণের পক্ষে ইন্দ্রজিৎ, অতিকায়, মহোদর, কুম্ভকর্ণসহ অনেকেই মারা পড়লো রাম-লক্ষ্মণের হাতে। বিভীষণ নানা কৌশল বলে দিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করলেন রামকে। সবশেষে শুরু হলো রাম-রাবণ যুদ্ধ। অনেক চেষ্টার পর রাম ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে রাবণকে হত্যা করলেন। যুদ্ধ চলেছিল ১৭/১৮ দিন।

বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করা হলো। সীতা রাবণের কাছে ছিলেন বলে, রাম লোকনিন্দার ভয়ে তাকে ফিরিয়ে নিতে চাইলেন না। আগুনে আত্মাহুতি দিতে চাইলেন সীতা। কিন্তু আগুন জ্বালতেই অগ্নিদেব সীতাকে কোলে করে রামের কাছে ফিরিয়ে দিলেন, বললেন : 'সীতা অপাপবিদ্ধা! শুদ্ধা! পবিত্রতাস্বরূপিনী!'

সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরলেন রাম আর লক্ষ্মণ চৌদ্দ বছর পর। রাম রাজা হলেন ভরত হলেন যুবরাজ।

(ছ) উত্তরকাণ্ড : সীতাকে নিয়ে প্রজারা কানাঘুষা শুরু করে দিল। রাম লক্ষ্মণকে আদেশ করলেন সীতাকে তমসা নদীর তীরে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে রেখে আসতে। বাল্মীকি আশ্রমে সীতার লব কুশ নামে দুটি যমজ সন্তান হলো।

অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন রাম। কৃত্তিবাসী রামায়ণ মতে যজ্ঞের ঘোড়াটাকে আটকে রেখে একে একে হনুমানসহ শত্রুঘ্ন, ভরত, লক্ষ্মণ, রাম সকলকে পরাস্ত করলেন বালক লব, কুশ। বাল্মীকি মুনির মধ্যস্থতায় সবাইকে মুক্তি দেয়া হলো। এ কাহিনী আদি বাল্মীকি রামায়ণে নেই।

যজ্ঞক্ষেত্রে ঋষিবালকের বেশে লবকুশ শোনালেন বাল্মীকি রামায়ণ। বাল্মীকি রামকে জানালেন লব-কুশ ও সীতার কথা। সীতাকে আবার শুদ্ধতার পরীক্ষার কথা বললেন রাম। সীতার ক্ষোভে, দুখে ধরিত্রীমাতা বিদীর্ণ হলেন– আর সীতা সেখানে প্রবেশ করলেন।

কালপুরুষের কৌশলে, রামকে দুর্বাসা মুনির আগমন বার্তা দিতে গিয়ে পূর্বশর্ত মতো লক্ষ্মণকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো সরযূ নদীতে। অনুতপ্ত রাম কুশকে কোশল আর লবকে উত্তর দেশের রাজা করে দিয়ে নিজে প্রাণ বিসর্জন দিলেন সরযূ নদীতে। ভরত, শত্রুঘ্নও রামের পথ অনুসরণ করলেন।

বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড নিয়ে সমস্যা

রামায়ণে রামের অলৌকিকত্ব, বিষ্ণুর অবতাররূপে রামকে চিহ্নিত করার প্রয়াস তা শুধু বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড-এর মধ্যেই রয়েছে। বাকি পাঁচকাণ্ডের সমন্বয়ে রামায়ণ অন্যান্য সাধারণ কাব্য, মহাকাব্য, গল্পগাঁথার মতোই রচিত। প্রথমে উত্তরকাণ্ডের কথা বলা যাক। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে উত্তরকাণ্ড বালকাণ্ডের আগে সংযোজিত হয়েছে। উত্তরকাণ্ডের সংযোজন যে মূল বাল্মীকি রামায়ণ রচনার কয়েকশ বছর পরে রচিত, তার প্রধান প্রমাণ এই কাণ্ডের ভাষা, রচনাশৈলী, যা অনেক পরবর্তী সময়ের সংস্কৃত ভাষা ও কাব্য রচনার পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত[১] প্রাচীন মহাকাব্য কিংবা প্রচারধর্মী যে কোন কাব্য যেভাবে শেষ করা হতো, যুদ্ধকাণ্ড অর্থাৎ ষষ্ঠকাণ্ডের শেষে তার সব নিদর্শন রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ষষ্ঠকাণ্ডে রামরাজত্বের উৎকর্ষের বর্ণনা, রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণের মাহাত্ম্য আর অনেক রকম ইহলৌকিক লাভের কথা বলা হয়েছে। উত্তরকাণ্ড বাদ দিয়ে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত পড়লেই মনে হয় যেন কাহিনী শেষ হয়েছে (মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত রামোপাখ্যানও এখানেই শেষ)। কিন্তু উত্তরকাণ্ডের শুরুতে যেন হঠাৎ করেই মুনি অগস্ত্যসহ কয়েকজন রাজপ্রাসাদে এলেন এবং নানারকমের গল্পের মাধ্যমে কর্মফল, সমাজতত্ত্ব, রামের অবতারতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করতে লাগলেন। যা মহাকাব্যের আগের অংশের সঙ্গে রচনাগত কোনো সংযোগ নেই।

উত্তরকাণ্ডের মতো সমগ্র বালকাণ্ডও প্রাথমিক পর্যায়ের রামায়ণ রচনার অন্তত দু'তিনশো বছর পরের রচনা। বিশেষজ্ঞদের মতে বালকাণ্ডের ভাষা, শব্দচয়ন, রচনাশৈলী তুলনাক্রমে আধুনিক যুগের সাক্ষ্য বহন করে। তারমধ্যে আবার যে অংশে রামের আপাত অলৌকিক জন্মকাহিনী লেখা আছে, তা তুলনাক্রমে আরও অনেক পরে সংযোজিত। কারণ বালকাণ্ডের আরম্ভে বর্ণিত নারদের কাহিনীতে এবং বাল্মীকি রচিত রামায়ণের সংক্ষিপ্তসারে এতো বড় একটা ঘটনার উল্লেখমাত্র নেই।

তাই বলা যায় যে, বাল্মীকি রচিত রামায়ণ বলে প্রচলিত রামায়ণ রচনা করা হয়েছিলো তৎকালীন সময়ে ভারতীয় মানসপটে প্রতিষ্ঠিত মিথ-এর উপর ভিত্তি করে। ঐতিহাসিকগণ সে কথাই মনে করেন। এছাড়া খোদ রামায়ণ* থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বিশিষ্ট অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় তার মহাকাব্য ও মৌলবাদ গ্রন্থে (এলাইড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২১) বিষয়টি ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্ত টেনেছেন। এই অবতারণা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, নারদ নিজ স্মৃতি মন্থন করে বাল্মীকিকে একজন অসাধারণ রাজার কাহিনী বলেছেন, অবতারের কাহিনী নয়, দ্বিতীয়ত, এই অসামান্য রাজা সেই সময়ই বাল্মীকির আশ্রমের অনতিদূরে অযোধ্যা নগরে রাজত্ব করেছেন। রামায়ণের অন্যত্র রামরাজ্যের বিস্তৃতির পরিচয় থেকে জানতে পারি যে, এই বাল্মীকির আশ্রম শুধু যে রামরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাই নয়, রাজধানীর খুব কাছে ছিল। অথচ রামের কাহিনী তো দূরের কথা, তার নামও মহর্ষি বাল্মীকি জানতেন না। ত্রিকালজ্ঞ এবং ত্রিভুবনে ঢেঁকি চড়ে অনায়াস বিচরণকারী কল্পচরিত্র দেবর্ষি নারদকেও এই নামটি বলবার সময় স্মৃতি মন্থন করতে হল। এ ধরনের অবতরণিকাই কি এই প্রাথমিক ইঙ্গিত বহন করে না যে রামায়ণের রচয়িতা এ কাহিনীকে বাস্তব ইতিহাস হিসেবে প্রচার করতে চাননি। এ থেকে কি বোঝা যায় না, বাল্মীকির নামে প্রচলিত রামায়ণটি একটি মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ বা ইতিহাসও নয়।

রামের অবতার তত্ত্বের বিশ্লেষণ

বাল্মীকি রামায়ণ বলে প্রচলিত রামায়ণ মহাকাব্যকে বাস্তব ইতিহাসে রূপান্তরিত করার প্রবণতা ধর্মবিশ্বাসের ফলশ্রুতি। আর এই মহাকাব্য ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে যাবার কারণ রামের অবতারত্বের কাহিনী। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিষ্ণুর অবতার হিসেবে রামের জন্মের তত্ত্ব মূলত রামায়ণের বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডে সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে বালকাণ্ডের এক অংশে আপাত অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত থাকলেও সেখানে কিন্তু অবতারত্বের কথা নেই। একমাত্র উত্তরকাণ্ডে এই কাহিনী বিস্তারিতভাবে স্থান পেয়েছে। বিশেষত, উত্তরকাণ্ডের ১০৪ নম্বর সর্গে কালরূপী ব্রহ্মার দূত এসে রামকে ব্রহ্মার হয়ে জানাচ্ছেন যে রামই স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং দেবতাদের রক্ষক। জনগণের উৎপীড়ক রাবণ বধের কারণেই তার মর্ত্যে আসা– যেহেতু সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, মহাকাল তাকে স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের কথা জানালেন। তারপর রাম 'সশরীরে বৈষ্ণবতেজে' স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করলেন।[৩] কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাম যদি বিষ্ণুর অবতার হয়ে থাকেন, তবে বিষ্ণু কে?

* বাল্মীকি রচিত ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত রামায়ণ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশনস কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১৭।

প্রাচীনকালে স্বভাবতই বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব ছিল। মানুষ তখন বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভয়ে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ত এবং তাদেরকে দৈবশক্তি, আধিভৌতিক, অলৌকিক সত্তা হিসেবে কল্পনা করত। এভাবে আকাশ সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঝড়, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতিকে দেবদেবী রূপে কল্পনা করতো তেমনি পৃথিবীতে অগ্নি, জল, মাটি, পর্বত, নদী, বন প্রভৃতি অনেক প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে দেবদেবীর অধিষ্ঠান কল্পনা করত। কিন্তু সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তাদের কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর, শক্তিশালী এবং সর্বব্যাপী সত্তা ছিল সূর্য আর তার পরেই চন্দ্র। তাই সূর্যকে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্য করবার রীতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সভ্যতায় প্রচলিত ছিল। অন্যান্য গ্রহ– বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি দৃশ্যত বড় বড় গ্রহকেও দেবতা জ্ঞান করা হত। সূর্যের সৃজনী শক্তি এবং প্রখরতার জন্য তাকে পুরুষ দেবতা এবং চন্দ্রের স্নিগ্ধতার জন্য তাকে সাধারণত দেবী হিসেবে কল্পনা করা হত। প্রাচীন মিশরে 'রা' নামে আর গ্রীসে 'এপোলো' নামে সূর্যকে শ্রেষ্ঠ দেবতা রূপে পূজা করা হত। ভারতবর্ষেও বৈদিকযুগ থেকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত সূর্যকেই সর্বপ্রধান দেবতা রূপে কল্পনা করা হত এবং বিভিন্ন মন্ত্রের মাধ্যমে অনেক নামে পূজা করা হত। তবে সব দেশেই স্থানীয় ভৌগোলিক, আর্থসামাজিক পরিবেশ দেবতার রূপ কল্পনায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন, আমরা জানি প্রাচীনকালে মিশরে নীলনদই ছিল ব্যবসা বাণিজ্য এবং যাতায়াতের অন্যতম উপায়, তাই তারা কল্পনা করত সূর্য আকাশ পথে নৌকায় চড়ে যাতায়াত করেন, আর অন্যান্য দেবতারা নৌকার মাঝি। আবার অন্যদিকে, ভারতবর্ষসহ গ্রীসে অভিজাত শ্রেণী রথে চড়ে যাতায়াত করতেন, তাই এসব অঞ্চলে কল্পনা করা হয় সূর্য আকাশ পথে রথে চড়ে যাতায়াত করেন আর অন্যান্য দেবতারা রথের অশ্ব, সারথি ইত্যাদি। আবার প্রাচীনকাল এবং মধ্যযুগে রাজারা এবং তাদের অন্নে পালিত শাস্ত্রকাররা সূর্য এবং চন্দ্র থেকে রাজাদের বংশের উৎপত্তি বলে প্রমাণ করার হাস্যকর চেষ্টা করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিসরের ফারাও সম্রাটেরা নিজেদের বংশকে সূর্য থেকে উৎপত্তির দাবি করত। আর ভারতেও বিভিন্ন পৌরাণিক বিখ্যাত রাজবংশসমূহের উৎপত্তির দাবি করা হত সূর্য কিংবা চন্দ্র থেকে। রামচন্দ্রের ঈক্ষুকা বংশই তো সূর্য থেকে উদ্ভুত।

'বিষ্ণু' শব্দের আক্ষরিক অর্থ (বিষ্=বিস্তার+নু) যার বিস্তার বা ব্যাপ্তিই পরিচয়। বলাবাহুল্য, পৃথিবী থেকে আপাতদৃষ্টিতে দেখা আকাশের গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে সূর্যের আছে একমাত্র এই পরিচয়। এখন খুব সংক্ষেপে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ(?) থেকে দেখা যাক যে, সূর্যই বিষ্ণু ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তের ১৬-১৭ঋকে একই সঙ্গে অশ্বীদ্বয়, সবিতা এবং বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। নিরুক্ত টীকাকার দুর্গাচার্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন : 'বিষ্ণুরাদিত্যঃ। ...সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেহন্তরীক্ষে। গয়শিরস্যস্তং

গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ মন্যতে।' ভাবার্থ হচ্ছে সূর্যই বিষ্ণু, তার উদয়কালীন, মধ্যাহ্নকালীন আর অস্তকালীন এই তিন পাদবিক্ষেপ। বিশেষত মধ্যাহ্নে অন্তরীক্ষে অবস্থিতিই সূর্যের বিষ্ণুতত্ত্ব। ঋগবেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১৫৫ সূক্তের ৫ঋকে বলা হয়েছে যে 'মানুষেরা বিষ্ণুর দুই পাদই অবলোকন করতে পারে এবং ধারণা করতে পারে। তৃতীয় পাদ মানুষেরা ধারণা করতে পারে না, এমনকি উড্ডীয়মান পক্ষীরাও প্রাপ্ত হইতে পারে না।' অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সূর্যকে নিরীক্ষণ করা মানুষের পক্ষে কঠিন এবং পাখীদের পক্ষেও তার কাছাকাছি যাওয়া অসম্ভব। একই সূক্তের পরবর্তী ৬ঋকে বলা হয়েছে যে 'বিষ্ণু চারটি নব্বই দিনকে চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করেন।' এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে বৈদিক যুগে প্রচলিত চার ঋতুর নিয়ন্তা হিসেবে সূর্যের কথা এখানে বলা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে ঋগ্বেদের আরও অনেক সূক্তে (১/১৫৪/৪-৬, ১/১৫৫/৪, ১০/৩৭) বিষ্ণু এবং সূর্য উভয়কেই জ্যোতির উৎস, অন্ন উৎপাদক, জগতের রক্ষাকর্তা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সূর্য, বিষ্ণু, সবিতা একই দেবতা, অশ্বীদয় তাদের রথের ঘোড়া। আর ঊষা এবং রাত্রি এই দুই দেবী সূর্য অথবা বিষ্ণুর গতি দ্বারাই সৃষ্ট। সামবেদ সংহিতাতেও অনেক জায়গায় সূর্যকেই বিষ্ণু বলা হয়েছে। যেমন সামবেদ সংহিতার ১৭/১/১/১৬২৫-২৬এ বলা হয়েছে যে 'হে বিষ্ণু! এই যে তুমি বললে, 'আমি বালরশ্মি সমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এই কি তোমার একমাত্র রূপ? তুমি সংগ্রামে (অর্থাৎ মধ্যদিনে) অন্যরূপ ধারণ করে থাক, আমাদের কাছে তোমার সেই অন্যরূপ প্রকাশিত কর। ... সেই মহান আমি তোমাকে স্তব করছি। সামবেদ সংহিতার ১৮/২/৫/১৬৭০-৭৪ এ বলা হয়েছে 'বিষ্ণু এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন। এর পদ সুদৃঢ়রূপে অন্তরীক্ষে স্থাপিত।... যখন বিষ্ণু পৃথিবীর সর্বত্র পরিক্রমা করেন, তখন রশ্মিরূপ দেবগণ আমাদের জন্য পৃথিবীতে প্রবেশ করেন। বিশিষ্ট সামবেদ বিশেষজ্ঞ পরিতোষ ঠাকুর (দেখুন : সামবেদ সংহিতা, অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিতোষ ঠাকুর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৫, ভূমিকা) দেখিয়েছেন যে সামবেদে সূর্য ও বিষ্ণু এক ও অভিন্ন, ঋগ্বেদের মতো সামবেদেও অগ্নি, রুদ্র, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেবদেবী সূর্যের বিভিন্ন শক্তি বিশেষ।

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, সূর্যের আরেক নামই বিষ্ণু। বিষ্ণুর উপাসনা ছিল বৈদিক ধর্মের সূর্য উপাসনারই নামান্তর মাত্র। আজ আমরা জানি সূর্য একটি জড়পিণ্ড। মহাকাশে সূর্যের চেয়ে অনেকগুণ বড় অগণিত নক্ষত্র রয়েছে। সূর্য হচ্ছে কতিপয় গ্যাসের সমন্বয়ে* গঠিত একটি নক্ষত্র একমাত্র বড় নক্ষত্র নয়; সূর্যের

* সূর্যের ভেতরের মূল রাসায়নিক পদার্থসমূহ হচ্ছে, হাইড্রোজেন– ৯২.১%, হিলিয়াম ৭.৮%, অক্সিজেন ০.০৬১%, কার্বন ০.০৩%, নাইট্রোজেন ০.০০৮৪%, নিয়ন ০.০০৭৬%, লৌহ ০.০০৩৭%, সিলিকন ০.০০৩১%, ম্যাগনেসিয়াম ০.০০২৪%, সালফার ০.০০২৫% এবং অন্যান্য ০.০০১৫%।

থেকে হাজারগুণ বড় এবং আলোকাজ্জ্বল নক্ষত্র রয়েছে মহাবিশ্বে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই গ্যাসীয় পিণ্ড মানুষরূপী অবতার হতে পারে! আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বিপুলসংখ্যক হিন্দুধর্মাবলম্বী যখন রামকে বিষ্ণুর (সূর্যের) অবতার বলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে দাবি করেন গলা ফাটিয়ে স্লোগান তুলেন 'রাম ভক্তিই, রাষ্ট্র (ভারত) ভক্তি', তখন তাদেরকে কি বলা যায়? জ্ঞানপাপী, সুবিধাবাদী না অন্য কিছু?

আরোও কিছু রামায়ণ কথা

গত পর্বে আমরা উল্লেখ করেছিলাম, বাল্মীকি রামায়ণ, তুলসী রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছাড়াও আরও কিছু রামায়ণ প্রচলিত আছে। যেমন– প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত দশরথ জাতক রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, উত্তর রামায়ণ, দক্ষিণ রামায়ণ ইত্যাদি। এসবের এক একটিতে একেকভাবে চিত্রিত রয়েছে রামায়ণ কাহিনী। কোথাও রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও ভরত ভাইবোন, কোথাও সীতা রাবণ ও মন্দোদরীর পরিত্যক্তা কন্যা, যাকে রাজা জনক ক্ষেতের আলে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। আবার পণ্ডিত শ্রী উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস তার গ্রন্থের পূর্বাভাস অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে রাম ও সীতা ভাইবোন। ভরত ছিলেন মালব রাজ্যের আর্যজাতীয় এক রাজন্য পরিবারের সন্তান এবং এক অর্থে রাম-সীতার দার্শনিক গুরু।[৬] যাইহোক, এখন আমরা দশরথ জাতক রামায়ণ কাহিনীকে সংক্ষেপে উল্লেখ করবো।

দশরথ জাতক রামায়ণ

বিশিষ্ট অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায় তার মহাকাব্য ও মৌলবাদ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৩১) লিখেছেন, 'বৈদেকি সাহিত্য, পানিনীর রচনা কিংবা পতঞ্জলির 'মহাকাব্যে' রাম অথবা রামায়ণের কোন উল্লেখ নেই, যদিও মহাভারতের অনেক চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রথম দু'টিতে। রামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'দশরথ জাতক' নামক প্রাচীন বৌদ্ধ কাহিনীতে। ...জার্মান ভারতবিদ অ্যালাব্রেকট ওয়েবার, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ড. সুকুমার সেনের মতে এটাই ছিলো আদি রামায়ণ।' এর সময়কাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তবু ঐতিহাসিকেরা ধারণা করেন, দশরথ জাতক রামায়ণ পালি ভাষায় ১৩টি গাথায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এটি রচিত হয়েছিলো। ভিন্নধর্ম এই রামায়ণের কাহিনী সংক্ষেপে হল : এই রামায়ণ কাহিনীর বিশেষত্ব হল রামপণ্ডিত-লক্ষ্মণকুমার ও সীতাদেবী হলেন ভাইবোন, বারানসীর ধার্মিক ও প্রজানুরঞ্জক রাজা দশরথের প্রথমা স্ত্রীর সন্তান সন্ততি। ভরতকুমার হলেন ২য় স্ত্রীর

পুত্র, বয়সের দিক দিয়ে ভরত রামের পরবর্তী। প্রচলিত রামায়ণের গল্পের মতই ২য় মহিষীর ষড়যন্ত্রে রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে ১২ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়। কিছুদিন পরে দশরথের মৃত্যু হলে ভরত রামকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে রামের সকাশে উপনীত হয়ে পিতার মৃত্যু সংবাদ জানান এবং অযোধ্যার শূন্য সিংহাসনে বসার অনুরোধ জানান। রাম বনবাসকাল পূর্ণ হওয়ার আগে দেশে ফিরতে অপারগতা প্রকাশ করলে ভরতকেই তার হয়ে রাজকার্য পরিচালনার নির্দেশ দেন। ১২ বছর পরে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে এলে পুরবাসীদের অনুরোধে রাম পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সীতা অগ্রমহিষীর আসনে অলংকৃত হন।

উল্লেখ্য যে রামায়ণের যে মূল আকর্ষণ রাবণ, সীতা হরণ ও রাম রাবণের মধ্যে যুদ্ধের কোন প্রসঙ্গ এই রামায়ণে নেই। আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার হল সীতা রামের অনুজা হওয়া সত্ত্বেও তার মহিষী হন। ভাই বোনে বিবাহ সে কালের একটি সামাজিক প্রথার কথা মনে করিয়ে দেয়। জাতক রামায়ণ রচনার কালে ব্যাপকহারে না হলেও এই প্রথা তখনও চালু ছিল মনে হয়। এখানে আরও একটি বিষয় যে পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে লক্ষ্মণ ও সীতার মত রাম শোকে ভেঙে পড়েননি, অত্যন্ত শান্ত ও সংহত চিত্তে তিনি এই শোক সংবাদ গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি এর কারণ হিসেবে ১২টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন গাঁথার আকারে।[৮]

অনার্য রামায়ণ উপাখ্যান

কাহিনীটি এরকম, যা ঘটেছিল পূর্বকল্পে বা প্রাক সত্য যুগে। *
এই কাহিনী অনুসারে প্রায় ৬,০০০ খ্রিস্টপূর্বে ভারতবর্ষে তখন জড় ও প্রকৃতি পূজা, যেমন সূর্য, চন্দ্র, বরুণ,... এবং যাগ-যজ্ঞ, পশুবলি ইত্যাদি প্রচলিত ছিল, যাকে বলা যেতে পারে 'আর্য ধর্ম'। শাসন ছিল রাজতন্ত্র আর বিবাহ প্রথা অনুলোম।**

এই ধর্ম-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে সে সময় ভারতের তিন স্থানে তিনজন নায়ক আবির্ভূত হয়েছিলেন, যেমন মালবে আর্য ভরত, যার গাত্রবর্ণ

---

*শ্রী উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের মতে, সত্যযুগ হচ্ছে-৮০০০ খ্রিস্টপূর্ব হতে ৭৫০০ খ্রিস্টপূর্বের মধ্যে যখন আর্যনামীয় শ্বেতকায় একটি জাতি বাইরে থেকে উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তখন এ দেশে দ্রাবিড় ও অন্যান্য কয়েকটি জাতি (কালো চামড়ার মানুষ) বাস করতো। আর্যরা ক্রমিকভাবে রাজ্য ও প্রাধান্য বিস্তার করতে করতে ৬১০০ খ্রিস্টপূর্বের কাছাকাছি সময়ে পূর্বে মিথিলা এবং দক্ষিণে গোদাবরী নদী ও সেখান থেকে সিংহলে নিজেদের ধর্মমত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাদি এবং ভাষা প্রতিষ্ঠা করেছিলো। এই দীর্ঘ সময় বুঝানো হয়েছে।

**বিবাহের ব্যাপারে আর্যদের কতকগুলো বিশেষ প্রথা। পুরোহিত সম্প্রদায়ের যুবকগণ নিজেদের ইচ্ছেমত যে কোন বর্ণের কন্যা, রাজন্য সম্প্রদায়ের যুবকগণ পুরোহিত ভিন্ন অন্য যেকোন বর্ণের, বৈশ্য সম্প্রদায়ের যুবকগণ শুধু নিজ সম্প্রদায়ের এবং আর্যীকৃত অনার্যদের কন্যা এবং আর্যীকৃত অনার্যরা শুধু নিজ বর্ণের কন্যাগ্রহণ করিতে পারতো। একই প্রথাকে অনুলোম বলে।

ছিল শুভ্র, বারানসী বা অযোধ্যায় সীতাদেবী, তিনিও আর্যবংশীয় শ্বেতবর্ণা, আর সিংহলে বা লঙ্কায় আবির্ভূত হয়েছিলেন শম্বর, আর্যভাষী হলেও তার বর্ণ ছিল কালো এবং গোত্র ও বংশ বিচারে অভিজাত কুলের নন।

জ্যেষ্ঠ ভরত কালক্রমে প্রচলিত যাগযজ্ঞ নির্ভর ধর্মের বিপরীতে 'ব্রহ্মবাদ' নামে এক নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সিংহলবাসী শম্বরও এক সময় ভারতে এসে ভরতের কাছে এই মতবাদে দীক্ষা নেন। কিন্তু পরে তিনি সিংহলে এই মতবাদের আরও প্রসার ঘটিয়ে একটি সার্বজনীন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা বিশ্বে 'চক্রধর্ম' নামে পরিচিতি লাভ করে। অনেক মত পথ ও দর্শন সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই সার্বজনীন, যাতে ব্রহ্মবাদেরও স্থান ছিল, অচিরেই ভারতে সাধারণ মানুষ ও তরুণদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, ছড়িয়ে পড়ে শম্বরের নাম।

এই মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে অযোধ্যার আর্যবংশীয়া সীতাদেবী ও তদীয় ভ্রাতা রামচন্দ্র শম্বরের নিকট এই নতুন ধর্মে দীক্ষা নেন। তখন শম্বর ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী নদীর তীরে একটি আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। কালে সীতা ও শম্বরের মাঝে গড়ে ওঠে প্রগাঢ় প্রেমের বন্ধন– সীতা হয়ে ওঠেন শম্বরের একান্ত সহচরী ও সাধন সঙ্গিনী। এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে সীতাভ্রাতা রাম চক্রধর্ম পরিত্যাগ করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন, এবং কিছুদিন পরে সনাতনধর্মীদের প্ররোচনায় শম্বরকে তার আশ্রমে হত্যা করেন।

এ সময় লঙ্কার রাজা ছিলেন রাবণ, যিনি সম্পর্কে শম্বরের মাতুল। আর্যবংশীয় হলেও রাবণ ছিলেন একজন মুক্তমনা ও সমাজ সংস্কারক। ভাগনেয় হত্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ হত্যাকারী আর্যধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন, কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও সবংশে নিহত হন। শম্বরের অনেক অনুসারীসহ সীতা দেবী আর্যদের হাতে ধরা পড়েছিলেন। সীতাকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়।[৯] এই সমুদয় কাহিনী উপাখ্যান, গালগল্প না ইতিহাস তা বিচারের দায়িত্ব গবেষকদের।

রামায়ণের ঐতিহাসিকতা অনুসন্ধানে

অনেকে প্রশ্ন তোলেন, রামায়ণ কি নিছক কল্পনা নির্ভর কাহিনী, না তার অন্তর্লোকে কিছুটা হলেও আছে ইতিহাসের উপাদান? যদি সত্য হয় তবে রামায়ণের কাহিনী কোন সময়ের ঘটনা? আবার আরও কিছু প্রশ্ন উঠে আসে, রামায়ণ কি ভারতীয় মিথ নির্ভর কাব্য, না কি এতে বিদেশি কাব্যের প্রভাব আছে? ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজি। তবে এর আগে বলে নেয়া ভাল যে, আর্যরা* ইরানীয় অঞ্চল থেকে

* আর্য হচ্ছে একটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম। সংস্কৃত, ল্যাটিন ও গ্রীক– প্রধানত এই তিনটিই হচ্ছে আর্য ভাষা। বর্তমানে ব্যাপকভাবে ভুল প্রয়োগের ফলে আর্য, আর্যজাতি, আর্যভাষী– সব একাকার হয়ে গেছে। ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে আর্যজাতি ভারতে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ থেকে ভারতে প্রবেশ শুরু করেছিল– যা অব্যাহত ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অবধি। – সম্পাদকগুলী

ধীরে ধীরে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। তবে এই আর্যদের এ অঞ্চলের প্রবেশের সময়কাল নিয়ে কিছুটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব রয়েছে ঐতিহাসিকদের মধ্যে। তবে এক ব্যাপারে এক মত যে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ এর পর ধীরে ধীরে আর্যভাষীদের এ অঞ্চলে প্রবেশ ঘটেছে। খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০-১৫০০ শতাব্দীর তিন চারশ বছর ধরে আর্যভাষীরা পারস্য অঞ্চল (অন্য নাম ইরান) থেকে উত্তর ভারতে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে দক্ষিণমুখে ছড়িয়ে পড়ে। আর্যরা যাযাবর পশু শিকারজীবী ছিল, এ অঞ্চলে এসেই কৃষিজীবী দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সাথে পরিচিতি ঘটে এবং ধীরে ধীরে কৃষি সভ্যতার সাথে মিশে যায়। অনেকেই দাবি করেন, উত্তর ভারতের আর্যভাষী জনপদগুলোর মানুষেরা ধীরে ধীরে দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জনজাতিগুলোর কোনটাকে বশীভূত করে, কোনটিকে পরাস্ত করে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার কাহিনীই রামায়ণে বিধৃত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাঁওতালী লোকপুরান-কাহিনীর মধ্যে একটি 'কুদুম' বা 'ধাঁধা' আছে, যা বাংলায় অনুবাদ করলে পাওয়া যায়- 'রাম ছিল। হরধনু ভেঙে সীতাকে ঘরে আনল। তারপর রাবণ তাকে চুরি করে নিয়ে গেল। সীতাকে পরে উদ্ধার করল রাম। তখন হল অগ্নিপরীক্ষা। এরপরে সীতার কোলে জন্মাল লব-কুশ। রাম তাদেরকে ঘরে আনল। কিন্তু সীতা লুকালো মাটির তলায়।'...

এই কাহিনীর মধ্যে যে ঐতিহাসিক স্তর-বিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে, তা হল এই রকম :

রাম=রা-(অর্থাৎ, জনপদের মানুষের রাজা)

রাবন= রা-বন (অর্থাৎ, বনের মানুষদের রাজা)

সীতা= লাঙলের ফাল হরধনু ভেঙে রাম সীতাকে লাভ করলেন, তার অর্থ শিকারজীবী মানুষ রূপান্তরিত হচ্ছে কৃষিজীবীতে।

জীবিকার উপজীব্য পরিবর্তিত হচ্ছে, অর্থনীতির পরিভাষায় উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বদল ঘটছে। সীতাহরণের রূপকে বোঝানো হচ্ছে বনচর মানুষদেরও কৃষিকর্মের জ্ঞান আয়ত্ত করে ফেলার ইতিবৃত্ত। রাম-রাবণের সামাজিক স্তরের মানুষদের দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে আদিবাসীদের পরাভবের কথা। অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে বনে পড়ে থাকার ফলে লাঙলে জমা মরিচাকে পুড়িয়ে ফের ব্যবহার উপযোগী করা। লব-কুশের অর্থ কৃষিসভ্যতার দ্যোতনাবাহী এবং লব ও কুশ যথাক্রমে শস্য ও তৃণের প্রতীক। তাদেরকে ঘরে নিয়ে আসার অর্থ ফসল গোলায় তোলা। আর মাটিরতলায় সীতার লুকিয়ে পড়ার অর্থ ফসলী মরশুমের পরিসমাপ্তি ধীরে ধীরে মাটির ওপরের হল কর্ষণের দাগগুলো (সীতা) মিলিয়ে যাওয়া। তাহলে অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে রামায়ণের 'বানর' শব্দ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে একটি লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন অধ্যাপক জয়ান্তনুজ বন্দোপাধ্যায় তার মহাকাব্য ও

লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায় তার মহাকাব্য ও মৌলবাদ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩৫); তিনি বলেছেন,

> 'বন শব্দের সঙ্গে ইক্ প্রত্যয় যোগে বান শব্দ হয়, যেমন বানপ্রস্থ প্রভৃতি শব্দে। তারপর বান শব্দের সঙ্গে নর শব্দের সন্ধি করলে এবং সন্ধির একটি বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী পুনরাবৃত্তিমূলক অক্ষরের একটিকে বাদ দিলে, বনে বসবাসকারী মানুষ অর্থে বানর হতে পারে। এমনও সম্ভব যে বানর, ভালুক প্রভৃতি জীবজন্তু বিভিন্ন বনবাসী আদিম জাতির টোটেম কিংবা প্রতীকি জাতিচিহ্ন ছিল। পৃথিবীর সব দেশেই প্রাচীনকালে আদিম জাতি-উপজাতিদেরমধ্যে এ ধরনের টোটেম কিংবা জাতি চিহ্ন প্রথা প্রচলিত ছিল। আর এই টোটেমের নামেই সেসব জাতি পরিচিত ছিল। যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের পটভূমিতে রামায়ণের কাহিনী রচিত হয়েছিল, সেখানেও এই টোটেম প্রথা নিঃসন্দেহে প্রচলিত ছিল। আর বানর বলতে হয়ত এমন একটি বনবাসী আদিমজাতিকে বোঝাত, যার টোটেম ছিল বানর। রামায়ণের বর্ণনাতে দেখাদেখি বানরদের রাজধানী কিস্কিন্ধ্যা একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। সে কারণে বনবাসের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয়ে রাম নিজে সেখানে না গিয়ে লক্ষ্মণকে পাঠিয়েছিলেন সুগ্রীবের সঙ্গে আলোচনা করতে, এবং কিস্কিন্ধ্যার বাইরে বনের ভিতরে তার সঙ্গে দেখা করাবার ব্যবস্থা করেছিলেন।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ঐ সময় আর্থসামাজিক বিবর্তনকে অবলম্বন করে যে ভাবের সঞ্জাত হয়েছিল, রামায়ণ কাহিনী তার উপরেই বহির্কাঠামো (সুপার-স্ট্রাকচার) রূপে নির্মিত হয়েছে, কালক্রমে এমন একটা ব্যাখ্যা চলে আসছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে রামায়ণ তথা সকল মহাকাব্যেরই উৎস লুকিয়ে রয়েছে লৌকিক সাহিত্য প্রকরণের মধ্যে। অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্তের মতে,

> 'আদিম মানুষের প্রথম সাহিত্য গড়ে উঠেছিল সৃষ্টি রহস্য, ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ, প্রাণের উদ্ভবের সূত্র প্রভৃতি বিষয়ে তাদের বিচিত্র কল্পনায় গড়ে তোলা এবং অতিলৌকিক নানান সত্তা ও ঘটনাকে অবলম্বন করে কাহিনী তৈরি করার মাধ্যমে। এগুলোকে বিশেষজ্ঞরা নাম দিয়েছেন 'মিথ' বা লোকপুরাণ বলে। প্রতিটি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীরই নিজস্ব সাংস্কৃতিক ইতিহাস গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব মিথগুলোর অবদান অপরিসীম। তাদের ঈশ্বর ও দেব কল্পনা, ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত আচার-বিধিইত্যাদি বিষয় বিবর্তিত হবার উৎসে এবং প্রবাহে লুকিয়ে থাকে এইসব মিথগুলো[১০]

তবুও ধর্মীয় বিশ্বাসে বুঁদ হয়ে থাকা, রামকে অবতার জ্ঞানে পূজা আর রামায়ণকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মান্য করা হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা যুগ যুগ ধরে। বিশ্বাসীরা 'রামায়ণের প্রতিটি ঘটনা সত্য এবং রাম এ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে রাক্ষস রাবণকে হত্যা করে

সীতাকে উদ্ধার করেন এবং রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।' তাহলে প্রশ্ন আসে সেই সময়কাল কবে? কোন কোন ঐতিহাসিক বা বিশেষজ্ঞ বলেছেন, রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার সময়টা খ্রিস্টপূর্ব ১২শ-১০মশতাব্দী হতে পারে। আমরা আগেই জেনেছি, বাল্মীকির নামে প্রচলিত রামায়ণ রচনার বেশ কয়েকটি ধাপ ছিল। এবং প্রথম ধাপ শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী এবং খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী আর দশরথ জাতক রামায়ণতো আরও অনেক পুরাতন।

বর্তমানে অযোধ্যা নামে পরিচিত ও তদসংলগ্ন এলাকায় এ পর্যন্ত প্রত্ন-খননে যেসব উপাদান সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে চূড়ান্তভাবে কোন কিছুই প্রমাণিত হয়নি। মৌর্যযুগের কিছু জৈন ও বৌদ্ধ মূর্তি, মাটির তৈজসপত্র ইত্যাদি পাওয়া গেছে, যা ৪র্থ শতকের আগের নয় বলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনুমান। সব চাইতে পুরানো সাক্ষ্য ৮ম শতকের সময়কালের। মোদ্দা কথা হল প্রত্ন সাক্ষ্যে এখনও অযোধ্যার প্রাচীনত্ব বা এখানে যে একটি উচ্চমানের নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা প্রমাণ করা যায়নি। (১১, ১২)

প্রত্নসাক্ষ্য বাদ দিলেও পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যেও অযোধ্যার সন্ধান মিলছে না। 'অঙ্গুত্তর নিকা'য় যেসব প্রাচীন নগরের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে রয়েছে চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী আর বারানসী, অযোধ্যার নাম নেই। অন্যান্য নগরের মধ্যে রয়েছে বৈশালী, তক্ষশীলা, মথুরা, অহিচ্ছত্র, কুশিনারা, ইন্দ্রপ্রস্থ, উজ্জয়নী। এখানেও অযোধ্যার খোঁজ নেই। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পরে রচিত (১০.২.৩১-৩৩ শ্লোক) অথর্ববেদে অবশ্য এক অযোধ্যার খোঁজ পাওয়া যায়। তবে সে অযোধ্যা; হল 'দেব নগর' বা 'মিথিক্যাল সিটি'-৮টিবৃত্ত, ৯টি দ্বার ইত্যাদির মাধ্যমে একে মানব দেহের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং এটি 'রামজন্মভূমি' অযোধ্যা কি না সংশয় রয়েছে। বৌদ্ধ তত্ত্বগ্রন্থ 'সমজুত্তনিকায়'তে এক অযোধ্যার উল্লেখ আছে বটে, তবে সেটা স্পষ্টভাবেই গঙ্গাতীরের একটি শহরের কথা বলা হয়েছে। এবং এই অযোধ্যার বয়স খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ বছর আগের নয়। হিউয়েন সাং তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই গাঙ্গেয় অযোধ্যার কথাই লিখেছেন। তাছাড়া খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত 'বিষ্ণুস্মৃতি' গ্রন্থের ৮৫তম অধ্যায়ে ৫২টি মূল তীর্থের তালিকায় অযোধ্যার নাম নেই। দেবতা রামের জন্মভূমি রূপে অযোধ্যার বিশেষ একটি মর্যাদা লাভ কি উচিত ছিল না এই তীর্থ তালিকায়? তাই বোঝা যাচ্ছে, অযোধ্যা কোনওদিন একটি তীর্থরূপে গণ্য হয়নি। স্বয়ং তুলসীদাস পর্যন্ত প্রয়াগকে তীর্থরাজ বলেছেন, কিন্তু 'অযোধ্যা' তার কাছে নিতান্তই 'আওধপুরী'। অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্তের(১০) মতে, 'গুপ্তযুগেই রামকে সরযূ নদীর তীরের অযোধ্যা সঙ্গে জোড়া হয়েছে এবং ১৬ শতকের আগে রামকে নিয়ে কোন কাল্ট উত্তর প্রদেশে গড়ে উঠেনি (পৃঃ ১১৪)।'

এখন দেখা যাক রামায়ণের লংকা নিয়ে ঐতিহাসিকদের অভিমত। অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃষ্ঠা ৩৫, ৩৬) বলেছেন, 'পণ্ডিতেরা এ বিষয়েও প্রায় ঐকমত্য পোষণ করেন যে রামায়ণের লংকা বর্তমান শ্রীলংকা নয়। কর্নাটক থেকে বেশি দূরে নয় এমন কোন বড় নদীর ধারে কল্পিত অথবা বাস্তব কোন পার্বত্য শহর। দশম-একাদশ শতাব্দীতে চোল সাম্রাজ্যের সঙ্গে শ্রীলংকার বাণিজ্য শুরু হবার পর থেকেই ক্রমশ রামায়ণ-এর লংকাকে শ্রীলংকার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়। কোন কোন রামায়ণের পরবর্তী রূপায়ণে সেভাবে ভাষা এবং ভাবের রূপান্তর ঘটে'।(১৩)

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, রাম কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। সেটা বুঝেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'রাম জন্মভূমি প্রকৃতপক্ষে মহাকবি বাল্মীকির মনোভূমি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

সুতরাং রাম যদি অনৈতিহাসিক চরিত্র হন তবে রামায়ণ উপাখ্যান বা মিথ-এর উৎপত্তি স্থল কোথায়? এ ব্যাপারে দীপঙ্কর লাহড়ী তার 'বিলুপ্ত জনপদ : প্রচলিত কাহিনী' গ্রন্থে (সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত, কলকাতা; ১৯৯৪ পৃষ্ঠা-১৯৫, ১৯৬) বলেছেন,

> 'রামায়ণ প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিস্মিত হতে হয় এই কথা ভেবে যে, সম্রাট অশোকের (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক) যুগে রাম নাম ধারী এমন কোন রাজা জনপদ কিংবা রাজ্য এ দেশে নেই। রামচন্দ্রের প্রাধান্য ভারতের জনমানসে বহুকাল ধরে স্বীকৃত তাতে ব্যাপারটা বিস্ময়কর বটে। অথচ ভূমধ্যসাগরের উত্তর পূর্বাঞ্চলে রাম কিংবা র-যুক্ত শব্দে চিহ্নিত বহু জনপদ ও রাজার নাম রয়েছে যেগুলোর প্রাচীনত্ব খ্রিস্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় সহস্রকের। যেমন মিশরের ফারাও বিভিন্ন রামেসিস (সংখ্যা ১১ জন); ডেভিডের পূর্বপুরুষ, ইব্রাহিমের উত্তর পুরুষ হিষরোনের পুত্র রাম জেরামিলের পুত্র এলিহুর পূর্বপুরুষ (বাইবেল); রামাল্লা (পশ্চিম জর্ডানে জেরুজালেমের উত্তরে শহর), রমৎগণ (তেল আবিবের কাছে শহর), রামাথেইম জোসিফ (স্যামুয়েলের জন্মস্থান-বাইবেল), রামঃ বা রমঃ (Ramah বাইবেলে উক্ত শহর), রামথ লেহি (দক্ষিণ পশ্চিম প্যালেস্টাইনের অঞ্চল বিশেষ– এখানে স্যামসনের হাতে ফিলিস্টাইনরা নিহত হয়), রামথ–নিজপে (জর্ডন নদীর পূর্ব অঞ্চল বিশেষ), র‍্যামবুয়া (Rambauillet-উত্তর ফ্রান্সের শহর)। এছাড়াও রম কিংবা রুপ উপসর্গযুক্ত শব্দ অনেক আছে যা ইউরোপের মধ্যভাগের ব্যক্তি, নগরী বা দেশ বোঝাতো। 'রোম নগরের প্রতিষ্ঠাতা রেমুলাস ও রেমাস নামক দুই যমজ ভ্রাতা। রোম বা রুমানিয়া দুটি সুন্দর উদাহরণ। জিপসিরাও নিজস্ব ভাষায় নিজেদের রম নামে পরিচয় দিতো।'

এছাড়া আমরা জানি যে, অসংখ্য দেব দেবী অধ্যুষিত প্রাচীন মিসরের প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্যদেব 'রা', তিনি দেবকুলের রাজা। কেউ কেউ মনে করেন তার আদি নাম রাম (Ram)। রা বা রাম নামে সম্ভবত তিনিই ছিলেন মিশরের বদ্বীপ অঞ্চলের

অতি প্রাচীন নগর হেলিয়োপলিসের অধীশ্বর এবং মিশরসহ সমগ্র পশ্চিম এশিয়া আর দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বিশেষত গ্রীসের সর্বজনমান্য দেবতা। সেই আমলে সূর্যদেবের পূজায় যে আন্তর্জাতিকতা দেখা গেছে তা নজিরবিহীন। এ থেকে অনেকে ধারণা করে থাকেন রাম ভারতের আগে মধ্যপ্রাচ্যের– অর্থাৎ মিশরের রাম এখন ভারতীয় ভগবান (সূত্র : দ্বন্দ্বে ও দ্বৈরথে; পৃষ্ঠা-৮০)। এবং সেই রাম আর্যদের মাধ্যমে ইরানীয় অঞ্চল দিয়ে আস্তে আস্তে উত্তর ভারতে প্রবেশ করেছে।

হোমার রচিত ইলিয়াড মহাকাব্যের সাথে রামায়ণের কাহিনীর মিল দেখে অনেক রামায়ণ বিশেষজ্ঞদের মতে রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে ভারতের পরিবেশে ইলিয়াড-এর ছায়া অবলম্বনে রচিত, হয়তো কিছুটা ওডিসির ছায়াও পড়ে থাকতে পারে। জার্মানির বিশিষ্ট রামায়ণ বিশেষজ্ঞ ড. অ্যালব্রেকট ওয়েবার এই মত পোষণ করতেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালের আগেই রচিত হয়েছিল। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত প্রকাশ করেছেন যে, হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্যই আগে রচিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে রামায়ণে ইলিয়াড থেকে অনেক উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছিল। তবে কেউ কেউ এ ব্যাপারে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তাদের অভিমত হচ্ছে, 'রামায়ণ বা মহাভারত' কাব্য দু'টি বিশ্বের দু'টি চিরন্তন সত্যকে আশ্রয় করে লিখিত। একটা হচ্ছে নারী অন্যটি হচ্ছে ভূমি। রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল নারীহরণকে কেন্দ্র করে আর মহাভারতের কুরুক্ষেত্র কাহিনী রচিত হয়েছে ভূমিকে কেন্দ্র করে। নারীহরণ ও তার জন্য যুদ্ধ, এই বিষয়বস্তুর জন্য গ্রীক কবি হোমারের কাছে যাবার প্রয়োজন ছিল না।[১৪] আবার অনেকে এমন মনে করেন যে, রামায়ণ ও ইলিয়াড দুটি মহাকাব্যই আরো প্রাচীন কোন উৎস থেকে এসেছে। অনেক বছর আগে মাল্লাদী ভেঙ্কট রত্নম নামে অন্ধ্র প্রদেশের একজন পণ্ডিত দুই খণ্ডে বই লিখে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, রাম ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মিশরের সবচেয়ে বিখ্যাত ফ্যারাও দ্বিতীয় র‍্যামোসিস, সীতা ছিলেন ইখনাতোনের ভগ্নি সীতামন, আর রাবণ ছিলেন একজন হিটাইট রাজা।[১৫] জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার মহাকাব্য ও মৌলবাদ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩৩) নীরদ চৌধুরীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Contient of Cire' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'রামায়ণ কাহিনী আদতে মধ্যপ্রাচ্যের কোন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে আর্যদের সঙ্গে তা ভারতে প্রবেশ করে এবং উত্তর ভারত থেকে ক্রমশ দক্ষিণ ভারতে বিস্তারের ঐতিহাসিক পটভূমিতে নানাভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে ভারতের রামায়ণের রূপ ধারণ করে।'

এই আলোচনার ভিত্তিতে আমরা কতিপয় সিদ্ধান্ত টানতে পারি। (১) রাম যে ঐতিহাসিক চরিত্র, এখন পর্যন্ত প্রমাণিত নয়। (২) মূল রামায়ণে রামের অবতারত্ব প্রসঙ্গ নেই এবং পল্লবিত রামায়ণে রামের ওপর বিষ্ণুর যে অবতারত্ব তা

পরবর্তীকালের প্রক্ষেপণ। (৩) সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস ভিত্তিক রামায়ণের একটি সামাজিক ব্যাখ্যা দেয়া যায়, যাকে রাম-রাবণ-সীতার প্রতীকে মহাকবি বাল্মীকি এই মহাকাব্য উপস্থিত করেছেন।

অথচ রামজন্মভূমি ও রামমন্দির প্রতিষ্ঠার নামে সারা উপমহাদেশে বিশেষ করে ভারতে কি লংকাকাণ্ডই না ঘটে চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। কত সহস্র নিরপরাধী অসহায় মানুষ প্রাণবিসর্জন দিল ধর্মের নামে। ইতিহাস কি আমাদের ক্ষমা করবে?

রামায়ণ মহাকাব্য হিসেবে অতুলনীয় এবং সাহিত্য জগতে এর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এই মহাকাব্যকে ধর্মগ্রন্থ বানিয়ে এবং রামচন্দ্রের মর্যাদা রক্ষার নামে একদল ধর্মব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ এবং রামভক্ত আধুনিক হনুমানেরা যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং ঘটাচ্ছে তাতে কি এই মহাকাব্যকেই অপমান করা হচ্ছে না? এর অবমূল্যায়ন ঘটছে না? আমাদের মনে হচ্ছে, রাম জন্মভূমি আর বাবরি মসজিদ নিয়ে ঘটনার রেশ আরও দীর্ঘকাল আমাদের বহন করতে হবে, আমরা কেবল আশা করব ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সেক্যুলার শক্তি উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মব্যবসায়ীদের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করবে– রক্ষা করবে অসহায় মানবতাকে।

প্রাসঙ্গিকী ও তথ্যপঞ্জী

১. A L Basham, The wonder that was India, Forntana, Calcutta, 1971, p 301, 304, 306.

২. জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায়, মহাকাব্য ও মৌলবাদ, এলাইড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ.২১। "...বাল্মীকি রামায়ণে-এর বালকাণ্ডে যেভাবে কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে রাম নামক একজন নরপতির উপাখ্যানকে কেন্দ্র করেই এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে। কোনো অবতারের বাস্তব ইতিহাসকে নয়। রামায়ণের আরম্ভে বাল্মীকি নারদকে বলেছেন : 'এক্ষণে এই পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি গুণবান, বিদ্বান, মহাবল, পরাক্রান্ত, মহাত্মা, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন? কোন ব্যক্তি সকলপ্রকার প্রাণীর হিতসাধন করে থাকেন? কোন ব্যক্তি লোকব্যবহারকুশল, অদ্বিতীয়, সুচতুর ও প্রিয়দর্শন? কোন ব্যক্তিই বা রোষ ও অসুয়ার বশবর্তী নহেন? রণস্থলে জাতক্রোধ হইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভীত হন? হে তপোবন! এইরূপ গুণসম্পন্ন মনুষ্য কে আছেন, তাহা আপনিই বিলক্ষণ জানেন। এক্ষণে বলুন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।' বাল্মীকি স্পষ্টতই একজন বহুগুণসম্পন্ন আদর্শ মানুষের পরিচয় পেতে চাইছেন। অবতারের কথা জিজ্ঞেস করছেন না। এমনকি কোন রাজার কথা জিজ্ঞেস করছেন না। অবতারত্বের প্রশ্ন জড়িত থাকলে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হতো না। কারণ রামায়ণ-এর অন্যত্র বর্ণনা অনুযায়ী অযোধ্যা নগরী

থেকে বাল্মীকির আশ্রয় বেশি দূরে ছিলো না। বাল্মীকির প্রশ্নের উত্তরে নারদও একজন বহুগুণ সম্পন্ন নরপতির নাম করেছেন, একজন অবতারের নাম নয়। নারদ বলেছেন : 'তাপস, তুমি যে সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করিলে, তৎসমুদয় সামান্য মনুষ্যে নিতান্ত সুলভ নহে। যাহাই হউক, এরূপ গুণবান মনুষ্য এই পৃথিবীতে কে আছেন, এক্ষণে আমি তাহা স্মরণ করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর।'; এর পর নারদ এই বলে কাহিনী শুরু করেছেন যে, 'রাম নামে ইক্ষাকু বংশীয় সুবিখ্যাত এক নরপতি আছেন।' তারপর রামের কিছু গুণ বর্ণনা; করে তার অভিষেকের মুখে কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্র এবং দশরথের কাছে বর প্রার্থনা থেকে আরম্ভ করে সীতাকে উদ্ধার করে লংকা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কাহিনী সংক্ষেপে বলে শেষে জানাচ্ছেন যে তখনও 'অযোধ্যাপতি রাম পিতার ন্যায় প্রজাপালন করিতেছেন।' অর্থাৎ নারদ কাহিনী বাল্মীকিকে বলবার সময় রাম অযোধ্যায় রাজত্ব করছেন। এরপর নারদ রামরাজত্বের মহত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, 'রাম দশ সহস্র ও দশ শত বছর রাজ্য শাসন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।'

৩. হেমচন্দ্র (অনূদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ ১০৯৭-৯৮, ১১০৩।

৪ www.solarviews.com/sun.ht;
http://observer.arc.nasa.giv/nasa/exhibits/sun/sun

৫. ভারতের বাইরে এশিয়ার বহুদেশে রামায়ণ কাহিনী ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থটিতে– V. Raghavan, The Ramayan in Greater India, South Gujrat India University, Surta, 1975.

৬. উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের পুরাবৃত্ত, ১ম খণ্ড, বি. সরকার এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৫০।

৭. ঈশান চন্দ্র ঘোষ (অনূদিত), জাতক, ৪র্থ খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ ৮৭-৯১।

৮. ১ (ক) লক্ষ্মণ সীতারে লয়ে, অবতরি জলমাঝে, দুইজনে থাক দাঁড়াইয়া ;

(খ) বলিল ভরত আসি, গিয়াছেন স্বর্গপুরে দশরথ জীবন ত্যাজিয়া।

২ বল রাম, কোন বলে হয়ে বলিয়ান শোককালে শোকাতুর নহে তব প্রাণ?
পিতার বিয়োগ বার্তা করিলে শ্রবণ, তথাপি না অভিভূতে দুঃখ তব মন!

রামপণ্ডিত নিজের অশোকের কারণ বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত গাথাগুলো বলিলেন :

৩ দিবা রাত্র উচ্চৈঃস্বরে করিয়া ক্রন্দন যাহারে রক্ষিতে কেহ পার না কখন,
তার জন্য বৃথা শোকে হয় কি কাতর বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান নর?

৪ বাল, বৃদ্ধ, ধনবান, অতি দীন হীন, মূর্খ, বিজ্ঞ সকলেই মৃত্যুর অধীন।

৫ তরুশাখে ফল যবে পরিপক্ক হয়, অনুক্ষণ থাকে তার পতনের ভয়।

জীবগণ, সেইরূপ জন্ম লাভ করি মৃত্যুভয়ে দিবানিশি কাঁপে থরথরি।

৬ ঊষাকালে যাহাদের পাই দশরথ না হেরি সায়াহ্নকালে তার বহুজন;
ইহাদের (ও) বহুজন ঊষা না ফিরিতে অদৃশ্য হইয়া যায় যমের কুক্ষিতে।

৭ বৃথশোকে অভিভূত হয়ে মূঢ় জন আত্মার অশেষ ক্লেশ করে উৎপাদন;
লভিতে ইহাতে যদি সুফল তাহারা, পণ্ডিতেও শোকবেগে হ'ত আত্মহারা।

৮ শোকেতে শরীর ক্ষয়, লাভ নাহি আর; বিবর্ণ, বিশুষ্ক দেহ, অস্থিচর্মসার।
শোক কি করিতে পারে মৃতুঞ্জীবন? কি ফল পাইব তবে করিয়া ক্রন্দন?

৯ বারির সাহায্যে যথা গৃহ দহ্যমান সযতনে গৃহিগণ করলে নির্বান
ধীর শাস্ত্রজ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ তেমতি শোকের সদা করেন দমন।
বায়ুবেগে তুলারাশি উড়ি যথা যায়, প্রজ্ঞাবলে শোক তথা শীঘ্র লয় পায়।

১০ কর্ম্মবশে যাতায়াত করে জীবগণ; কেহ মরে, কেহ করে জনম-গ্রহণ।
এই মাতা, পিতা, এই সোদর আমার, হেনজ্ঞানে সুখে মগ্ন নিখিল সংসার।

১১ গিয়াছেন স্বর্গে পিতা, কি কাজ ক্রন্দনে?
লইব পিতার স্থান, দীনেরে কবির দান
রাখিব মানীর মান, ভাবিয়াছি মনে।
জ্ঞাতিজনে সাবধানে করিব পালন,
পুষিব যতনে আর যত পরিজন।

১২ সুধীর, শাস্ত্রজ্ঞ লোকে করেন দর্শন ইহলোকে, পরলোকে প্রভেদ কেমন।
যত বড় শোক কেনো উপস্থিত হয়, দহিতে পারে না কভু তাদের হৃদয়।

৯. উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৬-৯০

১০. পল্লব সেনগুপ্ত, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা, উৎসের সন্ধানে, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, পৃ ৯৪-৯৫।

১১. ঐ, পৃ ১১৩।

১২. গৌতম নিয়োগী, রাম জন্মভূমি বনাম বাবরি মসজিদ, মাসিক অনিক, জুআই ১৯৯০, কলকাতা, পৃ ৩২।

১৩. J I Brockington, Righteous Rama : The Evolution of an Epic, Oxford University Press, Delhi.

১৪. অতুল সুর, হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য, সাহিত্যালোক, কলকাতা, পৃ ৩৩-৪২।

১৫. Malladi Venkat Ratnam, The greatest Pharao of Egypt, 2 vols., Rajahmudnry, 1934.

১৬. বেনজীন খান, দ্বন্দ্বে ও দ্বৈরথে, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা।

১৭. আর এম দেবনাথ, সিন্ধু থেকে হিন্দু, রিডার্স ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৮. সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

১৯. নন্দগোপাল, সেনগুপ্ত, বস্তুবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা।

২০. http://www.time.com.asia.features/India_ayodhya/timeline/;
http://www.vepachedu.org/Babri-history.html;
http://en.wikipedia.org/wiki/Babri_mosque;
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1844930.stm

নতুন কিছু ধর্মের কথা

জাহিদ রাসেল

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে বিভিন্ন সময় মানুষের ভয়, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের কারণে বহু ধর্মীয় মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। এর অনেকগুলোই সময়ের সাথে বিলীন হয়ে গেছে আবার এর কোন কোনটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মূলধারার ধর্মীয় বিশ্বাস হিসাবে টিকে রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এ ধরনের আরো বহু ধর্মীয় মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। উন্নত বিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের নতুন ধর্মীয় আন্দোলনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

বিশ শতকে উন্নত বিশ্বের মানুষেরা মূল ধারার ধর্মগুলো থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে। বস্তুবাদের বিকাশের ফলে মানুষ জীবনের ব্যাপক অর্থের অন্বেষায় প্রতিষ্ঠা করতে থাকে নতুন ধর্ম। যার ফলে বিগত দশকের ষাট ও সত্তুরের দশকে নাটকীয়ভাবে বেগ পায় নতুন ধর্মীয় আন্দোলনের (NRM)। কখনও কখনও মূল ধারার ধর্ম যেমন খ্রিষ্টান, জুডিজ্যম ও ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে এর কিছু অনুসারী সকল ধর্মগুলোর মূল শিক্ষার আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে আবার কখনো প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা, দর্শন, প্যাগানিজম (Paganism) অথবা বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ নতুন ধর্মীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে উত্তর আমেরিকাতে প্রায় ১৫০০-২০০০, ব্রিটেনে ৫০০ এবং আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকার উপজাতিদের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রচলিত। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে আমেরিকা, জাপান, কানাডা, পশ্চিম জার্মানি, নেদারল্যান্ড ও ফ্রান্সের মতো যে সকল দেশে মূলধারার ধর্মের প্রভাব কম সেখানেই নতুন ধর্মগুলোর বিস্তার বেশি লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে ইতালি, গ্রিস, স্পেন, অস্ট্রিয়া ও আয়ারল্যান্ডের মতো দেশ যেখানে মূল ধারার ধর্মের প্রভাব বেশি সেখানে নতুন ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাব কম। এখানে এদের কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বা উপদল (Christian Sect) : এ ধরনের সম্প্রদায়গুলো দুটি কারণে গতানুগতিক মূলধারার খ্রীষ্টান সম্প্রদায়গুলো থেকে আলাদা। প্রথমত, এরা বাইবেলের যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে তা চার্চের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন। দ্বিতীয়ত, এদের কোন কোন গ্রুপ অন্য গ্রন্থকে বাইবেলের সমমর্যাদা দিয়ে থাকে। যেমন The Church of Jesus Christ of latter day Saints, যা Mormon ধর্ম হিসেবে পরিচিত, তারা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ Book of Mormon কে বাইবেলের মতো পবিত্র মনে করে। অসংখ্য খ্রিষ্টান উপসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে Jehovah's Witness, the Salvation Army, Seventh Day Adventist Church সুপরিচিত। বিশ্বাসগত পার্থক্যের জন্যে বিভিন্ন সময় খ্রিষ্টান চার্চের সাথে এদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যেমন Eternal flame foundation-এর সদস্যরা মনে করে তারা দৈহিকভাবে অবিনশ্বর থেকে যাবে, আবার এদের কোন কোন গ্রুপ মনে করতো "Messiah" ২০০০ সালের ১লা জানুয়ারি পৃথিবীতে আসবেন এবং পৃথিবী ধ্বংস হবে। ২০০০ সালের ১লা জানুয়ারি www.olivertree.com নামক কটি ওয়েব সাইটে "Messiah cam"র নামে একটি লিংকের মাধ্যমে জেরুজালেমের গোলডেন গেইটে স্থাপিত ক্যামেরার মাধ্যমে Messiah'র আগমন সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। যদিও তিনি নির্ধারিত তারিখে আসেননি, কিন্তু ক্যামেরাটি এখনও পর্যন্ত অপেক্ষা করছে!!

একত্রীকরণ চার্চ (The Unification church) : একত্রীকরণ চার্চ সম্ভবত নতুন ধর্মীয় আন্দোলনের স্রোতে সবচেয়ে সুপরিচিত নাম। এটির নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন উত্তর কোরিয়ায় জন্মগ্রহণকারী রেভারেন্ড সুন ম্যুং মুন (The Reverend Sun Myung Moon)। এই ধর্মের অনুসারিরা মুনপন্থি (Moonies) নামে পরিচিত। এদের মূল বিশ্বাসগুলো লিপিবদ্ধ আছে স্বর্গীয় নীতি (Devine Principle) নামক বইয়ে। যাতে প্রাচ্যের দর্শনের সাথে সমন্বয় স্থাপন করে পুরাতন ও নতুন টেস্টামেন্টের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন রেভারেড মুন যাকে তার অনুসারীরা প্রেরিত পুরুষ বলে মনে করেন। গত শতকের ৭০'র দশকের গোড়ায় এটি বিশ্ববাসীর নজর কাড়ে যখন মুন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বড় বড় র‍্যালি-সমাবেশের আয়োজন করেন। এর সদস্যরা ছিল কলেজ পড়ুয়া মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর। একত্রীকরণ চার্চ গণবিয়ের আয়োজনের জন্যে বিখ্যাত ছিল। সবচেয়ে মজার বিষয় ছিল হলরুমে আগত পাত্রপাত্রীদের মাঝ থেকে বিয়ের জন্য জুটি নির্বাচন করতেন মুন নিজে। একেকটি অনুষ্ঠানে ২০০০ বা তারও বেশি বিয়ে হতো। ১৯৭০'র দিকে এই গ্রুপের সদস্যরা ঘরে ঘরে গিয়ে ফুল, কাপড়, মিষ্টি, বৃক্ষ বিক্রি করতো। বর্তমানে এর সদস্যরা একত্রীকরণ চার্চের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। একত্রীকরণ চার্চ কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে আছে সংবাদপত্র

(Wasington Times), টেলিভিশন স্টেশন, হোটেল চেইন, বিশ্ববিদ্যালয়, কলকারখানা। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের হিসাব মতো সারা পৃথিবী জুড়ে একত্রীকরণ চার্চের প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন সদস্য আছে। মুন তার বিলাস বহুল জীবন যাপন পদ্ধতি ও সদস্যদের দরিদ্র জীবন যাপন পদ্ধতি এবং ডানপন্থী রাজনীতির সমর্থন দেবার জন্য সমালোচিত হন।

প্রাচ্যের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত নতুন ধর্মীয় আন্দোলন : 'ইসকন' বা International Society for Krisna Conscience, ব্রহ্মকুমারী Brahma Kumaris (Raja yoga), আনন্দ মার্গ, রজনীশবাদ (Rajneeshism), সন্যাসীপন্থী (The Sannyasins), The Orange People Ges Elan Vital'র মতো ধর্মীয় আন্দোলনগুলো প্রাচীন হিন্দু ধর্মের দর্শনকে ভিত্তি করেই উদ্ভব হয়েছে। অন্যদিকে Zen ও Nichiren Shoshu Buddism বৌদ্ধ দর্শনকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এখানে এদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসেন্স (ISKCON) বা ইসকন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

এটি 'হরে কৃষ্ণ' আন্দোলন নামেও পরিচিত। এর প্রতিষ্ঠাতা কলকাতায় জন্মগ্রহণকারী এ. সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। এটি নতুন কোন ধর্ম নয়। এটি মূলত হিন্দুধর্মের বৈষ্ণব কালট থেকে তৈরি হয়েছে। এটিকে এর পশ্চিমা সংস্করণ বলা যেতে পারে। পশ্চিমা দেশগুলোতে থাকা বহু প্রবাসী ও ভারতের হিন্দুরা একে সত্যিকারের হিন্দু উপসম্প্রদায় হিসাবে স্বীকার করে নেয়। প্রভুপাদ ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং এটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। হিপ্পি ও মাদকে আসক্তদের এরা দ্রুত টেনে নেয়। এর সদস্যরা মনে করে গভীর আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। এর সদস্যরা দিনে ১৭২৮ বার 'হরে কৃষ্ণ' মন্ত্র জপে থাকে। এরা মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া, ধূমপান করা, চা কফি, মদ পান করা ও বিবাহ বহির্ভূত সেক্স থেকে বিরত থাকে। তারা কৃষ্ণ বিষয়ক সাহিত্য বিতরণ, অনুদান সংগ্রহ ও সদস্য সংগ্রহ করে থাকে। এর সদস্যদের রাস্তার পাশে মস্তক মুণ্ডিত, জাফরান রঙ্গের পোশাক পরিহিত অবস্থায় 'হরে কৃষ্ণ' জপ করতে দেখা যায়। ২০০২ সালে এর কিছু প্রাক্তন সদস্য এই বলে অভিযোগ আনে যে ৭০ ও ৮০'র দশকে ইসকনের বোর্ডিং স্কুলগুলোতে মারাত্মক শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল। ২০০২ সালের দিকে ব্যাংকের কাছে বড় অংকের দেনার দায়ে আমেরিকায় এর সবগুলো স্কুল বন্ধ হয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক বিদ্যার চার্চ (The Church of Scientology) : ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা লাফ্যায়েৎ রন হুব্বার্ড (Lafayette Ron Hubbard) একজন বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখক ছিলেন। ১৯৫০ সালে তার লেখা "Dianetics : The Mordern Science of Mental Health" বইটি

আমেরিকায় খুব জনপ্রিয়তা পায় যা এখনও একটি বেস্ট সেলার। দায়ানেটিকস (Dianetics) থেরাপিতে মনে করা হয় মানুষের মস্তিষ্কে তার জীবনে বা পূর্ববর্তী জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার চিত্র গেঁথে থাকে। এ সকল ঘটনার চিত্র সম্মিলিতভাবে মানুষের উন্নতির পথে বাঁধা হিসাবে দেখা দিতে পারে। বৈজ্ঞানিকবিদরা (Scientologiest) দাবি করে থাকেন, The Church of Scientology থেরাপি কোর্সে একজন সিনিয়র বৈজ্ঞানিকবিদ এক্ষেত্রে নিরীক্ষক (Auditor) হিসেবে বিভ্রান্ত মানুষকে এ সকল বাধা ঠেলে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে তৈরি করতে সাহায্য করেন। বৈজ্ঞানিক বিদ্যার চার্চ সম্ভবত নতুন ধর্মগুলোর মধ্যে সবচেয়ে 'সম্পদশালী' ও 'প্রভাবশালী' ধর্ম। বৈজ্ঞানিকবিদরা বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করে থাকেন, কোন কোন কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য তারা মাথা পিছু ৫০,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত খরচ করে থাকেন। বৈজ্ঞানিকবিদরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্থার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়ে। আমেরিকাতে তারা বিবাদে জড়িয়েছে Federal Bureau of Investigation (FBI), The Internal Revenue Service, The Food and Drug Administration (FDA) প্রভৃতির সাথে। বিবাদে জড়িয়েছে ইউকে, জার্মানি ও ফ্রান্সে যারাই তাদের নিষিদ্ধ বা বেঁধে রাখতে চেয়েছে। দীর্ঘ চার যুগ আইনী লড়াইয়ের পর, আমেরিকার Internal Revenue Service "The church of Scientologyকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে মেনে নেয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য 'দাতব্য কমিশন'কে (Charity Commission) দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় নি। বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় চার্চের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭৫০,০০০। The Church of Scientology'র বার্ষিক আয় প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড। বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় চার্চের পক্ষে আইনী লড়াই লড়বার জন্যে এর প্রায় ১০০ আইনজীবীর পেছনে প্রায় ১৩ মিলিয়ন ডলার খরচ করে থাকে। মজার বিষয় হলিউডের জোন ট্রাভোল্টা, শ্যারন স্টোন, ডেমি মুরে, টম ক্রুইজ' এর মতো অভিনেতা অভিনেত্রী এর সদস্য।

শয়তানবাদ (Satanism) অন্য যে কোন ধর্মের চেয়ে বেশি বিতর্কিত। এর অনুসারীরা শয়তানের পূজারি। ১৯৬৬ সালে এনটোন লা ভে (Anton la Vey) সানফ্রান্সিস্কোতে 'শয়তানের চার্চ' (The Church of Satan) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি 'শয়তানের বাইবেল' (The Satanic Bible) রচনা করেন। Marlyn Manson'র মতো নাম করা কিছু মিউজিকসিয়ান এতে যুক্ত হওয়ায় এটি নতুন করে আলোচনায় আসে। এলিস্টার ক্রোলি (Alister Crowley) শয়তান উপসনাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ছিলেন, তিনি তখন 'সবচেয়ে দুষ্ট মানুষ (জীবিত) হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

১৯৯০ সালের দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে "শয়তান উপসনাকারীদের" ধর্মের নামে অনাচারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের পুলিশ ও সরকারের তদন্তে বেরিয়ে আসে শয়তান উপাসনাকারীদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আসে তার অধিকাংশই গুজব।

The International Fortean Society, The Society for the Investigation for the Unexplained, The Raelians-এর মতো ধর্মীয় আন্দোলনগুলো গড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকে নির্ভর করে।

ব্রিটিশ সাংবাদিক এডওয়ার হান্টারের মতে নতুন ধর্মীয় সংগঠনগুলোর সদস্যদের মন নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে নতুন ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধারণার প্রসার ঘটাবার মাধ্যমে এর অনুসারীদের রক্ত মাংসে গড়া পপেটে বা human robot-এ পরিণত করে। নিচের ঘটনাগুলো তার বক্তব্যের সত্যতাই তুলে ধরে :

১। ১৮ই নভেম্বর ১৯৭৮, জোনস টাওন, গায়নায় জনতার মন্দির নামে এক ধর্মীয় সংগঠনের নেতা জিম জোনস ও তার ৯১৩ জন অনুসারী বিষাক্ত পানীয় পানের মাধ্যমে মারা যায়।

২। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সৌর মন্দির নামের গ্রুপটি প্রায় ৭০ জন সদস্য আত্মহত্যা করে। তারা বিশ্বাস করতো তাদের মৃত্যুর পর তারা যখন অদৃশ্যতা লাভ করবে, তখন তাদের নেতা যোশেফ দি মামব্রো তাদের সাইরাস গ্রহে নিয়ে যাবেন।

৩। আর্ডম শিনরিকিয়ো (Supreme Truth Society) নামের জাপানি এই ধর্মীয় সংগঠনটি ১৯৯৫ সালে টোকিও সাবওয়েতে বোমা বিস্ফোরণের জন্য দায়ী, এতে ১২ জন নিহত ও হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়।

৪। ১৯৯৭ সালে স্বর্গের দ্বার (Heaven Gate) নামক সংগঠনটির ৩৯ জন সদস্য পরস্পরকে মরতে সাহায্য করে। ১৯৯৭ সালে হেলির ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়। এই সংস্থার সদস্যরা মনে করেছিল এই মহাকাশ যানটি তাদেরকে নিতে এসেছে। তাই তারা এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে।

কে মুরতাদ?

হাসান মাহমুদ (ফতে মোল্লা)

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। দিনটি ছিল রবিবার ২৭শে জুন ৩৩ মুক্তিসন (২০০৪ সাল)। সকাল দশটায় ঢাকাতে 'নাস্তিক-মুরতাদ প্রতিরোধ কমিটি' আর 'মুসলিম মিল্লাত শারিয়া কাউন্সিলের' ঢাকা মহানগরী কমিটির সভায় প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি মওলানা সাফায়েত উল্লাহ জালালী'র সভাপতিত্বে শারিয়া কাউন্সিলের সভাপতি মওলানা মুফতি কুদরতে এলাহী এবং সদস্য মওলানা জাকারিয়া, মওলানা একায়েদ উল্লাহ, মওলানা কেরামত আলী, মওলানা জব্বার ফতেহপুরী, মুফতি সালেহ আহমদ প্রমুখ (তাঁদের মতে) এক বিশেষ সিদ্ধান্তে বিভিন্ন 'ইসলাম বিরোধী' কর্মকাণ্ডের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মুনতাসির মামুন আর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুল মোকাদ্দেস আকাশকে সুরা তওবার ৬ নম্বর আয়াত অনুযায়ী 'মুরতাদ' অর্থাৎ ইসলাম-ত্যাগী ঘোষণা করে ইসলামের আনুষ্ঠানিকতায় ফিরে আসার জন্য তিন মাসের সময় দিয়েছেন। তিন মাসের মধ্যে অধ্যাপকরা এ প্রস্তাবে সম্মত না হলে সুরা তওবার ১১ নম্বর আয়াত অনুযায়ী তাদের হত্যার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। ড. হুমায়ুন আজাদ তখনও জীবিত।

ওই নামের মওলানা-মুফতিদের নাকি পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু কাণ্ডটা কেউ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এবং এ 'ইচ্ছে'টা বাংলাদেশের কারো কারো মাথায় খেলা করছে তাতেও সন্দেহ থাকার কথা নয়। সে হিসেবে ঘটনাটা তাঁদের ভবিষ্যৎ মহাপরিকল্পনার আরেকটা 'স্টেট কেস' হিসেবে ধরে নিতে পারি আমরা। 'মুরতাদ' বিষয়টা বাংলাদেশে অপ্রাসঙ্গিক নয় এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এ ঘোষণায় বাংলাদেশী মুসলমানের ধর্মীয় আবেগের অপব্যবহার, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক অধঃপতন এবং প্রশাসনের ব্যর্থতা

ছাড়াও অন্য কিছু দিক সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সেগুলো হল, উল্লিখিত মওলানা-মুফতিরা–

১। তাঁদের আপত্তিগুলো দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের কাছে না জানিয়ে বেআইনীভাবে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়েছেন।
২। আদালতের সিদ্ধান্তের বাইরে মানুষ খুন করার ঘোষণার মত মারাত্মক অপরাধের দায়িত্ব নিয়েছেন।
৩। বিশ্বে সবাই এটা জেনেছে, তাঁরা ইসলামের বিকৃত হিংস্র রূপ তুলে ধরে দেশের ও ইসলামের ভাবমূর্তি আবারো নষ্ট করেছেন।
৪। মুরতাদ বিষয়ে কোরান-হাদিসের নির্দেশ অমান্য করে ইসলামের সীমা লংঘন করেছেন, যে বিষয়ে কোরান বারবার মুসলমানদের নিষেধ করেছে, সাবধান করেছে।
৫। সুরা তওবার ছয় ও এগারো নম্বর আয়াত সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
৬। আচার-আনুষ্ঠানিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে ইসলামের মূল শান্তি-বাণীকে অস্বীকার করেছেন।
৬। নিজেরা সন্ত্রাসের উদাহরণ শুরু করে অন্যদেরকে সন্ত্রাসে উৎসাহিত করেছেন।

আল কোরানের অনেক আয়াতে মুসলমানদের প্রতি চিরকালের নির্দেশ আছে যেগুলো মুসলমানদের চিরকাল পালন করতে হবে। আবার অন্য অনেক আয়াতে শুধুমাত্র তখনকার তাৎক্ষণিক কিছু ঘটনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে, সে পটভূমির বাইরে ওই আয়াতগুলো প্রয়োগ করার নির্দেশ কোরান দেয়ওনি, প্রয়োগ করা যায়ও না। সে চেষ্টার ফলও হবে আমাদের জন্য মারাত্মক। যেমন, সুরা নিসা'র ১৫৪ আয়াতে আল্লাহ বলছেন 'শনিবারের সীমা' লংঘন না করতে। এটা ছিল আল্লাহ'র তরফ থেকে শুধু সেই সময়ের আরবের সংস্কৃতি-ভিত্তিক নির্দেশ। যেহেতু আরবের বাইরে পৃথিবীতে কোন 'শনিবারের সীমা' কোনদিনই ছিল না এবং এখন আরবেও সে সংস্কৃতি আর নেই, তাই বাস্তবে এ আদেশ প্রযোজ্য হবার অবকাশ নেই। বাংলাদেশের ঘাড়ে এখন জোর করে 'শনিবারের সীমা' চাপিয়ে দিলে কি দাঁড়াবে অবস্থাটা?

তাৎক্ষণিক নির্দেশের এমন আরো অসংখ্য উদাহরণ আছে সারা কোরান জুড়ে, আছে সুরা মুনাফিকুন, মুমতাহিনা নূর, তাওবাহ, আনফাল, মায়েদাহ, নিসা, বাকারা ইত্যাদি বহু বহু সুরায়। সুরা তওবার ছয় ও এগারো নম্বর আয়াতেরও সুস্পষ্ট কারণ ও পটভূমি ছিল যা তাৎক্ষণিক, শাশ্বত নয়। রসুল আর মক্কীদের মধ্যে সম্পাদিত হোদায়বিয়া সন্ধির চুক্তি যখন মক্কীরা ভঙ্গ করেছিল, তখন চুক্তিভঙ্গের অপরাধে মক্কীদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল এবং চুক্তিবদ্ধ অন্যান্য মুশরিকদের সাথেও চুক্তি নবায়ন না করার ঘোষণা করা হয়।

তওবা'র প্রথম আয়াতগুলো হোদায়বিয়া সন্ধির সাথে সম্পর্কিত, তার বাইরে অন্য কোন ব্যাপারের সাথে নয়। সে জন্যই আয়াতগুলোতে বারবার 'চুক্তি' ও 'চুক্তিভঙ্গ' শব্দ দুটোর উল্লেখ আছে। এছাড়া সুরা তওবার ৬ নম্বর আয়াতে মুশরিকদের ক্ষমা করার কথা আছে, খুন করার নয়। খুন করার কথা আছে পাঁচ নম্বর আয়াতে, তাও সেটা মুশরিকদেরকে, মুরতাদকে নয়। আর ১১ নম্বর আয়াতও নাজিল হয়েছে নবীজীর তৃতীয় আকাবা-বায়াতের ঘটনায় কিছু লোকের ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব হিসেবে। আজকের বাংলাদেশে এ আয়াত প্রয়োগ করে খুন-খারাপী করার প্রশ্নই উঠে না।

এবারে দেখা যাক কাউকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করার অধিকার কোরান-রসুল দিয়েছেন কি না, কেউ কাউকে মুরতাদ ঘোষণা করলে সেটা কি ইসলাম-সম্মত, না কি কোরানের খেলাফ করার মত মারাত্মক অপরাধ। কোন কোন মওলানা বলেন, মুরতাদ শব্দটা এসেছে 'রিদ্দা' থেকে, রিদ্দার মূল হল 'রাদ'। সম্পর্কিত শব্দগুলো ইরতাদা, রিদ্দা, এবং রাদ সবই হল স্বকর্ম অর্থাৎ নিজে করতে হয়। বাইরে থেকে কেউ কাউকে স্বকর্ম করাতে পারে না। কোরানও 'মুরতাদ' শব্দটার এই অর্থটাই ধরে রেখেছে, নিচে দেখুন। যেমন, আত্মহত্যা। আত্মহত্যা যে করে, সে-ই করতে পারে। বাইরে থেকে কেউ অন্যকে খুন করতে পারে কিন্তু আত্মহত্যা করতে পারে না। রিক্যান্টেশন বা ধর্মত্যাগও নিজে করতে হয়, নিজমুখে বলতে হয়। যেহেতু কর্মটা স্বকর্ম, তাই কেউ নিজ মুখে ঘোষণা না করা পর্যন্ত কাউকে মুরতাদ বলার অবকাশ বা অধিকার কারোরই নেই। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বা অধ্যাপক আকাশ নিজেদের মুরতাদ ঘোষণা করেন নি। কাজেই উনাদের ব্যাপারে মওলানাদের ঘোষণা প্রযোজ্য নয়। ড. হুমায়ুন আজাদ তাঁর কিছু বইতে ধর্মে তাঁর অবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। সে হিসেবে উনাকে আমরা ইসলাম ত্যাগী অর্থাৎ মুরতাদ বলতে পারি। এবারে দেখা যাক তাঁর ব্যাপারে মওলানাদের ঘোষণা ইসলামসম্মত কি না, মুরতাদদের ব্যাপারে খোদ আল কোরান কি বলছে।

সুরা নিসা আয়াত ৯৪'এ বলা হয়েছে: 'যে তোমাদেরকে সালাম করে তাহাকে বলিও না যে তুমি মুসলমান নও...' অর্থাৎ যে সালাম করে, তাকে মুরতাদ বলার অধিকার কোরান কাউকে দেয়নি। বললেই সেটা হবে সরাসরি আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করা, যেটা আমাদের মওলানা-মুফতিরা এক্ষেত্রে করেছেন। না জেনে করে থাকলে এখন জানলেন, তওবা করে তাঁরা ঘোষণাটা ফিরিয়ে নিতে পারেন। আর জেনেও যদি করে থাকেন, তবে তাঁরা সরাসরি আল কোরানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছেন, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁদেরই। তবে আমরাও আমাদের জাতির বুদ্ধিসত্ত্বাকে কারো খেয়াল-খুশির খেলনা হতে দিতে পারি না। ওই কোরানের ভিত্তিতেই প্রতিবাদ পর্যায় পার হয়ে প্রতিরোধ আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

মোটামুটি যে সুরা-আয়াতগুলোতে মুরতাদের ব্যাপারে কোরানের নির্দেশ আছে তার মধ্যে সুরা নাহ্‌ল এসেছে মক্কাতে, বাকি নয়টা এসেছে মদিনাতে। লম্বা হয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিগুলো দেব না, আপনারা মিলিয়ে নিতে পারেন। আগে-পরের আয়াতগুলোর সাথে শানে নজুলও পড়ে নিন, যাতে 'পটভূমির বাইরে'– এই অভিযোগের সম্ভাবনা না থাকে। পড়ে নিন সুরা বাক্কারা-২১৮, ইমরান- ১০৬ ও ১৪৪, মায়েদা-৫৪, আদ-দাহার-২৯, কাহফ-২৯, আল যুমার-১৫, আল গাসিয়াহ-২৩ ও ২৪। আশুরা'র আয়াত ১৬ দেখা যেতে পারে, দেখা যেতে পারে সুরা তওবার আয়াতগুলোও, সংশ্লিষ্ট হিসেবে। সুরা ইমরান আয়াত-৭ এবং আরো অনেক আয়াতে কোরান বলেছে, কোরানের কিছু অংশ সুস্পষ্ট এবং সেটাই এ কেতাবের আসল অংশ। সেই আসল অংশের সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি দিচ্ছি এবারে।

আল্লাহ ইসলাম ত্যাগী মুরতাদদের কথা অনেকবারই বলেছেন এবং নিজেই শাস্তি দেবেন বলেছেন। নিজে শাস্তি দেবেন বলেই আল্লাহ মুরতাদকে খুন তো দূরের কথা, কাউকে মুরতাদ ঘোষণারও অধিকার দেননি। আমি আমাদের মওলানাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করব তাঁরা যেন অন্য যেকোন কারণেই হোক কোরআনের এ সুস্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা না করেন। হাদিসেও মুরতাদ খুনের কোন সূত্র নেই, সে কথায় পরে আসছি।

সুরা মুনাফিকুন, আয়াত-৩ ও ৪ : ইহা এই জন্য যে তাহারা বিশ্বাস করিবার পর পুনরায় কাফের হইয়াছে। ... তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ তাহাদিগকে।

সুরা আত তাওবাহ, আয়াত ৬৬ : 'ছলনা করিও না, তোমরা যে কাফের হইয়া গিয়াছ ঈমান প্রকাশ করিবার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে আমি যদি ক্ষমা করিয়াও দেই তবে অবশ্য কিছু লোককে আজাবও দিব।'

সুরাত আত্ তাওবাহ, আয়াত ৭৪ : '..... মুসলমানগণ হইবার পর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী হইয়াছে... তাহাদিগকে আজাব দিবেন আল্লাহতা'লা, বেদনাদায়ক আজাব দুনিয়াতে এবং আখেরাতে'।

সুরা নাহল, আয়াত ১০৬ : '... যে কেহ বিশ্বাসী হইবার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাদের উপর আপতিত হইবে আল্লাহর গজব এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে শাস্তি'।

সুরা নিসা, আয়াত ১৩৭ : 'যাহারা একবার মুসলমান হইয়া পরে আবার কাফের হইয়া গিয়াছে, আবার মুসলমান হইয়াছে এবং আবারও কাফের হইয়াছে এবং কুফরিতেই উন্নতিলাভ করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদেরকে না কখনও ক্ষমা করিবেন, না পথ দেখাইবেন।'

এবারে কোরআনের আরও সুস্পষ্ট বাণী, সুরা ইউনুস, আয়াত ৯৯ : 'আর তোমার পরওয়ারদিগার যদি চাহিতেন তবে পৃথিবীর বুকে যাহারা রহিয়াছে, তাহারা সকলেই ইমান নিয়া আসিত সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে ইমান আনিবার জন্য'?

এই আয়াতগুলোতে প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলমানের জন্য রয়েছে তার মা'বুদের জলদগম্ভীর সুস্পষ্ট নির্দেশ, ধর্মত্যাগীকে তাঁর হাতেই ছেড়ে দিতে, ওতে মানুষের এখতিয়ার নেই। তিনি ওদের দেখে নেবেন, কোন মানুষ কোন রকম জবরদস্তি করতে পারবে না। কাজেই, অধ্যাপকদের 'ইসলামে ফিরে আসার' জন্য জবরদস্তি করে (তা-ও আবার তিন মাসের মধ্যে) কোরানের সুস্পষ্ট বরখেলাপ করেছেন আমাদের মওলানারা। দ্বিতীয়ত : সুরা, নিসা, আয়াত ১৩৭- 'একবার মুসলমান হইয়া পরে আবার কাফের হইয়া গিয়াছে, আবার মুসলমান হইয়াছে এবং আবারও কাফের হইয়াছে'– এ আয়াতে একই মুসলমানের প্রথমে মুরতাদ হবার পর আবার ইসলাম গ্রহণ করে আবারও মুরতাদ হবার কথা বলা আছে। হ্যাঁ, এ-ই হল 'লা ইকরাহা ফিদ্বীন'– ধর্মে জবরদস্তি নেই। মওলানারা যদি মুরতাদকে খুন করেন, তবে এক্ষেত্রে প্রথমবার মুরতাদ হলে তাকে খুন করতে হবে, তারপর সেই লাশকে আবার মুসলমান হতে হবে। তারপর সেই লাশকে আবারও ইসলাম ত্যাগ করতে হবে এবং সেজন্য সেই লাশকে দ্বিতীয়বার খুন করতে হবে। এ জগাখিচুড়ী বাস্তবে সম্ভব নয়। লাশ তার ধর্মবিশ্বাস পাল্টাতে পারে না আর এক লোককে দু'বার খুন করা যায় না। আমাদের মওলানাদের বুঝতে হবে, ইসলামকে রক্ষা করার জন্য অনেক বড় শক্তি নিরন্তর কাজ করছে, মানুষকে এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না। খামোখা হুড়-হাঙ্গামা করলে সেই মহাশক্তিকে শুধু বিরক্তই করা হয়।

'শান্তির ধর্ম' মুখে দাবি কারাটা সহজ, কাজে দেখানোটা বড় কঠিন। অশান্ত পরিস্থিতিতে শান্ত থাকা এবং শান্তি বজায় রাখাই এ দাবির সুকঠিন মর্মবাণী। সে যুগের যুদ্ধ বিগ্রহের কিছু তাৎক্ষণিক আয়াত ছাড়া এই শাশ্বত দাবির মর্যাদা কোরান রেখেছে বার বার, শত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও। আমি আবারও আমাদের মওলানাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করব তাঁরা যেন নিজেদের উত্তেজিত আবেগে ভুল না করেন, শান্ত ব্যবহারের মাধ্যমে কোরানের এই গুরুত্বপূর্ণ দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করেন, গরম মাথায় এ দাবির ক্ষতি না করেন। মুরতাদদের কথা ছেড়ে দিন, আল্লাহ- কোরআন-রসুলকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা বা বিদ্রূপ করাটা কি তার চেয়েও অনেক বেশি অপরাধ নয়? এই জঘন্য অপকর্মটাই করেছেন সালমান রুশদী, গঠনমূলক সমালোচনা না করে ইসলামকে নিয়ে শুধু ঠাট্টা-তামাশা করেছেন তাঁর 'স্যাটানিক ভার্সেস' বইতে। এক্ষেত্রে রাগে রক্ত মাথায় চড়ে আমরা তাঁর ওপর ডাণ্ডা

হাতে চড়াও হলে তার পেছনে একটা আবেগ কাজ করে বোঝা যায়। কিন্তু এই অসহ্য পরিস্থিতিতেও 'শান্তির ধর্ম'-এর কঠিন দাবি বজায় রেখেছে কোরান। নিষেধের তর্জনী তুলে কোন রকম হিংস্রতা করতে সরাসরি নিষেধ করেছে সে, দূরদর্শী বেহেশতি নেতার মত শান্ত থাকার আদেশ দিয়েছে। কাজটা কঠিন, কিন্তু সত্যিকারের মুসলমান হতে হলে এ আদেশ মানা ছাড়া উপায় নেই। দেখুন সুরা আল জাসিয়া আয়াত ৯: 'যখন আমার কোন আয়াত অবগত হয়, তখন তাহাকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করে। ইহাদের জন্যই রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে জাহান্নাম।' আর দেখুন সুরা নিসা আয়াত ১৪০-এর পরিষ্কার আদেশ : 'যখন আল্লাহতা'লার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হইতে শুনিবে, তখন তোমরা তাহাদের সহিত বসিবে না, যতক্ষণ না তাহারা অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া যায়'। হ্যাঁ, এ-ই হল সত্যিকারের শান্তির ধর্ম। এ আদেশ না মানলে কি হবে? সেটাও বলে দিয়েছে আল কোরান পরের আয়াতেই– 'তাহা না করিলে তোমরাও তাহাদের মত হইয়া যাইবে'।

আর কত স্পষ্ট করে বলতে হবে কথাটা? এই হল শান্তির ইসলাম, কারণ ঠাট্টা করে কোন ঐশী দর্শনকে উৎখাত করা যায় না।

এবারে নবীজীর দিকে তাকানো যাক। আল্লাহর রসুল, আল কোরানেই প্রতিধ্বনি করেছেন তিনি। তাঁর সাহাবী উসামা যখন এক কাফেরকে খুন করতে উদ্যত, তখন সেই শেষ মুহূর্তে সে কাফের বলে উঠল– 'লা ইলাহা ইল্লাললাহ, মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ'। কিন্তু সেটা জান বাঁচানোর জন্য মিথ্যে মনে করে উসামা তাকে খুন করলেন। শুনে নবীজী এত আক্ষেপ করেছিলেন, উসামা'র ওপরে এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যা বলার নয়। একবার নয়, বার বার তিনি বলছিলেন, 'কে তোমাকে কলমা'র দায় হইতে মুক্ত করিবে, উসামা?' 'তুমি কি তাহার বক্ষ চিরিয়া দেখিয়াছ– তাহার মনের মধ্যে কি আছে'? উসামা বলেন– 'আমি তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর কখনোই কাহাকেও কতল করিব না যে কলমা পড়িয়াছে' (সিরাত রসুলুল্লাহ-ইবনে হিশাম-ইশাক অনুবাদ এ, গয়োম- পৃষ্ঠা ৬৬৭, Volume 9, Book 83, Number 11)। নবীজীর কত বড় বরখেলাপ করেছেন আমাদের মওলানারা, ভাবলে চোখে পানি এসে যায়। আমি তাঁদের দাঁড় করিয়ে দিতে চাই নবীজীর সামনে জবাব দেবার জন্য। কলমা'র কাছে দায়ী হয়েছে তাঁরা, কলমার দায় বড় দায়। তাঁর জীবনে অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নবীজী যত ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন ধর্মে বাড়াবাড়ি করার জন্য, তত ক্ষিপ্ত তিনি আর কোন কারণেই হননি (সহি বোখারি- খণ্ড ১, হাদিস ৬৭০)। এ কথাও তিনি বলেছেন 'যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশীদার না করবে, সে-ই বেহেশতে যেতে পারে' (ঐ, হাদিস ১৩০)।

আরও আছে। দেখুন : 'আমার পরে তোমরা একে অন্যের গলা কেটে নিজেরাই মুরতাদ হয়ে যেও না' (ঐ হাদিস ১২২)।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ড. মুহসিন খানের বোখারি- অনুবাদেও আছে এই হুশিয়ারী : volume 9, Book 83, Number 5 : Narrated Al-Miqdad bin `Amr Al-Kindi :

> An ally of Bani Zuhra who took part in the battle of Badr with the prophet, that he said, "O Allah's Apostle! If meet an unbeliever and we have a fight, and he strikes my hand with the sword and cuts it off, and then takes refuge from me under a tree, and says, 'I have Surrendered to Allah (i.e. embraced Islam),' may I kill him after he has said so?' Allah's Apostl said, "Do not kill him for if you kill him. he would be in the position in which you had been before you kill him. and you would be in the position in which he was before he said the sentence. "The prophet also said to Al-Miqdad, "If a faithful believer conceals his faith (Islam) from the disbelievers, and then when he declares his Islam, You kill him, (you will be sinful). Remember that you were also concealing your faith (Islam) at Mecca before."
>
> Volume 9, Book 83, Number 7 and 8 : Narrated 'Abdullah bin Umar : The Prophet said,
>
> "After me (i.e. after my death), do not become disbelievers, by striking (cutting) the necks of one another.-
>
> Narrated Abu Zur'a bin 'Amr bin Jarir :
>
> The prophet said "After me, do not become disbelievers, by striking (cutting) the necks of one another."

এবারে কি বলবেন আমাদের মুরতাদ ঘোষণাকারী মওলানারা? জাতির আজ কত বড় দুর্ভাগ্য, আমাদের মওলানা-মুফতিরা নবীজীর এত স্পষ্ট হুঁশিয়ারী সরাসরি অমান্য করে আজ আমাদেরই অধ্যাপকদের গলা কাটতে উদ্যত। ওপরের হাদিসগুলোর আলোকে দেখলে ফল কি দাঁড়ায়? কে মুরতাদ?

ইসলাম ত্যাগের ঘটনাটা নবীজীর সময়ও কয়েকবারই ঘটেছে বলেই তো কোরানে ওই আয়াতগুলো এসেছে। এমনকি এত সম্মানিত সাহাবি তাঁর ওহি-লেখক আবদুল্লাহ বিন সা'আদও হঠাৎ মুরতাদ হয়ে মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিল। ছোটখাট মুরতাদ তো নয়ই, এ হেন মহা-মুরতাদকেও খুন করেননি

নবীজী। এতে করে আমাদের মওলানাদের জন্য প্রত্যক্ষ এবং জ্বলন্ত উদাহরণ রেখে গেছেন। প্রায় একশ'টা যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে নবীজীর সময়, অনেক খুন-জখমও হয়েছে। সেসব সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত ধরা আছে তারিখ আল্ তাবারি, সহি সিত্তা (বোখারি-মুসলিম-নাসায়ী-আবু দাউদ-তিরমিজি এবং ইবনে মাজাহ বা মুয়াত্তা), ইমাম শাফি'ই আর ইমাম আবু হানিফার শারিয়া কেতাব আর ইবনে হিশাম-ইশাকের সিরাত রসুলুল্লাহ বইগুলোতে। কিন্তু হাজার হাজার পৃষ্ঠার এই সুবিশাল দলিলগুলোর মধ্যে একটা উদাহরণও পাওয়া যায়নি যেখানে কোন মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন নবীজী, কেউ পারলে দেখাক আমাদের। হারিথ নামের যে মুসলমান মুরতাদ হয়েছিল, তাকেও মাফ করেছিলেন তিনি (সিরাত- পৃঃ-৩৮৪)। উকিল গোত্রের যে আটজনকে অনেক পরে মক্কা বিজয়ের দিনে ইবনে খাত্তালসহ যে চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন তিনি, তারা অন্যান্য অপরাধ করেছিল (সহি বোখারি- খণ্ড ৪, হাদিস ২৬১ ও অধ্যায় ১৬৯)। তাঁর সামনেই প্রকাশ্য কথায় এক নাম না জানা বেদুঈনও মুরতাদ হয়েছিল, তার কোনই শাস্তি দেননি নবীজী।

অথচ নবীজী নিজে না দিলেও সহি বোখারিতে দেখি এক মুসলমান খুন করেছে এক মুরতাদকে, 'নবীজী বলেছেন' বলে। আমরা জানি, বহু লোকেরা 'নবীজী বলেছেন' বলে কত জাল হাদিস দিয়ে নিজেদের অপকর্মকে ওই নবীজীর নামেই হালাল করেছে। নবীজীর মৃত্যুর পরে পরেই আবুবকরের বিরুদ্ধে কিছু রাজনৈতিক বিদ্রোহ হয়েছিল, কিন্তু সেটা ছিল রাজনৈতিক টানাপোড়নের ব্যাপার। সেটাকে কেউ ইসলাম ত্যাগ বলে নি, পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরাও বলেননি। বার্নার্ড লুইসও সে কথা স্পষ্টই বলেছেন তাঁর 'দি অ্যারাবস ইন হিস্ট্রি' বইতে। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে কোনই মুরতাদ-হত্যার দলিল পাওয়া যায়নি।

এবারে শারিয়ার আইন। শারিয়া যখন বানানো হচ্ছিল, সেই সপ্তম-অষ্টম-নবম শতাব্দীর মুসলমানদের অবস্থা খেয়াল করুন। পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে যুদ্ধ তখন তুমুল। আরবের শুকনো মরুভূমি থেকে অবিশ্বাস্য সামরিক শক্তিতে বেরিয়ে এসে মুসলিম সৈন্যরা তখন ঝড়ের মত ছুটে গিয়েছিল সর্বত্র। পুরোটা মধ্যপ্রাচ্য শুধু নয়, আফ্রিকা-এশিয়ার দেশের পর দেশ তাদের পদানত হচ্ছিল প্রত্যেকটা দিন। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সেই উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বানানো হচ্ছিল মুসলমানের আইন, শারিয়া। এ হেন ক্রান্তিকালে মুসলমানের সুসংহত ঐক্যের গুরুত্ব অপরিসীম। কোন এক মুসলমান মুরতাদ হয়ে গেলে যুদ্ধজর্জরিত অন্য মুসলমানদের ওপরে তার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা প্রবল, সেটা মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত সর্বনাশা হতে পারে। তাই সে পথে মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড, বিয়ে নাকচ, উত্তরাধিকার নাকচ ইত্যাদির লাঠি তুলে ধরেছেন আমাদের শারিয়া-ইমামেরা। পরবর্তীকালেও শারিয়া এই একই চাপের মধ্যে বড় হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইবনে তাইমিয়ার সময়ের কথাই

ধরুন। পূবদিকে অমুসলিম মঙ্গোলের ধাক্কা, পশ্চিমেও মুসলিম শক্তির অবক্ষয় তখন শুধু দেয়ালের লিখন। খ্রিষ্টানদের প্রচণ্ড চাপের মুখে পুরো স্পেন থেকে পেছনে হটে এসেছে মুসলিম শক্তি, ছোট্ট প্রদেশ গ্রানাডার রশি ধরে কোন রকমে ঝুলে রয়েছে সে। প্যালেস্টাইন উপকূলে মঙ্গোলদের সহায়তায় ক্রুসেডারেরা আঘাতের পর আঘাত হানছে পশ্চিমে শেষ মুসলিম শক্তি মামলুক সাম্রাজ্যের ওপর। মুসলমানের এই আত্মরক্ষার অগ্নিযুগে কোন মুসলমানের ইসলাম ত্যাগ করার উদাহরণ স্বভাবতই মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য। এই কারণগুলো সাময়িক এবং রাজনৈতিক। কোরান-হাদিসের খেলাফ বলে এগুলো ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গও নয় এবং এগুলো এখন আর খাটেও না।

মুরতাদ ফতোয়ার প্রথম বলি হলেন নবীজীর আদরের নাতি ইমাম হোসেন। এজিদের সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে দেয়া হল ইমাম হোসেনের বিরুদ্ধে ফতোয়া, এজিদ-পালিত মোল্লারাই ছড়ালেন সেটা রাজ্যময়। এজিদের রাজকীয় আদেশ নয়, সেই ফতোয়াই ছিল ইমামের ঘাতকদের আসল মানসিক শক্তি, সেই ফতোয়া নিজের পাগড়ির ভেতরে রাখত ইমামের ঘাতক সীমার নিজে। ফতোয়াটা তারিখ-আল-তাবারিতে পাওয়া যায় (ডঃ সাচেদিনা)। ভারতের ইতিহাসে একমাত্র উদাহরণ হল আওরঙ্গজেবের আমলে এক পর্তুগীজ ইসলাম গ্রহণ করে পরে মুরতাদ হয়, সে গুপ্তচরবৃত্তি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, সম্রাট তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। পরের দিকে কোন রকম কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে মুরতাদ- ফতোয়া নিয়ে শুরু হল হরিলুট। যে যাকে পারে মুরতাদ বলা শুরু করল। এই নাগিনীর বিষাক্ত ছোবলের হাত থেকে রেহাই পাননি বড়পীর সাহেবের মত বুজর্গ আর ইমাম তাইমিয়ার মত যুগশ্রেষ্ঠ নেতা, তাঁদেরকেও মুরতাদ ঘোষণা করা হয়েছিল– (ফতহুল গয়ব– বড়পীর সাহেবের বক্তৃতার সংকলন আর) 'এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দি রিভাইভালিস্ট মুভমেন্ট ইন ইসলাম' মৌদুদি- পৃঃ ৬৬)। চিন্তা করা যায়! মনসুর হাল্লাজ থেকে আমাদের মানবদরদী কবি নজরুল পর্যন্ত রক্ষা পাননি এ থেকে। নসর জায়েদের মত অনেক মুসলমান পণ্ডিত ইসলাম না ছেড়েও এই ফতোয়ার উদ্যত খঞ্জর থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন, নাওয়াল সাদাবীর ৩৭ বছরের বিয়েকে তালাক ফতোয়া দেয়া হয়েছে। রক্ষা পাননি মওলানা মৌদুদিও। এ লম্বা লিস্টিতে আর যাব না, তবে দেওবন্দি- বেরিলভির মওলানাদের পরস্পরকে 'কাফের' বলার ফতোয়া আমাদের মনে আছে। মোদ্দা কথাটা হল, কোন না কোন মওলানার হুংকারে দুনিয়ার প্রতিটি মুসলমানই মুরতাদ, এমনকি একদল মওলানাদের ফতোয়ায় অন্যদল মওলানারাও মুরতাদ। সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ লজ্জাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এই 'মুরতাদ' ফতোয়া নিয়ে। এ দলিল স্পষ্ট ধরা আছে পাকিস্তানের চিফ জাস্টিস মুনির আর জাস্টিস কায়ানি নিয়ে গঠিত ১৯৫৪ সালের পাঞ্জাব অ্যাক্ট-২ এর অধীনে কোর্ট অফ

ইনকুয়ারী'র রিপোর্টে। পাকিস্তানের নামকরা মওলানাদের সাথে দীর্ঘকাল আলোচনা করে এই সত্য পাওয়া গেছে, একদল মওলানা রাষ্ট্রের গদীতে বসলে অন্য সব মওলানাদেরকে 'মুরতাদ' ফতোয়ায় কল্লা কেটে ফেলবেন। গত বছর একই কথা বলেছেন বিখ্যাত শারিয়া বিশেষজ্ঞ ড. আবদুল্লাহ নঈম নাইজিরিয়ার কনফারেন্সের বক্তৃতায়, একই কথা বলেছেন মাহমুদ তাহা, বলে চলেছেন ড. সাচেজদিনা, ড. আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার, আরও অনেক মুসলমান ইসলামী বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশের ড. তাজ হাশমী, ড. মায়মুল খান, কিন্তু কেউ শুনছে না।

গত চৌদ্দ'শ বছরে আজ পর্যন্ত কোন মুরতাদের সঙ্গে মওলানাদের সংলাপের উদাহরণ পাইনি। মওলানাদের সে সংস্কৃতিই গড়ে ওঠেনি। তাঁদের উচিত ছিল প্রত্যেকটি মুরতাদকে সমাদরে ডেকে আলোচনায় বসে তার ইসলাম ত্যাগের কারণ খুঁজে বের করা, সে কারণ নিরসনের চেষ্টা করে তাকে ইসলামে ফেরানোর চেষ্টা করা। এ চেষ্টায় ফল কিছু হতই, ফল না হলেও অন্তত ভাল কিছুর চেষ্টা তো হত। এই দরকারি কাজটাকে কখনই দরকারি মনে করা হয়নি, সরাসরি খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মের লালন ও বিকাশ যে শুধুমাত্র আত্মার স্নিগ্ধ নীড়েই, ডাণ্ডায়-হুংকারে নয়, ইসলামের এ সত্যটাকে উপলব্ধি করা হয়নি। মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে জেলখানার মত করে বন্দি করে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা হয়েছে।

১৯৬৫ সালে গৃহীত মানবাধিকার সনদের ১৮ নম্বর আর্টিকেল অনুযায়ী বিশ্বের প্রত্যেকটি লোকের ধর্ম পরিবর্তনের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সব মুসলিম রাষ্ট্র সেটাতে সইও করেছে (একমাত্র সৌদি আরব ছাড়া)। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ, একশ' বিশ-ত্রিশ কোটির অসীম সমুদ্র, সুবিশাল জনতার বিশ্ব মুসলিম! কোথায় আকাশ ভেঙে পড়ে যদি দু'চার শ' চলেই যায়? কোরআনের 'তোমার ধর্ম তোমার, আমারটা আমার', 'ধর্মে শক্তিপ্রয়োগ নেই', এ বাণী দুটোর মর্যাদা তো রক্ষা হয়, নবীজীর প্রত্যক্ষ উদাহরণের মর্যাদা তো রক্ষা হয়, দুনিয়ার সামনে শান্তি র ধর্মের অন্তত একটা প্রমাণ তো হয়! ওদিকে অনেক অমুসলিম তো মুসলমান হচ্ছেই! ওরা মুসলমান হলে খুশিতে ফেটে পড়ি আমরা, কিন্তু কোন মুসলমান ঐ একই কাজ করলে যদি তাকে কতল করি তবে সেটা ইসলাম হতে পারে না। কোরান-রসুলই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইসলাম কোন ইঁদুর মারা কল নয় যে তার মধ্যে ঢোকা যাবে কিন্তু বেরোনো যাবে না।

মওলানারা ভুল করেছেন, কোরানের বাণী উপেক্ষা করে মহাভুল করেছেন। কোরানের সুরা নিসা ৯৪, সুরা বাকারা ২৫৬ আর সুরা কাফিরুন আয়াত ৬-এর অবমাননা না করে মুরতাদকে হত্যা তো দূরের কথা, মুরতাদ ঘোষণাও সম্ভব নয়। শক্তি দিয়ে কারো ওপরে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা চাপিয়ে দিলেই ইসলামের শাশ্বত মর্মবাণীর প্রতি আত্মার আনুগত্য আসবে, এটা তাঁদের নিদারুণ ভ্রান্তি। শক্তি

প্রয়োগের বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী ঘৃণারই জন্ম হয়। এই করে করেই আজ ইসলামের মধ্যে রক্তচোখের দানব দেখছে দুনিয়ার মানুষ। আনুষ্ঠানিকতায় ধর্ম প্রমাণ হয় না, নামাজ-রোজা করা অনেক খুনী-ধর্ষকও আছে ইতিহাসে। মওলানাদের উচিত অনতিবিলম্বে ইসলামবিরোধী এ ঘোষণা ফিরিয়ে নেয়া। এতে দোষের কিছু নেই, শ্লাঘারও কিছু নেই। এ মহাভুল আরও ভুলের জন্ম দিতে পারে। জাতির পিঠ ধীরে ধীরে দেয়ালে ঠেকে যাচ্ছে, কেউ হয়ত এ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় মরিয়া হয়ে নজরুলের মত ' দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি' বলে তাঁদের ওপরেও চড়াও হয়ে 'মুরতাদ' ঘোষণা দিতে পারে, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে পারে, এমনকি মাথার দামও ঘোষণা করতে পারে। আর বাংলাদেশে তো ভাড়াটে খুনি পাওয়াই যায়।

মানবতাভিত্তিক সংবিধান এবং অমানবিক বিধান

মীজান রহমান

কানাডার মানুষ বহু বহু বছর সাধ্য সাধনার পর একটি মানবতাভিত্তিক সংবিধান দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে, যার মূল মন্ত্রই হল সমান অধিকার, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি, গোত্র, ভাষা, কৃষ্টি নির্বিশেষে। 'সবার চেয়ে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই', এই সনাতন বুলিটি আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কেবলি বুলি, কিন্তু এদেশে সেটা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ক্যানাডার 'চার্টার অব রাইটস' ধর্মগ্রন্থের মতই পবিত্র। চার্টারের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে এদেশের মানুষ সরকারের পতন ঘটায়, উত্থান ঘটায়, এমনকি প্রয়োজন হলে যুদ্ধে যেতেও প্রস্তুত হবে। মানবাধিকারের এই সনদটিকে তারা জাতীয় পরিচয়পত্র বলে সম্মান করে বলেই পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানাপ্রকারের মানুষ (বাংলাদেশের খুনি, রোয়ান্ডার খুনি বা যেকোন দেশের খুনিরাও) এখানে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং প্রার্থী হওয়ার পরমুহূর্ত থেকে নিষ্পত্তির আগ পর্যন্ত সরকারের আতিথেয়তা ভোগ করে। এই সনদের আকর্ষণেই মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু মেয়ে শরিয়ার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ক্যানাডায় চলে এসেছে। শরিয়া সম্বন্ধে পশ্চিমের কোন ধারণাই ছিল না আগে। ৯/১১'র পরে কারো কারো চোখ খুলতে শুরু করেছে। শরিয়া যে কোন নারীবাদী মতাদর্শ নয় সেটি অনেকেই টের পেয়েছে। তবে বেশিরভাগই পায়নি। অন্তত অন্টারিওর বর্তমান সরকার যে এখনো পায়নি তার লক্ষণ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। ১৭ই জানুয়ারির Ottawa Citizen'র প্রথম পৃষ্ঠায় বব হার্ভের (Bob Harvey) কলাম পড়ে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। বলে কি? সত্যি সত্যি শরিয়া এসে যাচ্ছে এখানে? সরকারের চোখে ধুলো দিতে পারল তারা? হার্ভে সাহেবের কলাম পড়ে তো তাই মনে হল। ঘটনা হল এরকম : অন্টারিওর কতিপয় শরিয়াপন্থী ধর্মীয় নেতা সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈবাহিক, পারিবারিক ও অন্যান্য ছোটখাটো বৈষয়িক বাদ-বিসংবাদগুলো তাদেরই ধর্মীয়,

অর্থাৎ শরিয়া আইন অনুসারে নিজেদের সম্প্রদায়ের ভেতরে সালিশ আদালতের (Arbitration Court) মাধ্যমে মীমাংসা করার অধিকার দেওয়া হোক। দুর্ভাগ্যবশত: ধর্মীয় আদালতের নজির সরকার নিজেই সৃষ্টি করেছিল আগে। ক্যাথলিক ও মেননপন্থীরা অনেকদিন থেকেই এ সুবিধা ভোগ করে আসছে। হার্ভের লেখা পড়ে জানলাম যে ইসমাইলী মুসলমানদেরও সে অধিকার আছে। বলা বাহুল্য যে ইহুদী সম্প্রদায়ও তা থেকে বঞ্চিত নয়। সুতরাং আমাদের শরিয়াবাদীরাও যে একই দাবি তুলবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আবেদনপত্র পাবার পর প্রাদেশিক সরকারের আইনমন্ত্রী মাইকেল ব্রায়ান্ট একটি কমিশন গঠন করলেন বিষয়টি আদ্যোপান্ত বিচার যাচাই করে রিপোর্ট তৈরি করার জন্যে। কমিশনের ভার দেওয়া হল মেরিয়ন বয়ড (Marion Boyd) নামক এক মহিলার ওপর, যিনি এককালীন (NDP) সরকারের নারী বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। শ্রীমতী বয়ড সম্প্রতি তার রিপোর্ট পেশ করেছেন। এবং দুঃখের বিষয় যে তিনি শরিয়ার কোন কোন বিধান সম্পর্কে কিঞ্চিৎ উদ্বেগ প্রকাশ করলেও মোটামুটিভাবে তার পক্ষেই রায় দিয়েছেন। সরকার যদি তার সুপারিশ মেনে নেয় তাহলে এ প্রদেশের মুসলিম সম্প্রদায় ইচ্ছে করলে তাদের পারিবারিক মামলার নিষ্পত্তির জন্যে প্রাদেশিক জজের আদালতে না গিয়ে ধর্মীয় আদালতে যাবার অধিকার পাবে। শরিয়া আইনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হলেন টরন্টোর এক অবসরপ্রাপ্ত আইনজীবী- তার নাম সৈয়দ মোমতাজ আলী। ক্যানাডিয়ান ইসলামিক কংগ্রেসের সহসভাপতি ওয়াহিদা ভ্যালিয়ান্তে নিজে নারী হওয়া সত্ত্বেও শরিয়ার প্রচণ্ড সমর্থক। অন্যদিকে ক্যানাডিয়ান কাউন্সিল অব মুসলিম উইমেনের নির্বাহী পরিচালক আলিয়া হোনাবেন পোষণ করেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মত। তিনি বলছেন : 'মুসলিম আইন পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ আইন পুরুষকে নারীর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের অধিকার দেয়। পুরুষের বিচারই শেষ বিচার, অলঙ্ঘ বিচার। মুসলিম নারীর কর্তব্য হল পুরুষকে মান্য করা, পুরুষের বিধানকে অকাট্য বলে গণ্য করা।'

এই বিশ্বাসকে 'Absolute nonsense' বা চরম প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন ওয়াহিদা ভ্যালিয়ান্তে। অটোয়া-গ্যাটিনোর মুসলিম কমিউনিটি কাউন্সিলের সভাপতি মোমতাজ আক্তার সাহেব তার সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন বলেছেন : 'শরিয়াবিরোধীদের ধারণাই নেই তারা কি নিয়ে কথা বলছে'।

উক্তিটা আমার গায়ে লাগল, কারণ আমি নিজে শরিয়াবিরোধী। আমি কি নিয়ে কথা বলছি সেটা আমার জানা উচিত। পুরো আইনগ্রন্থ নিয়ে বলা সম্ভব নয়, শুধু কয়েকটি নমুনা পেশ করব শরিয়া আইনের, যা থেকে আমার উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণটা অনুমান করা যাবে। হার্ভে সাহেবের কলাম থেকে জানলাম যে ইসমাইলী সম্প্রদায়ের শরিয়া যুক্তির অন্যতম ভিত্তি কোরানেরই একটি উক্তি :

"If you fear a breach between them twain, appoint arbiters, one from his family, and the other from hers; if they wish for peace, Allah will cause their conciliation."

ধর্মগ্রন্থ নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করেন তারা জানবেন যে এই উদ্ধৃতিটি আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর তরজমা থেকে নেয়া (৪:৩৫)। খুবই যুক্তিসঙ্গত উক্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ঠিক আগের আয়াতটিতে (৪:৩৪) কি লেখা আছে সেটাও বোধহয় উদ্ধৃতির দাবি রাখে :

"As to those women on whose part ye fear disloyalty and illconduct, admonish them, refuse to share their beds, beat them..."

উক্তিটির তাৎপর্য এতই সুদূরপ্রসারী যে ইউসুফ আলী সাহেবের অনুবাদে কোন ভুল ত্রুটি আছে কিনা সেটা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাই আমি এন. জে. দাউদ অনুদিত এবং ইসলামিক বুক সার্ভিস প্রকাশিত মুহাম্মদ মার্মাদুকে পিকথলের (Pickthall)-এর তরজমা দুটোই মিলিয়ে দেখলাম তার সঙ্গে।

দাউদের অনুবাদে আছে : (4:34)

"Men has authority over women because God has made the one superior to the other, and because they spend their wealth to maintain them, Good women are obedient. They guard their unseen parts because God has guarded them. As for those from whom you fear disobedience, admonish them, forsake them in beds apart, and beat them..."

ওদিকে পিকথল বলেছেন : (3:34) :

"Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women). So good women are obedient, guarding in secret that which Allah ath guarded. As forthose from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them in beds apart, and scourge them..." ১

অর্থাৎ একটু হেরফের হলেও, মূল বক্তব্য একটিই। এতে কি এই প্রমাণ হয় না যে, আলিয়া হোগবেন (Hogben) যা বলেছেন আসলে সেটাই কোরানসম্মত কথা? সুতরাং ওয়াহিদা ভ্যালিয়ান্তের "Absolute nonsense" অভিযোগটা মনে হয় উল্টো তার নিজের বেলাতেই প্রযোজ্য। আটোয়া-গ্যাটিনোর মাননীয় মোমতাজ আক্তারও সম্ভবত জানেন না তিনি কি বলছেন।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এ দুজনের কেউ কোরান ভাল করে পড়েননি। পড়লেও বোঝেননি কিছুই। বুঝলে এসব ছ্যাবলা অপবাদ দিতেন না শরিয়াবিরোধীদের। উপর্যুক্ত আয়াতটির পরিপ্রেক্ষিতে বা এর মদদেই হয়ত শরিয়া'তে বিধিবদ্ধ হয়েছে তথাকথিত Shafi'i Law (#m.10.12,p-541 ও 0.17.4p.519) :

"A Muslim man is allowed to beat his wife or wives."

প্রসঙ্গত উল্লেখ না করে পারা গেল না যে, কোরানের এই আয়াতটিতে নারী-পুরুষের আপেক্ষিক মান বা গুরুত্ব সম্বন্ধে যা বর্ণিত হয়েছে তা কানাডার 'লিঙ্গনির্বিশেষে সমান অধিকার' সূত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং অন্টারিওর প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিত যে শরিয়ার সঙ্গে আমাদের চার্টারেরই একটা মৌলিক বিরোধ রয়ে গেছে। মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে পশ্চিমের লোক আর কিছু জানুক বা না জানুক একটা জিনিস কারও অজানা নয় যে, মুসলিম পুরুষের জন্যে চারটি বিয়ের অধিকার আছে। কার্যত হয়ত সেটা বিরল, কিন্তু আইনত একসাথে চার বিবি থাকা সম্ভব। ২১শে জানুয়ারি Ottawa Citizen'র আরেকটি খবরে পড়লাম। এটিও প্রথম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে ক্যানাডিয়ান ইসলামিক কংগ্রেসের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ এলমাসরি ক্যানাডার সাম্প্রতিক সমকামী বিবাহের ওপর কটাক্ষ করতে গিয়ে বলেছেন যে, তার চেয়ে বরং বহুবিবাহ (অর্থাৎ ইসলাম সম্মত) অনেক হিতকর। তার মতে গোপন প্রেমিকার চাইতে দ্বিতীয় বিবাহ নৈতিকভাবে শ্রেয় কারণ এতে প্রথম স্ত্রীর সম্মতি আছে। এই বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, পশ্চিম সমাজের অজ্ঞ ও অর্বাচীন পাঠকদের অবগতির জন্যে তিনি এ'ও বলছেন : 'দ্বিতীয় স্ত্রী, এবং স্ত্রীদের ছেলেমেয়েরা, একই পরিবারের ছত্রছায়ায় সমান অধিকার ও সমান ব্যবহার ভোগ করে।" যুগপৎ একাধিক স্ত্রীর মত ন্যাক্কারজনক অমানবিক প্রথাটির আলোচনায় না গিয়ে আমি শুধু তার 'সমান' শব্দটির ওপর মন্তব্য করব। 'সমান ব্যবহার' কথাটা যে কোরানবিরোধী সেটা বোধহয় এলমাসরি সাহেব ভেবে দেখেননি। তাহলে আমি একটি আয়াতের দুটি অনুবাদ পেশ করব : Abdullah Yusuf Ali : (4:129)

"You are never able to be fair and just, as between women, even if it is your ardent desire...."

Dawood বলছেন : (4:129)

"Try as you may, you cannot treat all your wives impartially. Do not set yourself altogether aginst any of them, leaving her, as it were, in suspence."

অর্থাৎ কোরান যা বলছে, সাধারণ বুদ্ধিতে সেটাই বাস্তব। এলমাসরি যা

বলছেন, তা শুধু কোরানবিরোধীই নয়, যুক্তি হিসেবে উদ্ভট ও অবাস্তব। তাছাড়া একটা জিনিস তার মাথায় ঢুকছে না যে, একাধিক স্ত্রীর ধারণাটিই চার্টারের পরিপন্থী। লোকটি সম্বন্ধে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, তিনি চার্টার তো বোঝেনই না, কোরানও বোঝেন না।

অন্টারিওতে শরিয়া আইন চালু করার আগে প্রাদেশিক সরকারের আরো ক'টি বিষয় বিবেচনা করে দেখা উচিত। যথা ঃ

(১) উত্তরাধিকার আইন : পুরুষের অর্ধেক পাবে মেয়ে ড. আবদুর রহমান দোয় পৃঃ ২৯৯,

(২) পরকীয়া প্রেম এবং ধর্ষণ, যা দণ্ডনীয় অপরাধ (হাদ, অর্থাৎ আল্লার শাস্তি), তার প্রমাণের জন্য প্রয়োজন :
(ক) হয় দোষী তার দোষ স্বীকার করবে, নয়ত (খ) কমপক্ষে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী পুরুষকে সাক্ষ্য দিতে হবে। এ আইনটি শুধু (Shafi'i Law# 0.24.9 তেই নয়, কোরানেও আছে।

(৩) স্ত্রীকে স্বামীর তালাক দেওয়ার অধিকার আছে, এবং তার জন্যে শুধু মুখের উচ্চারণই যথেষ্ট। সে উচ্চারণ রাগের মাথায় হোক, গাঁজার নেশায় হোক, কারো জোরজবরদস্তিতে হোক বা ঠাট্টা করেই হোক। সে যে উচ্চারণ করেছে তার সাক্ষী থাকলেই হল। বলাবাহুল্য যে এ অধিকারটি স্ত্রীদের নেই। মুখের কথা দূরে থাক প্রাণের ভয়েও কোন স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক দিতে পারবে না এত সহজে। দ্রষ্টব্য : (Shafi'i Law# n3.5, p.560; Hanafi Law, p.81, 523; Deen Ki Binate, Maolana Ashraf Ali, Thanvi p.254, Law 1537, 1538, 1546 and 2555.)

(৪) স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটানোর একমাত্র উপায় শরিয়া আদালতকে রাজি করানো। শুধু তাই নয়, স্বামীকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দ্রষ্টব্য: (Hanafi Law, p.112; Shafi'i Law, # n.50, w.52-1-253-255; Sharia the Islamic Law by Dr. Abdur Rahman Doi, p.192)

(৫) মনে করুন রাগের মাথায় বউ তালাক দেওয়ার পর স্বামী জিভ কেটে বউকে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনতে চাইছে। উঁহু, এত সহজ নয় বাবা। মুখের কথায় তালাক হয়, মুখের কথায় পুনর্মিলন হয় না। অনেক ঝামেলা আছে। তবে স্ত্রীর ঝামেলার সঙ্গে স্বামীর ঝামেলার কোন তুলনাই হয় না। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে প্রথমে অন্য কোন পুরুষের স্ত্রী হতে হবে। না, শুধু কাগজে

কলমে হলে চলবে না, শয্যাসঙ্গিনী হয়ে বসবাস করতে হবে, অন্তত একবার। তারপর নতুন স্বামী যদি দয়া করে তাকে আবার তালাক দেয়, তাহলেই তার মুক্তি। কেবল এই শর্তেই স্ত্রী তার আগের স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে। মুসলিম আইনে এর নাম হল 'হিল্লা বিয়ে।' দ্রষ্টব্য : Islamic Laws by Ayatollah Seestani, Law# 2536, p.469; Hanafi Law, p.15; Shafi'i Law# p.29.1.p.673.

আমি প্রশ্ন না করে পারছি না যে শরিয়া সমর্থকরা কি এখানেও এ আইনটিও অন্টারিওর মুসলিম সমাজে চালু করার কথা ভাবছেন? যদি না ভেবে থাকেন তাহলে জানতে চাইব, কেন না? শরিয়া আইন যদি এতই মহৎ, এতই পবিত্র জিনিস হয়ে থাকে তাহলে একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা কেন। ক্যানাডিয়ান ইসলামিক কংগ্রেসের ওয়াহিদা ভ্যালিয়ান্তেকেও আমি জিজ্ঞেস করব, এ আইনটি জেনেও কি তিনি আলিয়া হোগবেনের যুক্তিকে "Absolute nonsense" বলে উড়িয়ে দেবেন। খোদা না করুন, তার ভাগ্যে যদি এধরনের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটনা ঘটে যায় কোনদিন তাহলে কি তিনি নিজে হিল্লা প্রথাতে পরপুরুষকে একরাতের জন্যে বিয়ে করতে সম্মতি দেবেন?

(৬) মুসলিম আদালতে কোন দাসদাসী (বর্তমান যুগের চাকর চাকরাণীও নিশ্চয়ই তার অন্তর্ভুক্ত), মেয়ে গায়িকা বা কোন নিচু শ্রেণীর লোক (মেথর, ঝাড়ুদার ইত্যাদি), এদের সাক্ষ্যের কোন দাম নেই। (Hanafi Law, p.361; Shafi'i Law# 0.24.3.3 p.636.)

লক্ষ্য করুন যে এ আইনে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকেই খাটো করে দেখা হচ্ছে না শুধু, গান গাওয়া মেয়েদেরও সেই দলে ফেলা হচ্ছে। এতে অনুমান করা যায়, শিল্পকলা, বিশেষ করে কণ্ঠসঙ্গীতের প্রতি শরিয়াবাদীদের কি হীন মনোভাব। আফগানিস্তানের তালেবানরা যে গানবাজনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল তার পেছনে ইসলামী আইনের সমর্থন ছিল বৈকি।

(৭) হুদুদ মামলাতে মেয়েদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হয় না। (Hanafi Law, p.353; Shafi'i Law# 0.24.9, p.638; penal Law of Islam, p.44,45.)

(৮) ব্যবসা বাণিজ্যের কথাবার্তায় মেয়েদের কথার দাম পুরুষের অর্ধেক। (Hanafi Law p.353; Shafi'i Law# 0.24.7, p.637)

(৯) বিচ্ছেদের পর বাচ্চাদের ওপর মায়ের দাবি অগ্রগণ্য। তবে একটা শর্ত আছে: মেয়েকে নামাজী হতে হবে এবং অবিবাহিত থাকতে হবে। বাচ্চারা

যখন বড় হয় (ছেলে হলে ৯ বছর, মেয়ে হলে ৭) তখন সে-অধিকারটা চলে যায় বাবার কাছে। (Hanafi Law, p.138, 139; Shafii Law#m. 13.0,p.550)

(১০) স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বামীর– আহার, বস্ত্র ও বাসস্থান। তবে প্রসাধন দ্রব্য বা চিকিৎসার খরচ বহন করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য স্ত্রী অবাধ্য হলে তাকে কিছুই দেওয়ার প্রয়োজন নেই। (Hanafi Law, p.140; Shafi'i Law# m.11, p.644, Tafsier of Translation of the Qura'an by Muhiuddin Khan, p.867).

(১১) মুসলিম মেয়ে শুধু মুসলিম ছেলে ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। তবে মুসলিম ছেলে ইচ্ছে করলে ইহুদী বা খ্রিষ্টান মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য কোন মুসলিম মেয়ে যদি ধর্মান্তরিত হয়ে ইহুদী অথবা খ্রিষ্টান হয়ে যায় তাহলে মুসলিম ছেলের জন্য তাকে বিয়ে করা বারণ। (Tafsier of Quara'an, Muhiuddin Khan, P.120.)

(১২) কোন মহিলার পক্ষে সম্ভব নয় বিয়ের কন্যার অভিভাবক হওয়া। (Hanafi Law, p.138, 139; Shafi'i Law # m.3.4.1,p.518.)

(১৩) তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর প্রাপ্য হল অনুর্ধ তিন মাসের ভরণপোষণের খরচ, তার বেশি নয়। (Hanafi Law, p.145; Shafi'i Law # m.11.10.3, p.546.)

(১৪) শরিয়া আইন অনুযায়ী পালক সন্তান অবৈধ। (Sharia the Islami Law by Dr. Abdur Rahman Doi, p.468.)

(১৫) কোন নারী নিহত হলে তার ক্ষতিপূরণের টাকা পুরুষের অর্ধেক, এবং ক্ষতিপূরণের টাকা দাবি করার অধিকার শুধু পুরুষেরই, নারীর নয়। (Sahi'i Law # 0.4.9, 0.590; Sharia the Islamic Law by Dr. Abdur Rahman Doi, p.235.)

(১৬) ধর্ষিতা নারীকে বিয়ে করার বাধ্যবাধকতা নেই ধর্ষকের, শুধু ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়েই খালাস পাবে (Shafi'I Law # m.8.10,p.535.)

এ ধরনের দৃষ্টান্ত আরো অনেক আছে। উপর্যুক্ত সূত্রগুলো হাতে পেলেই বুঝতে পারবেন। এখন আমি প্রশ্ন তুলব : এসব জেনেশুনেই কি অন্টারিও প্রদেশের কোন মুসলমান নারী শরিয়া কোর্টে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করতে চাইবেন? ওয়াহিদা ভ্যালিয়ান্তে নিজেও কি চাইবেন?

ম্যারিয়ন বয়ডের সমর্থনসূচক রিপোর্ট থেকে মনে হচ্ছে শরিয়া বুঝি শেষ পর্যন্ত এসেই গেল অন্টারিওতে। এসে যদি যায়ই উত্তর আমেরিকাতে এই হবে তাদের প্রথম প্রদক্ষেপ। আর এই শরিয়ার বিজয়পতাকা আরও কোথায় কোথায় উড়বে কে জানে। অন্টারিও হল ক্যানাডার জনবহুল ও সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশ। মৌলভী সাহেবরা যদি এখানে একবার নাক গলাতে পারেন তাহলে অন্য প্রদেশগুলোতে যেতে আর কত সময় লাগবে। যুক্তরাষ্ট্রে যেতেই বা কদ্দিন। মুসলমান তো এখন কম নেই কোথাও। নিজেদের দেশে টিকতে পারেনি, মারামারি কাটাকাটি হৈ হৈ রৈ রৈ তো লেগেই আছে সারাক্ষণ। বিশেষ করে শরিয়াশাসিত দেশগুলোতে। আমি বিশেষ করে ভাবছি সেইসব মুসলিম নারীর কথা যারা শরিয়ার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ক্যানাডা-আমেরিকাতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে যে সেই শরিয়াই তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে চলে আসবে পশ্চিমে? তারা এখন কোথায় আশ্রয় নেবে? ম্যারিয়ন বয়ড কি একবার ভেবে দেখেছেন তাদের কথা? একবারও কি ইউরোপের উদাহরণ দেখবার চেষ্টা করছেন? নেদারল্যান্ডে বসবাসকারী আইরিস নামক একটি নিগৃহীত মুসলিম নারীর দুর্দশার কথা কি তিনি পড়েছেন 'সাপ্তাহিক গার্ডিয়ান'-এর পৃষ্ঠায়? পড়েননি নিশ্চয়ই। পড়লে বুঝতে পারতেন শরিয়াবাদী গোঁড়া মুসলমানরা কেমন করে ইঁদুরের মত ঢুকে কালে কালে সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে হিংস্র শ্বাপদের রূপ নেয়। পড়লে বুঝতে পারতেন কেন এবং কাদের চক্রান্তে ভ্যান গ'র মেধাবী বংশধরকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করা হল তার নিজেরই দেশের প্রকাশ্য রাজপথে। জানি, অন্টারিওর শরিয়াবাদীরা আজকে মুষিকের মত নম্রস্বরে বলছেন, শরিয়া কোর্টে যাওয়া কোন বাধ্যবাধকতা নেই, এটা পুরোপুরি স্বেচ্ছামূলক। কিন্তু একবার ক্ষমতা হাতে এলে সে ক্ষমতা তারা কিভাবে ব্যবহার করবেন সে কাহিনী এদেশের সরল বিশ্বাসী ন্যায়নিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গদের জানার কথা নয়, কিন্তু আমরা জানি। আমরা মৌলভীসাহেবদের ভয়াবহ চেহারা দেখেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে। আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদরা যখন শত্রুকে হারিয়ে বিজয় ঘোষণা করে কাবুলের নগরকেন্দ্রে তখন খুশির চোটে কাবুলবাসীরা মিষ্টির দোকানে ভিড় জমিয়েছিল। তারা কল্পনাও করেনি যে এই তালেবানরাই শরিয়ার ডাণ্ডা দেখিয়ে মেয়েদের স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেবে, বোরখা না পরলে দোররা মারবে, পুরুষের দাড়ি না থাকলে অপমান করবে, টেলিভিশন বন্ধ হবে, শিল্পচর্চা বন্ধ হবে, নাচগান বন্ধ হবে। তাদের শরিয়া আর মোমতাজ আলী-ওয়াহিদ ভ্যালিয়ান্তের শরিয়া কি একই শরিয়া নয়? তারা কি একই শরিয়ার বই অনুসরণ করেন না? কেমন করে জানব যে শরিয়ার অধিকার পাওয়ার পর মওলানা সাহেবরা সামাজিকভাবে চাপ দিতে শুরু করবেন না মুসলিম কোর্টে যাওয়ার জন্যে? এরই মধ্যে একটি কাগজ

বিলি হয়ে গেছে বলে শুনেছি যাতে লেখা আছে যে কোন ব্যক্তি বা পরিবার মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যদি শরিয়া কোর্টে না গিয়ে অমুসলমান কোর্টে যায় বিচারের জন্যে তাহলে তাকে অমুসলিম বা মুরতাদ বলে ঘোষণা করা হবে। এটা তারা অস্বীকার করবে জানি, কিন্তু এর সম্ভাবনা যে আছে সেটা ভুক্তভোগীরা ভাল করেই জানে। আমার এই শরিয়াবিরোধী লেখাটি কি শরিয়ার পরও আমি লিখতে সাহস পাব? তারা কি আমাকে মুরতাদ আখ্যা দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে? তখন আমার স্বাধীনতার কি অবস্থা হবে, যে স্বাধীনতা আমি পরম নিশ্চিন্তে ভোগ করে এসেছি গত ৪৩ বছর ধরে? তাহলে বলুন, কেন আমি বা আমার মত সমমনা মানুষ, জেনেশুনে খাল কেটে কুমির আনার প্রস্তাবে একমত হব?

পশ্চিমের মুক্ত জগতেই যখন এই দুর্যোগ তখন আমাদের দেশে কি হচ্ছে তা একবার ভেবে দেখুন। জামাত ও তাদের দোসররা তো উঠেপড়ে লেগেছে বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করবে বলে। ইসলামিক রাষ্ট্র বলতে বোঝায় শরিয়ার শাসন, যার দৃষ্টান্ত সারা বিশ্বই স্তম্ভিত হয়ে দেখেছে আফগানিস্তানে। খেলার মাঠকে তারা বানিয়েছিল মুণ্ডপাতের মাঠ। প্রাচীন বুদ্ধমূর্তিকে কামান দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল ওটা মূর্তি ছিল বলে। মেয়েদের করা হয়েছিল গৃহবন্দী। কারো বাড়িতে রেডিও বা ভিসিআর-এ গান শোনা গেলে গুরুতর শাস্তি হত গৃহকর্তার। জানালার পর্দা খোলা থাকলে জবাবদিহি করতে হত। এরকম রাষ্ট্রই কি তারা বানাতে চায় আমাদের দেশে? একাত্তরে পাকিস্তানী ঘাতকদের সাহায্যে সারাদেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে তাদের তৃপ্তি হয়নি, বন্য পশুদের কাছে স্বদেশের যুবতী মা-বোনদের লেলিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, এখন সেই একই গোষ্ঠী দেশকে মানবতার শ্মশান বানাতে উদ্যত হয়েছে। দেশের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কোমল, মহৎ ও মাধুর্যময়, যা কিছু অগ্রমুখী ও সৃজনশীল তাকেই ধ্বংস করে তারা খাঁ-খাঁ মরুভূমি বানাতে চাইছে। তাদের এখুনি প্রতিহত করা দরকার আমাদের। নইলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে। দেশের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে তাদের ধর্ম শান্তির ধর্ম। কিন্তু জামাতের ধর্ম শান্তির ধর্ম নয়, কেবলি শান্তির ধর্ম, তাদের ধর্ম ধ্বংসের ধর্ম প্রতিহিংসার ধর্ম। তারা মানবজাতির স্বাভাবিক কোমলবৃত্তির শত্রু। তারা নিজেদের আল্লার সিপাই বলে দাবি করে, কিন্তু সত্যিকার অর্থেই তারাই ইসলামের শত্রু। পৃথিবীর কাছে তারাই ইসলামকে খর্ব করেছে। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন এক মধ্যযুগের মতবাদ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। সাধারণ মানুষকে এখন বুঝতে হবে যে, ইসলামের মৌলিক বাণীতে নিষ্ঠুরতা নেই, নিষ্ঠুরতা আছে জামাতের হাতিয়ার শরিয়াতে। তাই জামাত আর শরিয়ার বিরুদ্ধে মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে। ইসলামের সম্মানের খাতিরেই প্রতিটি নিষ্ঠাবান মুসলমানের জন্যে এটি এখন কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আশার কথা যে প্রতিরোধের হাওয়া যেন বইতে শুরু করেছে আস্তে আস্তে। জঙ্গি মৌলবাদের ধ্বংসলিপ্সা থেকে মুসলমান জাতি ও মনুষ্যত্বকে রক্ষা করার জন্যে দেশে বিদেশের নানা জায়গায় গড়ে উঠছে মুক্তমনা চিন্তাবিদদের সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। সংখ্যায় হয়ত এখনো নগন্য তারা, কিন্তু বিদ্যায় বুদ্ধিতে চিন্তায় চেতনায়, সর্বোপরি, মানবচিত্তের সার্বিক মুক্তিকামনায়, তারা উগ্রবাদীর চাইতে শতগুণ শক্তিমান। পাঠক যদি আগ্রহী হন এদের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত খবর জানতে আর যদি বাংলাদেশের জামাতিদের পেটের কথা জানতে চান তাহলে নিয়মিত পড়ুন: www.mukto-mona.com এবং www.jamatepislami.com এতে ওরা তথ্যপ্রমাণ দিয়ে বোঝাচ্ছে যে জামাতের ধর্মান্ধ, অজ্ঞ, উগ্রবাদীরাই আসলে ইসলামের প্রতিপক্ষ। জামাতের কথাবার্তা ও আচার-আচরণ শুধু অনৈসলামিকই নয়, ইসলামবিরোধীও বটে। সুতরাং মুরতাদ আর অমুসলমান বলে যদি ফতোয়া দিতেই হয় কারো বিরুদ্ধে তাহলে জামাতের কর্তাদের ওপরই দিতে হবে। অত্যন্ত উদ্ধত উক্তি, সন্দেহ নেই। তবে খোলা মন নিয়ে যদি পরীক্ষা করে দেখেন এদের বক্তব্য তাহলে বুঝবেন যে, এরা যা বলছে তা ফেলে দেওয়ার মত নয়। প্রচুর যুক্তি আছে এদের। এরা উদ্ধত হতে পারে কিন্তু অযৌক্তিক নয়। এরা পড়াশুনা করে।

তথ্যসূত্র

১। ৪-৩৪ ও ৩৫ আয়াত দুটির অনুবাদ নিচের অনুবাদগুলোর সাথেও তুলনা করে দেখা যেতে পারে।

THE HOLY QUR-AN : English translation, Revised and Edited by Presidency of Islamic Researches, IFTA, Call and Guidance. (Saudi Arabia).

4-34 :
Men are the protectors
And maintainers of women,
Because Allah has given
The one more (strength)
Than the other, and because

They suport them from their means.
Therefore the righteous women
Are devoutly obedient, and guard
In (the husband's) absence

What Allah would have them guard.
As to Those women
On whose part ye fear
Disloyalty and ill-conduct, Admonish them (First),
(Next) refuse to share their beds,
(And Last) beat them (lightly)
But if they return to obedience,
Seek not against them
Means (of annoyance):
For Allah is Most High,
Great (above you all).

4-35 :
If you fear a breach
Between them twain,
Appoint (two) arbiters,
One from his family,
And the other from hers;
If they seek to set things aright,
Allah will cause
their conciliation:
For Allah have full knowledge,
And is acquainted
With all things.

বাংলা অনুবাদ

কোরআন শরীফ : ভাই গিরীশ চন্দ্র সেনের অনুবাদ (খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা)

৪-৩৪ : পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর কর্তৃত্ব রাখে, ঈশ্বর তাহাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন বলিয়া, এবং তাহারা (পুরুষেরা) নিজের ধন ব্যয় করে বলিয়া; পরন্তু সাধ্বী নারীগণ বাধ্যা হয়, তাহারা গোপনীয়তার (দাম্পত্য ধর্মের) সংরক্ষিকা ঈশ্বর সংরক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া; এবং তোমরা যে সকল নারীর অবাধ্যতা আশঙ্কা করিয়া থাক তাহাদিগকে উপদেশ দান কর ও শয়নাগারে তাহাদিগকে যাইতে বারণ কর, এবং তাহাদিগকে প্রহার কর, যদি তাহারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাহাদের প্রতি কোন পথ অন্বেষণ করিও না; নিশ্চয়ই ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ ও মহান।

৪-৩৫ : এবং যদি (হে বিচারকগণ) তোমরা উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব আশঙ্কা কর তবে পুরুষের স্বগণ হইতে একজন মীমাংসাকারী ও স্ত্রীর স্বগণ হইতে একজন মীমাংসাকারী

নিযুক্ত করিবে, যদি তাহারা মীমাংসা করিয়া দিতে ইচ্ছা করে তবে ঈশ্বর উভয়ের প্রতি অনুকূল হইবেন।
আল কোরআনের বাংলা অনুবাদ : এ কে এম আশরাফুল ইসলাম, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ২০০১, ঢাকা।

৪-৩৪ : পুরুষ নারীর কর্তা, আল্লাহই তাদের একজনকে অন্যের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। কারণ পুরুষ তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং সতী নারীরা তাদের অনুগত হবে এবং তাদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ যা হেফাজত করতে বলেছেন তা হেফাজত করবে; তাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করলে সদুপদেশ দাও, বিছানা ভিন্ন কর এবং তাদের মার দাও। তারা অনুগত হলে তাদের বিরুদ্ধে আর কিছুই কর না। আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।

৪-৩৫ : তাদের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহই তার অনুকূল পথ করে দিবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

২। ১২৯ আয়াতটির অনুবাদ নিচের অনুবাদগুলোর সাথেও তুলনা করে দেখা যেতে পারে।

4-129

You are never able
To do justice
Between wives
Even if it is
Your ardent desire.
But tum not away
(From a Woman) altogether,
So as to leave her (as if were)
Hanging (in the air)
If ye come to a friendly
Understanding and practice
Self-restraint, Allah is
Off-forgiving. Most merciful.

(THE HOLY QUR-AN : English translation, Reviesed and Edited by Presidency of Islamic Researches, IFTA, Call and Guidance, Saudi Arabia)

বাংলা অনুবাদ

৪-১২৯ : এবং যদি তোমরা ইচ্ছা কর তথাপি নারীগণের সম্বন্ধে ন্যায়াচরণ করিতে সক্ষম হইবে না, অন্তত সম্পূর্ণ অনুরাগে (প্রিয়তমার প্রতি) অনুরাগ প্রকাশ করিও না, অবশেষে তাহাদিগকে শূন্যে লম্বিত স্ত্রীবৎ ছাড়িয়া দেও এবং যদি সম্মিলন স্থাপন কর ও ধর্মভীরু হও তবে নিশ্চয় ঈশ্বর দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

(ভাই গিরীশ চন্দ্র সেনের অনুবাদ, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা।

৪-১২৯ : শত ইচ্ছাতেও তোমরা স্ত্রীদের সাথে সমান ব্যবহার করতে পারবে না। তাই তোমরা একদিকে ঝুঁকে পড় না, আবার কাউকে ঝুলিয়েও রেখ না। তোমরা যদি সৎকর্ম কর, মুত্তাকী হও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(এ. কে. এম আশরাফুল ইসলামের বঙ্গানুবাদ, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ২০০১, ঢাকা)।

নৈতিকতা ও ধর্ম

অভিজিৎ রায়

আধুনিক সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম ও নৈতিকতার বিশ্লেষণ

ছোটবেলায় এক ভদ্রলোকের বাসায় যেতাম। জ্ঞানী-গুণী কিন্তু রসিক মানুষ। পেশায় অধ্যাপক। আমার সাথে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম আর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খুব আগ্রহ ভরে আলোচনা করতেন। তাঁর বাড়ির নাম ছিল- 'সংশয়'। আমি একদিন না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম- 'সংশয়, কেন? উনি উত্তরে হেসে বললেন– 'অভি, সংশয়ই হচ্ছে সকল জ্ঞানের উৎস। মানুষ চোখ কান বন্ধ করে যে যা বলেছে তা বিশ্বাস না করে সংশয় প্রকাশ করেছে বলেই আমাদের সভ্যতা আজ এত দূর এগিয়েছে।' সত্যিই তাই। ইতিহাসের দিকে তাকান যাক। টলেমীর 'পৃথিবী- কেন্দ্রিক' মতবাদে কোপার্নিকাস আর গ্যালেলিওরা সংশয় প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই টলেমীর মতবাদ একসময় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা একসময় 'ইথার' নামক কাল্পনিক মাধ্যমটির অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বলেই পরবর্তীকালে আলোর প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে পদার্থ-বিজ্ঞানে জায়গা করে নিয়েছে প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন আর দ্য ব্রগলীর তত্ত্বগুলো। হাটন ৬০০০ বছরের পুরনো পৃথিবীর বয়সের বাইবেলের সংস্কারে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন বলেই মিথ্যা বিশ্বাসকে সরাতে পেরেছিলেন মানুষের মন থেকে। এভাবেই সভ্যতা এগোয়। অনেকেই তর্ক করতে এসে নিজের বিশ্বাসের পক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন না; তখন খুব ভক্তি গদ গদ চিত্তে তোতাপাখীর মত আউড়াতে থাকেন বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যাওয়া নিরক্ত বাক্যাবলী– 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর' অথবা 'মানলে তাল গাছ, আর না মানলে গাব গাছ।' এ যেন ডুবন্ত মানুষের শেষ খড়কুটো আকড়ে ধরে অনেকটা যুক্তিহীনভাবেই অন্ধ-বিশ্বাসের পক্ষে সাফাই গাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। কিন্তু যারা এ ধরনের তারা বোঝেন না যে, 'বিশ্বাসে

মিলায় বস্তু' এ ধরনের ভাবনা নিয়ে বসে থাকলে আজও বোধ করি সূর্য পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরত। সভ্যতার অনিবার্য গতি আসলে বিশ্বাসের বিপরীতে, যুক্তির অভিমুখে; ক্যারেন আর্মস্ট্রং তাঁর The Battle for God বইয়ে যেটিকে একটু গুরুগম্ভীর ভাষায় বলেছেন– 'মিথোস্ থেকে লোগোস এর দিকে' (১)। এ প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধেরও একটি চমৎকার উক্তি রয়েছে– Doubt everything, and find your own light. গৌতম বুদ্ধের উক্তিটি যেন আধুনিক যুক্তিবাদীদের সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গীরই এক সংগঠিত রূপ– যেটি আসলে বলছে, কোন কিছুই বিনা প্রশ্নে মেনে নিও না! সেই একই সংশয়বাদী ভাবনার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই আধুনিক কালে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায়:

'বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখ দ্বিতীয় বিদ্যায়।
বরং বিক্ষত হও প্রশ্নের পাথরে।
বরং বুদ্ধির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো।
অন্তত আর যাই করো, সমস্ত কথায়
অনায়াসে সম্মতি দিও না।
কেননা, সমস্ত কথা যারা অনায়াসে মেনে নেয়,
তারা আর কিছুই করে না,
তারা আত্মবিনাশের পথ
পরিষ্কার করে।'

সংশয়বাদ নিয়ে সামান্য কটি কথা খুব হাল্কাভাবে হলেও প্রথমেই সেরে নেওয়া হল এই কারণে যে, আজ আমরা সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করব, ব্যবচ্ছেদ করে দেখব আমাদের সমাজের একটি বহুল প্রচলিত মিথকে, যেটি ছোটবেলা থেকেই আমাদের শিখিয়েছে, ধর্ম পালন করা ছাড়া কখনই ভাল মানুষ হওয়া সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়া।

ধর্ম ও নৈতিকতার জগাখিচুড়ি বনাম রূঢ় বাস্তবতা

প্রাচীনকাল থেকেই ঈশ্বরের প্রতি অগাধ আনুগত্য এবং ধর্ম বিশ্বাসকেই মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করা হয়েছে। পাশ্চাত্য বিশ্বে গোড়া খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরা সংগঠিত হয়ে অনেক আগে থেকেই মগজ ধোলাই করতে শুরু করেছে এ কথা প্রচার করে যে, তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো আর তাদের ঈশ্বরই একমাত্র নৈতিকতা বিষয়ে শেষ কথা বলবার অধিকার রাখে। ধর্মগ্রন্থগুলোতে যেভাবে পথ দেখানো হয়েছে, সেগুলো অন্ধভাবে অনুসরণ করাই হল নৈতিকতা (২)। আমাদের দেশি সংস্কৃতি তো আবার এসব ব্যাপারে সবসময়

একধাপ এগিয়ে। অনেক বাসায় দেখেছি শৈশব থেকেই ছোট ছেলে মেয়েগুলোর মাথা বিগড়ে দিয়ে বাংলা শেখার আগেই বাসায় হুজুর রেখে আরবী পড়ানোর বন্দোবস্ত করান হয়, ধর্মকথা শেখান হয় আর নৈতিক চরিত্র গঠনের মূলমন্ত্র হিসেবে তোতা পাখীর মত আওড়ানো হয় 'অ্যাই বাবু-এগুলো করে না– আল্লাহ কিন্তু গুনাহ দিবে।' ছোটবেলা থেকেই এইভাবে নৈতিকতার সাথে ধর্মের খিচুড়ি একসাথে মিশিয়ে এমনভাবে ছেলে- পিলেদের খাওয়ানো হয় যে তারা বড় হয়েও আর ভাবতেই পারে না যে ধর্ম মানা ছাড়াও কারো পক্ষে ভাল মানুষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু সত্যিই কি ধর্মের সাথে নৈতিক চরিত্র গঠনের কোন বাস্তব যোগাযোগ আছে? নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, কৃষ্ণ নাম, তবলিগ জামাত ইত্যাদির মাধ্যমে গণমানুষের নৈতিকতা উন্নয়নের যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্মের নামে মারামারি, হানাহানি, হিংসা, শোষণ, নির্যাতন, দারিদ্র্য আর সন্ত্রাসের বিস্তার দেখে বোঝা যায় যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আসলে কোন বিশাল অনুপ্রেরণা হয়ে মানুষের মধ্যে কখনই কাজ করেনি। কারণটা অতি পরিষ্কার। ঈশ্বরে বিশ্বাসের মাধ্যমে মরালিটি বা নৈতিকতা অর্জনের চেষ্টা করা আসলে সোজা পথে ভাত না গিলে কানের চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার মতন। প্রত্যেক ধর্মই বলছে বিধাতা ভাল মানুষকে পুরস্কৃত করেন আর পাপী তাপী-নীতিহীনদের শাস্তি দেন। বোঝাই যায় পুরস্কারের লোভটাই এখানে মুখ্য। নৈতিকতা বাদ দিয়ে অন্য যেকোন উপায়ে আল্লাহকে তুষ্ট করে পুরস্কার বগলদাবা করতে পারলে কোন বান্দাই আর নৈতিকতা- ফৈতিকতার ধার ধারবে না। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, রাম-নাম, হরিবোল, পাঁঠা বলি, কোরবানী, নামাজ, হজ্জ, কোরান তেলাওয়াত, পূজা, যজ্ঞ এই সমস্ত ব্যাপার-স্যাপারগুলোর মাধ্যমে মানুষ আসলে নৈতিকতার কোন ধার না ধেরে বিধাতার তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টাতেই মত্ত। মানুষের প্রতি আর সমাজের প্রতি যাদের অবজ্ঞা আর প্রবঞ্চনা বেশি, তারাই কিন্তু বেশী-বেশী 'আল্লা-আল্লা' করে চ্যাচায়। কারণ ধর্মেই রয়েছে সমস্ত অ-কাজ, কু-কাজ করেও পার পাবার ঢালাও ব্যবস্থা। মক্কা, জেরুজালেম, পুরী, বারাণসী কি তিরুপতি, এসব পবিত্র স্থান দর্শনে রয়েছে জীবনের সব পাপ ধুয়ে গিয়ে পরকালে স্বর্গবাসী হওয়ার নিশ্চিন্ত গ্যারান্টি। কোটি টাকার চোরাকারবারী তাই ধুম-ধাম করে পূজা-যজ্ঞ করে নয়ত শেষ বয়সে এলাকায় মন্দির গড়ে দেয় 'সমাজের ভালোর জন্য'।

উপরন্তু, যুক্তি আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ সচেতন মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে যে, ঈশ্বর এক অর্থহীন অলীক কল্পনা মাত্র। রাহুল সঙ্কৃত্যায়নের ভাষায়– 'অজ্ঞানতার অপর নামই হল ঈশ্বর।' কাজেই অজ্ঞানতাকে পুঁজি করে ঈশ্বর নামক মিথ্যা-বিশ্বাসের মূলা ঝুলিয়ে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের

কাহিনী আজ অনেকের কাছেই 'শিশুতোষ ছড়া' ছাড়া আর কিছু নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল তার Why I am not a Christian' গ্রন্থে বলেন (৩) :

> 'ধর্ম সম্পর্কে দু ধরনের আপত্তি করা যায়- বৌদ্ধিক এবং নৈতিক। বৌদ্ধিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় যে, কোন ধর্মকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়ার কোন যৌক্তিক কারণ নেই এবং নৈতিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় ধর্মের উপদেশগুলো এমন সময় থেকে উঠে এসেছিল যখন মানুষ বর্তমান যুগের থেকেও অনেক নিষ্ঠুর ছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে এই উপদেশগুলো অমানবিকতাকে চিরন্তন করবার জন্যই তৈরি। যদি এই চিরন্তন ব্যাপারটি গ্রহণে মানুষকে বাধ্য না করা হত, তবে মানুষের নৈতিক বিবেকবোধ বর্তমানে আরো অনেক উন্নত হত।'

আমি একবার এক ওয়েব সাইটের জন্য ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যকার বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। লেখা শুরু করতে না করতেই এক ধার্মিক ভদ্রলোক সেখানে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন,

> 'শ্রী অভিজিৎ রায়দের মত ব্যক্তিবর্গ যুগ যুগ ধরে এসেছে এবং ভুত হয়ে চলে গেছে। এদের সম্পর্কে কোরানে উল্লেখ রয়েছে যে, তারা অন্ধ ও বর্বর। এদের হৃদয়ে সীলমোহর এঁটে দেওয়া আছে। তারা কিছুই দেখতে পায় না এবং শুনতে পায় না। শুধু প্রাণীর মত হাম্বা হাম্বা রব তোলে।'

কোরানে যদি সত্যই এমনটি বলা থাকে (এবং কোরানে সত্যই অবিশ্বাসীদের অন্ধ/বর্বর, এবং এদের হৃদয়ে যে সীলমোহর এঁটে দেওয়া আছে তা বলা আছে; দেখুন সুরা ২:৭, ৪:১৫৫, ৭:১০০, ৭:১০১, ৯:৯৩, ১৬:১০৮, ৩০:৫৯, ৪৫:২৩ ইত্যাদি) বলতেই হয় মহান সৃষ্টিকর্তার রুচিবোধ সত্যিই প্রশংসনীয়। কেবল ধর্ম মানি না বলেই ভদ্রলোক আমায় 'অন্ধ' ও 'বর্বর' বলেছেন, আর প্রমাণ স্বরূপ 'সাক্ষী গোপাল' মেনেছেন তার চির-আরাধ্য ওই ধর্মগ্রন্থকেই। শুধু যে কোরানেই অধার্মিকদের সম্বন্ধে এ ধরনের বিষোদগার করা হয়েছে তা ভাবলে ভুল হবে। শঙ্করাচার্য প্রমুখ দার্শনিকদের প্রাচীনকালের নাস্তিক্যবাদী চার্বাক দর্শনকে 'লোকায়াত' বা ইতর লোকের দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রবণতাটির কথা এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতেই পারে। এমনকি চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বলা হয় যে, মহাভারতের এক কুচরিত্র রাক্ষস চার্বাকের নাম থেকেই নাকি চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। মহাভারতে আছে- চার্বাক ছিল দুর্যোধনের বন্ধু এক দুরাত্মা রাক্ষস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জিতবার পর চার্বাক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞাতিঘাতী হিসেবে ধিক্কার জানিয়ে

আত্মঘাতী হতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা তাদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় চার্বাকের চালাকি ধরে ফেলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন। বোঝাই যায়, প্রাচীন ভাববাদীরা এই নাস্তিক্যবাদী দর্শনটির প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এমন ঘৃণ্য চরিত্রের রাক্ষসের সাথে দর্শনটিকে জুড়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আরেকটি উদাহরণ দেখি।

মহাভারতের শান্তিপর্ব। এক ধনী বণিক রথে যাওয়ার সময় এক ব্রাহ্মণকে ধাক্কা মেরে দিল। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ অপমানের জ্বালা ভুলতে আত্মহত্যা করার কথা চিন্তা করল। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার মধ্যে সর্বনাশের সঙ্কেত দেখতে পেয়ে শিয়াল সেজে হাজির হলেন। ব্রাহ্মণকে তার পশু জীবনের নানা দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে মানবজীবনের জয়গান গাইলেন। জানালেন অনেক জন্মের পুণ্যের ফল সম্বল করে এই মানব জন্ম পাওয়া। এমন মহার্ঘতম জীবন আর তায় আবার ব্রাহ্মণ! এমন জীবন পাওয়ার পরও কি কেউ আত্মহত্যা করে? কাজেই অভিমানে আত্মহত্যা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। শিয়াল নিজেও আগের জন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিল। কিন্তু সে জন্মে সে চূড়ান্ত মুর্খের মত এক মহাপাতকের কাজ করেছিল বলেই আজ এই শিয়াল জন্ম। চূড়ান্ত মূর্খের মত কাজটি কি? এই বারেই কিন্তু বেরিয়ে এল নীতি কথা–

অহমাংস পাণ্ডিতকো হৈতুকো দেবনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিং তর্কবিদ্যম অনুরক্তো নিরার্থিকাম॥
হেতুবাদান প্রবদিতা বক্তা সুংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চ অভিবক্তা চ ব্রাহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্॥
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ
ভাস্য ইয়ং ফলনিবৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ॥ (শান্তিপর্ব ১৮০/৪৭-৪৯)

(অর্থাৎ, আমি ছিলাম এক বেদ সমালোচক পণ্ডিত। নিরর্থক তর্কবিদ্যায় ছিলাম অনুরক্ত। বিচার সভায় ছিলাম তর্কবিদ্যার প্রবক্তা। যুক্তিবলে দ্বিজদের ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটাতাম। ছিলাম জিজ্ঞাসু মনের নাস্তিক, অর্থাৎ কিনা পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ। হে ব্রাহ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আমার এই শিয়ালজন্ম।)

বোঝাই যায়, বৈদিক যুগেও যুক্তিবাদীদের সংশয়, অযাচিত প্রশ্ন আর অনর্থক তর্ক-বিতর্ক একটা 'ফ্যাক্টর' হয়ে উঠেছিল। 'পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ'– এ ধরনের লেবেল এঁটে দিয়ে বেদ-সমালোচকদের প্রতিহত করার প্রচেষ্টা তারই ইঙ্গিত বহন করে। আজকেও কি এ দৃষ্টিভঙ্গীর খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে? যে ভদ্রলোকটি আমাকে ধর্মগ্রন্থের সমালোচনা করার জন্য 'অন্ধ' বা 'বর্বর' হিসেবে চিত্রিত করছেন, সে ধরনের লোকজনের কিন্তু আজো সমাজে অভাব নেই, নাস্তিক শুনলেই

তারা খ্যাঁক করে ওঠেন– 'ও তুমি নাস্তিক! তবে তো তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার! তোমার তো চরিত্র বলে কিছু নেই'। এরা আসলে নাস্তিকদের মানুষ বলেই মনে করেন না, ভাল-মানুষ ভাবা তো অনেক পরের কথা। কিন্তু, নাস্তিক মানেই কি অনৈতিক, চরিত্রহীন, লম্পট গোছের কিছু? এমনিভাবে ভাবার মোটেই কোন কারণ নেই। নাস্তিকরা আসলে নাকের সামনে থেকে ঈশ্বর নামক মূলাটি সরিয়ে বাস্ত বসম্মতভাবে 'মরালিটি' বা নৈতিকতাকে দেখবার পক্ষপাতি। ঈশ্বরের ভয়ে নয়, একটি সুন্দর এবং সুস্থ সমাজ গড়ে তুলবার প্রয়োজনেই মানুষের চুরি-দারি, লাম্পট্য, খুন, ধর্ষণ বিসর্জন দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধগুলি গড়ে তোলা দরকার। নয়ত সমাজের ভিত্তি-মূলই যে একসময় ধ্বসে পড়বে! কাজেই অধার্মিকদের চোখে 'নৈতিকতা' বেহেস্তে যাওয়ার কোন পাসপোর্ট নয়, বরং নিতান্তই সামাজিক আবশ্যকতা। ধর্মান্ধরা যেহেতু সামাজিক মূল্যবোধের এই বিষয়গুলো একেবারেই বুঝতে চান না, তাই তাদের মধ্যে যুদ্ধ, দাঙ্গা, জিহাদ, মারামারি লেগেই আছে। ১৯৭১ সালের কথাই ধরা যাক। সারা বাংলা হত-বিহ্বল হয়ে দেখেছে কিছু ধর্মান্ধ মানুষ ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে কি করে পশুর স্তরে নেমে যেতে পারে।

এক ভদ্রলোককে চিনতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সাতে-পাঁচে নেই; সাদা চোখে দেখলে নিতান্ত ভালমানুষ বলেই মনে হবে। কিন্তু ভূক্তভোগীরা জানেন যে একাত্তরে ভদ্রলোক এহেন দুষ্কর্ম নেই যা করেননি। সে সময় এমনকি তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন এই বলে যে, খান- সেনারা যদি কোন বাঙালি মেয়েকে ধর্ষণ করে তবে সেটি অন্যায় বলে বিবেচিত হবে না, বঙ্গনারীরা পাকবাহিনীর জন্য 'মালে গনিমত', কারণ তারা ইসলামের জন্য লড়ছে। এমন নয় যে ভদ্রলোক অশিক্ষিত ছিলেন, অথবা ছিলেন বুদ্ধিহীন। বরং সৎ এবং হৃদয়বান হিসেবেই একটা সময় তার খ্যাতি ছিল; কিন্তু এই 'সজ্জন' ব্যক্তিও স্রেফ ধর্মের ভালবাসায় অন্ধ হয়ে নেমে গেলেন পশুর স্তরে। উনি ভেবেছিলেন পাকিস্তান ভেঙে গেলে ইসলাম হবে বিপন্ন। তাই ধর্ম বাঁচাতে যা যা করা দরকার সবই করেছেন। এমনকি খান সেনাদের সাথে পাল্লা দিয়ে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও আছে। ব্যাপারটি অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও অতিমাত্রায় ধর্মপ্রবণদের কাছে এ ধরনের কাজ খুবই স্বাভাবিক। অনেক সময়ই মানবিকতার চেয়ে তাদের কাছে ধর্মবোধটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই ভদ্রলোকের কথা ভাবলেই নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ভাইনবার্গের বিখ্যাত উক্তিটি আমার মনে পড়ে যায় (৪):

> 'ধর্ম মানবতার জন্য এক নির্মম পরিহাস। ধর্ম মানুক বা নাই মানুক, সব সময়ই এমন অবস্থা থাকবে যে ভালমানুষেরা ভাল কাজ করছে, আর খারাপ মানুষেরা খারাপ কাজ করছে। কিন্তু ভাল মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করানোর ক্ষেত্রে ধর্মের জুড়ি নেই।'

শুধু একাত্তর তো কেবল নয়, বছর কয়েক আগে গুজরাটে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দাঙ্গা, আর তারও আগে অযোধ্যায় বাবরী মসজিদের ধ্বংস– শিবসেনাদের তাণ্ডব নৃত্য ধর্মের এই ভয়াবহ রূপটিকেই মনে করিয়ে দেয়। অপরপক্ষে নাস্তিকদের যেহেতু এই অতি মানবিক সত্তা- কেন্দ্রিক নৈতিকতায় কোন বিশ্বাস নেই, একজন নিষ্ঠাবান নাস্তিক সত্যিকার অর্থে গড়ে ওঠেন একজন প্রথা-বিরোধী মানুষ হিসেবে। সুমন তুরহান নামে এক লেখক মাসিক দেশ পত্রিকার ৪ঠা নভেম্বর ২০০২ সংখ্যায় 'নাস্তিকতার সংজ্ঞা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন- 'নাস্তিকদের অবিশ্বাস তাই শুধু অতিমানবিক সত্তায় নয়, তার চেয়ে অনেক গভীরে, তিনি অবিশ্বাস করেন প্রথাগত সভ্যতার প্রায় সমস্ত অপবিশ্বাসে। সব কিছুই তারা যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে চান।' (৫) এর মধ্যে যে কিছুটা হলেও সত্যতা নেই তা নয়। তবে ভালমানুষ হোন, আর নাই হোন এটা কিন্তু ঠিক যে নাস্তিক বা অধার্মিকদের মধ্যে থেকে কখনোই আল-কায়েদা, তালিবান, হরকত-উল- জিহাদ, রাজাকার, আলবদর বা শিবসেনাদের মত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপ দেখা যায় না। যতদিন ধর্ম থাকবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকবে ধর্মের সাম্প্রদায়িক এই সাংগঠনিক রূপটিও কিন্তু বজায় থাকবে পুরোমাত্রায়। কাজেই যতদিন মানুষের আনুগত্য ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকবে ততদিন তা মানুষকে স্বাধীনভাবে আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জনে বাধা দিবেই। বেহেস্তের লোভে বা ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য নয়, মানুষকে ভালবেসে মানুষের জন্য কাজ করার প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয়, তবেই গড়ে উঠবে সার্বজনীন মানবতাবাদ। সম্প্রতি এর প্রচেষ্টা শুরুও হয়েছে। ঈশ্বর কেন্দ্রিক মিথ্যার বেসাতির মন থেকে সরিয়ে শুধু মানুষের জন্য মানুষের কাজ করার বাসনা নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে নতুন শতকের আধুনিক মতবাদ হিসেবে এসেছে হিউম্যানিজম। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে মানবতাবাদী সমিতি এবং যুক্তিবাদী সমিতি অফিস আদালতের ফর্মে বা বিয়ের রেজিস্ট্রেশনে 'হিন্দু' 'মুসলিম' এই শব্দগুলির পাশাপাশি ধর্মের জায়গায় 'মনুষ্যত্ব' শব্দটি ব্যবহারের আইনি অধিকার আদায় করেছে (৬)। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের একটি চমৎকার উক্তি তার অলৌকিক নয়, লৌকিক গ্রন্থ থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি (৭)-

> 'আগুনের ধর্ম যেমন দহন, ছুরির ধর্ম যেমন তীক্ষ্ণতা তেমনি মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। আর সে হিসেবে নামাজ না পড়েও বা শনি শীতলার পূজা না করেও আমরা যুক্তিবাদী নাস্তিকেরাই প্রকৃত ধার্মিক, কারণ আমরা মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ চাই।'

ধর্মগ্রন্থগুলো কি সত্যই নৈতিকতার ধারক এবং বাহক?

ধর্ম হল বিষবৃক্ষ, আর মৌলবাদ হল সে বৃক্ষের বিষাক্ত একটি শাখা : ইদানিং এক নতুন ধরণের প্রগতিবাদী (নাকি সুবিধাবাদী) আন্দোলন শুরু হয়েছে, যার মূলমন্ত্র হল ধর্ম নয়, কেবল মৌলবাদকে আঘাত কর। অনেক মুক্ত-মনা যুক্তিবাদীদের দেখছি বুঝে হোক, না বুঝে হোক এ প্রচারণায় গা ভাসিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের মতই ইদানিং সোচ্চারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ছেন : 'শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও মৌলবাদ রুখব', যেন মৌলবাদ ব্যাপারটি হঠাৎ করেই আকাশ থেকে আবির্ভূত হয়েছে মহীরূহ আকারে- কোন শিকড়-বাকড় ছাড়াই। যারা ধর্মকে শাশ্বত চিরন্তন আর জনকল্যাণমূলক বলে মনে করেন আর যত দোষ চাপাতে চান কেবল গোলাম আজম, আদভানী কিংবা 'মৌলবাদ' নামক নন্দঘোষটির ঘাড়ে, তাদের প্রথমে খোদ 'মৌলবাদ' শব্দটিকেই বিশ্লেষণ করে দেখতে বলি। 'মৌল' শব্দের অর্থ মূল থেকে আগত, বা 'মূল সম্বন্ধীয়'। আর 'বাদ' শব্দের অর্থ যে 'মত', 'তত্ত্ব' বা থিওরী, তা তো আমরা জানিই। তা হলে মৌলবাদ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি দাঁড়ালো? দাঁড়ালো– 'মূল থেকে আগত তত্ত্ব'। কোন্ মূল থেকে আগত তত্ত্ব? শেষ পর্যন্ত ওই ধর্মগ্রন্থের গোঁড়া মূলনীতিগুলো হতে আগত তত্ত্ব কাজেই বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কিন্তু থলের বিড়াল ঠিকই বেড়িয়ে পড়ছে যে, ধর্মশাস্ত্রের মূল নীতিগুলোকে চরম সত্য বলে যারা মনে করেন, তারাই শেষ পর্যন্ত মৌলবাদী হন। মৌলবাদ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Fundamentalism'। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলা হয়েছে– "Strict maintainence of traditional spritual beliefs'; চ্যাম্বার্স ডিকশনারি শব্দটি সম্পর্ককে বলছে– 'Belief in literal truth in Bible, against evolution etc.'। কাজেই ধর্মকে বাদ দিয়ে মৌলবাদ রুখবার চেষ্টা অনেকটা বিষবৃক্ষের গোড়ায় পানি ঢেলে বাঁচিয়ে রেখে আগায় কাঁচি চালানোর প্রচেষ্টা, নিছক ভণ্ডামি। তসলিমা নাসরীন একবার একটি ইংরেজি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন (৮) :

> 'আমি সাধারণভাবে মৌলবাদীদের আর সেই সাথে ধর্মের– দু'এরই সমালোচনা করেছিলাম। আমি আসলে ইসলামের সাথে ইসলামী মৌলবাদের কোন তফাৎ দেখি না। আমি মনে করি ধর্মই হচ্ছে মূল উৎস, যেটি থেকে মৌলবাদ নামক বিষাক্ত ডালপালাগুলো সময় সময় বিস্তার লাভ করে। আমি খুব পরিষ্কারভাবেই এটি বলছি কারণ, কিছু উদারপন্থী লোকজন আছেন যারা এ ধরনের প্রশ্নে ইসলামকে ডিফেন্ড করেন আর সমস্ত সমস্যার জন্য কেবল মৌলবাদীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হন। কিন্তু ইসলাম নিজেই তো নারী-নির্যাতনকারী। ইসলাম নিজেই তো গণতন্ত্র সমর্থন করে না আর সমস্ত মানবিক অধিকার হরণ করে।'

আমার এক পরিচিতজন আছেন– সেক্যুলার এবং প্রগতিশীলতার দাবিদার। কিন্তু তসলিমার এই সাক্ষাৎকার পড়ে তার যেন পিত্তি জ্বলে গেল! তসলিমা 'শ্যালো', তসলিমা নির্বোধ, তসলিমা 'ইডিয়ট', কী নন তিনি! বুঝলাম, তসলিমার বড় অপরাধ তিনি ধর্ম আর মৌলবাদকে এক করে ফেলেছেন। কিন্তু তসলিমা ভুল বলছেন, না ঠিক বলছেন সেটি বিশ্লেষণ করতে হলে নির্মোহ সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে তাকানো দরকার। যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ধর্মগ্রন্থগুলোর সাথে মৌলবাদের সত্যই কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে কিনা, এবং ধর্মগ্রন্থগুলো আদপেই নৈতিকতার ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত হবার যোগ্যতা রাখে কিনা!

ধর্মগ্রন্থগুলো আসলে কি বলছে : পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মমতগুলো সৃষ্টি হয়েছে বড় জোর বিগত ২-৪ হাজার বছরের মধ্যে। হিন্দু, ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম কোনটাই সে অর্থে চিরন্তন বা সনাতন নয়। কাজেই 'সনাতন ধর্ম' নিছকই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। তবে সনাতন না হলেও ধর্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু কিন্তু হয়েছিলো বহু হাজার বছর আগে। বিরূপ প্রকৃতির নানা দুর্যোগ– দাবানল, প্লাবন, বজ্রপাত প্রভৃতির ব্যাখ্যা খুঁজতে অসহায় হয়ে আর ওগুলোর হাত থেকে মুক্তি খুঁজতে মানুষ সৃষ্টি করেছিল নানা দেবদেবীর; মৃত্যুকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করতে পেরে সৃষ্টি করেছিল অদৃশ্য আত্মার। যারা সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে সামান্য পড়াশুনা করেছেন তারাই এগুলো জানেন। আর এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, মানুষের মধ্যে তথাকথিত 'ধর্মবিশ্বাসের' সৃষ্টি হয়েছিল এখনকার মানুষের পূর্বসুরী নিয়ানডার্থাল মানুষের আমলে যারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে। নিয়ানডার্থাল মানুষের আগে পিথেকনথ্রোপাস আর সিনানথ্রোপাসদের মধ্যে ধর্মাচরণের কোন নির্দেশ পাওয়া যায়নি (১৫)। তবে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বিশ্বাসগুলো ছিল একেবারেই আদিম– আজকের দিনের প্রচলিত ধর্মমতগুলোর তুলনায় একেবারেই আলাদা। এখন থেকে কমপক্ষে বিশ হাজার বছর বা তারও আগে উচ্চতর পুর-প্রস্তর যুগে এসে ধর্ম, আত্মা, পরমাত্মা, যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত ব্যাপার স্যাপারগুলো সুসংহত হয়। এ সময়কার প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসগুলোর মধ্যে বৈদিক ধর্মের (হিন্দু ধর্মের পূর্বসুরী) উদ্ভব হয়েছিল আজ থেকে মাত্র সাড়ে তিন থেকে চার হাজার বছর আগে, প্রয়োজনে যে ধর্মীয় রীতি নীতি নিয়ম কানুন তৈরি হয়েছিল, আজ তা কালের পরিক্রমায় স্থবির, পশ্চাৎপদ, নিবর্তনমূলক এবং অমানবিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কোরানেও রয়েছে নির্দেশাবলীর ছড়াছড়ি, যেগুলো 'মৌলবাদের সুতিকাগার' হিসেবে কারো মনে হতেই পারে। যেমন (৯) :

কোরান মুমিন ভক্তদের শেখাচ্ছে যেখানেই অবিশ্বাসীদের পাওয়া যাক তাদের হত্যা করতে (২:১৯১, ৯:৫), তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে, কঠোর ব্যবহার

করতে (৯:১২৩), আর যুদ্ধ করে যেতে (৮:৬৫)। কোরান শেখাচ্ছে বিধর্মীদের অপদস্ত করতে আর তাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করতে (৯:২৯)। কোরআন অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নির্যাসটুকু কেড়ে নিয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করছে যে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম (৩:৮৫)। এটি অবিশ্বাসীদের দোজখে নির্বাসিত করে (৫:১০) এবং 'অপবিত্র' বলে সম্বোধন করে (৯:২৮); মুসলিমদের ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সকল ধর্মকে সরিয়ে ইসলামী রাজত্ব কায়েম হয় (২:১৯৩)। কোরআন বলছে যে শুধু ইসলামে অবিশ্বাসের কারণেই একটি মানুষ দোজখের আগুনে পুড়বে আর তাকে সেখানে পান করতে হবে পুঁতি দুর্গন্ধময় পূঁজ (১৪:১৭)। এই 'পবিত্র' গ্রন্থটি অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে অথবা তাদের হাত পা কেটে ফেলতে প্ররোচিত করছে, দেশ থেকে অপমান করে নির্বাসিত করতে বলছে আর ভয় দেখাচ্ছে এই বলে যে– 'তাদের জন্য পরকালে অপেক্ষা করছে ভয়ানক শাস্তি' (৫:৩৪)। আরও বলছে, 'যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে যাতে ওদের চামড়া আর পেটে যা আছে তা গলে যায়, আর ওদের পেটানোর জন্য থাকবে লোহার মুগুর' (২২:১৯)। কোরান ইহুদী এবং নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বটুকু করতে পর্যন্ত নিষেধ করছে (৫:৫১), এমনকি নিজের পিতা বা ভাই যদি অবিশ্বাসী হয় তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখতে উদ্বুদ্ধ করছে (;২৩, ৩:২৮)। আল্লাহ তার কোরানে পরিষ্কার করেই বলছে– আল্লা-রসুলে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড (৪৮:১৩)। ইসলামে অবিশ্বাস করে কেউ মারা গেলে কঠোরভাবে উচ্চারিত হবে 'ধর ওকে, গলায় বেড়ি পড়াও এবং নিক্ষেপ কর জাহান্নামে আর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তুর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে' (৬৯:৩০-৩৩)। মহানবী সবসময়ই আল্লাহর নামে যুদ্ধ করতে সবাইকে উৎসাহিত করেছেন সাফাই গেয়েছেন এই বলে– 'এটা আমাদের জন্য ভালই, এমনকি যদি আমাদের অপছন্দ হয় তবুও' (২:২১৬), তারপর উপদেশ দিয়েছেন– 'কাফেরদের গর্দানে আঘাত কর' আর তারপর তাদের উপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার নির্দেশের পর বলেছেন অবশিষ্টদের ভালভাবে বেঁধে ফেলতে (৪৭:৪)। পরমকরুণাময় আল্লাহতালা এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন– 'কাফেরদের হৃদয়ে আমি গভীর ভীতির সঞ্চার করব' এবং বিশ্বাসীদের আদেশ করেছেন কাফেরদের কাঁধে আঘাত করতে আর হাতের সমস্ত আংগুলের ডগা ভেঙে দিতে (৮:১২)।

আল্লাহ জিহাদকে মুমিনদের জন্য 'আবশ্যিক' (mandatory) করেছেন আর সতর্ক করেছেন এই বলে– 'তোমরা যদি সামনে না এগিয়ে আস (জিহাদের জন্য) তবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মন্তুদ শাস্তি' (৯:৩৯)। আল্লাহ তার পেয়ারা

নবীকে বলছেন, 'হে নবী, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর আর কঠোর হও– কেননা, জাহান্নামের মত নিকৃষ্ট আবাস স্থলই হল তাদের পরিণাম' (৯:৭৩)।

সবই কোরানের কথা (হাদিস এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলোর কথা না হয় বাদই থাকুক আপাততঃ)। অনেকেই দেখেছি নিজস্ব বিশ্বাসে আপ্লুত হয়ে কোরানকে নির্দ্বিধায় 'The Book of guidence' বলে মেনে নেন, আর ইসলামকে মনে করেন 'শান্তির ধর্ম'। যারা এমনটি ভাবেন, তারা কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে উপরের আয়াতগুলো যারা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে আর সমাজে তার বাস্তব প্রয়োগ চায় তারা কি ধরনের 'শান্তি' এ পৃথিবীতে বয়ে আনছে? জিহাদীদের কল্যাণে আজকে বিশ্বে 'ইসলামী সন্ত্রাসবাদ' একটি প্রতিষ্ঠিত শব্দ। প্রতিদিন কাগজের পাতা খুললেই দেখা যায় এই জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ কিছু লোক বোমা মারছে– লক্ষ্য; মানুষ-জন, বাড়ি-ঘর, কারখানা, রাস্তাঘাট, যানবাহন, সিনেমা হল, সাংস্কৃতিক অঙ্গন বা সমুদ্র- সৈকত। হাজার খানেক জিহাদী সংগঠন যেমন– আল কায়দা, ইসলামিক জিহাদ হামাস, হরকত-উল-জিহাদ, হরকত-উল-মুজাহিদিন, জেইস-মুহম্মদ, জিহাদ-এ-মুহম্মদ, তাহরিখ-এ-নিফাজ-সারিয়াত-এ-মুহম্মদ, আল-হিকমা, আল-বদর-মুজাহিদিন, জামায়ে ইসলামিয়া, হিজাব-এ ইসলামিয়া আজ সারা পৃথিবী জুড়ে কায়েম করছে এক ত্রাসের রাজত্ব (১০)। এই তো কয়েক বছর আগে ১৭ই আগস্ট (২০০৫) সারা বাংলাদেশে ৬৩টি জেলায় এক নাগাড়ে বোমার মহড়া হয়ে গেল। মহড়ার প্রকোপ এমনই ব্যাপক ছিল যে অনেকেই ১৭ই আগস্ট দিনটিকে এখন 'বাংলাদেশের ৯/১১' বলে অভিহিত করতে শুরু করেছেন। জঙ্গিবাদের সাথে বিশুদ্ধ ইসলামের সম্পর্ক কতটুকু তা বোঝা হয়ে গেছে বোমা মহড়ার স্থানগুলোতে পাওয়া তাদের ছাপানো লিফলেটগুলো থেকেই। সারা লিফলেট জুড়েই কোরান হাদিস থেকে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে কাফের নাফরমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক। ফরহাদ মজহার আর বদরউদ্দিন উমরেরা পালের হাওয়া যতই অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করুক না কেন, বিশুদ্ধ ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, তা আর অস্বীকার করার জো নেই (১১)। সচেতন শান্তিকামী ধার্মিক মানুষদের আজ আত্মোপলব্ধির সময় এসেছে, সময় এসেছে সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন করার– কেন এই জঙ্গি দলগুলো এত ইসলামিক? কেন তারা সন্ত্রাসী? কারা ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে মোল্লা ওমর, বিন-লাদেন, মৌলানা মান্নান, গোলাম আজম, শাইখ আবদুর রহমান, মুফতি হান্নান আর বাংলাভাইদের? ইন্ধন যোগাচ্ছে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে? আজ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তাই বলার সময় এসেছে– এই 'পবিত্র' ধর্মগ্রন্থগুলো অনেকাংশেই মুসলিমদের ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস। তবে সেই সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি দীর্ঘদিনের

বিদ্বেষমূলক পররাষ্ট্রনীতির কথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। জনবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া কিংবা সাদ্দামের সাথে আল-কায়েদার কোন সম্পর্ক না খুঁজে পাওয়া কিংবা জৈব-যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া সত্ত্বেও নির্লজ্জভাবে ইরাকের উপর যে আগ্রাসন চালিয়েছে তা শুধু যে আমেরিকার চিরচেনা সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে তা নয়, ইসলামী বিশ্ব এই আগ্রাসনকে যে কোন কারণেই হোক 'ইসলামের উপর আঘাত' হিসেবে নিয়েছে। সেজন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, যে সমস্ত দেশেই ইসলামী আত্মঘাতী বোমা হামলার মাত্রাটা বেশি যে দেশের সরকার ইরাক যুদ্ধে বুশ- বেস্নয়ারকে নগ্নভাবে সমর্থন করেছে। এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আর প্রতিহিংসার ব্যাপারগুলো ভুলে গেলে কোন আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

ধর্ম, মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনার একটা বড় সমস্যা হল অযাচিত 'স্টেরিওটাইপিং'-এর ভয়। এ ধরনের আলোচনা শুরু হলেই আমি দেখেছি বিশ্বাসীদের অনেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে থাকেন– শুধু গুটি কয়েক সন্ত্রাসীদের কারণে সামগ্রিকভাবে ইসলামকে বা মুসলমানদের দায়ি করা কি ঠিক হচ্ছে? একজন বিন লাদেন বা একজন মুফতি হান্নান কি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে নাকি? না, সত্যই করে না। কাজেই আমিও বলি যে, পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কখনও সন্ত্রাসী বলা উচিত নয়, যারা এ ধরনের 'স্টেরিওটাইপিং' করতে চান তারা ভুল করেন। এটি একধরনের racism। কেউ বা বলেন এটি এক ধরনের রোগ– 'ইসলামফোবিয়া'! রোগই বলুন আর পশ্চিমা জাত্যাভিমানই বলুন (যাকে প্রয়াত এডয়ার্ড সাইদ অভিহিত করেন 'ওরিয়েন্টালিজম' নামে), ৯/১১-এর পর পশ্চিমাবিশ্বে বসবাসরত মুসলিমরা এ ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই– এ তো অস্বীকার করবার জো নেই। মুসলিম মানেই যে 'সন্ত্রাসী' নয় এটি বোঝার জন্য তো কোন দর্শন কপচানোর দরকার নেই, আমার-আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তো যথেষ্ট হবার কথা। আমার নিজেরই অনেক মুসলিম বন্ধু-বান্ধব রয়েছেন। তাদের কেউই তো সন্ত্রাসী নন। কেউই বিন লাদেন নন, কেউই নন মুফতি হান্নান। তারা আমার বিপদে আপদে খোঁজ-খবর নেন, বাসায় এসে গল্প-গুজব করেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, এমন কি নামাজের সময় হলে এই কাফেরের বাসায় 'পশ্চিম দিক কোনটা' জানতে চেয়ে নামাজও পড়েন। এরা নিপাট ভাল মানুষ। তারা কোরআনের কোন আয়াতে ভায়োলেন্সের কথা আছে তা সম্বন্ধে মোটেও ওয়াকিবহাল নন, সেটা নিয়ে আগ্রহীও নন– তারা আসলে 'spiritual Islam' এর চর্চা করেন। বিপদটা কখনই এদের নিয়ে নয়। এরা সবাই শান্তি, ভালবাসা আর সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই মূল্যবোধগুলো তারা যতটা না ইসলাম থেকে পেয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি

ছোটবেলা থেকেই সামাজিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ কোনদিন কোরানের বা ইসলামের চর্চা না করেও তো বহু মানুষ এই গুণাবলি থেকে বর্জিত নয়, এমন প্রমাণ ভুরি ভুরি হাজির করা যায়। কিন্তু এই 'Spiritual Islam'-এর চর্চাকারী দলের বাইরেও একটা অংশ রয়েছে যারা রীতিমত কোরানের চর্চা করেন, চোখ-কান বন্ধ করে কোরানের সকল আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেন আর কোরানের আলোকে দেশ ও পৃথিবী গড়তে চান। বিপদটা এদের নিয়েই। কারণ কেউ যদি সামাজিক শিক্ষার বদলে কোরানের সকল আদেশ-নির্দেশ চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নেন তাহলে কি হবে? নিচের আয়াতটায় চোখ বুলানো যাক (১৭)–

> Let not the believers Take for friends or helpers Unbelievers rather than believers : if any do that, in nothing will there be help from Allah (Q.3:28)

যারা কোরানের মধ্যে কখনও ভায়োলেন্সের টিকিটিও খুঁজে পান না, বরং পবিত্র কোরানের আলোকে জীবন সাজাতে চান, তারা নিজেরাই কি তাদের কোন হিন্দু, খ্রিষ্টান বা অধার্মিক প্রতিবেশীদের প্রতি কোরাানে বর্ণিত উপরের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করেন? তারা কি সত্যিই শুধুমাত্র অমুসলিম বলেই কারো বন্ধুতত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেন? যদি তা না হয়, তবে বলতেই হয় যে তারা আসলে কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী চলছেন না। কিন্তু কোরান তো 'আল্লাহর কিতাব'। কেউ যদি ভাসা ভাসা কোরানের চর্চা না করে কোরানের সকল নির্দেশ আক্ষরিকভাবেই মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেয় আর অবশেষে সাম্প্রদায়িক 'তালিবান' হিসেবে বেড়ে ওঠেন, তবে দোষটা কার হবে?

আরেকটি আয়াত দেখি (১৭)–

> Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is possible that ye dislike a thing which is good for you (Q.2:216)

অথবা

> Then fight in Allah's cause- Thou art held responsible only for thyself- and rouse the believers. It may be that Allah will restrain the fury of the fury of the Unbelievers; for Allah is the strongest in might and in punishment (Q.4:84).

কোরানের বর্ণিত নির্দেশ মত জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে তালিবানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইহুদী নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য আফগানিস্তান চলে গিয়েছিলেন অনেকেই। কারণ ইহুদি-নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে তারা

আল্লাহর নির্দেশ বলেই মেনে নিয়েছিলেন। তাদের যে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় তাও নয়। এমনি একজন ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে জন ফিলিপ ওয়াকার লিন্ধ ধর্মান্তরিত নাম আবদুল হামিদ, বিখ্যাত 'আমেরিকান তালিবান'। দৈনিক প্রথম আলোর ১৮ই অক্টোবর ২০০৫ রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হরকাতুল জিহাদের তত্ত্বাবধানে আশির দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় তিন হাজার মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিল (১৮)। কোরানের অমানবিক শিক্ষাই যে শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্যে 'কাফিরদের' বিরুদ্ধে অযথা হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানোতে বহুলাংশে দায়ি, এটি অস্বীকার করার চেষ্টা স্রেফ আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। এ স্পর্শকাতর বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে সবসময়ই ঘুরে ফিরে ৯/১১'র ঘটনাটি সামনে চলে আসে। ৯/১১-এর ঘটনায় সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে দেখেছিলো কি করে কিছু ধর্মোন্মাদ জিহাদী সৈনিক উড়োজাহাজকে অস্ত্র বানিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ লোকের প্রাণহানি ঘটাতে পারে। যারা ইসলামের মধ্যে প্রতিনিয়ত শান্তি খোঁজেন, তারা বলবেন, এগুলো কতিপয় পথভ্রষ্ট দুস্কৃতকারীদের কাজ– যার সাথে প্রকৃত ইসলামের কোনই সম্পর্ক নাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই 'কতিপয় পথভ্রষ্ট দুস্কৃতকারী'রা তো আর নিজেদের দুস্কৃতকারী ভাবেনি। বরং ভেবেছে তারাই সাচ্চা মুসলিম, যারা কিনা আল্লাহর দেওয়া অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে। ৯/১১ ঘটার অনেক আগেই- ১১ই জানুয়ারি ১৯৯৯-এর নিউজ উইকের একটি সংখ্যায় ওসামা বিন লাদেনের একটা সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারে লাদেন সাহেব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন তিনি সকল আমেরিকানদের মেরে ফেলাকে 'জায়েজ' মনে করেন। পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল (১৯)-

> QUESTION : "Why have you asked Muslims to target civilian Americans all over the world? Islam prohibits its followers from killing civilians in war?"
> BIN LADEN : "If the Israelis are killing small children in Palestine and the Americans are killing the innocent people in Iraq, and if the majority of the American people support their dissolute president, this means the American people are fighting us and we have the right to target them.
> QUESTION : "All Americans?"
> BIN LADEN "Muslim scholars have issued a fatwa [a religious order] against any American who pays taxes to his government. He is our target, because he is helping the American war machine against the Muslim nation.

হিন্দু ধর্মকে ইসলাম থেকে কোন অর্থেই ভাল বলবার জো নেই। যে জাতিভেদ প্রথার বিষ-বাষ্প প্রায় তিন হাজার বছর ধরে কুরে কুরে ভারতকে খাচ্ছে তার প্রধান রূপকার স্বয়ং ঈশ্বর। মনুসংহিতা থেকে আমরা পাই- মানুষের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য, আর পা থেকে শূদ্র সৃষ্টি করেছিলেন (১:৩১)। বিশ্ববাসীরা জোর গলায় বলেন, ঈশ্বরের চোখে নাকি সবাই সমান! অথচ, ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে আর শূদ্রদের পা থেকে তৈরি করার পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যটি কিন্তু বড়ই মহান! শূদ্র আর দলিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাই 'ঈশ্বরের মাথা থেকে সৃষ্ট উঁচু জাতের' ব্রাহ্মণদের দুর্ব্যবহারের কথা সর্বজনবিদিত। সমস্ত বড়লোকের বাসায় এখনও দাস হিসেবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হয়। মনু বলেছেন– দাসত্বের কাজ নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শূদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন (৮:৪১৩)। এই সমস্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বাসার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে চলে যাওয়ার পর গঙ্গা জল ছিটিয়ে গৃহকে 'পবিত্র' করা হত (ক্ষেত্র বিশেষে এখনও হয়)। আর হবে নাই বা কেন! তারা আবার মানুষ নাকি? তারা তো অচ্ছুৎ! শ্রী এম. সি. রাজার কথায়, 'আপনি বাড়িতে কুকুর-বিড়ালের চাষ করতে পারেন, গো-মুত্র পান করতে পারেন, এমনকি পাপ দূর করার জন্য সারা গায়ে গোবর লেপতে পারেন, কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ছায়াটি পর্যন্ত আপনি মাড়াতে পারবেন না' (২০)! এই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের নৈতিকতা! এমন কি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে শূদ্রদের উপার্জিত ধন সম্পত্তির ওপর তাদের ভোগেরও অধিকার নেই। সব উপার্জিত ধন দাস-মালিকেরাই গ্রহণ করবে– এই ছিল মনুর বিধান– 'ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিত স্বং ভর্ত্তৃহার্যধনো হি সঃ' (৮:৪১৬)। শূদ্ররা ছিল বঞ্চনার করুণতম নিদর্শন; তাদের না ছিল নাগরিক অধিকার, না ছিল ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক অধিকার। শূদ্রদের যাতে অন্য তিন বর্ণ থেকে আলাদা করে চেনা যায় এবং শূদ্ররা যেন প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখে যে তিন বর্ণের মানুষের ক্রীতদাস হয়ে সেবা করবার জন্যই তাদের জন্ম। তিন বর্ণের মানুষদের থেকে শুদ্ররা যে ভিন্নতর জীব, মনুষ্যেতর জীব তা জানানোর জন্য প্রতি মাসে মাথার সব চুল কামিয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছেন মনু (৫:১৪০)। একজন শুদ্রকে বেদ পাঠ তো দূরের কথা, শ্রবণেরও অধিকার দেওয়া হয়নি। একজন শুদ্রকে তার উঁচু জাতে বিয়ে করবার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। একজন শুদ্র যদি ব্রাহ্মণের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসে পড়ে, তবে তার বুকে গরম লোহার রডের ছ্যাকা দেবার অথবা পশ্চাৎদেশ কর্তন করে নেবার বিধান রয়েছে (৮:২৮১)।

মনুর এসব বর্ণবাদী নীতির বাস্তব রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই রামায়ণ ও মহাভারতে। বিশেষত ধর্মশাস্ত্রীয় অনুশাসন যে শ্রেণী বৈষম্যের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং শূদ্রদের দমন-পীড়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত, তার সবচেয়ে বড়

উদাহরণ শম্বুকবধ কাহিনী। এক শূদ্র তাপসের তপস্যা করার 'অপরাধে' রামচন্দ্র খড়্গ দিয়ে শম্বুকের শিরোচ্ছেদ করেন তার তথাকথিত রামরাজ্যে[২১]। প্রায় একই ধরনের ঘটনা আমরা দেখি মহাভারতে যখন নিষাদরাজ হিরন্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে এলে তাকে নিচ জাতি বলে প্রত্যাখ্যান করেন দ্রোণ। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত একলব্যের শর নিক্ষেপের দক্ষতা নষ্ট করে ধনুর্বিদ্যায় দ্রোণের প্রিয় ছাত্র অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রক্ষার অভিপ্রায়ে 'গুরু দক্ষিণা' হিসেবে একলব্যের বুড়ো আঙুল কেটে নেন তিনি। এ ধরনের অনেক উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন মহাকাব্যগুলোতে[২২]।

আসলে এইসব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আদিম মানুষের সাম্যের সমাজকাঠামোর ভিত উপড়ে ফেলে প্রতিষ্ঠা করেছিল অসম সমাজের, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের। ধর্মই তৈরি করেছিল হুজুর-মজুর শ্রেণীর কৃত্রিম বিভাজনের, কিংবা হয়ত বলা যায় শোষক শ্রেণীই শ্রেণী বিভক্ত সমাজের ফায়দা পুরোপুরি লুটবার জন্য প্রথম থেকেই কাজে লাগিয়েছিল ধর্মকে; যেভাবেই দেখি না কেন এর ফলে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সামাজিক আর অর্থনৈতিক শোষণের। এই শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবার জন্যই ব্রাহ্মণেরা প্রচার করেছিল– ধর্মগ্রন্থগুলো স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত। মানুষে মানুষে বিভেদ নাকি ঈশ্বর-নির্দেশিত! ঈশ্বরকে সাক্ষ্য মেনে রাজনৈতিকভাবে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত সুদূরপ্রসারী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় উপমহাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে।

ইসলামী জিহাদী সৈনিকদের মতই ভারতে বিভেদের হাতিয়ার 'সনাতন ধর্ম' রক্ষায় আজ সচেষ্ট হয়েছে বিজেপি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিব-সেনা, বজরং দলের মত প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো। কয়েক দশক আগেও ভারতে নব্যহিন্দুত্বের তেমন কোন সংগঠিত রূপ ছিল না[২৩]। তবে অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর ধর্মান্ধতার কারণে ভারতের আপামর জনসাধারণের কাছে সন্ন্যাসী, গেরুয়া, জটা, দণ্ড, রুদ্রাক্ষ, কমণ্ডুলু এসব দীর্ঘকাল ধরে একটা বিমূঢ় সম্ভ্রম ভোগ করে এসেছে। ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের মোহের কথা ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা জানে। তাই ধর্মীয় ভাবালুতাকে উস্কে দিতেই বোধহয় ১৯৮৮-৯০ সালে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দূরদর্শনে ধর্মীয় অবয়বে প্রচারিত হল রামায়ণ আর মহাভারত। সরকারি প্রচার মাধ্যমে এভাবে অন্ধ বিশ্বাসকে উৎসাহ দেবার ফলে ভারতে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দুয়ার উন্মোচিত হল, রোপণ করা হল এক বিষবৃক্ষের চারা। দূর-দর্শনের পর্দায় প্রথমবার রামায়ণ চলাকালে কল্পিত রাম জন্মভূমি নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার এবং পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর উত্থান সেই প্রক্রিয়ারই অংশ। জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে তার 'মহাকাব্য ও মৌলবাদ' বইয়ে বলেন[২৪] :

"দুর্ভাগ্যবশত : ভারতবর্ষে রামায়ণ ও মহাভারতকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহাকাব্যিক প্রতিফলন হিসেবে অথবা ভারতীয় তথা বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে গণ্য না করে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতাই বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানেই আমাদের গভীর লজ্জা। প্রথমে ১৯৮৮-৯০ সালে এবং আরও কয়েকবার সরকারি দূরদর্শনে রামায়ণ ও মহাভারত যে অবয়ব ও প্রকাশভঙ্গিমায় সম্প্রচারিত হয়েছে, তা এই মৌলবাদী রাজনীতিতে ইন্ধন জুগিয়েছে বলেই মনে হয়। দূরদর্শনে সম্প্রচারিত রামায়ণের কাহিনী প্রধানত তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস গ্রন্থকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে, বাল্মীকি রামায়ণকে ভিত্তি করে নয়। তুলসী রামায়ণের মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলনের ফলশ্রুতি এবং বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের ফলশ্রুতি এবং বৈষ্ণব ভক্তি সাহিত্যের অন্তর্গত। আদি বাল্মীকি রামায়ণে বালকাণ্ড ও উত্তর কাণ্ড ছিল না। আর পরবর্তীকালে সংযোজিত এই দুই কাণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্ষিপ্ত কথা বাদ দিলে আদি বাল্মীকি রামায়ণে রামের অবতারত্বের বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় না। মহাকাব্য হিসেবেও রামায়ণের সাহিত্যগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তুলসী রামায়ণে বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ দেবতা রামকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। দূরদর্শনে এভাবে রামায়ণকে মহাকাব্য হিসেবে উপস্থিত না করে বিকৃতরূপে অবতারকাহিনী ও ধর্মগ্রন্থরূপেই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সরকারি প্রচারমাধ্যমে এভাবে অন্ধবিশ্বাসকে উৎসাহ দেওয়ার ফলে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সঞ্জীবিত হয়েছে, এ ধারণা যুক্তিসঙ্গত। দূরদর্শনের পর্দায় প্রথমবার রামায়ণ চলাকালে রামজন্মভূমি নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার এবং পরবর্তীকালে তার ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াই এর অকাট্য প্রমাণ।'

ক'বছর আগে গুজরাটে ঘটে গেল স্মরণকালের মধ্যে সবচাইতে ভয়াবহ দাঙ্গা। ধর্মের মায়াজালে পড়ে সাধারণ মানুষ কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে আর নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে- গুজরাটের সাম্প্রতিক দাঙ্গা তার প্রমাণ। তারপরেও কিন্তু ধর্মের সমালোচনা করলে সব শিয়ালই দেখছি এককাট্টা হয়ে বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ান!

ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের পবিত্র গ্রন্থের দিকে তাকালে দেখা যায়, পুরো বাইবেলটিতেই ঈশ্বরের নামে খুন, রাহাজানি, ধর্ষণকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। কিছু উদাহরণ তো দেওয়া যেতেই পারে। যুদ্ধজয়ের পর অগনিত যুদ্ধবন্দিকে কব্জা করার পর মুসা (মোশি) নির্দেশ দিয়েছিলেন ঈশ্বরের আদেশ হিসেবে সমস্ত বন্দি পুরুষকে মেরে ফেলতে (৩০) :

'এখন তোমরা এইসব ছেলেদের এবং যারা কুমারী নয় এমন সব স্ত্রী লোকদের মেরে ফেল; কিন্তু যারা কুমারী তাদের তোমরা নিজেদের জন্য বাঁচিয়ে রাখ' (গণনা পুস্তক, ৩১:১৭-১৮)।

একটি হিসাবে দেখা যায়, মুসার নির্দেশে প্রায় ১০০,০০০ জন তরুণ এবং প্রায় ৬৮,০০০ অসহায় নারীকে হত্যা করা হয়েছিল (৩১)। এছাড়াও নিষ্ঠুর, আক্রমণাত্মক এবং অরাজক বিভিন্ন ভার্সসমূহের বিবরণ পাওয়া যায় যিশাইয় (২১:৯), ১ বংশাবলী (২০:৩), গণনা পুস্তক (২৫:৩-৪), বিচারকর্তৃগণ (৮:৭), গণনা পুস্তক (১৬:৩২-৩৫), দ্বিতীয় বিবরণ (১২:২৯-৩০), ২ বংশাবলী (১৪:৯, ১৪:১২), দ্বিতীয় বিবরণ (১১:৪-৫), ১ শমূয়েল (৬:১৯), ডয়টারনোমি (১৩:৫-৬, ১৩:৮-৯, ১৩:১৫), ১ শমূয়েল (১৫:২-৩), ২ শমূয়েল (১২:৩১), যিশাইয় (১৩:১৫-১৬), আদিপুস্তক (৯:৫-৬) প্রভৃতি নানা জায়গায়।

বিশ্বাসী খ্রিষ্টানরা সাধারণত বাইবেলে বর্ণিত এই ধরনের নিষ্ঠুরতা এবং অরাজগতাকে প্রত্যাখ্যান করে বলার চেষ্টা করেন, এগুলো সব বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ) অধীন, যীশু খ্রিষ্টের আগমনের সাথে সাথেই আগের সমস্ত অরাজগতা নির্মূল হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এটি সত্য নয়। বাইবেলের নতুন নিয়মে যীশু খুব পরিষ্কার করেই বলেছেন যে তিনি পূর্বতন ধর্মপ্রবর্তকদের নিয়মানুযায়ীই চালিত হবেন (৩০) :

'এ কথা মনে কোর না, আমি মোশির আইন-কানুন আর নবীদের লেখা বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসি নি বরং পূর্ণ করতে এসেছি' (মথি, ৫:১৭)।

খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারীরা যেভাবে যীশুকে শান্তি এবং প্রেমের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন, সত্যিকারের যীশু ঠিক কতটুকু প্রেমময় এ নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। যীশু খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে :

'আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি এই কথা মনে কোর না। আমি শান্তি দিতে আসি নাই, এসেছি তলোয়ারের আইন প্রতিষ্ঠা করতে। আমি এসেছি মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে দাঁড় করাতে; ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, বৌকে শাশুড়ির বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি' (মথি, ৫:১৭)।

ব্যভিচার করার জন্য শুধু ব্যাভিচারিণী নন, তার শিশুসন্তানদের হত্যা করতেও কার্পণ্য বোধ করেন না যীশু:

'সেইজন্য আমি তাকে বিছানায় ফেলে রাখব, আর যারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করে তারা যদি ব্যভিচার থেকে মন না ফিরায় তবে তাদের ভীষণ কষ্টের মধ্যে ফেলব। তার ছেলেমেয়েদেরও আমি মেরে ফেলব (প্রকাশিত বাক্য, ২:২২-২৩)'।

ধর্মের সমালোচনা কেন

মানবতাবাদীরা আর যুক্তিবাদীরা কেন ধর্মগ্রন্থগুলোর সমালোচনা করেন? সমালোচনা করেন কারণ তা সমালোচনার যোগ্য, তাই। কোন কিছুই তো আসলে সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়– তা সে অর্থনীতি বা পদার্থবিজ্ঞানের নতুন কোন তত্ত্বই হোক, বা আল্লাহর 'মহান' বাণীই হোক। সমালোচনার একটি বড় কারণ হল, ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিরাজমান নিষ্ঠুরতা। ধর্মগ্রন্থগুলি তো আর গীতাঞ্জলি বা সঞ্চিতার মত নির্দোষ কাব্যসমগ্র নয় যে অবসর সময়ে শুয়ে শুয়ে কাব্য চর্চা করলাম আর তারপর আলমারির তাকে তুলে রেখে দিলাম! ধর্মগ্রন্থগুলিতে যা লেখা আছে তা ঈশ্বরের বাণী হিসেবে পালন করা হয় আর উৎসাহের সাথে সমাজে তার প্রয়োগ ঘটানো হয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত সতীদাহর মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শুধুমাত্র ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে সতীদাহের শিকার হয়েছে ৮১৩৫ জন নারী। এই তো সেদিনও ১৯৮৭ সালে রূপ কানোয়ার নামে একটি মেয়েকে রাজস্থানে পুড়িয়ে মারা হল 'সতী মাতা কী জয়' ধ্বনি নিয়ে। সারা গ্রামের মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল– কেউ টু শব্দটি করল না। আর করবেই বা কেন? ধর্ম রক্ষা করতে হবে না? মহাভারতের কথা শুনলে যেমন পুণ্য হয়, সতী পোড়ানো দেখলেও নাকি তেমনি। ধর্ম যে কিরকম নেশায় বুদ করে রাখে মানুষকে, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এই সতীদাহ। এ জন্যই বোধহয় Pascal বলেছেন– 'Men never do evil so completelly and cheerfully as when they do it from religious convicition.' খুবই সত্য কথা। চিন্তা করুন ব্যাপারটা– জীবন্ত নারী মাংস জ্বলছে, ছটফট করছে, অনেক সময় বেঁধে রাখতে কষ্ট হচ্ছে, মাঝে মাঝে পালাতে চেষ্টা করছে– আফিম জাতীয় জিনিস গিলিয়ে দিয়ে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আবার চিতায় তুলে দেওয়া হচ্ছে– কী চমৎকার মানবিকতা (২৫)! প্রায় প্রতিদিনই পত্রপত্রিকায় পড়েছি যে, ইসলামী বিশ্বে শারিয়ার শিকার হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে অসহায় সাফিয়া, আমিনারা। কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে কাফিরদের বিরুদ্ধে রোজই যুদ্ধের হাঁক পাড়ছে বায়তুল মোকাররমের 'বিখ্যাত' খতিব। তবুও নেশায় বুদ হয়ে ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'শান্তি', 'প্রগতি' আর 'সহিষ্ণুতা' খুঁজে চলেছেন মডারেট ধর্মবাদীরা (২৬)।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই বেশ কিছু ভাল কথা আছে (এগুলো নিয়ে আমার বা কারোই আপত্তি করার কিছু নেই); এগুলো নিয়েই ধার্মিকেরা গর্ববোধ করেন আর এ কথাগুলোকেই নৈতিকতার চাবিকাঠি বলে মনে করেন তারা। কিন্তু একটু সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই বোঝা যাবে– ভালবাসা প্রেম এবং সহিষ্ণুতার বিভিন্ন উদাহরণ যে ধর্মগ্রন্থ এবং তার প্রচারকদের সাথে লেবেল হিসেবে লাগিয়ে দেওয়া হয়, সেগুলো কোনটাই ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের

জন্য মৌলিক নয়। যেমন, যীশুখ্রিষ্টের অনেক আগেই লেভিটিকাস (১৯:১৮) বলে গেছেন, 'নিজেকে যেমন ভালবাস, তেমনি ভালবাসবে তোমার প্রতিবেশীদের।' বাইবেল এবং কোরানে যে সহনশীলতার কথা বলা আছে, সেগুলোর অনেক আগেই (খ্রিষ্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগে) কনফুসিয়াস (Confucius) একইরকমভাবে বলেছিলেন– 'অন্যের প্রতি সেরকম ব্যবহার কোর না, যা তুমি নিজে পেতে চাও না।' আইসোক্রেটস (Isocrates) খ্রিষ্টের জন্মের ৩৭৫ বছর আগে বলে গিয়েছিলেন, 'অন্যের যে কাজে তুমি রাগান্বিত বোধ কর, তেমন কিছু তুমি অন্যদের প্রতি কোর না।' এমনকি শত্রুদের ভালবাসতে বলার কথা তাওইজমে রয়েছে, কিংবা জৈনের ও বুদ্ধের বাণীতে, সেও কিন্তু যীশু বা মুহম্মদের অনেক আগেই।

কাজেই নৈতিকতার যে উপকরণগুলোকে ধর্মানুসারীরা তাদের স্ব স্ব ধর্মের 'পৈত্রিক সম্পত্তি' বলে ভাবছেন, সেগুলো বিকশিত হয়েছে সমাজবিবর্তনের অবশ্যাম্ভাবী ফল হিসেবে। সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যকে ' নৈতিক গুণাবলী' হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে; কারণ ওভাবে গ্রহণ না করলে সমাজব্যবস্থা অচিরেই ধ্বসে পড়ত। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক সলোমন অ্যাশ বলেন,

'আমরা এমন কোন সমাজের কথা জানি না, যেখানে সাহসিকতাকে হেয় করা হয়, আর ভীরুতাকে সম্মানিত করা হয়; কিংবা উদারতাকে পাপ হিসেবে দেখা হয় আর অকৃতজ্ঞতাকে দেখা হয় গুণ হিসেবে।'

এমন ধরনের সমাজের কথা আমরা জানি না কারণ অমন সমাজ টিকে থাকতে পারে না। খুব সাদা চোখে দেখলেও, একটি সমাজে চুরি করা যে অন্যায়, এটি বুঝবার জন্য করার জন্য কোন স্বর্গীয় ওহি নাজিল হওয়ার দরকার পড়ে না। কারণ যে সমাজে চুরি করাকে না ঠেকিয়ে মহিমান্বিত করা হবে, সে সমাজের অস্তিত্ব লোপ পাবে অচিরেই। ঠিক একইভাবে আমরা বুঝি, সত্যি কথা বলার বদলে যদি মিথ্যা বলাকে উৎসাহিত করা হয়, তবে মানুষে মানুষে যোগাযোগ রক্ষা করাই দুরূহ হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারগুলো উপলব্ধির জন্য কোন ধর্মশিক্ষা লাগে না। আবার এমনও দেখা গেছে যে, শতাব্দীপ্রাচীন কোন চলমান ব্যবস্থার পরিবর্তন মানুষ নিজে থেকেই করেছে পরিবর্তিত মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে মানবতাকে যাচাই করে, এবং অনেকক্ষেত্রেই ধর্ম কি বলছে না বলছে তার তোয়াক্কা না করেই। দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ এমনি একটি ঘটনা। বলা বাহুল্য, কোন ধর্মগ্রন্থেই দাসত্ব উচ্ছেদের আহ্বান জানানো হয়নি। বাইবেলের নতুন কিংবা পুরাতন নিয়ম, কিংবা কোরান, অথবা বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা- কোথাও দাসত্বপ্রথাকে নির্মূল করার কথা বলা হয়নি, বরং সংরক্ষিত করার কথাই বলা হয়েছে প্রকারান্তরে। কিন্তু মানুষ সামাজিক

প্রয়োজনেই একটা সময় দাসত্ব উচ্ছেদ করেছে, যেমনিভাবে হিন্দু সমাজ করেছে সতীদাহ নির্মূল বা খ্রিষ্ট সমাজ ডাইনি পোড়ানো বন্ধ। সতীত্ব সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা, কিংবা সমকামিতা বা গর্ভপাতের অধিকার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে সারা পৃথিবী জুড়ে এ কয় দশকে। এ পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির অনেকগুলোই ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

Let the data decide; উপাত্ত দিয়েই বিচার করা যাক–

আজ আধুনিক রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, আল্লাহর গুনার দোহাই দিয়ে মানুষ জনকে সৎ পথে পরিচালিত করার ব্যাপারটি কি নিদারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয়েছে। আল্লাহ বা ঈশ্বরের গুনার ভয় দেখিয়েই যদি মানুষজনকে পাপ থেকে বিরত রাখা যেত, তা হলে আর রাষ্ট্রে পুলিশ- দারোগা, আইন-কানুন, কোর্ট-কাচারি কোন কিছুরই প্রয়োজন হতো না। এক ইন্টারনেট ফোরামে একটা সময় রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং ধর্মের নৈতিকতা বিষয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম; সাথে সাথেই এক ধার্মিক ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করলেন– 'অভিজিৎ রায়ের মত নাস্তিক লোকজন রাষ্ট্রে আছেন বলেই পুলিশ দারোগার প্রয়োজন'। এ ধরনের উক্তিকে স্রেফ একজন মাত্র অজ্ঞ ধার্মিকের আস্ফালন বলে মনে করলে কিন্তু ভুল হবে। এ ধরনের ধ্যান ধারণা অনেকেই মনে মনে পোষণ করেন, তাদের বেশ বড় অংশই আবার সুশিক্ষিত। পাশ্চাত্য বিশ্বে ডিস্কোভারি ইনস্টিটিউটের পুরোধা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের অন্যতম প্রবক্তা ফিলিপ জনসনের মতে, যেহেতু অবিশ্বাসীরা ডারউইনের মতানুসারে মনে করে মানুষ বানর থেকে উদ্ভুত হয়েছে, সেহেতু তারা যে কোন ধরনের 'নাফরমানি' করতে পারে– সমকামিতা, গর্ভপাত, পর্ণোগ্রাফি, তালাক, গণহত্যা সবকিছু (২৭)। এমন একটা ভাব, ডারউইন আসার আগ পর্যন্ত সারা পৃথিবী যেন এগুলো থেকে একেবারেই মুক্ত ছিল!

একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি হিসেবে ফিলিপ জনসনের এ ধরনের আবেগপ্রবণ আপ্তবাক্যাবলিতে আমার বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, বরং আমার আস্থা থাকবে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত ফলাফলে; বিজ্ঞানীরা যেটিকে বলেন, 'Let the data decide'। আমি ফিলিপ জনসনের সমর্থনে এমন কোন উপাত্ত বা ডেটা খুঁজে পাইনি যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের চাইতে বেশি অপরাধপ্রবণ; বরং কিছু পরিসংখ্যান একেবারেই উল্টো সিদ্ধান্ত হাজির করছে। আমেরিকায় বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে নাস্তিকদের চাইতে পুনরুজ্জীবিত খ্রিষ্টানদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার বেশী; এও দেখা গিয়েছে যে, যে পরিবারের

পরিবেশ ধর্মীয়গতভাবে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল সেসব পরিবারেই বরং শিশুদের উপর পরিবারের অন্য কোন সদস্যদের দ্বারা যৌননিপীড়নের হার বেশি (২৭)। ১৯৩৪ সালে আব্রাহাম ফ্রাঞ্জব্লাউ (Abraham Franzblau) তার গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন ধার্মিকতা এবং সততার মধ্যে বরং বৈরী সম্পর্কই বিদ্যমান। ১৯৫০ সালে মুরে রসের (Murray Ross) গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসে যে ধার্মিকদের তুলনায় নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরাই বরং সমাজ এবং মানুষের প্রতি সংবেদনশীল থাকেন, তাদের উন্নয়নের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ১৯৮৮ সালে ভারতের জেলখানায় দাগী আসামিদের মধ্যে একটি জরিপ চালিয়েছিল। জরিপের যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল অবাক করার মত। দেখা গিয়েছে, আসামিদের শতকরা ১০০ জনই ঈশ্বর এবং কোন না কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী (২৮)। আমেরিকায়ও এরকম একটি জরিপ চালানো হয়েছিল ৫ই মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে। সে জরিপে দেখা গেছে যে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ধর্মহীন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কম (মাত্র ০.২১%), সে তুলনায় ধার্মিকদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা অনেক বেশি (১৪)। আজ বাংলাদেশে জরিপ চালালেও ভারতের মতই ফলাফল পাওয়া যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, বেহেস্তের লোভ বা দোজখের ভয় কোনটাই কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারেনি। আল্লাহর গুণাহ কিংবা ঈশ্বরের ভয়েই যদি মানুষ পাপ থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারত, তবে তো বাংলাদেশ এতদিনে বেহেস্তে পরিণত হত। কিন্তু বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা আজ কী দেখছি? বাংলাদেশে শতকরা ৯৯ জন লোকই আল্লা- খোদা আর পরকালে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতিতে এই দেশটিই আজ পৃথিবীর শীর্ষে। ধর্মে বিশ্বাস কিন্তু দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারেনি। পারবেও না। যে দেশে সর্বোচ্চ পদ থেকে বইতে শুরু করে দুর্নীতির স্রোত, যে দেশে রাজনৈতিক নেতা থেকে সরকারের উঁচু স্তরে-সর্বত্র দুর্নীতি বিদ্যমান– যেখানে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় হত্যাকারী, ধর্ষক, গুণ্ডা, ছিতাইকারী, ডাকাত ও মাস্তানরা শুধু রেহাইই পায় না, বরং বুক চিতিয়ে ঘুরে বেরাবার ছাড়পত্র পায়, নেতা হবার সুযোগ পায়, সে দেশের মানুষ নামাজ পড়েও দুর্নীতি চালিয়ে যাবে। এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? তারা রোজাও রাখবে, আবার ঘুষও খাবে। তাই হচ্ছে। এই তো ধর্মপ্রাণ, আল্লাহ-খোদায় বিশ্বাসী বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা। অপরদিকে সিঙ্গাপুরের দিকে তাকানো যাক। এ দেশটিতে অধিকাংশ লোকই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মপরিচয় থেকে মুক্ত। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্রকেই দেখেছি ধর্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে– 'ফ্রি থিঙ্কার'। অথচ, ধর্ম নয়, শুধু আইনের শাসন আর সামাজিক মূল্যবোধগুলোর চর্চা করে সিঙ্গাপুর আজ পৃথিবীর সবচেয়ে কম

দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলির একটি। অধিকাংশ সিঙ্গাপুরবাসীরা আল্লা-খোদার নামও করেন না, নরকের ভয় অথবা বেহেস্তের লোভও তাদের নেই। কোন যাদুবলে তারা তাহলে দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকছে?

উপরের পরিসংখ্যানগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে, মানুষ নাস্তিক হলেই ভাল হবে কিংবা আস্তিক হলেই খারাপ হবে, বরং এটাই বোঝানো যে, ধর্ম কোনভাবেই নৈতিকতার 'মনোপলি ব্যবসা' দাবি করতে পারে না। আসলে কোন বিশেষ ধর্মের আনুগত্যের ওপর কিন্তু মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন নির্ভর করে না, নির্ভর করে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আর সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। আসলে আধুনিক যুগের জীবনযাত্রার প্রেক্ষাপটে একথা বলা যায় যে, প্রাচীনকালের ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে নৈতিকতাকে বিশ্লেষণ করলে আর চলবে না, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান এবং বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

মাইকেল শারমার তার The Science of Good & Evil : Why people Cheat, Gossip, Care, Share and Follow the Golden Rule বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন সমাজ বিকাশের প্রয়োজনেই মানুষ কিছু নীতিকে 'গোল্ডেন রুল' হিসেবে গ্রহণ করেছে (৩২) :

Do unto others, as you would have them do unto you.

কারণ এই নীতির অনুশীলন ছাড়া সমাজ ব্যবস্থা টিকে থাকবে না। মাইকেল শারমার তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, মানব বিবর্তনের ধারাতেই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আবার নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহনশীলতা, উদারতা, স্বার্থত্যাগ, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি গুণাবলির চর্চা হয়েছে। ফলে সভ্যতার প্রতিনিয়ত সংঘাত ও সংঘর্ষে গড়ে উঠেছে মানবীয় সম্ভাবনাময় নীতিবোধ, যা মানুষকে, প্রকৃতিতে টিকে থাকতে সহায়তা করেছে।

নৈতিকতার ব্যাপারটি শুধু মানব সমাজেরই একচেটিয়া তা নয়, ছোট স্কেলে তথাকথিত অনেক 'ইতর প্রাণী' জগতের মধ্যেও কিন্তু এটি দেখা যায়। ভ্যাম্পায়ার বাদুরেরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য ভাগাভাগি করে, বানর এবং গরিলারা তাদের দলের কোন সদস্য মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলে তাকে সহায়তা করে, এমনকি 'দশে মিলে' কাজ করে তার জন্য খাবার নিয়ে আসে। ডলফিনেরা অসুস্থ ডলফিনকে ধাক্কা দিয়ে সৈকতের দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে অসুস্থ ডলফিনটির পর্যাপ্ত আলো বাতাস পেতে সুবিধা হয়, তিমি মাছেরা তাদের দলের অপর কোন আহত তিমি মাছকে দ্রুত সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। হাতীরা তাদের পরিবারের অসুস্থ বা আহত সদস্যকে বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

তাহমিনা আর সুকুমারের গল্প : নৈতিকতার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী

আমি আমার প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই একটি নাস্তিক ভারতীয় দম্পতির চলমান স্রোতের বিপরীতে নিরন্তর সংগ্রামের কথা বলে। তাদের ঘটনাটি মুক্তমনায় বছর কয়েক আগে প্রকাশিত হয়েছিল, প্রকাশিত হয়েছিল ভারতের বেশ ক'টি পত্র-পত্রিকায়ও। তাহমিনা খাতুন আর তার স্বামী সুকুমার মিত্র– এই দম্পত্তি ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাস নাগাদ সুন্দরবনে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে চব্বিশ পরগনার নাজাত-এর 'হোটেল পান্থনিবাসে' এক রাত থাকবার জন্য যান। হোটেলের ম্যানেজার তাদের ঢুকতেই দিল না। স্পষ্ট অবিশ্বাসের সুরে জানালো, 'একজন খাতুন কি করে একজন মিত্রের স্ত্রী হয়?' তারা তখন বাধ্য হয়ে ম্যানেজার সাহেবকে নিজেদের বিয়ের সার্টিফিকেট দেখালেন। তবু ম্যানেজার সাহেব নির্দেশ দিলেন তাহমিনাকে পদবী হিসেবে 'মিত্র' লিখতে হবে। তাহমিনা- সুকুমার কেউই এতে রাজি হলেন না। আর কেনই বা হবেন, তারা তো হিন্দু বা মুসলিম পরিচয়ে নিজেদের অভিহিত করেন না। তারা বললেন– 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান নই, আমরা মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি এবং মনে করি এটি কোন অপরাধ নয়।' কিন্তু ম্যানেজার সাহেবের হৃদয় তাতে গলেনি। তিনি তাদের হোটেল ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ক্ষুব্ধ, অপমানিত এই দম্পতি ব্যাপারটিকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও জেলার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের নজরে আনেন; এমনকি কনজিউমার্স কোর্টে যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন তারা।

এ ধরনের ব্যাপার অবশ্য তাদের জীবনে এই প্রথম নয়। হাবড়ার গান্ধী সেন্টিনারি বিটি কলেজে বিএড পড়ার জন্য এক সময় তাহমিনা খাতুন আবেদন করেছিলেন। তার যোগ্যতা অনুসারে তিনি ছিলেন ৮৮০ জন আবেদনকারীর মধ্যে প্রথম। কিন্তু তিনি আবেদনপত্রে নিজেকে মুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করেননি। শুধুমাত্র এই অপরাধে তাকে কলেজে ভর্তি করা হল না। তিনি বারাসত আদালতে মামলা করলেন। কোর্টের রায় হল তার অনুকূলে। স্পষ্ট বলা হল, এভাবে ভর্তি না করার ব্যাপারটি একজনের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে তাকে ভর্তি করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। কিন্তু আদালতের নির্দেশ মানা হল না, তাহমিনাকে ভর্তি করা হয়নি। তাহমিনা আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে আদালতে আবার আবেদন জানিয়েছিলেন। এবং শেষ অব্দি অনেক দেরিতে তাকে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হল– কিন্তু তখন তার চাকরি করার বয়স পেরিয়ে গেছে।

কিন্তু এই ক্রমাগত নিগ্রহ আর নির্যাতনের মুখে দাঁড়িয়েও তারা মনোবল হারাননি। 'হয়ত সারা জীবন ধরেই এসবের মুখোমুখি আমাদের হতে হবে, তবু আমরা লড়াই থেকে পিছু হটতে চাই না, কারণ, শেষ অব্দি আমাদের জয় হবেই'–

এই ছিল তাঁদের দ্বিধাহীন উত্তর (২৯)।

তাহমিনা আর সুকুমারদের মত সংগ্রামীদের নিয়েই গড়ে উঠুক আগামী বিশ্ব। সেই দিনের প্রত্যাশায়–

তথ্যসূত্র

(১) ক্যারেন আর্মস্ট্রং তার 'Battle of God' বইয়ে বলেছেন, মানুষের চিন্তাধারা অনাদিকাল থেকেই বিকশিত হয়েছে পরিষ্কার দুটি ধারায়। এর একটি হচ্ছে 'মিথোস' এবং অপরটি 'লোগোস'। 'মিথোস এসেছে ইংরেজি 'মিথ' থেকে, আরো গভীরে গেলে পাওয়া যাবে 'musteion'। মিথের মূল প্রতিশব্দগুলো mystery এবং mysticism, যা প্রকাশ করে রহস্যময়তা, দুর্জ্ঞেয়তা এবং অতীন্দ্রিয়তাকে। ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর চোখে মিথ হচ্ছে কতগুলো রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কার– যেগুলোর কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ কখনও পাওয়া যায় না। এগুলো মানব মনে জায়গা করে নিয়েছে স্রেফ কতকগুলো বিশ্বাসের কাঁধে ভর করে। ফশফন গ্রিক শব্দ লোগোসকে বর্ণনা করেছেন 'যুক্তিগ্রাহ্য', 'প্রমাণসাপেক্ষ', 'বিজ্ঞান ভিত্তিক' শব্দ ক'টির সাহায্যে। তিনি বলেন, আধুনিক বিশ্বে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, প্রগতি আর উন্নয়নের মূলে রয়েছে 'লোগোস'- যা জ্ঞান ও যুক্তির মাপকাঠিতে প্রকৃত বাস্তবতার পরিচায়ক। (আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায়, অক্কুর প্রকাশনী, ২০০৪)।

(২) "The religions of the world, especially Christainity, have laid claim to the role of arbiters of human behavior, They insist that they have the right to tell the rest of us what is right and what is wrong because they have a special pipeline to the place where right and wrong are defined- in mind of god." see "Do Our Values Come from God? The Evidence Says No," Victor Stinger, Mukto-Mona (www.mukto-mona.com)

(৩) আমি কেন ধর্মবিশ্বাসী নই, বার্ট্রান্ড রাসেল, ভাষান্তর : অরিন ভাদুড়ী, দীপায়ন, ২য় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪।

(৪) "Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes riligion.", Steven Weinberg, In a speech given in Washington, DC, on April 1999.

(৫) নাস্তিকতার সংজ্ঞা, সুমন তুরহান। দেশ ৪ নভেম্বর, ২০০২।

(৬) 'ধর্ম' যেহেতু ব্যক্তিগত ব্যাপার তাই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মীয় পরিচয় জানানো জরুরি নয় বলে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীরা মনে করে। কিন্তু সমস্যা হল, যারা কোন ধর্ম মানে না তারা চাকুরী বা শিক্ষার ক্ষেত্রে কলামটা খালি রাখতে চাইলেও অতীতে আপত্তি উঠেছে নানা জায়গায়; এমনকি ফর্ম বাতিল করা হয়েছে অসম্পূর্ণ বলে। সেই সময় বহুমানুষ দ্বারস্থ হয় ভারতীয় মানবতাবাদী সমিতির। এই সময় প্রথম এই সমিতি Humanists Association of India সক্রিয় হয় মানবতাকে ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে, সেটা ১৯৯২-৯৩ সালের দিকে। দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ও সংবাদপত্রের দপ্তরে যোগাযোগ করে ঘটনাটি জানানো হয়। যাতে একজন মানুষ নিজের ধর্ম 'মানবতা' বলতে পারে তার জন্য সরকারি কোনও নিয়মাবলী বা নির্দেশিকা আছে কিনা তা স্পষ্টভাবে জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে সবাই বলেন যে এভাবে নতুন ধর্ম তৈরি করা সম্ভব নয়। তারপর মানবতাবাদী সমিতি সরাসরি চিঠি পাঠায় জাতিসংঘের অফিসে। উত্তর আসে দেরি না করেই। জাতিসংঘ তাদের 'মানবিক ও ধর্মীয় অধিকার' সংক্রান্ত যাবতীয় বই ও কাগজপত্র পাঠিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়– '১৯৮১'-এর জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করেছে প্রতিটি মানুষের যে কোন ধর্মমত গ্রহণ ও চর্চা করার স্বাধীন অধিকার আছে। তারপরই এই আইনী লড়াইতে যৌথভাবে নেমে পড়ে ভারতের মানবতাবাদী সমিতি ও যুক্তিবাদী সমিতি। রাষ্ট্রসংঘকে চিঠি দিয়ে জানানো হয় যে ভারত জাতিসংঘের সদস্য দেশের অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মকে এখানে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। Humanism-কেও ধর্ম বলে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু যেহেতু জাতিসংঘ তার নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিয়েছে, আমরা জাতিসংঘের অন্তর্গত দেশ হিসাবে মনে করি মানবতা আমাদের ধর্ম হতে কোন বাধা নেই। এবং আইনীভাবে এই ধর্মমতকে গ্রহণ করার অধিকার ভারতের নাগরিকেরা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিদেশী দূতাবাসগুলিতেও। তারপর ভারতের মানবতাবাদী সমিতির সহায়তায় কোর্টে গিয়ে affidavit করে দলে দলে ছেলে- মেয়ে Humanism-কে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে (১৯৯৩ এর ১০ ডিসেম্বর)। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন : মানুষের ধর্ম মানবতা, সুমিতা পদ্মনাভন, দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম, পুনঃমুদ্রিত, মুক্তমনা (www.mukto-mona.com)

(৭) অলৌকিক নয়, লৌকিক, প্রথম খণ্ড, প্রবীর ঘোষ, দে'জ প্রকাশন।

(৮) "I criticized fundamentalists as well as religion in general. I don't find any difference between Islam and Islamic fundamentalists. I believe religion is the root, and from the root fundamentalism grows as a poisonous stem. If we remove fundamentalism and keep religion, then one day or another fundamentalism will grow

again. I need to say that because some liberals always defend Islam and blame fundamentalists for creating problems. But Islam itself oppresses women. Islam itself doesn't permit democracy and it violates human rights, One brave Woman vs. Religious Fundamentalism. An interview with Taslima Nasrin, Free inquiry magazine, Volume 19, Number 1, available on line http:/www.secularhumanism.org/libray/fi/nasrin191.html

(৯) কোরআন শরীফ (বঙ্গানুবাদ), মাওলানা খান মুহাম্মদ ইউসুফ আবদুল্লাহ, সোলেমানিয়া বুক হাউস।

(১০) প্রথম আলোর অক্টোবর ১৮, ২০০৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী খোদ বাংলাদেশেই ২৯টি কিংবা তারও বেশি জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : জামাতুল মুজাহিদিন, জাগ্রত মুসলিম জনতা, শাহাদাত-ই আল হিকমা, হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী, শহীদ নসুরুল্লাহ আল আরাফাত বিগ্রেড, হিজবুত তাওহিদ, জামায়াত-ই ইয়াহিয়া, আল তুরাত, আল হারাত আল ইসলামিয়া, জামায়াতুল ফালাইয়া তাওহিদি জনতা, বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট, জুম্মাতুল আল সাদাত, শাহাদাত-ই-নবুয়ত, আল্লাহর দল, জইশে মোস্তফা বাংলাদেশ, আল জিহাদ বাংলাদেশ, ওয়ারত ইসলামিক ফ্রন্ট, জামায়াত-আস-সাদাত, আল খিদমত, হরকত-এ ইসলাম আল জিহাদ, হিজবুল্লাহ ইসলামী সমাজ, মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল, ওয়ার্লড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ, জইশে মুহাম্মদ, তা আমীর উদদীন বাংলাদেশ, হিজবুল মাহাদী, আল ইসলাম মার্টায়ারস বিগ্রেড ও তানজীম। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময় নিষিদ্ধ করেছে চারটি আত্মস্বীকৃত ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনকে, এগুলো হল : শাহাদাত ই আল হিকমা (২০০৪) জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি ২০০৫), জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি ২০০৫) এবং হরকাতুল জিহাদ (২০০৫)। এর মধ্যে সম্প্রতি কয়েকটি দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

(১১) 'আমাদের সময়' পত্রিকার একটি খবরে (সেপ্টেম্বর ৯, ২০০৫) প্রকাশ ফরহাদ মজহার সাহেব প্রেসক্লাবে একটি আলোচনা সভায় বক্তব্য রেখেছেন যে, ১৭ আগস্টের বোমাহামলাকারীদের যদি সন্ত্রাসী বলা হয়, তবে নাকি ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধারাও সন্ত্রাসী; শুধু তাই নয়, 'বোমাবাজি সন্ত্রাস–জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক এই সমাবেশটিতে সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন বোমাবাজদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যদি 'অবৈধ' হয় তবে নাকি ৫২, ৬৬, ৬৯, ৭১-এর সকল আন্দোলনও সবই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। মজহার জেহাদ ও শ্রেণী সংগ্রামকে এক করে দেখেন, আর মার্ক্সিয় তত্ত্ব আউড়ে সেটাকে সময় সময় বৈধতা দিতে চেষ্টা করেন। এই প্রেসক্লাবের আলোচনা সভাতে মজহার সাহেব পরিষ্কার করেই বলেছেন, ১৭ই আগস্টের হামলাকারীরা নাকি 'তাদের মত করে সমাজটাকে বদলাতে চায়।' এতে নাকি দোষের কিছু নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিন লাদেনের প্রতি মজহার সাহেব

একটা সময় এতই গুণমুগ্ধ ছিলেন যে, তিনি 'চিন্তা' নামক একটা পত্রিকায় 'ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম' নামের প্রবন্ধের (ডিসেম্বর, ২০০১) সমাপ্তি টেনেছেন করাচীর 'উম্মত' নামক পত্রিকায় লাদেনের সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। চেগুয়েভারা, লেনিন, স্ট্যালিনের মত বিন-লাদেনকেও একই কাতারে ফেলে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে 'বিপ্লবী কমরেড' বানিয়ে ছেড়েছিলেন লাদেনকে!' 'প্রগতিশীল' এবং 'নিরপেক্ষ' মজহার বিশ্বাস করতেন না ৯/১১ এর বিধ্বংসী ঘটনায় লাদেন জড়িত থাকতে পারে। কারণ তার ধারণা হয়েছিল, 'মুসলমান হিসেবে তিনি মিথ্যা কথা বলেন না।' ফরহাদ মজহারকে নিয়ে আমার একটি লেখা 'ফরহাদ মজহারের বিভ্রান্তি' শিরোনামে দৈনিক ভোরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। প্রবন্ধটি মুক্তমনা (www.mukto-mona.com) ওয়েবসাইটে রাখা আছে।

(১২) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে (১ম ও ২য় পর্ব), অনন্ত, মুক্ত-মনায় প্রকাশিত। এছাড়া আরও পড়ুন অলস দিনের ভাবনা, অভিজিৎ রায়, মুক্ত-মনা। The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity, by Tariq Ali, Verso; Pbk edition (April, 2003); Rogue State: A Guide to the World's Only Superpower by William Blum, Common Courage Press (May, 2000);

(১৩) দেখুন : http:/www.usccr.gov/pubs/tragedy/imm1012/zogby3.htm

(১৪) দেখুন : The results of the Chiristians vs atheists in prison investigation, By Rod Swift, http:/holysmoke.org/icr-pri.htm

(১৫) ধর্মের উৎস সন্ধানে (নিয়ান্ডার্থাল থেকে নাস্তিক), ভবানীপ্রসাদ সাহু, প্রবাহ, জানুয়ারি ১৯৯২

(১৬) বিস্তারিত তথ্যের জন্য পড়ুন : মুক্ত-মনা কারা? অভিজিৎ রায়,
Response to Manosh on Criticism of Islam etc in Mukto-Mona by Avijit Roy; Hoax of "Constructive Criticism" by Avijit Roy
http:/www.mukto-mona.com/articles/avijit/index.htm

(১৭) The Holy Quran, Translation by Adbullah Yusuf Ali, Goodwords Books 2001.

(১৮) অবশেষে হরকাতুল জিহাদ নিষিদ্ধ, প্রথম আলো রিপোর্ট; ১৮ই অক্টোবর, ২০০৫।

(১৯) TERRORIST AND INSURGENT ORGANIZATIONS, Air University Library Publication,

(২০) My Religion, by Avijit Roy, http:/humanists.net/avijit/article/my-religion-avijit.htm

(২১) বাল্মীকি রামায়ণ, হেমচন্দ্র অনুদিত, রিপ্লিকেট পাবলিকেশন, কলিকাতা ১৯৮৪, পৃঃ ১০৬৭-৭১

(২২) মহাকাব্যগুলোতে প্রভাব বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন : মহাকাব্য ও মৌলবাদ, জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায়, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা। এবং Laws of Manu, translated with extracts from seven commentaries by G. Buhler, ed. F Max Muller, Clarendon Press, Oxford, 1886.

(২৩) হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, সুকুমারী ভট্টাচার্য, দীপ প্রকাশন, ২০০০।

(২৪) মহাকাব্য ও মৌলবাদ, জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায়, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা।

(২৫) সতীঃ একের আনলে বহুরে আহুতি, ভাস্বতী চক্রবর্তী, দেশ ৪ জানুয়ারি, ২০০৩।

(২৬) সত্যি কথা বলতে কি– আমি আসলে বিন-লাদেন, মুফতি হান্নান, বাংলাভাই, মোল্লা ওমর, খোমেনি বা মৌলানা মান্নানের মত লোকদের তেমন একটা দোষ দেই না; অন্তত তারা কথায় আর কাজে এক। আল্লাহ কোরানে যেভাবে যেভাবে বলেছেন, ঠিক সেভাবেই কোরানের আদর্শকে সামনে রেখে তারা কাজ করে চলেছেন। আমি আসলে দোষ দেই 'শিক্ষিত' এবং 'মডারেট' তকমাধারী (বক) ধার্মিকদের যারা কোরানের মধ্যে সহিষ্ণুতা খুঁজে পান আর চারিদিকে এত অশান্তি দেখেও 'ইসলাম শান্তির ধর্ম' বলতে বলতে মুখে ফ্যানা তুলে ফেলেন। ঠিক একই ব্যাপার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের জন্যও খাটে যারা রামের শাসনামলে শূদ্র তাপস শম্বুক কিংবা রামপত্নী সীতার কি করুণ অবস্থা হয়েছিল তা না জেনেই 'রাম রাজ্য' প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন, অথবা বেদ, গীতা, উপনিষদ মনুসিংহিতায় কি আছে তা না জেনেই হিন্দু ধর্মকে সহিষ্ণুতম ধর্ম হিসেবে আখ্যা দিয়ে বসেন, আর মারামারি হানাহানি আর সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির জন্য দায়ি করেন কেবল গুটিকয় আদভানী আর লালু প্রসাদকে।

(২৭) দেখুন : see "Do Our Values Come from God?, The Evidence Says No". Victor stinger, http:/www.colorado.edu/philosophy/vstinger/Godless/Values.htm অলৌকিক নয়, লৌকিক, তৃতীয় খণ্ড, প্রবীর ঘোষ, দে'জ প্রকাশনী, পৃঃ ৩৯।

(২৯) নাস্তিক হওয়ার অপরাধে, ভবানী প্রসাদ সাহু, দীপ প্রকাশন, ২০০০।

(৩০) পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, ২০০০।

(৩১) 'Do not think that I have come to send peace on earth: I have not come to send peace, but a sword. For I have come to set a man at

against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in law' (Matthew 10:34-37 RSV)-এর বঙ্গানুবাদ।

(৩২) The Science of Good & Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share and Follow the Golden Rule, Michael Shermer, New York: Times Boojs, 2004.

ধর্মের উপযোগিতা : জনৈক বিবর্তনবাদীর দৃষ্টিতে

ড. রিচার্ড ডকিন্স
অনুবাদ : বন্যা আহমেদ ও জাহেদ আহমদ

আমাদের চারপাশে ধর্মচর্চার নামে কি অপরিসীম অপচয়ই না করা হয়– একজন ডারউইনবিদ হিসেবে ধর্মের এই লাগামহীন অপব্যয়িতার দিকটি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। প্রকৃতি অত্যন্ত মিতব্যয়ী, সে প্রতিটি মুহূর্তের, প্রতিটি পাই পয়সার হিসেব রাখে, নগণ্য অপচয়কেও ছেড়ে দেয় না। কোন বন্য প্রাণী যদি তার স্বভাবগত কারণে অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) ঠিকই তার থেকে যোগ্যতর কোন প্রতিবন্ধীকে বেছে নেয় যে বংশবৃদ্ধি এবং টিকে থাকার কাজকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রকৃতি অর্থহীন বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেয় না। যদিও এত স্পষ্টভাবে আমরা সবসময় তা দেখতে পাই না, প্রকৃতি কিন্তু তার এই নির্মম গতিতেই এগিয়ে চলে।

কিছু পাখি আছে যারা পিঁপড়ার বাসায় পাখা ডুবিয়ে দিয়ে স্নান (anting) করে– দেখলে মনে হবে যেনো পিঁপড়েগুলোকে দিয়ে তারা তাদের পাখা আক্রমণ করাচ্ছে। হয়তো বা এর পিছনে পাখা থেকে জীবাণু ঝেড়ে ফেলার মত কোন স্বাস্থ্যগত কারণ রয়েছে। কিন্তু, এই ধরণের কাজের আদৌ কোন উপকারিতা আছে কিনা সে সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত নয়। তবে এ ধরনের অনিশ্চয়তা একজন ডারউইনবিদকে এসব কর্মকাণ্ডের পিছনে কোন ভালো কারণ থাকতেও পারে– তা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত করতে পারে না।

মানুষ নামের দ্বিপদী জীবরা ধর্মচর্চার পিছনে প্রচুর সময় ব্যয় করে, ব্যয় করে প্রচুর সম্পদও। মধ্যযুগের শত শত বছর ধরে অসংখ্য মানুষের শ্রমের বিনিময়ে চার্চগুলো নির্মিত হয়েছে। মধ্যযুগ এবং রেনেসাঁর সময়কার অধিকাংশ মেধাই ব্যয়িত হয়েছে পবিত্র ধর্মীয় সঙ্গীত এবং চিত্রকল্প রচনায়। খুবই কাছাকাছি আরেকটি ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের অপরাধে হাজার হাজার– এমনকি লাখ

লাখ মানুষকে অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে, মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে; ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তাদের দেবতাদের জন্য প্রাণ দিয়েছে, হত্যা করেছে, উপবাস করেছে, চিরকুমারত্ব বরণ করেছে, এমনকি সমাজচ্যুতও হয়েছে।

বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ ব্যবস্থাই নেই যেখানে কোন না কোন ধরনের সময় এবং অর্থ অপচয়ী, বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী, বংশবৃদ্ধিরোধকারী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখা যায় না। এ বিষয়টি ডারউইনবাদে বিশ্বাসী যে কারও জন্য একটা বড় রকমের ধাঁধার মত। আমরা যেভাবে পাখীদের অন্টিং-এর উদ্দেশ্যটা অনুমান করেছি, ধর্মও কি ডারউইনবাদীদের সামনে একই ধরনের চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে না– যার অনুরূপ একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া আজ খুবই প্রয়োজন? আমরা কেন প্রার্থনা করি, কেনই বা আমরা এত জাঁকজমকপূর্ণ ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করে আমাদের সারাটা জীবনই উৎসর্গ করে দিই?

ধর্মীয় আচরণ তখনি ডারউইনবাদের মাথাব্যাথা হয়ে দাঁড়ায় যখন তা অদ্ভুত কোন ব্যতিক্রম না হয়ে বহুলভাবে স্বীকৃত একটি ব্যাপারে পরিণত হয়। আপাতদৃষ্টিতে, ধর্ম সার্বজনীন, এবং শুধুমাত্র বিভিন্ন সমাজে এর বিভিন্ন রূপ আছে বলেই সমস্যাটা আপনাাপনি দূর হয়ে যাবে না। ভাষার মতই ধর্ম মূলত সার্বজনীন এবং অঞ্চলভেদে এই বিশ্বাসের তারতম্যও অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়। এই প্রবন্ধের বেশিরভাগ পাঠকই স্বীকার করবেন যে আমাদের মধ্যে সবাই ধার্মিক নন। কিন্তু তারপরও ধর্ম মানব সমাজে সর্বজনস্বীকৃত: পোশাক পরিধানের কিংবা খাবার পরিবেশনের রীতির মতই প্রত্যেকটি সমাজে বিশেষ ধর্মীয় রীতিও প্রচলিত রয়েছে; এমন কি যারা ধর্মচর্চা করেন না, তারাও সেটাকে সামাজিক নিয়ম হিসেবেই মেনে চলেন। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, আসলেই ধর্ম ঠিক কী কাজে লাগে?

ধর্মীয় বিশ্বাস যে মানুষকে টানা-পীড়ন সম্পর্কিত অসুখ (stress-related diseases) থেকে মুক্তি দিতে পারে– এই ধারণাটির পিছনে তেমন কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা সত্যি হলেও আমাদের অবাক হওয়ার মত কিছু থাকবে না। ডাক্তারদের চিকিৎসার একটা লক্ষ্যণীয় অংশই হচ্ছে সান্ত্বনা এবং আশ্বাস প্রদান। আমার ডাক্তার মাথায় হাত বুলিয়ে চিকিৎসা করেন না, কিন্তু অনেক সময়ই মনে হয় যে, তার স্টেথোস্কোপ পরা বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার আশ্বাসবাণী শুনেই আমার ছোটখাটো অনেক অসুখ ভাল হয়ে গিয়েছে। রোগীর মন রক্ষার জন্য মিথ্যা ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারটি (Placebo effect) সবাই জানেন। অনেক সময় ওষুধীয় গুণাবলীহীন এসব নকল বড়ি (dummy pills) খেয়েই দেখা যায় রোগীরা ভাল হয়ে যায়। সে জন্যই নতুন ওষুধের ট্রায়ালের সময় প্ল্যাসিবো ব্যবহার করা হয়। প্ল্যাসিবোর মত হোমিওপ্যাথি ওষুধেও রোগ সেরে উঠতে দেখা যায়, অথচ

হোমিওপ্যাথি ওষুধ তৈরি করার সময় এগুলোকে এতই তরল করে ফেলা হয় যে তাতে রোগ সারানোর কোন উপাদানই আর অবশিষ্ট থাকে না।

ধর্মও কি, প্ল্যাসিবোর মতই, মনের পীড়ন কমিয়ে মানুষের আয়ু বাড়িয়ে তোলে? হয়তো করে, কিন্তু তত্ত্বটিকে সংশয়বাদীদের সাথে পরীক্ষায় উপনীত হতে হবে যারা মনে করেন অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম অশান্তি তো কমায়ই না বরং বাড়িয়ে তোলে। আমার মতে ধর্মের মত একটি বিশাল এবং সার্বজনীন বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য এটি একটি অত্যন্ত দুর্বল তত্ত্ব। আমাদের পূর্বসুরীদের মনের অশান্তি কমিয়ে তাদেরকে দীর্ঘজীবী করার মাধ্যমে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিলো বলে আমি মনে করি না। এই ধরনের থিওরী ধর্মের মত এতো বড় একটি ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করার জন্য আদৌ যথেষ্ট নয়।

অন্যান্য তত্ত্বগুলো এ সম্পর্কিত ডারউইনীয় ব্যাখ্যা সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিফহাল নয় বলে মনে হয়। উদাহরণ হিসেবে নিচের কথাগুলি বিবেচনা করা যাক। 'ধর্ম মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটায় এবং মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থানের বিষয়টি তুলে ধরে', কিংবা 'ধর্ম সান্ত্বনাদায়ক। মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় এবং ধর্ম আমাদের আশ্বস্ত করে আমরা অমর থাকবো।' এ সমস্ত কথায় মনস্তাত্ত্বিক সত্য থাকতে পারে, কিন্তু এগুলি কখনোই ডারউইনীয় ব্যাখ্যা হতে পারে না। এ কথাটিই স্টিভেন পিংকার উল্লেখ করেছেন তার মন কী ভাবে কাজ করে' (How the Mind Works, Penguin, ১৯৯৭) বইতে :

> '... এটি কেবল প্রশ্নেরই জন্ম দেয় যে, মন কেন এমনভাবে বিকশিত হবে যেখানে তাকে স্পষ্ট মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। বরফ শীতল পরিবেশে একজন মানুষ মনে মনে 'আমি উষ্ণতায় আছি' ভাবলেই আরাম পাবে না; তেমনি সিংহের মুখোমুখি একজন মানুষ সিংহকে খরগোস কল্পনা করলেই তার মনের সমস্ত ভীতি দূর হয়ে যাবে না।' (পৃষ্ঠা ৫৫৫)।

মৃত্যু-ভয় সম্পর্কিত ডারউইনীয় তত্ত্বের স্বরূপটি হওয়া উচিত এরকম : 'পরকালে বিশ্বাসের ব্যাপারটি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে যখনই একে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়।' এ বিষয়টি সত্য, কিংবা মিথ্যা হতে পারে। অথবা হতে পারে– এটি মানসিক চাপ এবং রোগীর মন রাখার জন্য মিথ্যা ওষুধ সম্পর্কিত আরেকটি তত্ত্ব- কিন্তু আমি সে বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যায় এখন যাচ্ছি না। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে, একজন ডারউইনবিদের সবসময় এ ভাবেই প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত।

কোন কোন মানুষ বিশ্বাসের সাথে একমত পোষণ করেন এবং কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেন– এমন সব মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্য কেবল মাত্র তাৎক্ষণিক, কোন চূড়ান্ত ব্যাখ্যা নয়। একজন ডারউইনবিদ হিসেবে আমি চূড়ান্ত প্রশ্নগুলির ব্যাপারেই আগ্রহী।

ডারউইনবিদদের কাছে তাৎক্ষণিক আর চূড়ান্তের পার্থক্যের ব্যাপারটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাৎক্ষণিক প্রশ্নগুলি আমাদেরকে শরীরবিদ্যা (Physiology) আর মস্তিষ্ক প্রভৃতি অঙ্গের দিকে ধাবিত করে। তাৎক্ষণিক উত্তরে ভুল কিছু নেই, এগুলি গুরুত্বপূর্ণ, এবং বৈজ্ঞানিক।

কিন্তু আমার কাছে আগ্রহের বিষয় হচ্ছে ডারউইনীয় চূড়ান্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারটি। বিজ্ঞানীরা যদি কখনো মস্তিষ্কে 'সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্র' নামক কোন কিছুর আদৌ সন্ধান পান, আমার মত ডারউইনবিদের কাছে তখন জিজ্ঞাসার বিষয় হবে: 'সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্র'টি কেন বিকশিত হয়েছে। কেন আমাদের সেই সমস্ত পূর্ব পুরুষ যারা বংশগত নীতির (genetic) বদৌলতে 'সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্র' পেয়েছে, তারা কেন টিকে থাকতে পেরেছে তাদের প্রতিপক্ষের তুলনায়, যাদের মস্তিষ্কে 'সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্র' বিকশিত হয়নি? চূড়ান্ত ডারইনীয় প্রশ্নগুলি কিন্তু মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের তাৎক্ষণিক প্রশ্নের তুলনায় বেশি ভাল, গভীর কিংবা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তবুও আমি এখানে এই প্রশ্নগুলিই আলোচনা করছি। কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, চূড়ান্ত ব্যাখ্যার বিষয়টি আসলে দলগত বাছাই তত্ত্বেরও (Group selection theories) অন্য রূপ। দলগত নির্বাচন একটি বিতর্কিত ধারণা যেখানে বলা হয় ডারউইনীয় তত্ত্ব অনুযায়ী দেখা যায় এটি গোষ্ঠীর মধ্যকার ব্যক্তি পর্যায় থেকে বাছাই করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্ববিদ (anthropologist) কলিন রেনফ্রিউ ধারণা করেন যে, খ্রিষ্টান ধর্ম টিকে থেকেছে একধরনের দলগত বাছাইয়ের মাধ্যমে কারণ তারা নিজেদের মধ্যে বিশ্বস্ততা এবং ভ্রাতৃত্বশীল ভালবাসার বিষয়টি লালন করে। আমেরিকান বিবর্তনবাদী ডেভিড স্লওয়ানও একই রকম তত্ত্বে বিশ্বাসী।

দলগত বাছাই তত্ত্ব ধর্মের ক্ষেত্রেও যে কাজ করতে পারে সেটির একটি কাল্পনিক উদাহরণ দিচ্ছি। ধরা যাক, একটি উপজাতি অত্যন্ত পরাক্রমশালী যুদ্ধের দেবতা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। পাশাপাশি আরেকটি উপজাতি শান্তি ও পরমসহিষ্ণুতার দেবতায় কিংবা তাদের আদৌ কোন দেবতা বা ঈশ্বর নেই। প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে যে সব যোদ্ধারা বিশ্বাস করেছে যে যুদ্ধে 'শহীদ' হলে তারা সরাসরি স্বর্গে পৌঁছে যাবে, তারা বেশি সাহসিকতা ও মনোবলের সাথে যুদ্ধ করবে এবং নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে না। কাজেই এমন একটি উপজাতির আন্তঃগোত্রীয় বাছাইয়ে টিকে থাকার সম্ভাবনা অধিক; তারা তখন পরাজিত উপজাতির গবাদি পশু ছিনিয়ে নেবে, তাদের স্ত্রীলোকদের লুট করে উপপত্নীতে পরিণত করবে। এইরকম উপজাতি ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধি করতে থাকবে, একই বৈশিষ্ট সম্পন্ন নতুন জাতির জন্ম দেবে যারা সেই একই যুদ্ধবাজ দেবতা, বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী। এখানে পাঠকের খেয়াল রাখা

উচিত- আমি যা বলছি সেটি কিন্তু 'যুদ্ধ বাজ ধর্ম টিকে থাকে' বলার চাইতে আলাদা। অবশ্যই সেটি টিকে থাকবে, কিন্তু এখানে আসল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে– গোত্র যারা যুদ্ধের দেবতায় বিশ্বাসী তারাই টিকে থাকে।

দলগত বাছাই তত্ত্ব নিয়ে জোরালো আপত্তি রয়েছে। সেগুলো সব খণ্ডানো এই প্রবন্ধের পরিধির বাইরে। গাণিতিক মডেল প্রমাণ করেছে যে, বিশেষ কিছু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দলগত বাছাই তত্ত্ব কাজ করতে পারে। বলাবাহুল্য, উপজাতির গোত্রের ক্ষেত্রে ধর্ম সেই বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কাজ করেছে। এটি একটি অত্যন্ত মজাদার তত্ত্ব কিন্তু এখানে আমি এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনায় যাব না।

ধর্ম কি কোন সাম্প্রতিক ব্যাপার? আমাদের জিন (বংশগতি উপাদানের একক) বেশিরভাগ প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেলার পর কি এর উদ্ভব হয়েছে? ধর্মের সর্বব্যাপিতা এই তত্ত্বের যেকোন সরলীকরণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তথাপি, এটির একটি বড় দিক রয়েছে যেটি আমি এখানে তুলে ধরব। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দলগত বাছাই বা নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে বৈশিষ্ট্যগুলি স্থান করে নিয়েছিল সেটি প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম নয়। এর অনন্য উপকারিতা ছিল, এটি ঘটনাক্রমে আজকে আমাদের সামনে ধর্মীয় আচরণ হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। ধর্মীয় আচার-আচরণের ব্যাপারটি কেবল তখনি আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে যখন, আমরা প্রশ্নটিকে অন্যভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হব।

মুরগী এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হতে পারে। সবল মুরগীদের দুর্বল মুরগীকে ঠোকরানোর ব্যাপারটি ('Pecking order') অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। এই 'দলগত প্রভাবশালীতা'র (dominance hiearchy') ধারণাটি প্রথম মুরগীদের মধ্যেই আবিস্কৃত হয়েছিল। প্রতিটি মুরগী শিখে নেয় কোনটিকে সে লড়াইয়ে হারাতে পারবে এবং কোনটি তাকে হারানোর ক্ষমতা রাখে। যে দলে এই 'প্রভাবশালীতা' সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে সেখানে প্রকাশ্য লড়াই দেখা যায় না বললেই চলে। এরকম গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত পাকাপোক্তভাবে আসনগাড়া মুরগীরা, ঘন ঘন দল বদল করা অন্যান্য দুর্বল মুরগীদের চাইতে বেশি ডিম পাড়ে। এ ব্যাপারটিতে দলগত প্রভাবশালীতার উদাহরণ দেখা যায়; কিন্তু এটি কোন আদর্শ ডারউইনবাদ নয়; কারণ, এটি একটি দলগত ব্যাপার। দলগত উৎপাদনশীলতার ব্যাপারটি হয়তো কৃষকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু অস্বাভাবিক কোন ব্যতিক্রম ছাড়া প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের ক্ষেত্রে এর কোন উপযোগিতা নেই বললেই চলে। 'দলগত প্রভাবশালীতা' তত্ত্বটি টিকে থাকার সংগ্রামে কতটুকু মূল্যবান?'– একজন ডারউইনবিদের কাছে এ প্রশ্নের কোন গুরুত্ব নেই। এক্ষেত্রে সঠিক প্রশ্নটি হওয়া উচিত : 'ব্যক্তি পর্যায়ে শক্তিশালী মুরগীর বিরুদ্ধাচারণ করে টিকে থাকার সংগ্রামের মূল্য কতটুকু, কিংবা অপেক্ষাকৃত দুর্বল মুরগীদের থেকে আলাদা হয়ে না থাকার

ক্ষতি তাকে কতটুকু পোষাতে হয়?' ডারউইনবাদে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলিকে এমনভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যেখানে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা (genetic variations) দেখা যায়। এখানে আলাদা আলাদাভাবে এক একটি মুরগীর মারমুখী প্রবণতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রত্যেকটি মুরগীর মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা আছে। কিন্তু দলগত প্রভাবশালীতার ক্ষেত্রে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা (genetic variations) বিষয়টি অবান্তর, কেননা দলের কোন বংশানুগতি (gene) নেই। তা আছে কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে।

উপরের উদাহরণ দিয়ে আমি এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে, ধর্মও দলগত প্রভাবশীলতার মত একটি বিষয় হতে পারে। 'টিকে থাকার সংগ্রামে ধর্মের ভূমিকা কতটুকু' এই প্রশ্নটিই হয়ত ভুল। আমার মতে সঠিক প্রশ্নটি হওয়া উচিত : 'ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষের মধ্যে যেসব ব্যবহার বা মনস্তাত্ত্বিক আচরণ লক্ষ্য করা যায়– সেগুলিকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমরা ধর্ম বলি; টিকে থাকার সংগ্রামে এগুলির গুরুত্ব কতটুকু?' সঠিক উত্তর খোঁজার আগে আসলে প্রশ্নটিকে সঠিকভাবে দাঁড় করানো খুবই জরুরি। ডারউইনবিদদের মধ্যে যারা কেবল ধর্মের টিকে থাকার কারণ খোঁজার মধ্যেই ব্যস্ত রয়েছেন, তারা আসলে ভুল প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। এর বদলে বরং আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকে চলে আসা এমন কিছু বিবর্তনশীল বিষয় নিয়ে ভাবা উচিত যেগুলো তাদের সময় ধর্ম হিসেবে বিবেচিত না হলেও পরবর্তীতে সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় উপাদান হিসেবে খুঁটি গেড়ে বসেছে।

আমি এই প্রবন্ধে মুরগীদের ঠোকরানোর ধারা নিয়ে কিছু উদাহরণ হাজির করেছি। আসলে এ ব্যাপারটি আমার থিসিসের একেবারে মূল বিষয়; তাই একই বিষয়ে আরেকটি উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না বলে পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। মথ যখন দলবদ্ধভাবে প্রজ্জ্বলিত আগুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, এটাকে কেউ স্রেফ দুর্ঘটনা বলে মনে করেন না। দেখলে মনে হবে তারা যেন উড়তে উড়তে আগুনে আত্মাহুতি দিচ্ছে। এটাকে আমরা মথদের 'আত্মবিনাশী আচরণ' হিসেবে গণ্য করতে পারি আর বিস্মিত হতে পারি এই ভেবে যে ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন কীভাবে এমন একটি আত্মবিনাশী কাজকে সমর্থন করতে পারে! আমার কথা হচ্ছে এই সমস্যাটি থেকে একটা বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর আশা করার আগে প্রশ্নটিকে বরং ঘুরিয়ে নতুন করে লেখা উচিত। এটা মোটেও আত্মাহুতি নয়। আসলে অনভিপ্রেত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ফলাফল হিসেবেই আমরা এই আপাতঃ আত্মাহুতির ব্যাপারটি দেখে থাকি।

কৃত্রিম আলোগুলো আমাদের রাতের দৃশ্যপটে অতি সাম্প্রতিক সংযোজন। এর আগে রাতের আলো বলতে শুধু চাঁদ আর তারার আলোই বোঝাতো। আলোর

এই উৎসগুলো প্রায় অসীম দূরত্বে থাকার কারণে এদের কাছ থেকে আলো এসে পৌঁছায় সমান্তরাল পথে, ফলে তৈরি হয় এক আদর্শ দিকদর্শন যন্ত্র। আকাশের এই আলোক উৎসগুলোকে পতঙ্গরা সরল পথে চলবার জন্য ব্যবহার করে থাকে। পতঙ্গদের স্নায়ুতন্ত্রগুলো একটি সরল নিয়ম অনুসরণ করে অভিযোজিত হয়েছে– 'এমনভাবে পথ চলে যেন, আলো এসে তোমার চোখে ৩০ ডিগ্রি কোণে আঘাত করে।' যেহেতু পতঙ্গদের চোখগুলো যৌগিক (পুঞ্জাক্ষি), এই ব্যাপারটা একটা বিশেষ ধরনের ওমাটিডিয়ামের (পুঞ্জাক্ষির কেন্দ্রে এক ধরনের বিশেষ টিউব) জন্য খুবই সহায়ক।

কিন্তু এই আলোক দিকদর্শন যন্ত্রটি আলোর উৎস্যগুলোর অসীম দূরত্বে থাকার উপর খুব গভীরভাবে নির্ভরশীল। যদি তা না থাকে, তবে আলোক রশ্মিগুলো সমান্ত রাল রইবে না, বরং অনেকটা সাইকেলের চাকার স্পোকগুলোর মত ছড়িয়ে যাবে। যে স্নায়ুতন্ত্র ওই ত্রিশ ডিগ্রির সাধারণ নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সেটি মথকে একটি লগারিদমিক সর্পিল পথে ঠেলে আগুনের শিখার উপর নিয়ে ফেলবে। শ'য়ে শ'য়ে মথ যখন প্রতিদিন চাঁদ বা তারা বা দূরের শহরের আলোর উপর নির্ভর করে নিখুঁতভাবে দিক নির্ণয় করে চলতে থাকে তখন আমরা তা আর খেয়াল করি না। আমরা শুধু দেখি মথগুলো আগুনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আর তা দেখে আমরা ভুল প্রশ্ন করে যেতে থাকি– ' কেন মথগুলি আত্মাহুতি দিয়ে চলেছে?'

এই শিক্ষাগুলোকে মানুষের ধর্মীয় ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। অসংখ্য মানুষ, এমনকি কোন কোন জায়গায় শতকরা একশজন মানুষ, এমন সব বিশ্বাস পোষণ করে যা শুধু বৈজ্ঞানিকভাবে অপ্রমাণযোগ্য তথ্যেরই পরিপন্থি নয়, আরেকটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের সাথে তার বিরোধিতাও অত্যন্ত প্রকট। তারা শুধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসই করে না, এর পিছনে প্রচুর সময় এবং অর্থ ব্যয় করে, জীবন দান করে, এমনকি হত্যাও করে। আমরা অনেকে তা দেখে বিস্মিত হই যেমন হই মথের আত্মবলি দেওয়া দেখে। আমরা ভাবতে থাকি, 'কেন?' কিন্তু আমার মতে আমরা এক্ষেত্রেও ভুল প্রশ্ন করছি।

মনে হতে পারে, আজকে আমরা যেসব ধর্মীয় আচরণ দেখি তা নিতান্তই কোন এক সময়ের মানুষের কোন এক মানসিক প্রবণতার দুর্ভাগ্যজনক অভিব্যক্তি, কিন্তু হয়তো সেই সময়ে এর কোন উপযোগিতা ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে এই মানসিক প্রয়োজনটি কি হতে পারে এ বিষয়ে আমি একটি প্রস্তাব দিতে চাই, কিন্তু প্রস্তাবটি দেওয়ার আগে পরিষ্কার করে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে এটি একটি উদাহরণ মাত্র। আমি মনে করি, এ বিষয়ে একটি বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে আমাদের সঠিক প্রশ্নটি খুঁজে বের করা অনেক বেশি জরুরি।

আমার এই সুনির্দিষ্ট প্রকল্পটি হচ্ছে শিশুদের নিয়ে। অন্য যে কোন প্রজাতির চেয়ে আমরা, টিকে থাকার জন্য, পূর্ববর্তী প্রজন্মের অভিজ্ঞতার উপর অনেক বেশি নির্ভর করে থাকি। তত্ত্বগতভাবে, শিশুরা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই শিখে নিতে পারে যে নদীতে কুমীর থাকলে সেখানে সাঁতার কাটতে হয় না। কিন্তু এটা ঠিক যে শিশুমস্তিষ্কে 'বড়রা যা বলে তা বিশ্বাস করো, পিতামাতার কথা শোন, মুরুব্বিরা যখন গুরু গম্ভীরভাবে কিছু বলে তা প্রশ্নকরা ছাড়াই মেনে চল'– এই ধরনের কিছু নিয়ম বাঁধা আছে বলে তা থেকে আমরা অনেক বাড়তি সুবিধাও পেয়ে থাকি।

ছোটবেলায় স্কুলের ধর্মযাজকের শিখানো সেই ভয়ংকর উপদেশটির কথা আমি কখনই ভুলব না। এটা আসলে ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়েছে পরবর্তীকালে : সে সময়ে ধর্মযাজক যেভাবে চেয়েছিলেন আমার শিশু-মস্তিষ্ক সেভাবেই উপদেশটি গ্রহণ করেছিলো। একদল সৈন্যের রেল লাইনের পাশে কুচকাওয়াজ করার একটি গল্প বলেছিলেন আমাদের। এক সময় তাদের নেতার দৃষ্টি অন্য কিছুতে আকর্ষিত হওয়ায় তিনি সৈন্যদেরকে থামার উপদেশ দিতে ভুলে যান। সৈন্যরা বিনাবাক্যে আদেশ মেনে নিতে এতই অভ্যস্ত ছিল যে, তারা মার্চ করতে করতে চলমান ট্রেনের মুখে গিয়ে পড়ে। যদিও এখন আমি গল্পটি আর বিশ্বাস করি না, কিন্তু নয় বছর বয়সে ঠিকই বিশ্বাস করেছিলাম। যাজকটি চেয়েছিলেন আমরা যেন সৈন্যদের এই প্রশ্নাতীতভাবে আদেশ মেনে চলার রীতিকে, তা যতই অযৌক্তিকই হোক না কেন, একটি আদর্শ হিসেবে মেনে নেই। এবং সত্যি কথা বলতে কি, আমরা সে সময়ে এটিকে একটি গুণ বলেই মনে করতাম। আমি তখন আসলেই ভাবতাম দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে চলন্ত ট্রেনের মুখে পড়ার সৎসাহস কোনদিনও আমার হবে কিনা।

সুশিক্ষিত সৈন্যদের মত কম্পিউটারকেও যা বলা হয় তারা তাই করে থাকে। Programming Language-এর মাধ্যমে তাদেরকে যা নির্দেশ দেওয়া হয় তারা আজ্ঞাবাহী গোলামের মতই তা পালন করতে থাকে। এদিকে কম্পিউটার আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক কাজ করে দেয়, অন্যদিকে এই আনুগত্যের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে খারাপ নির্দেশাবলীকেও সে একইভাবে পালন করতে থাকে। কোনটি ভালো নির্দেশ আর কোনটি খারাপ নির্দেশ কম্পিউটার তা বুঝতে পারে না। সৈন্যদের মত তারাও শুধু নির্দেশ পালন করে যায়।

এই প্রশ্নাতীত বাধ্যতার ফলেই কম্পিউটার ভাইরাসের শিকারে পরিণত হয়। খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা একটি প্রোগ্রাম যখন কম্পিউটারকে তার ভিতরে লিপিবদ্ধ সব ঠিকানার তালিকা পাঠাতে নির্দেশ দেয় তখন সে তো তা পালন করেই, অন্য সব কম্পিউটার যাদেরকে সে এই প্রোগ্রামটি পাঠায় তারাও কাজটি একের পর এক অনুগতভাবে সম্পাদন করতে থাকে। এভাবেই অত্যন্ত দ্রুত

গতিতে ভাইরাসগুলো ছড়িয়ে পড়ে। এমনভাবে কোন কম্পিউটার বানানো সম্ভব নয় যা আমাদের কাজের বেলায় অনুগত থাকবে কিন্তু ভাইরাসের সামনে দুর্বল হবে না।

আমার উপরের ব্যাখ্যা যদি বোধগম্য হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা ইতোমধ্যেই শিশুমস্তিষ্ক এবং ধর্মের মধ্যকার যোগসূত্রটি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) একটি শিশুর চিন্তাধারাকে এমনভাবেই তৈরি করে যাতে সে মা বাবা এবং গোত্রের মুরুব্বিদের কথা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে। এবং এই বিশেষ গুণটিই অবচেতনভাবে তাকে আবার মানসিক ভাইরাসের আক্রমণের শিকারে পরিণত করে। শিশুমস্তিষ্ক– ভালোভাবে বেঁচে থাকার পূর্ব শর্ত হিসেবে- বাবা মা এবং মুরুব্বিদের বিশ্বাস করতে বলে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই 'বিশ্বাসকারীর' পক্ষে ভাল উপদেশ এবং খারাপ উপদেশের মধ্যে পার্থক্য করার কোন উপায় থাকে না। শিশুর পক্ষে বুঝে নেওয়া অসম্ভব যে 'নদীতে সাঁতার কেটো না, কুমীল খেয়ে ফেলবে' একটি ভালো উপদেশ কিন্তু আবার 'পূর্ণিমার সময় ছাগল বলি না দিলে শস্যহানি ঘটবে' একটি খারাপ উপদেশ। দুটি উপদেশই তার কাছে একই রকম তাৎপর্যময়। দুটি উপদেশই এসেছে এমন এক বিশ্বাসী লোকের কাছ থেকে যাকে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করা শিরোধার্য।

পৃথিবী, মহাশূন্য, নৈতিকতা এবং মানব প্রকৃতি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আবার যখন এই শিশুটিই বড় হয়ে ওঠে, তার নিজের ছেলেমেয়ে হয়, সে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে আরও সুচারুভাবে এসব শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করে।

এই মডেল অনুযায়ী, আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ রকমের ভিত্তিহীন বিশ্বাসের ধারা পুরুষানুক্রমিক বিকশিত হতে থাকে। এই অযৌক্তিক বিশ্বাসগুলো হয় এলোপাতাড়িভাবে (random drift) ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে অথবা ডারউইনীয় নির্বাচনের মত কোন এক গতিতে বিকশিত হতে থাকে, এবং অবশেষে আমরা যে রূপটি দেখতে পাই তা তার আদি রূপ থেকে বিবর্তিত হতে হতে অনেকখানি বদলে গেছে। একইভাবে ভাষাও পর্যাপ্ত সময় এবং ভৌগোলিক ব্যবধানের কারণে তার মূল উৎস থেকে সরে যেতে যেতে লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। একই জিনিস দেখা যায় ধর্মের ক্ষেত্রেও, শিশুমস্তিষ্ককে সহজেই ছাঁচে ঢেলে বানানো যায় বলেই ধর্ম বংশ পরম্পরায় একজন থেকে আরেকজনের কাছে ক্রমাগতভাবে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে।

ডারউইনীয় নির্বাচন শিশুমস্তিষ্কে এমনভাবেই তৈরি করে যাতে তারা মুরুব্বিদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করে; চিন্তাধারাকে এমনভাবেই সংগঠিত করে যেন বাচ্চারা একদিকে অনুকরণ প্রবণ হতে, অন্যদিকে গুজব, রূপকথা এবং ধর্মে

বিশ্বাস করতে প্রবৃত্ত হয়। বংশগতিক নির্বাচনই (genetic selection) আমাদের মস্তিষ্ককে এভাবে তৈরি করেছে এবং এখান থেকেই non genetic (বংশগতনীতির অধীন নয় এরকম) এক ডারউইনীয় নির্বাচনের ভিত্তি তৈরি হবে। আমি মনে করি ধর্ম এমনি এক দলগত ঘটনা যাকে non genetic মহামারী এবং ডারউইনীয় নির্বাচনের সংমিশ্রণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। আমার এই প্রকল্প যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এমন কি তাদের জীনের জন্যও ধর্মের কোন ভূমিকা বা উপকারিতা নেই। এর যদি কোন উপকারিতা থেকেই থাকে তা মানুষের প্রয়োজনে নয়, তা শুধুই ধর্মের নিজের টিকে থাকার প্রয়োজনে।*

*ড. রিচার্ড ডকিন্সের এই প্রবন্ধটি ইংরেজিতে সর্বপ্রথম Free Inquary ম্যাগাজিনের ২৪ নম্বর ভল্যুমের ৫ নম্বর সংখ্যায় 'What Use is Religion?' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের অনুমতি সাপেক্ষে প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করা হল। বাংলা অনুবাদের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে মুক্তমনা (www.mukto-mona.com) কর্তৃক সংরক্ষিত।

ধর্মনিরপেক্ষতা

সনৎ কুমার সাহা

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে কিছু বলা আমার পক্ষে সংগত কিনা এ প্রশ্ন আমাকে বিব্রত করে। ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রথাবদ্ধ ধর্মেই আমার কোন আস্থা নেই, এবং প্রচলিত অর্থে ঈশ্বর আমার কাছে একটা ভ্রান্তি অথবা অবান্তর উপদ্রব বলে মনে হয়। এ অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্যের একপেশে হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আমি অস্বীকার করিনে। তবে এ বিষয়ে আমি সচেতন যে, আমার অস্তিত্ব উপেক্ষা করেই চারপাশের জনসমষ্টি আপন প্রবণতায় চলে, অথবা আপন ইচ্ছায় বসে থাকে। যদিও জনগণের ধর্ম বিমোচন এক কল্যাণকর অবস্থা বলে মানি, তবু বাস্তবে তার ব্যাপক সংগঠনে বিশ্বাসী হওয়া যে ক্যানিউটের সমুদ্র-শাসনে প্রয়াসী হওয়ার মতই নির্বোধ ও হাস্যকর তা আমার পছন্দসই না হলেও আমি স্বীকার না করে পারিনে। আর ধর্মনিরপেক্ষতা যতটা বিষয়ীনির্ভর, তার চেয়ে অনেক বেশি বিষয় নির্ভর বলেই আমি মনে করি।

কিন্তু বাস্তবে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যে কি বোঝায়, এ নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে অনেক। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে এক একটা মানে খাড়া করি এবং তাতেই ইচ্ছা হলে বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করি। একজনের ধারণা অন্যজনের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে। তবু যেহেতু বিষয়টি বিস্ফোরক এবং সমস্যাকে পাশ কাটানোর পথ প্রশস্ত ও সুবিধাজনক, তাই এ নিয়ে বিতর্কের ভিতরে না গিয়ে নানা রকম গোঁজামিলের জগাখিচুড়িকে মেনে নেওয়াই আমরা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি– ধর্মনিরপেক্ষতার অপব্যাখ্যা যদি আসর জাঁকিয়ে বসে, তবুও। সাচ্চা ঝুটা, সবরকম ধারণা-নিরপেক্ষ থাকা বোধহয় ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষণ নয়। কিন্তু এ কথা মানলেই আবার এক বিপজ্জনক অবস্থায় আমাদের পিছলে পড়ার সম্ভাবনা। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে বিপরীত ধারণার সহাবস্থান অযৌক্তিক হলে ধর্ম সম্পর্কে বিপরীত ধারণার সহাবস্থান যুক্তিসংগত হয় কি? দ্বিতীয়টিকে মানলে প্রথমটির

যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অধিকার আমাদের বিনষ্ট হয়। এবং তা হলে ধর্মনিরপেক্ষতার সঠিক মানে খোঁজা নিতান্তই অর্থহীন হয়ে পড়ে। তবু যেহেতু ধরে নিই, চিন্তায় নৈরাজ্য ও কর্মে বিশৃঙ্খলা সামগ্রিকভাবে গণজীবনে ক্ষতিকর, তাই ধর্মনিরপেক্ষতার একটা সংগত ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা অন্বেষণ একবারে অর্থহীন মনে হয় না।

এখানে অবশ্য একটা কথা বলা প্রয়োজন, ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি যে শুধু আমাদেরই তা নয়। ভারত গত পঁচিশ বছর ধরে ধর্মনিরপেক্ষতাকে তাদের অন্যতম রাষ্ট্রীয় নীতি বলে ঘোষণা করে আসছে। অথচ সেখানেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরে এ বিষয়ে ধারণা অস্বচ্ছই রয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী থেকে ধর্মকে বাদ দেওয়াই সংগত মনে করতেন, জাতীয় জীবনেও প্রথাবদ্ধ সব ধর্মের প্রতি উদাসীন থাকাই তাঁর কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হতো। অথচ সে দেশেই দার্শনিক রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণ ঘোষণা করেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, এবং Hindu view of life-এর কল্পিত ভাববাদী পূর্ণতায় তিনি আস্থাবান। সে দেশের সংবিধান ঈশ্বরবর্জিত; কিন্তু সংবিধানের রক্ষকদের অনেকেই জাতীয় পরিষদে শপথ নেন ঈশ্বরেরই নামে। পাশ্চাত্যের অনেক 'আলোকপ্রাপ্ত' দেশের রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধেও কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। ইংল্যান্ডের অধিপতি গীর্জারও রক্ষাকর্তা এবং প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়-বহির্ভূত কাউকে তার বিয়ে করার অধিকার রাজকীয় অনুশাসনে নিষিদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইবেল হাতে শপথ করে রাষ্ট্রীয় কার্যভার গ্রহণ করেন এবং জার্মানিতে অন্যতম শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের নাম ক্রিশ্চান ডিমোক্রেটিক পার্টি।

এসব দেখে শুনে আমাদের বিভ্রান্তি বাড়ে বই কমে না, প্রশ্ন ওঠে, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ কি তবে অন্যত্রও উপেক্ষিত? না কি ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে এমন কিছু বোঝায়, যাতে রাষ্ট্রীয় বিধানে বিশেষ ধর্মের প্রতি অথবা সাধারণভাবে ধর্ম বা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য কোন আপত্তিকর বিষয় বলে বিবেচিত হয় না।

একথা হয়ত আমরা ভুলে যাই যে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' একটা তৈরি করা প্রতিশব্দ। উক্তি ও উপলব্ধির গরমিলের সম্ভাবনা তাই একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইউরোপে সেকুলারিজম হঠাৎ একদিন দিনক্ষণ বেধে চালু করা হয়নি। জীবনের প্রয়োজনে তা ক্রমশ জীবনকে অঙ্গীকার করার প্রয়াস পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাই মানুষ সচেতনভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা না করেও ঐতিহ্য লালিত হয়ে ও অভ্যাসবশে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে পড়েন। যদিও এটাকে ইউরোপীয় জীবনের সার্বিক সত্য বলে ধরে নেওয়া ভুল হবে, তবুও সেখানে যে বাস্তব অবস্থা সমাজে সেক্যুলারিজম-এর প্রকাশ স্বাভাবিক ও অনিবার্য করেছে, তার প্রবণতা ও

প্রতিক্রিয়াতেই হয়ত তার অর্থ ধীরে ধীরে একটা স্পষ্টতর রূপ লাভ করে চলেছে। ধ্রুবক হিসেবে শব্দটির ব্যবহার তাই, মনে হয়, অসমীচীন ও বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে।

ইউরোপে মানুষের ধারণায় ও ক্রিয়াকলাপে সেক্যুলারিজম, নিশ্চিতভাবে রূপ পেতে থাকে রেনেসাঁর সময় থেকে। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই ইউরোপে আধুনিকতার সূত্রপাত। ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে কিছু মানুষ, মানুষ হিসেবে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেন। যদিও গীর্জাতন্ত্র ও স্কলাসটিক ধ্যানধারণা একেবারে উঠে যায় না, তবু সেই চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই মানবমুখী মনোভাব সেখানে আর ঠেকিয়ে রাখা সহজ হয় না। পেত্রার্ক ভাল্লা, দ্য ভিঞ্চি, সেক্সপীয়র এঁদের সবার চিন্তা ও কীর্তি সমকালীন খৃষ্ট ধর্মের নিরানন্দ জগতের ভিত্তিভূমিতে আঘাত হানে। দার্শনিক ব্রুনো ধর্মের পাণ্ডাদের হাতে বন্দি ও পরে নিহত হন; কিন্তু তার বাস্তববাদী দর্শন ধর্মীয় সংকীর্ণতার প্রাচীর ভেঙে ফেলে নতুন চিন্তার পথ উন্মুক্ত করে। কোন পারলৌকিক প্রত্যাশা নয়, জাগতিক সুখ-দুঃখের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাই নব যুগের চিন্তানায়কদের বেশি করে আকর্ষণ করে, তাদের চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

একটা বিষয় লক্ষণীয় এই রেনেসাঁ'র মানবমুক্তি প্রয়াস তৎকালীন গীর্জা কেন্দ্রিক ধর্মের গোঁড়ামিকে উপেক্ষা করেই পরিচালিত হয়। সেক্যুলারিজম বলতে এখানে তাই সব ধর্মের সহাবস্থান বোঝায় না। সে ধরনের সমস্যাকে সামনে রেখে রেনেসাঁর উদ্ভব ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদির দম বন্ধ করা পরিবেশ থেকে মানুষের চিন্তা ও কর্মকে মুক্তি দিয়ে জাগতিক সকল বিষয়ে তাকে উৎসাহিত করাতেই সেক্যুলারিজম-এর প্রকাশ নিশ্চিত হতে থাকে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, ধর্মীয় অনুশাসনে নয়, আপন আপন ঐশ্বর্যের বলেই তখন থেকে ইউরোপে দাঁড়াবার সুযোগ পায়।

অবশ্য এই রেনেসাঁ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যাপক সম্ভাবনার পথে সামন্তবাদ ও গীর্জার প্রভূত্ব বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ধর্মের সামাজিক চাহিদা পূরণের ক্ষমতা ভিতরে ভিতরে লুপ্ত হতে থাকে; –যদিও সব মানুষ সে সময়ে এ বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন থাকে না। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কাছে ধর্মকে প্রকৃত পক্ষে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করে তার বাইরের খোলসে যদিও ঠাট বজায় রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় আরো কিছুকাল।

তবে একথা অস্বীকার করা চলে না যে, রেনেঁসা সব মানুষের, এমন কি অধিক সংখ্যক মানুষেরও, আন্দোলন ছিলো না। ব্যক্তি ও সমাজ জীবন জটিল ও

বহুমাত্রিক। একই সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে তাদের অবস্থান সম্ভব। ইউরোপে রেনেসাঁ পর্বেও এই রকম চিন্তায় ও কর্মে নানা স্তর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তীব্র অন্তর্বিরোধ বর্তমান ছিলো। ধর্মের পাণ্ডাদের উৎপীড়ন থেকে রেহাই পাননি ব্রুনো অথবা গ্যালিলিও। এবং এই উৎপীড়নে সামগ্রিকভাবে সমাজের সমর্থন মোটেই অকিঞ্চিৎকর ছিল না। যে বতিচেল্লি রঙে রেখায় ধর্মবিমুক্ত শুদ্ধ সুন্দরের উপাসনা করেন, তিনিই পরিণতিতে ধর্মান্ধ সাভোনারোলার প্রবল চরিত্রের পদপ্রান্তে আপনাকে সমর্পণ করে নিশ্চিত হন। তবে যেটা উল্লেখযোগ্য তা হলো, কালের যাত্রার ধ্বনি অল্প সংখ্যক কিছু মানুষের কানে এক সময়ে বাজে, এবং আপন আপন সুবিশাল কীর্তি দিয়ে সেই যাত্রায় তারা প্রচণ্ড বেগ আনে। কালের যাত্রায় যা জ্বালানির কাজ করে, তা সমাজবহির্ভূত কোন অলৌকিক শক্তি নয়, তা স্বয়ম্ভুও নয়। আজকের ইউরোপ তার কাজে ও ভাবনায় সে সময়ের সব প্রবণতাকেই স্বীকার করে, যদিও সেক্যুলার ভাবনার প্রয়োগই ব্যক্তি ও সমাজজীবনে অনেক বেশি ব্যাপক।

একটা কথা এখানে বোধহয় অপ্রাসংগিক হবে না যে, প্রাক- রেনেসাঁ যুগে যে অঞ্চল সেক্যুলার জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিলো, তা ইউরোপ নয়, আরব ভূখণ্ড। ইবনে রুশদ, ইবনে সিনা, ইবনে খালদুন প্রমুখ মনীষীর মুক্ত চিন্তা, সে যুগেও গোঁড়া মোল্লাদের মনঃপুত হয়নি। বস্তুবাদে আস্থা জ্ঞাপন বা গোষ্ঠী চেতনায় ইতিহাসের পথ অন্বেষণ অবশ্যই ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপন্থী। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় রেনেসাঁর কোন কোন স্মরণীয় ব্যক্তির মত ওই আরব মনীষীদের অনেককে দুঃখ বরণ করতে হয়েছে। তবু এটা লক্ষ্যণীয় যে, মুক্ত চিন্তার একটা পরিবেশ মুসলিম ও অমুসলিম মনীষীদের চিন্তার বিনিময় ও তার সমৃদ্ধি সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলেছিল। ব্যাপক অর্থে মানবিক মূল্যবোধে আস্থা, সহনশীলতা ও জ্ঞানচর্চা সমাজের উন্নততর অংশে স্বীকৃত ও শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছিলো। কিন্তু সব পণ্ড করে দিলো ক্রুসেড। শত শত বছরের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মযুদ্ধ মুসলমানদের মুক্ত মানসিকতা প্রসারের আর সুযোগ দেয় না, জেহাদের তিক্ততা ও যুদ্ধের উন্মাদনা তাদের ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক করে তুলতে থাকে। নোতুন চিন্তার অবকাশ অথবা নোতুন করে সত্যান্বেষণের ইচ্ছা তাদের ধীরে ধীরে ক্ষয় পায়। ক্রুসেডের অবসানে তাই তারা হয়ে পড়ে জীর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য। তাদেরই জ্ঞানকে আহরণ করে রেনেসাঁর নায়করা যখন নতুন সম্ভাবনার পথে পা বাড়ান তখন আরব জগৎ ধর্মান্ধতার খোলস পরে অপরিসীম অহংকারে কূপমণ্ডূকতাকে আত্মরক্ষার পরম পথ বলে বেছে নেয়। ইতিহাসে 'যদি'র কোন স্থান নেই জানি, তবু ক্ষোভের সঙ্গে একটা কথা না ভেবে পারিনে, ক্রুসেডের সর্বনাশা দহন যদি ওভাবে না পোড়াতো, তবে রেনেসাঁ ও আনুষঙ্গিক সেক্যুলার চিন্তার প্রথম ফসল হয়ত ঘরে উঠতো আরব জগতেই, এবং তা ঘটতো ইউরোপীয় রেনেসাঁর কয়েকশ বছর আগেই।

যাই হোক, ইউরোপে ধর্মের খুঁটি থেকে মুক্তিতে যে আধুনিকতার শুরু, তা সামন্ততন্ত্রকে পঙ্গু করে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধনতন্ত্র ও শিল্প বিপ্লবের পথে, পরিশেষে সমাজবাদের দিকে ধাবিত হয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রাখতে ধর্মকেও পরিবর্তন মেনে নিতে হয়। মার্টিন লুথারের সংস্কার ও প্রোটেস্টান্ট মতবাদের অভ্যুদয় গীর্জার আধিপত্য ও পাণ্ডা পুরুতদের দৌরাত্ম্য বিশেষভাবে খর্ব করে। দলীয় চেতনার ধারক হিসেবে ধর্ম ক্রমেই গুরুত্ব হারাতে থাকে এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সামাজিক স্থিতিবিধানে এখনও প্রয়োজনীয় মনে হলেও উন্নয়নের নিয়ামক হিসেবে তাদের কেউ আর চিহ্নিত করেনা। অবশ্য এ থেকে এমন ধারণা করা অনুচিত যে মানুষ সেখানে ধর্মের আশ্রয়কে পুরোপুরি পরিত্যাগ করার জন্যে মনের দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও নিরীশ্বরবাদী হলবাক, যিনি ঘোষণা করেন, অজ্ঞানতা, ভয় ও প্রবঞ্চনা থেকে ধর্মের উদ্ভব তার সবচেয়ে বিখ্যাত বই ,The System of Nature বিচলিত সংস্কারবোধ ও অন্ধ আবেগতাড়িত জনসাধারণের যুক্তিহীন আক্রোশে খোলা রাস্তায় পোড়ানো হয়। সংস্কার ও প্রতিক্রিয়ার এই ধারা সমাজদেহে এখনও একেবার হীনবল নয়। তবে যা স্মর্তব্য, তা হলো আজকের মানুষের উন্নয়নস্পৃহা এই সংস্কার ও প্রতিক্রিয়ায় ব্যাহত হয়, স্বকালে লাঞ্ছিত সক্রেটিস, গ্যালিলিও অথবা হলবাকের মত মনীষীদের কীর্তিই আধুনিক মানুষের চিন্তার ভিত্তিভূমি রচনা করে।

সেক্যুলারিজম বহু শতাব্দী ধরে যেভাবে আচরিত ও রূপান্তরিত হয়ে আসছে, আজ 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে যদি তারই ঠিক বঙ্গানুবাদ বলে ধরে নিই, তবে শুধুমাত্র সব ধর্মের সহাবস্থানেই তার অর্থ পুরোপুরি ধরা পড়ে না। একথা সত্য যে ধর্মনিরপেক্ষতায়' তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়, ধর্ম থেকে চিন্তার মুক্তিতেই ধর্মনিরপেক্ষতা পূর্ণতা পায়।

যে দেশে একাধিক ধর্মের মানুষ একত্রে বসবাস করে, সেখানে রাষ্ট্রীয় বিধানে সর্বধর্মের সহাবস্থান মেনে নেওয়ায় হয়ত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা মেলে, কিন্তু তাতেই দেশের সব মানুষ চিন্তায় ও কর্মে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিসমূহ যদি গণ্ডি ছাড়াবার প্রেরণা না জোগায় তবে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের আপন আপন বৃত্তে একসঙ্গে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা সম্ভব ও স্বাভাবিক। বুদ্ধির মুক্তি তাতে ঘটে না এবং সাম্প্রদায়িকতার বিস্ফোরণ যে কোন সময়ে সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বীকৃতি আছে সত্য; কিন্তু তা থেকে এটা বলা চলে না যে সাম্প্রদায়িকতা সে দেশে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। ধর্মের গণ্ডি ভাঙার প্রবণতা এখনও সে দেশে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেনি এবং তা না হলে প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা দূরের জিনিসই রয়ে যাবে।

তবে প্রথাবদ্ধ, ধর্মশাসিত, গোষ্ঠী জীবনের সংস্কার যেখানে প্রবল, সেখানে সমাজকে উন্নত পর্যায়ে টেনে তোলায় ব্যক্তির দায়িত্ব কতটুকু? তার করণীয়ই বা কী? একক প্রচেষ্টায় ব্যক্তি সমাজকে কোন বিশেষ দিকে চালিত করতে পারে, এ ধারণা ভ্রান্ত। প্রগতিমুখী শক্তিগুলো যদি সমাজের ভেতরে গড়ে না ওঠে, এবং সমাজের মানুষ যদি সেই শক্তির প্রকাশকে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত থাকে, তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির আন্তরিক প্রয়াসও গণজীবনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্নই থাকে। আবার উল্টোদিকে এ কথাও সত্য যে, যে কোন প্রগতি আন্দোলনই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির পৃথক পৃথক, কিন্তু একাভিমুখী অথবা সংঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে রূপ পায়। আসল কথা হলো, সমাজের অভ্যন্তরে প্রগতির শক্তি ও লক্ষণগুলোকে ঠিকভাবে চেনা ও তাদের সঠিক প্রকাশে সহায়তা করা। তাৎক্ষণিক ফল না মিললেও পরিণতিতে তা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ইউরোপে রেনেসাঁর ক্ষেত্রে তা ঘটেছে। রেনেসাঁ পরবর্তী অনেক প্রগতি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাই। পথিকৃৎদের যে প্রায়ই দুর্ভোগ সইতে হয় মানবজীবনের ধারায় একথার সত্যতা বারে বারে মেলে। সমাজে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা যদি প্রবল হয় এবং প্রথাবদ্ধ ধর্ম যদি তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তবে দুঃখভোগের সম্ভাবনা থাকলেও অন্তত কিছু সংখ্যক ব্যক্তির ধর্মকে উপেক্ষা করার সৎসাহস থাকা চাই। সমাজে উন্নয়নের প্রয়োজন স্বীকৃত হলে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি সাধারণ মানুষের আক্রোশ দীর্ঘকাল স্থায়ী না হবারই সম্ভাবনা। সমাজ ব্যক্তিকে মূল্যবান মনে করতে পারে তখনই যখন প্রবহমান মানব ধারাকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে ব্যক্তিও যত্নবান হয়।

পরিশেষে একটি কথা বলে আমার বক্তব্যে সমাপ্তি টানি। প্রথাবদ্ধ কোন ধর্মেই আমার কোন আস্থা না থাকলেও আমার আপনজন যে কোন ধর্মে বিশ্বাসী হতে পারে। তার প্রতি আমার অনুরাগে তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।*

*অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করার পর সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধটি ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ধর্মনিরপেক্ষতা বই থেকে গৃহীত।

ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি

কাজী আবদুল ওদুদ

দেশ বিভক্ত হলো। এর ফলে ভারতবর্ষের পূর্বে ও পশ্চিমে মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন ভূখণ্ড লাভ হলো। এই স্বাধীন ভূখণ্ড মুসলমানরা কিভাবে শাসন করবে, কিভাবে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবে, আজ সেকথা বিশেষভাবে ভাবা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব পশ্চিম দুই অঞ্চলেই কথা উঠেছে মুসলমানদের এই নতুন রাষ্ট্র 'শরীয়ত' অর্থাৎ কোরআন-হাদিসের বিধিবিধান অনুসারে শাসিত হওয়া চাই। এই মত প্রবল হয়ে উঠবে মনে হয়; কেননা, মুসলমানরা নতুন রাষ্ট্র লাভ করেছে স্বতন্ত্র জাতীয়তার দাবিতে।

কিন্তু এ যুগে প্রাচীন শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তনার পথে বাধাও কম নেই। সেই সব বাধা দুই প্রধান ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে : প্রথমত, শরীয়তের ও একালের বিধিবিধানের মধ্যে পার্থক্য; দ্বিতীয়ত, নতুন মুসলিম রাষ্ট্রে অ-মুসলমানেরা সংখ্যাশক্তিতে নগণ্য নয়, তারা শরীয়তের বিধান অনুসারে শাসিত হতে রাজি হবে কি না।

প্রথম শ্রেণীর কথাই আগে ভাবা যাক। কোনো কোনো অপরাধের জন্য অপরাধীর হাত পা কেটে ফেলা কিংবা তাকে পাথর মেরে মেরে ফেলার বিধান শরীয়তে আছে। মুসলমানদের নতুন রাষ্ট্রে সেসবের পুনঃ প্রবর্তন হবে? অপরাধের প্রতি একালের মানুষের মনোভাবে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেছে– অপরাধকে একালে দেখা হয় প্রধানত সামাজিক ব্যাধি হিসাবে: তাই অপরাধী ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেবার কথা তেমন না ভেবে একালে ভাবা হয় শিক্ষাদীক্ষার সাহায্যে তাকে একজন স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ করে গড়ে তোলার কথা। শরীয়তপন্থীরা কি এই নতুন সম্ভাবনাপূর্ণ সমাজদর্শন অস্বীকার করবেন? একে ইসলামের প্রতিকূল জ্ঞান করবেন? (পাথর মারার মতো শাস্তি হযরত মোহাম্মদ যথেষ্ট অনিচ্ছুক হয়ে বিধান করেছেন হাদিস গ্রন্থে এমন প্রমাণ বিরল নয়।)

দ্বিতীয়ত শ্রেণীর বাধাও কম প্রবল নয়, বরং এক হিসাবে প্রথম শ্রেণীর চাইতেও গুরুতর, কেননা, সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠদের আচরণের উপরেই নির্ভর করবে ভারতবর্ষের মুসলমান ও হিন্দু উভয় রাষ্ট্রেরই শান্তি-শৃঙ্খলা হয়ত বা তাদের অস্তিত্ব। তবে অন্য দিক থেকে এ সমস্যাটা একটু হাল্কা করে ভাবা যায়। মুসলমানরা যদি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয় যে, শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তনই তাদের রাষ্ট্রের জন্য প্রধান কাম্য, আর মুসলিম রাষ্ট্রের অ-মুসলমানরা যদি শরীয়তের শাসন স্বীকার করতে অসম্মত হয়, তবে অতি দুরূহ লোক-বিনিময়ের দ্বারা মুসলমানেরা এ সংকট থেকে উদ্ধার পেতেও পারে।

প্রথম শ্রেণীর বাধা কিন্তু তেমন কঠিন মনে না হলেও আসলে খুব কঠিন, কেননা এক্ষেত্রে বিরোধ বাইরের কারো সঙ্গে নয়, বিরোধ নিজেদের মনের সঙ্গে। ধর্মের বিধান কেন মানুষ মানবে? এই জন্য যে ধর্মের বিধান মানলে মানুষের যে শুধু পরকালে কল্যাণ হবে তাই নয়, ইহকালেও কল্যাণ হবে। সেই জন্য মুসলমান তার প্রার্থনায় বলে: প্রভু দুনিয়ার ভালো দাও, পরকালের ভালো দাও। কিন্তু তার বিচার-বুদ্ধি যদি তাকে বলে ঃ অপরাধ মানুষ করে শুধু তার কুপ্রবৃত্তির তাড়নাই নয় বরং অভাবের তাড়নায়, আর সব মানুষের অভাব-অভিযোগ দূর করা এযুগের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান কাজ– তবে হাত পা কাটা ও পাথর মেরে মেরে ফেলার মতো কঠোর শাস্তি মেনে নেওয়া তার পক্ষে সহজ হবে না– কেবলই তার মনে হবে: সত্যই কি মানুষের উপকার হচ্ছে এমনসব বিধানের দ্বারা? তাই শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তন যারা চান তাদের একথা বললেই চলবে না যে শরীয়ত কোরআন হাদিসের বিধান, অতএব মান্য; তাদের প্রমাণ করতে হবে যে শরীয়ত বলতে যেসব বিধিবিধান মুসলমানরা পুনরায় প্রবর্তিত করতে চায় সেসব একালেও মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নতির জন্য বাস্তবিকই কাম্য। কোরআনও কিন্তু এই কথাই বলেন : কোরআন আল্লাহর বাণী অতএব মানুষকে মানতে হবে, এইই কোরআনের প্রধান বক্তব্য নয় বরং কোরআনের প্রধান বক্তব্য এই যে কোরআন আল্লাহর বাণী, মানুষ তার বুদ্ধিকে সক্রিয় করে প্রকৃতির দিকে আর ইতিহাসের ঘটনাবলীর দিকে তাকিয়ে কোরআনের নির্দেশের সত্যতা উপলব্ধি করুক, আর সেই নির্দেশ অনুসারে জীবন-যাপন করে ইহকালে ও পরকালে লাভবান হোক। কোরআন ও হাদিসের মধ্যে একটি লক্ষ্যণীয় পার্থক্য এই যে 'রূপে'র চাইতে 'ভাবে'র উপরে জোর কোরআনে কিছু বেশি।

বাস্তবিক মুসলমানের ধর্মগত সমস্যা সাধারণত যত সহজ ভাবা হয় আসলে তত সহজ নয়। মুসলমানের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরআন। কোরআনের নিচে বিশ্বস্ত হাদিসের (হযরত মোহাম্মদের বাণীর ও চরিত্র-চিত্রের) স্থান। কোরআন আকারে বড় নয়। বিশ্বস্ত হাদিসও সংখ্যায় খুব বেশি নয়। কাজেই কোরআন-হাদিসের

প্রকৃত বিধিবিধান কি সে সম্বন্ধে কাজ চালাবার যোগ্য একটা ধারণা করা কঠিন নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় : ইসলামের নির্ভর অলিখিত অনির্দিষ্ট শাস্ত্রের উপরে নয়, বরং সুলিখিত সুনির্দিষ্ট শাস্ত্রের উপরে। মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনও এইসব সুস্পষ্ট নির্দেশের দ্বারাই চালিত। যেকোনো শাস্ত্রজ্ঞ 'আলেম'কে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় : একজন ধার্মিক মুসলমানের কি কর্তব্য? তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে উত্তর দেবেন : তাকে আল্লাহতে ও রসুলে বিশ্বাস করতে হবে, নামাজ রোজা হজ জাকাত নিয়মিতভাবে নিষ্পন্ন করতে হবে। কিন্তু সেই 'আলেম'কে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় : এসব শাস্ত্রীয় বিধিবিধান-পালনকারীর সংখ্যা মুসলমান সমাজে নগণ্য নয়, কিন্তু কোরআনে যে বলা হয়েছে, 'নামাজ পড়– নামাজ কদর্যতা ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে' এমন কল্যাণপথের প্রকৃত পথিক মুসলমান সমাজের বিধিবিধান পালনকারীদের মধ্যে তেমন লক্ষ্যণীয় নয় কেন, তবে তার উত্তর দেওয়া তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের এই দিকটা তার চিন্তা-ভাবনার বিষয় হয়নি বললেই চলে, কেননা, তার মনোযোগ আকৃষ্ট রয়েছে লিখিত বিধিবিধানের রকমারিত্বের দিকে, সমাজ-মনের উপরে সেসবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে সেই অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ব্যাপারের দিকে নয়। ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ) আবিষ্কারের পর খাদ্য-বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন, খাদ্যে সূক্ষ্ম ভিটামিনের অভাব যদি হয় তবে স্থূল অন্যান্য যত উপকরণই তাতে থাকুক সেসবের দ্বারা মানবদেহের প্রকৃত পুষ্টিসাধন হয় না; তেমনি ধর্মের বিচিত্র বিধিবিধানের মূল যে সূক্ষ্ম মনুষ্যত্ব-সাধন, অর্থাৎ জ্ঞান ও চরিত্র-লাভ ও অশ্রান্ত শুভ-সাধনা, সেই অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা ভুলে গেলে ধর্মের বিধিবিধান পালনের দ্বারাও কোনো সত্যিকার লাভ সম্ভবপর নয়– তা সেসব বিধিবিধান যত বিচিত্র, যত কষ্টসাধ্য হোক। কোরআন বলেন :

> তিনি জ্ঞান দেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর যে জ্ঞান পায় সে মহাসম্পদ পায়, জ্ঞানী ভিন্ন আর কেউ বিচার করে দেখে না (২:২৬৯)।
>
> আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন : একজন ক্রীতদাসের কথা ভাব, কোনো কিছুর উপরে তার কর্তৃত্ব নেই, আর ভাব অন্য একজনের কথা যাকে আমার তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে উৎকৃষ্ট জীবিকা, তা থেকে সে খরচ করে চলে প্রকাশ্যে এবং গোপনে– এই দুই জন কি তুল্য মর্যাদার?.... (১৬:৭৫)।

ধর্মের এই যে মূল কথা মনুষ্যত্ব সাধন- ব্যাপক ও গভীর মনুষ্যত্ব সাধন– এই ব্যাপারটি না বুঝে ধর্মের ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ করতে গেলে যে নিতান্ত কাঁচা বনিয়াদের উপরে ইমারত তোলার চেষ্টা করা হয়, মুসলমান-সমাজের একালের শরীয়তপন্থীদের সে-বিষয়ে হুশিয়ার হবার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এ যুগ আত্মনিয়ন্ত্রণের বা জাতীয় বৈশিষ্ট্যসাধনের যুগ বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিবিড়

বিশ্বসংযোগের যুগও বটে। আত্মনিয়ন্ত্রণ–তত্ত্ব থেকে যে এ যুগের মুসলমানের 'নতুন' করে লাভ হয়েছে শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তনার স্বপ্ন তা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু যদি শুধু আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বপ্নে সে বিভোর থাকে আর বিশ্বের সঙ্গে তার যোগ যদি শিথিল হয়, তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ওহাবীদের চাইতে তার ভাগ্য প্রসন্নতর হবার কথা নয়, কেননা ওহাবীদের মনোবল ছিল অপরিসীম আর বাইরের সঙ্গে সংযোগ দূরে থাকুক তাদের শত্রুপক্ষের বলবিক্রম সম্বন্ধে ধারণাও ছিল অদ্ভুত।* একালের শরীয়তপন্থীরা ওহাবীদের অনুবর্তী না হয়ে বরং অনুবর্তী হোক মহাপ্রাণ স্যর সৈয়দের, ইসলাম সম্বন্ধে যিনি বলতে পেরেছিলেন : 'যা সত্য নয় তা ইসলাম নয়'। যে কোন ধর্ম বা আদর্শ সম্বন্ধে এ সার কথা। যা সত্য অর্থাৎ সার্থক নয় তা ধর্ম বা আদর্শ হবার যোগ্য নয়। কোরআনের একটি বাণীর মর্ম এই; আল্লাহ যদি চাইতেন তবে সবাইকে একজাতীয় লোক করতেন, কিন্তু তিনি মানুষের (বিচার-বুদ্ধির) পরীক্ষা করতে চান, তাই কল্যাণের পথে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করুক (৫:৪৮)। কল্যাণের পথে প্রতিযোগিতা- মানুষের দৈনন্দিন জীবনে– এর উপরে জোর দিতে ইসলাম যে কসুর করেনি দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের 'আলেম'রা সে-কথা ব্যক্ত করতে পারেননি। সেজন্য মুসলমান-সমাজের একালের চিন্তা নেতাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে। সব সময়ে তাদের হুশিয়ার থাকতে হবে পূর্বের ভুল যেন আবার না করা হয়। তারা গভীরভাবে অধ্যয়ন করুন কোরআন ও হাদিস, হজরতের জীবনকথা, মুসলিম ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠদের কথা, ভিন্ন দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠদেরও কথা; এসবের চাইতেও কঠিনতর প্রয়াস তারা চেষ্টা করুন চরিত্রে ও চেতনায় নিজেরা মহৎ হতে, কেনা যার নিজের চোখ নেই, সূর্যের ঔজ্জ্বল্যও তার জন্য ব্যর্থ; আর বিচিত্র শুভ-সাধনায় তারা সংসারে গড়ে তুলুন স্বর্গ- প্রত্যেক স্মরণীয় জাতি এমন সংসারে স্বর্গ গড়ার চেষ্টা করেছেন। এমন বিচিত্র ও বিপুল ঐহিক পাথেয়ের সাহায্যেই তারা আশা করতে পারেন তের শত বছরের ব্যবধান অতিক্রম করে শরীয়তের মর্ম উপলব্ধি করতে। শরীয়তের পুনঃপ্রবর্তন অবশ্য অসম্ভব, কেননা অতীত অস্তমিত-মৃত, তার যে অংশ সজীব সে তুমি ও আমি; অতীত পুনর্জীবিত হবে না, তবে তুমি ও আমি বিপুল সাধনায় নব মহিমা লাভ করতে পারবো– সংসারে এক নতুন চাঁদের হাট বসাতে পারবো।[১] আর যেহেতু আমরা ইসলামের উত্তরাধিকারী সে জন্য আমাদের মহিমা-লাভ হবে ইসলামের নতুন মহিমা লাভ।

---

* দ্রঃ বাংলার মুসলমানের কথা

[১]তোমরা এখন এমন যুগে যখন যে-সব আদেশ-নির্দেশ তোমাদের দেওয়া হয়েছে তার দশ ভাগের এক ভাগ ত্যাগ করলে তোমরা ধ্বংস হবে; কিন্তু এমন যুগ আসবে, যখন এই সব আদেশ-নির্দেশের দশভাগের একভাগ পালন করলে তোমরা মুক্তি পাবে। – হাদিস

নতুন মুসলিম রাষ্ট্রে অ-মুসলমানদের সমস্যার ইঙ্গিত মাত্র করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি বাস্তবিকই খুব জটিল। মুসলমানের ইতিহাসে, দেখা যায়, এটি বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে মীমাংসা করতে চেষ্টা করা হয়েছে। মদিনায় ও হোদায়বিয়ায় হজরত বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন মুসলমান ও অ-মুসলমানের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে, পরস্পরের মধ্যেকার বিরোধিতা দূর করতে, সেজন্য নিজের প্রাধান্য অনেকখানি খর্ব করতেও তিনি প্রস্তুত। কিন্তু বিজয়ী ইসলাম স্বভাবতই বিজিতদের সঙ্গে সন্ধি করেছে তাদের আনুগত্য-স্বীকারের শর্তে। সেই আনুগত্য স্বীকারের ধারাও এক থাকেনি। প্রথম যুগে অ-মুসলমানরা আনুগত্য স্বীকার করে জিজিয়া দিয়ে তাদের ধর্মাদি আচরণের অবাধ অধিকার পেতো, সিন্ধুর হিন্দুরা বিনকাসিমের কাছ থেকে এমন অধিকার পেয়েছিল। কিন্তু পরে এ অধিকার স্বীকৃত হয়নি। প্রধানত এই ব্যাখ্যারই ফলে আওরঙ্গজেব বহু হিন্দু মন্দির ভেঙেছিলেন। অ-মুসলমানদের অতি প্রাচীন মুসলিম রাষ্ট্রের এই নীতিবৈচিত্র একালের মুসলমানরা যথেষ্ট কাজে লাগাতে পারে। এক্ষেত্রেও স্যর সৈয়দের অপূর্ব ইসলাম নীতি- যা সত্য নয়, অর্থাৎ সার্থক নয়, তা ইসলাম নয়– তারা প্রয়োগ করতে পারে; কায়েদে আজমের যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি অভয় দান তা সম্পূর্ণ ইসলাম-অনুমোদিত জ্ঞান করতে পারে।

ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি কী– আইনজ্ঞেরা তার উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন কোরআন হাদিস আর মুসলিম ইতিহাস মন্থন করে। কিন্তু যিনি জানেন, মুসলমান হওয়ার অর্থ আল্লাহর, অর্থাৎ সত্য ও কল্যাণের, অনুগত হওয়া, আর সেইজন্য জগতের বন্ধু হওয়া,[২] তিনি নিঃসংশয়ে বুঝবেন– ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি কাণ্ডজ্ঞান ও মানবহিত।

---

[১]জগৎ আলস্নাহর পরিবার। সে-ই আলস্নাহর কাছে ভাল যে তার পরিবারের প্রতি ভাল। –হাদিস।

[২]সে আলস্নাহতে বিশ্বাসী নয়, সে আলস্নাহতে বিশ্বাসী নয়, সে আলস্নাহতে বিশ্বাসী নয় যার আঘাত থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। –হাদিস।

ধর্মরাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম

আনিসুজ্জামান

এই বক্তৃতার শিরোনামটি বেশ ভারিক্কি শোনালেও কোনো তত্ত্বকথার অবতারণা করে আমি আপনাদের ভারাক্রান্ত করব না। আমার সে অভিপ্রায় নেই, যোগ্যতাও নেই। ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের যে-অভিজ্ঞতা, আমি সে সম্বন্ধে কিছু বলব এবং তার পটভূমি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলব। অনেকের মতো আমিও ইংরেজ আমলে জন্মেছি, পাকিস্তান আমলে বড় হয়েছি এবং বাংলাদেশ আমলে মরতে বসেছি। ইংরেজ আমলের মতো পাকিস্তানেরও গোড়ার দিকে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না; তার পরে পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হলো; আমরা বাংলাদেশ করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়লাম; তারপর ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিলাম এবং তারও পরে রাষ্ট্রধর্ম করলাম। আমার মনে পড়ে, উনিশ শতকের বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা ও লেখক রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-৯১) কথা। আত্মচরিত-এ (১৯০৯) তিনি লিখেছিলেন :

> হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় আমার ধর্মমতে পর পর কতগুলি পরিবর্তন হয়, কিন্তু উনিশ বৎসরের সময় পরম শ্রদ্ধাসম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইলে যে আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম হই, তাহা এখনও আছি। ... শোভালিয়র র‍্যামেজ-র 'সাইরাসেজ ট্রাভেলস' পড়িয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মে আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের... এবং চ্যানিঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটারিয়ান খ্রিষ্টিয়ান হই, তৎপরে ঈষৎ মুসলমান হই, পরিশেষে কলেজ ছাড়িবার অব্যবহতি পূর্বে হিউম পড়িয়া সংশয়বাদী হই। যে পুস্তক যখনই পাঠ করা যায় তখনই সেইরূপ হওয়া অবশ্য বালকতা বলিতে হইবে, আর তখন যথার্থই বালক ছিলাম।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক-বিষয়ে ঘন ঘন মত পরিবর্তন করে আমরাও বালকতার পরিচয় দিয়েছি কিনা বলা যায় না। হয়তো রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা এখনো বালক রয়ে গেছি।

যে-দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল, অনেকে সে-তত্ত্বের উদগাতা বলে জানেন স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে (১৮১৭-৯৮)। তার বহু বক্তব্য এ ধারণা সমর্থন করে, তবে উল্টো কথাও তিনি বলেছিলেন। ১৮৮৪ সালে স্যার সৈয়দ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। জানুয়ারি মাসে গুরুদাসপুরে তিনি বলেন :

> Remember that the words Hindu and Mahomedan are onely meant for religious distinction–otherwise all persons, whether Hindu o Mahomedan or even Christians who reside in this country are all in this particular respect belonging to one and the same nation.

ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে তিনি বলেন :

> With me it is not so much work considering that their relgious faiths but that we inhabit the same land and are subject to the rule of the same government. These are the grounds upon which I Call both the races which inbahit India by the word 'Hindu' by which I mean that they are the inhabitants of Hindustan.

স্বধর্ম ও স্বদেশের মধ্যে যে-পার্থক্য এখানে করা হয়েছে, তা বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। ধর্ম সম্পর্কে স্যার সৈয়দের আরেকটি মৌলিক ধারণার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, তাও ভেবে দেখা যেতে পারে। তিনি মনে করতেন যে, সকল নবীই মানবসমাজে অভিন্ন ধর্মবিশ্বাস (দীন) প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই নিজেদের কালোপযোগী ভিন্ন জীবনবিধান (শরীয়া) বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। বিশ্বাস অপরিবর্তনীয় বা শাশ্বত; বিধান পরিবর্তনীয় ও ইহজাগতিক। পূর্বগামী নবীদের আনীত বহু আইন কুরআন শরীফ বাতিল করে দিয়েছে, কেননা ইতিহাসের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে সেসব আইন প্রয়োগযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল। স্যার সৈয়দ যে এভাবে ইহজাগতিক ও পারলৌকিককে আলাদা করে দেখতে পেরেছিলেন, এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

স্যার সৈয়দ আহমদের পরবর্তী প্রজন্মের ভারতীয় মুসলমানদের সুযোগ্য প্রতিনিধি মনে করা হয় মওলানা মোহাম্মদ আলীকে (১৮৭৮-১৯৩১)। ইসলামের ঐক্য ও মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তার বেশ কিছু বক্তব্য আছে। তবে ধর্মীয় অস্তিত্ব ও দেশগত পরিচয়কে তিনিও পৃথক করে দেখেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন: সে যুক্তরাষ্ট্র কেবল রাজনৈতিক নয় ধর্মীয় যুক্তরাষ্ট্রও। প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে তিনি বলেছিলেন :

> Where God commands... I am a Muslim first, a Muslim second and a Muslim last and nothing but a Muslim... My first duty is to my maker, not to HM the king nor to my companion Dr Monje... But where India is concerned, where India's freedom is concerned, where the welfare of India is concerned, I am an Indian first, an Indian second, an Indian last and nothing but an Indian... I belong to two circles of eqal size but which are not concentric. One is India and the other is the Muslim world... we belong to these circles... and we can leave neither.

সমাজ-রাজনীতি-সাংবাদিকতা-ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে অল্প বয়সে আত্মপ্রকাশ করে মওলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) গণ্য হয়েছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আলীর সমসাময়িক একজন বিশিষ্ট নেতা ও চিন্তাবিদ বলে। ইসলামের বাইরে তিনি কিছুই ভাবতে চাননি এবং তাই এক সময়ে ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করা মুসলমানের পক্ষে নীরব ধর্মদ্রোহিতার তুল্য জ্ঞান করেছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি স্পষ্টই লিখেছিলেন যে, ইউরোপে জাতি শব্দ সহস্র হৃদয় স্পন্দিত করে, আর মুসলমানের হৃদয় যাতে স্পন্দিত হয়, তা হলো আল্লাহ বা ইসলাম শব্দ। খিলাফত আন্দোলনের সময়ে তিনি খিলাফতের একটি নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন এবং ভারতবর্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দুর সঙ্গে সহযোগিতা করা মুসলমানের কর্তব্য বলে স্থির করেন। পরে অসহযোগ আন্দোলনের কালে তিনি যে তত্ত্বে উপনীত হন, তাতে তিনি আজীবন নিষ্ঠ ছিলেন। এই তত্ত্বের মূল তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন হযরত মুহম্মদের মদিনা চুক্তিতে, যাতে মুসলমান-অমুসলমান-নির্বিশেষে মদিনাবাসীকে উম্মা ওয়াহিতা বা একটিমাত্র সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়। এটিকে নজির হিসেবে ধরে নিয়ে তিনি ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন এবং এভাবে ইসলামের সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পাশাপাশি ভারতবাসীর অখণ্ড সত্তায় আস্থাজ্ঞাপন করেছিলেন।

তবে ভারতীয় রাজনীতির ধারা এবং শাসনব্যবস্থা সংস্কারের গতি ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের দিকে। একদিকে বাস্তব জীবন ও রাজনীতি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করছিল। অন্যদিকে মর্লি-মিন্টো সংস্কারে মুসলমানের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের যে ব্যবস্থা করা হয়, মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে তা ব্যাপকতা লাভ করে। স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবির পোষকতা করেছিল।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রগঠনের দাবি জানানো হয়। পরে, ১৯৪৬ সালে এপ্রিল মাসে, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ দলীয় আইনসভা-সদস্যদের

সম্মেলনে দুটি রাষ্ট্রের জায়গায় পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান নামটি উল্লেখ করা হয়নি এবং ভাবী রাষ্ট্রের ধর্মীয় চরিত্র সম্পর্কেও কোনো আভাস দেওয়া হয়নি। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের দিল্লি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) রাষ্ট্রের নাম প্রসঙ্গে যা বলেন, তার সারমর্ম এই : লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান কথাটাই ব্যবহার করা হয়নি। হিন্দুরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে বলে যে, এতে পাকিস্তান চাওয়া হয়েছে। হিন্দুদের সংবাদপত্রের একাংশ এবং ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা পাকিস্তান কথাটা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তবে আমি তাদের ধন্যবাদ দিই এজন্য যে, এর ফলে অনেকগুলো শব্দের বদলে এই একটি শব্দ ব্যবহারের সুযোগ তারা করে দিয়েছেন।

১৯৪৩ সালের মুসলিম লীগ অধিবেশন আরো একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে। অধিবেশন শুরু হবার আগে একদল প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান কুরআনের ভিত্তিতে রচিত হবে বলে মুসলিম লীগকে ঘোষণা করতে হবে। বোম্বাইয়ের ড. আবদুল হামিদ কাজী এই অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য একটি প্রস্তাবের খসড়াও প্রচার করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হবে হুকমত-ই-ইলাহিয়ার– অর্থাৎ প্রথম চার খলিফার হাতে প্রণীত নীতিসমূহের ভিত্তিতে। কিন্তু প্রস্তাব উত্থাপনের সময় আসার আগেই সভাপতির ভাষণ প্রদত্ত হয় এবং তাতে এ প্রসঙ্গে জিন্নাহ বলেন :

> The constitution of Pakistan can only be framed by the millat and the people. Prepare yourselves and see that you frame a Constitution to your heart's desire. There is a lot of misunderstanding. A lot of mischief is created. Is it going to be an Islamic Government? Is it not begging the question? Is it not a question of passing a vote of censure on yourself? the Constitution and the Government will be what the people will decide.

এর পরে ড. কাজী তার প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। তিনি খুশি হয়েছিলেন কিনা বলা মুশকিল। কেননা জিন্নাহর বক্তৃতায় একদিকে যেমন বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের সরকার ইসলামী হবে না, এমন মনে করা আত্মনিন্দার শামিল, অন্যদিকে তেমনি বলা হয়েছিল যে, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কেবল জনগণের অভিপ্রায়-অনুসারী সংবিধান রচনা করবে।

তবে মুসলিম লীগের অনেক নেতাই বিভিন্ন সময়ে এমন উক্তি করেছিলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে কুরআনের নির্দেশ-অনুগ। অনেকেই আবার এসব কথায় আস্থাজ্ঞাপন করেননি। জমিয়ত-আল-উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মওলানা হুসেন আহমদ মদনী (১৮৭৯-১৯৫৭) জিন্নাহকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন যে,

পাকিস্তান যে ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না, জাগতিক রাষ্ট্র হবে, তা এদের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। জিন্নাহ এবং অন্যান্য মুসলিম নেতাকে তিনি ইসলাম সম্পর্কে কেবল অজ্ঞ নন, উদাসীন বলে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং তার বক্তব্যের সমর্থনে এদের পক্ষে ১৯৩৭ সালের শরীয়া আইন সমর্থন না করার ও ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহবিচ্ছেদ আইন বিরোধিতা না করার দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। জিন্নাহকে তিনি অভিহিত করেছিলেন কাফেরে আজম বলে (কেউ কেউ বলেন, আহরার- নেতা মওলানা মজহার আলী আজহারের দুটি ছন্দোবদ্ধ চরণে প্রথম এই বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি করা হয়) এবং মুসলিম লীগে যোগদান ইসলামবিরোধী কাজ বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। জামাতে ইসলামীর আমীর মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী (১৯০৩-৭৯) তো স্পষ্টতই বলেছিলেন যে, জিন্নাহ থেকে শুরু করে মুসলিম লীগের নিম্নপর্যায়ের কর্মীদের কারো দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামসম্মত নয় এবং কোনো সমস্যাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ক্ষমতা তাদের নেই। জাতীয়তাবাদ– তা ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ হলেও– এবং গণতন্ত্রের ধারণা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিজাত বলে তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। পাকিস্তান, তার মতে, কাফেরানা রাষ্ট্র– যার নাম তিনি দিয়েছিলেন না-পাকিস্তান। অবশ্য উল্টো কথা বলার মতো আলেমও পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের সমর্থক আলেমদের সংগঠন জমিয়ত-আল-উলামায়ে ইসলাম উপরিউক্ত সমালোচনার জবাবে বলেছিলেন যে, মুসলিম লীগে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লোকের অভাব থাকলে তেমন লোকদের উচিত মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে সে- অভাব দূর করা। তবেই অধার্মিক পাশ্চাত্যপন্থী নেতাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পাকিস্তান ধার্মিক ব্যক্তিদের নেতৃত্বে শরীয়ার শাসন প্রবর্তনে সমর্থ হবে।

সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পাকিস্তান- প্রতিষ্ঠার আগে ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি সত্ত্বেও দেশটিতে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কোনো সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল না। মুসলমানেরা যাতে নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী জীবন গঠন করতে পারেন, তার নিশ্চয়তা লাভই ছিল পাকিস্তানের লক্ষ্য। ১৯৪৬-এ রয়টারের প্রতিনিধিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জিন্নাহ বলেন :

> The new state would be a modern democratic state with sovereignty resting in the people and the members of the new nation having equal rights of citizenship regardless of their religion, caste or creed.

তাই এটা বিস্ময়কর নয় যে, পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে, ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্টে, সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন :

> You are free to go to your mosques or any other place of worship in this State of Pakistan. You may belongs to any religion or caste or creed that had nothing to do with the business of the State... you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State.

জিন্নাহর এ উক্তি কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টাদের ক্ষুণ্ন করেনি, জি. এম সৈয়দের মতো মুসলিম লীগবিরোধী নেতাকেও একথা বলতে প্ররোচিত করেছিল যে, এতে জিন্নাহর chastened mood-এর প্রকাশ ঘটেছে এবং লীগের এত কালের কর্মসূচি ও সংগ্রামের অন্তরালবর্তী মৌলিক নীতি বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। তবে জিন্নাহর অনুসারীরা অল্পকালের মধ্যেই তার এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পাকিস্তান সংবিধান-সংক্রান্ত যে Objective Resolution উত্থাপন করেন, তাতে প্রথমেই রাষ্ট্রের– শুধু রাষ্ট্রের নয়, সমগ্র বিশ্বজগতের– সার্বভৌমত্ব বলা হয়েছে আল্লাহর এবং রাষ্ট্রকে যদিও স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তবু এই রাষ্ট্রের মুসলিম অধিবাসীরা যাতে কুরআন শরীফ ও সুন্নায় বর্ণিত ইসলামের শিক্ষা ও আবশ্যকতা-অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনযাপন করতে পারেন, তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। ১৯৫০ সালের মূলনীতি কমিটির রিপোর্টেও এর প্রতিধ্বনি করা হয় এবং সেই সঙ্গে যোগ করা হয় যে, রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলিম। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা নির্বাচনী অঙ্গীকারের শীর্ষদেশেও লেখা হয়েছিল:

নীতি : কোরআন ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয় করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।*

১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় এই নামান্তরের প্রস্তাব করেন

---

* এ সম্পর্কিত একটা শোনা কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার রচনার ভার পড়ে আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯) উপরে। তিনি এর আগে আওয়ামী লীগের জন্য ৪২ দফায় একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। একুশে ফেব্রুয়ারির কথা মনে রেখে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (১৮৮৫-১৯৭৯) সম্মতি নিয়ে এই ৪২ দফা ছেঁকেকেটে এবারে তিনি ২১ দফায় রূপ দেন। এ পর্যন্ত আবুল মনসুর আহমদ নিজেই লিখে গেছেন। তারপরের অংশই শোনা কথা। এই ২১ দফা মওলানা ভাসানীকে দেখালে তিনি নাকি কুরআন ও সুন্নার খেলাফ কোনো আইন তৈরি করা হবে না– এই অঙ্গীকার জুড়ে দিতে বলেন। আবুল মনসুর আহমদ ২১ দফা রাখতে চান বলে এটাকে কোনো দফা হিসেবে গণ্য না করে প্রথম দফার মাথায় 'নীতি' বলে কথাগুলো যোগ করেন এবং 'কুরআন ও সুন্না'র জায়গায় 'কুরআন ও সুন্নার মৌলিক নীতি' বসিয়ে দেন।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯৩-১৯৬৩)। সভায় মওলানা ভাসানী বলেন যে, এই প্রস্তাব অনেকদিন ধরেই তাদের বিবেচনাধীন ছিল। তবে ভাষা আন্দোলনের সময়ে মুসলিম লীগ যেরকম মিথ্যে প্রচার করে, তা স্মরণ করেই সংগঠন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় না করা পর্যন্ত তারা নাম বদলাবার ঝুঁকি নিতে চাননি। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে এই নীতির সংযোজন অনুরূপ বিবেচনাপ্রসূত কিনা তা বলা যায় না। তবে মওলানা ভাসানী পরেও কুরআন ও সুন্নার সঙ্গে সংগতির কথা বলেছেন।

১৯৫৬ সালে যখন পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়, তখন দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিদের অনেকে দেশের এই নামকরণের বিরোধিতা করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপিত হলে শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-৭৫) যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

> আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে, তারা মাইনরিটিদের সমানভাবে দেখবেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, কিভাবে সমানভাবে দেখবেন– ইসলামিক রিপাবলিক নাম চেঞ্জ করে দিয়ে? ইসলামিক রিপাবলিক না হয়ে পাকিস্তান রিপাবলিক হোক, আমরা একথা নিয়ে ফাইট করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম, রাজনীতিতে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সব সমান হবে– সত্য এবং সাম্যের নীতির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। ... স্যার, আমরা হেড অফ দি স্টেট মুসলমান করে দিলাম। ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান নাম করলাম। এইভাবে দুই জাতি তো করেই দিলাম তার উপরেও যদি সেপারেট ইলেকশন হয় তাহলে কি হয়? দুই জাতির ভিত্তিতে আমাদের পাকিস্তান হয়েছে। এর পরও যদি আজকে আলোচনা করা হয় যে, পাকিস্তানে আমরা দুই জাতি, একটা হিন্দু আর একটা মুসলমান, তাহলে একটা প্রোভোকেশন দেয়া হয়। আজ যদি পূর্ব বাংলার এক কোটি হিন্দু বলে যে, আমাদের আলাদা জায়গা অর্থাৎ একটা হিন্দু স্টেট দিতে হবে, তাহলে কি হবে? পাকিস্তানের খাতিরে, পাকিস্তানের ইনসাফের খাতিরে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের খাতিরে আমি আমার বন্ধুদের অনুরোধ করব তারা যেন এই সেপারেট ইলেকটরেটের প্রস্তাব উইথড্র করেন।

এই বক্তৃতায় যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা বিকশিত হচ্ছিল অনেকদিন ধরে। বিশেষ করে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর থেকে পূর্ব বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ভাষা-আন্দোলনের আগে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ছিল দেশের একমাত্র সংগঠন যার দ্বার সকল সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ভাষা-আন্দোলনের পরে আমরা দেখি অসাম্প্রদায়িক ছাত্রসংগঠনরূপে ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা, অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে গণতন্ত্রী দলের আত্মপ্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগে পরিণত এবং দেশের এই অংশের প্রধান

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী মুসলিম লীগের আওয়ামী লীগে রূপান্তর। ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ এই ক্রমবর্ধমান অসাম্প্রদায়িক চেতনারই বহিঃপ্রকাশ।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে যুক্ত নির্বাচন বিল উত্থাপন করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি স্মরণীয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার অংশবিশেষ এরকম :

> It may appear strange to those who have not been able to adapt themselves to the change in political outlook resultant on the creation of Pakistan that I who was an advocate of the two nation theory in undivided India, and whose contribution to the creation of Pakistan was perhaps not insignificant, and who belived in separate electorate in undivided India, should advocate joint electorate in Pakistan as a salutary constitutional principle... Separate electorate was a device to secure proper representation in the Legislatures for the Muslim minority; it took something away from the majority population; it was certainly never meant to be a device to safeguard the intersts of the majority population...,
>
> ... The two nation theory was advanced by the Muslims as a justification for the partition of india and the creation of a State made up of geographically contiguous units where the Muslims were numerically in a majority. Once the State was created. the two nation theory lost its force even for the Muslims. If it is still persisted in, it will logically lead to the partition of Pakistan... The Muslims who were a nationality in undivided India, are now citizens in their own country Pakistan, in which every citizen, whatever may be his religions, is a member of the Pakistani nation. There is, thus a radical difference between the conception of the Millat-i-Islam which transcends geographical boundaries, and the conception of a Pakistani nation or qaum which has boundaries and has a peculiar entity which differentiates it from other nations. Circumstances thus have changed, and so must our political outlook change with the establisment of Pakistan.

গণপরিষদে কিন্তু এই প্রশ্নে আপসরফা হলো এভাবে যে, পূর্ব পাকিস্তানে হবে যুক্ত নির্বাচনপ্রথা আর পশ্চিম পাকিস্তানে থাকবে স্বতন্ত্র নির্বাচনপ্রথা।

পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কতটা গড়ে উঠেছিল, তা এ থেকে সহজেই বোঝা যায়। তাই একদিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র, অন্যদিকে তার দুই অংশে দুরকম নির্বাচন প্রথা।

পাকিস্তানে পরবর্তী পনেরো বছরে অন্যান্য বিষয়ে বিরোধের মতো রাষ্ট্রজীবনে ধর্মীয় অনুসঙ্গ এবং অসাম্প্রদায়িকতার– কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা যায় ধর্মনিরপেক্ষতা বা ইহজাগতিকতার– বিরোধ তীব্র হয়েছে। ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করে ১৯৬২ সালে দেশের দ্বিতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রের নাম ফিরে আসে পাকিস্তান রাষ্ট্রে– অর্থাৎ নাম থেকে ইসলামী কথাটা বাদ যায়। তবে রাষ্ট্রের মূলনীতিতে কুরআন ও সুন্না এবং ইসলামী জীবনধারার কথা বলা হয় এবং তার জন্য ইসলামী আদর্শ-বিষয়ক একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধান রদ হয়ে যায় ১৯৬৯ সালে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান যে Legal Farmework Order জারি করেন, তাতে বলা হয় যে, নির্বাচনের পর যে জাতীয় সংসদ গঠিত হবে সে-সংসদের দ্বারা প্রণীতব্য সংবিধানে "Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan" অটুট রাখতে হবে। এই কারণে ১৯৭০ সালে যেসব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, কুরআন ও সুন্নার পরিপন্থী আইন-প্রণয়ন থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি তাদের প্রত্যেককেই দিতে হয়েছিল।

জেনারেল আইয়ুব খান ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মতো সামরিক শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধান সংবিধানের ইসলামী চরিত্র রাখতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে, ক্ষমতায় থাকার জন্য, সাধারণ মানুষকে ভোলাবার জন্য, তাদের প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের যোগ ঘটানোর। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মুহম্মদ মুনীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবৃত করেছেন :

> ... When I was a member of Ayub's Cabinet in 1962 and the Political Parties Bill was under discussion a person moved and amendment to the bill proposing that no party would be formed the object of which was opposed to the 'Ideology of Pakistan' shall have to be defined. On this the member who had moved the original amendment replied that the ideology of Pakistan was 'Islam', but nobody asked him the further question. 'What is Islam?' The amendment to the bill was therefore passed as the member who supported the amendment was Maulvi Abdul Bari of Lyallpur who was a supporter of Ayub. Nobody can say anything to the contrary where Islam is mentioned.
>
> Ayub was then in Karachi and I could not contact him. When he returned I mentioned to him the incident and he remarked, "What will the world say about it all".

বিচারপতি মুনীর যে বলেছেন– ইসলাম কী, এ বিষয়ে কেউ আর প্রশ্ন করল না–

তার একটা ইতিহাস আছে। পাঞ্জাবে ১৯৫৩ সালে আহমদীয়া-বিরোধী দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য তার নেতৃত্বে বিচারপতি কায়ানীকে নিয়ে যে কোর্ট অফ ইনকোয়ারি গঠিত হয়, তাতে তাঁরা দেখতে পান যে, ইসলাম কী এবং মুসলমান কে, সে বিষয়ে কোনো দুজন আলেম একমত হতে পারেননি। কোনো কোনো আলেমের মতে, আল্লাহর আইন কুরআন ও সুন্নায় পাওয়া যায় বলে ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তির বা সমষ্টির আইন-প্রণয়নের অধিকার নেই এবং আল্লাহর আইন ব্যাখ্যা করার অধিকার রয়েছে কেবল শাস্ত্রজ্ঞানীদের।

পাকিস্তানের শাসকেরা ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংযোগ ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু দেশের দুই অংশের বিচ্ছেদ অনিবার্য করে তুলেছিলেন। এর আশু কারণ আমাদের অজানা নয়। তবে অনেকদিন ধরে যেসব কারণে দুই অংশের মতান্তর সৃষ্টি হচ্ছিল, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়টি তার একটি বললে ভুল হবে না।

৩

অনেক স্বেদ, অশ্রু ও রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেশের রাষ্ট্রীয় চরিত্র যে ধর্মীয় হবে না, তার প্রথম আভাস পাওয়া যায় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। এতে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হবে, সে কথা মুক্তিযুদ্ধের কালে নেতারা বহুবার বলেছিলেন। শুধু প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান এবং এমন কি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মুশতাক আহমদের বক্তৃতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় তিন নীতি– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার– কথা একাধিকবার ঘোষিত হয়েছিল। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেদিন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, সেদিন রেসকোর্সের জনসভায় বক্তৃতাদানকালে তিনি বলেছিলেন :

> সকলে জেনে রাখুন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। ইন্দোনেশিয়া প্রথম ও ভারত তৃতীয়। বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয় ভিত্তি হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

পরে তিনি আরও একটি নীতি যোগ করেন– জাতীয়তাবাদ। সেই চারটি মূলনীতিকে ভিত্তি করেই বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়।

আগে বলেছি, ধর্মনিরপেক্ষতার ভাব শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তার একটা কারণ ছিল এই যে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার

দাবি উপেক্ষা করে যারা উর্দু চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, তারা ধুয়া তুলেছিলেন ধর্মের। পাকিস্তান মুসলমানের রাষ্ট্র, উর্দু মুসলমানের ভাষা; তাই উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে। বাংলা হিন্দুর ভাষা, ওতে ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট লেখা হয়নি; তাই বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারবে না। পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ১৯৫১ সালে বলেছিলেন যে, জাতি হিসেবে মুসলমানের টিকে থাকার সংগ্রাম আর উর্দুকে জিইয়ে রাখার সংগ্রাম অভিন্ন। উর্দুর আধিপত্য প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষ ধর্মের নামে শোষণ ও উৎপীড়ন এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ভাষা-আন্দোলনের পরে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ কিংবা প্রতিষ্ঠিত ছাত্র ও রাজনৈতিক দলের অসাম্প্রদায়িকীকরণ সম্ভবপর হয়েছিল শুধু নয়, অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। বাঙালি হতে হলে ও গণতন্ত্রী হতে হলে ধর্মনিরপেক্ষ না হয়ে উপায় নেই, এ কথা বুঝতে মানুষের দেরি হয়নি। ইসলামের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করার যে চেষ্টা দেশে চলছিল, সে সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দীর পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতায় খুব চমৎকার করে বলা হয়েছে।

> It is so easy to mislead our people who are prepared to sacrifice everything in the way of Islam, to mislead them in the name of Islam. It is so easy to excite passion, so easy to kindle dires, so easy to destroy', so difficult to build, that I would beg of those who are utilising these controversy, for the sake of opposition, not to fan the flames of fanaticism and bigotry and hatred, but to pause and build Pakistan on the solid foundation of trust and unity between all the people inhabiting this beloved country of ours.

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার বিপদ সম্পর্কে পাকিস্তানের দিনগুলিতেই আমরা ক্রমশ অবহিত হয়েছি। তারপর ১৯৭১-এ এর মারাত্মক রূপ দেখলাম। ইসলাম রক্ষার নামে, মুসলিম রাষ্ট্রের নামে, কী অমানুষিক অত্যাচারই না হলো দেশের মানুষের উপর। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এদেশীয় দোসররা ধর্মের নামে সকল বর্বরতার প্রতি সমর্থন জানালেন। ইসলাম ও পাকিস্তানকে অভিন্ন বলে দাবি করে তারা ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তানের বিরোধীতা মানেই ইসলামের বিরোধিতা। যেন পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ইসলামের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন যে, আল-বদর বাহিনী গঠন করা হয়েছে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করার জন্যে। যখন সেই সামরিক বাহিনীর ভরাডুবি হলো, তখন তাদের যোগসাজশে ক্রোধে উন্মত্ত আল-বদরেরা দেশের সেরা সন্তানদের হত্যা করে

নিজেদের আদর্শবাদের পরিচয় রেখে গেল।

এই অভিজ্ঞতা ১৯৭২ সালে আমাদের মনে তাজা ছিল। তাই যে সংবিধান আমরা তখন রচনা করেছিলাম, তাতে একদিকে যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা একটি মূল রাষ্ট্রীয় নীতি বলে গৃহীত হয়, অন্যদিকে তেমনি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ লোপ করে দেয়া হয় সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে। তাতে বলা হয়, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাবান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার এবং কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বলে স্বীকৃত হলেও এর তাৎপর্য আমাদের সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি– এমনকি, রাষ্ট্রপরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সকলের কাছেও নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটা ব্যবহৃত হচ্ছে সেকুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে। অনেকে মনে করেন, ইহজাগতিকতা বললে কথাটা স্পষ্ট হতো। তা হয়তো হতো, তবে ধর্মনিরপেক্ষ বলায়ও ভুল হয় না। নিরপেক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অপেক্ষারহিত– ওতে কর্মসম্পর্কহীন, প্রয়োজনরহিত বা উদাসীন বোঝায়। আমরা যখন জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা দলনিরপেক্ষ ব্যক্তির কথা বলি, তখন নিরপেক্ষ শব্দের সেই দ্যোতনাই ধরা পড়ে। কোনো জোটের সঙ্গে যে দেশের যোগ নেই, তা জোটনিরপেক্ষ দেশ; কোনো দলের সঙ্গে যে ব্যক্তির সংস্রব নেই, তিনি দলনিরপেক্ষ লোক। তেমনি ধর্মের সঙ্গে যে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নেই, তা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তাই বোঝায় রাষ্ট্রীয় উদযোগের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ের সংযোগহীনতা, ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংস্রবশূন্যতা, পারলৌকিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন ইহজাগতিকতা। ধর্ম থাকবে নাগরিকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের বিষয় হয়ে, রাষ্ট্র সকলকে নিজস্ব ধর্মপালনের স্বাধীনতা ও অধিকার দেবে, কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না।

তবে নিরপেক্ষতা বলতে অনেকেই ধরে নেন রাষ্ট্রে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও যেসব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পক্ষপাতহীনতা। সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের স্পষ্ট বিধান সত্ত্বেও ১৯৭২ সাল থেকে আমাদের প্রবণতা দেখা দিল রাষ্ট্র কর্তৃক সকল ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদানের। তাই বেতারে, টেলিভিশনে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে– সর্বত্র কুরআন শরীফ, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক পাঠ হতে থাকল একসঙ্গে। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় এ নয়, এ হতে পারে সকল ধর্মের সমান মর্যাদালাভ। আমরা কথায় কথায় আরও ঘোষণা করতে লাগলাম, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। আর তা প্রমাণ করার জন্যই যেন বঙ্গভবনে বা গণভবনে মিলাদ পড়ানোও হলো।

ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যাই বোঝাক না কেন, আমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোকের কাছে তা একবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। তারা ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের ধারায় আস্থাবান, মুসলমান ও অমুসলমানকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে দেখতে অভ্যস্ত, সকল ধর্মের গ্রন্থ ও অনুসারীর সমান মর্যাদালাভ তাদের কাছে খুবই শোচনীয় ব্যাপার। ১৯৭৫ সালের পরে তাদের সুযোগ এলো। মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান (১৯৩৫-৮১) মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের ক্ষমতার অংশ দিলেন এবং সংবিধানের মূলনীতিতে পরিবর্তন আনলেন। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশ বলে সংবিধানের প্রস্তাবনার পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম যুক্ত হলো, ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় এলো 'সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এবং সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের উচ্ছেদ হয়ে গেল। ১২ অনুচ্ছেদের উচ্ছেদের ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নতুন করে আমদানি হলো এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক দল ও ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। পরে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশকে বৈধ রূপ দেওয়া হলো। জিয়াউর রহমান যেমন আওয়ামী লীগের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্যে ধর্মনিরপেক্ষতা বর্জন করেন, মনে হয়, জেনারেল এরশাদ তেমনি পূর্বগামীর কীর্তি কিংবা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ১৯৮৮ সালে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন। সংশোধনীতে বলা হয় : 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।' ইসলামের সঙ্গে অন্য ধর্মের কী বিপুল পার্থক্য করা হলো, সংশোধনীর ভাষা থেকেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে সংবিধানে সকল নাগরিককে যে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং আইনের দৃষ্টিতে যে সমতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা লংঘন করা হলো। কোনো অমুসলমানের পক্ষে সংবিধান রক্ষার এবং এর প্রতি অনুগত থাকার শপথ নেওয়ার অর্থ হয়ে দাঁড়ালো বিসমিল্লাহর প্রতি তার আনুগত্য– ঘোষণা।

রাষ্ট্রধর্ম-প্রবর্তনের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন লিখেছেন :

> বিধানটি রাষ্ট্রের ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যতীত অন্যদের ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত করেছে, যদিও তারা একই দেশের সমান সাংবিধানিক অধিকারের অধিকারী। প্রশ্ন থেকে যায়, ইসলাম কোনো একটি দেশের সে দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ মুসলমান হলেও– রাষ্ট্রধর্ম হতে পারে কি না? আবার একটি রাষ্ট্র সার্বভৌম ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করতে পারে কি না?...
> ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হলে, ইসলাম সে দেশের মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম অধিকারের অধীন হয়ে যাচ্ছে। ইসলাম তার সর্বজনীনতা হারাচ্ছে। তার বিশ্বজনিনতা খর্ব হচ্ছে। ...
> ... যদি ধর্মমত সার্বভৌম হয়ে থাকে, তবে রাষ্ট্রকে সেই মতের অধীন হয়ে চলতে হবে...। ইসলামের মতো আপন নীতিমালাসম্পন্ন ধর্ম রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে

পারে না। আবার সার্বভৌম রাষ্ট্র ইসলামের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। এর মিমাংসা হতে পারে রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক করা।

বিশেষ ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষপাতের ফলে যে নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়, একথা অনেকে মানতে চান না। তারা যুক্তরাজ্যের দৃষ্টান্ত টানে। স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের পরে ইউরোপে ক্রমে ধর্ম ও রাষ্ট্রের– চার্চ ও স্টেটের– পৃথকীকরণ ঘটে এবং সকল নাগরিকের ইহলৌকিক কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হয়। তা সত্ত্বেও ইউরোপের সব দেশে রাষ্ট্র ও ধর্ম পৃথক হয়নি। যুক্তরাজ্যের রাজা বা রানী চার্চ অফ ইংল্যান্ডের রক্ষাকর্তা– এই অর্থে অ্যাংলিকান চার্চের ধর্মই যুক্তরাজ্যের সরকারি ধর্ম। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার একাধিক দেশ বা আয়ারল্যান্ড, ইতালি ও স্পেনে রাষ্ট্র বিশেষ বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। অন্যদিকে ক্যাথলিক ধর্মের অসাধারণ প্রাধান্য সত্ত্বেও ফ্রান্স ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, প্রোটেস্ট্যান্টদের গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ দেশ– সরকারি কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে কোনো প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করা বা কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে বলা কিংবা শিক্ষাক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে বাইবেল পাঠ বা প্রার্থনা করাও সংবিধানবিরোধী বলে সেদেশের সর্বোচ্চ আদালত স্থির করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রসংস্থার (ওআইসি) অর্ধেক সদস্যরাষ্ট্রেই রাষ্ট্রধর্ম বলে কিছু নেই। ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব আমীরাত বা সিরিয়ার মতো দেশ রাষ্ট্রধর্ম স্বীকার করে না। তুরস্ক কেবল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়, তার সংবিধানের যেকটি ধারা কোনোভাবে সংশোধনযোগ্য নয়, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারা তার একটি; সে দেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও নারীর স্বাধীনতা-বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রচলিত। সুতরাং কেবল উদাহরণ দিয়ে কোনো লাভ নেই। স্বদেশের অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতির ভিত্তিতেই এ করণীয় নির্ণয় করা আবশ্যক। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ফ্রান্সকে ধর্মনিরপেক্ষ থাকার প্রেরণা যুগিয়েছে; আদি বসতিস্থাপনকারীদের ধর্মীয়ভাবে নিপীড়িত হওয়ার অভিজ্ঞতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষ কোনো ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে দেয়নি। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির যে কুফল আমরা ভোগ করেছি, ধর্মের নামে যে শোষণ ও নিপীড়ন এখানে চলেছে, এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মিলিত সংগ্রামের যে ইতিহাস আমরা রচনা করেছি, তার ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শগ্রহণই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সংগত ছিল।

৪

সামরিক শাসনের আওতায় ধর্মনিরপেক্ষতা উঠে গিয়েছিল– তার বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম- ঘোষণার বিরুদ্ধে

আন্দোলন হয়েছিল, যদিও তা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। আওয়ামী লীগ ও আট দলে তাদের সহযোগিরা, ওয়ার্কার্স পার্টি ও পাঁচদলে তাদের সহযোগীরা, মহিলা-সংগঠন এবং অধিকাংশ সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠন প্রতিবাদ করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) চুপ করে থাকলেও ধর্মনিরপেক্ষতার উচ্ছেদ যে তাদেরই কীর্তি, তা তারা বেশ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৯১ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময়ে প্রচার চলল, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ উঠে যাবে। এ প্রচারণায় কাজ হয়েছিল। আওয়ামী লীগও ভয় পেয়ে আল্লাহ আকবর ধ্বনি তুলল, আবার ধর্মনিরপেক্ষতাও ছাড়তে পারল না। একটি পোস্টারে দেখেছিলাম, নৌকার ছবির নিচে নজরুল ইসলামের কবিতার উদ্ধৃতি: কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝিমাল্লা/ দাড়িমুখে সারিগান লা-শরিক আল্লাহ। আওয়ামী লীগই শুধু যে এই পরস্পরবিরোধী পথ অনুসরণ করে, তা নয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অফিসেও মিলাদ মাহফিল হয় এবং তাদের প্রার্থীর নির্বাচনী পোস্টার ও প্রচারপত্রে আল্লাহ আকবর যোগ করা হয়। সাধারণ নির্বাচনের পরে জয় বাংলা ও খোদা হাফেজেরও যোগ কিছু বেড়েছে বলে মনে হয়।

ধর্মনিরপেক্ষবাদী যে ধর্মবিশ্বাসী হতে পারবেন না, তা নয়; তবে রাজনীতিতে ধর্ম টেনে আনবেন না বলে তিনি প্রতিশ্রুতিবিদ্ধ। তিনি নামাজ পড়ুন, রোজা রাখুন, জাকাত দিন, হজ পালন করুন, মন্দিরে যান, চার্চে প্রার্থনা করুন, বৌদ্ধ ধর্মসংঘের শরণ নিন, কিন্তু এই ধর্মবোধের সঙ্গে যেন রাজনীতির সংস্রব না ঘটান, এটাই তার কাছে দাবি। এটাই যে তার করণীয় তা তিনি নিজেই জানেন ভালো করে, তবে প্রতিপক্ষের অপপ্রচারে ভীত হয়ে যা করণীয়, তা তিনি করতে পারেন না। ভয় যে শুধু অপপ্রচারে তা নয়। লোকে কী বলবে, তারও ভয়; মনে সংশয়।

কী চায় জনসাধারণ? মনে রাখতে হবে যে, সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার উচ্ছেদ কিংবা সংবিধানে রাষ্ট্রধর্মের সংযোগ জনসাধারণের দাবিতে হয়নি। শুধু ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছায় এসব ঘটেছে। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রধান দুটি দলের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে, ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধীদের (৩০.৮%) চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা (৩৩.৮৭%)। তবে বিএনপি, জামাতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের মোট প্রাপ্ত ভোটের (৫৪.৭৮%) হিসেবে বলতে হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধীরা বেশি জনসমর্থন লাভ করেছেন। ওদিকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদের নির্বাচনের ফলাফল দেখলে স্পষ্টই মনে হয়, রাষ্ট্রধর্মের পক্ষে না হলেও তরুণদের বেশিরভাগ ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে নয়।

. এ অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষবাদীর কর্তব্য কী? তিনি কি তাকিয়ে থাকবেন জনগণের অভিপ্রায় বোঝার জন্যে? তিনি কি চালিত হবেন তাদের সাময়িক মনোভাবের দ্বারা? নাকি নেতৃত্ব দিয়ে তাদের নিয়ে যাবেন তার বিশ্বাস-অনুযায়ী মঙ্গল ও কল্যাণের পথে? পাকিস্তানের দ্বিজাতিতত্ত্বের আবহাওয়ায় যারা সাহস করে বলেছিলেন, এ তত্ত্ব ভুল, অন্তত অপ্রয়োজনীয়, তাদের দৃষ্টান্ত কি পথ দেখাবে না? ১৯৪৮-এ যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাদের পক্ষে সেদিন জনসমর্থন ছিল না, তবু বিশ্বাস অনুযায়ী তারা অগ্রসর হয়েছিলেন– এ উদাহরণ কি অনুকরণীয় হবে না? মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। ধর্মরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা গোপনে লালন করে যারা আপাতত রাষ্ট্রধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের আশার পথ চেয়ে আছেন। তবে ধর্ম নিয়ে রাজনীতির পরিণাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে, তা নিশ্চয়ই তাদেরও অজানা নয়। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই একদিন এদেশের জনপ্রতিনিধিরা চেয়েছিলেন, ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনের বিষয় হয়ে থাক, রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সংস্রব ঘটিয়ে কাজ নেই– তাতে রাষ্ট্র ও ধর্ম দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বোধ যার আছে, তাকেই বলতে হবে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতায় ফিরে যাবো, যেমন ফিরে গিয়েছি সংসদীয় গণতন্ত্রে।

মানুষের জন্য ধর্ম, না ধর্মের জন্য মানুষ?

কবীর চৌধুরী

সব ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত মানবকল্যাণের ধারণা, শান্তি ও সম্প্রীতি, পরহিতব্রত। সেই আদিকাল থেকে পৃথিবীর তাবৎ ধর্মপ্রচারকরা জোর দিয়েছেন শান্তি, ভালবাসা, সেবা ও পরোপকারের উপর, আদেশ দিয়েছেন মানুষে মানুষে মিলন, সৌহার্দ্য ও সহিষ্ণুতার উপর, সঙ্কীর্ণতা ও বিভেদের উপর নয়, ঔদার্য ও মৈত্রীর উপর, আদেশ দিয়েছেন হিংসা ও দ্বেষ, লোভ ও সহিংসতা পরিহার করতে। তারা গুরুত্ব আরোপ করেছেন মানুষে মানুষে মিলন, সৌহার্দ্য ও সহিষ্ণুতার উপর, সঙ্কীর্ণতা ও বিভেদের উপর নয়, ঔদার্য ও মৈত্রীর উপর।

সব ধর্মেই কিছু পালনীয় প্রথা ও আচার আছে, কিছু আনুষ্ঠানিকতা আছে। এগুলির সার্থকতা ধর্মের প্রাণকে উজ্জল ও শক্তিশালী করার মধ্যে নিহিত। আচার অনুষ্ঠানকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে, ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালনই সব চাইতে জরুরি এই ধারণাকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিলে, ধর্মকর্ম নিষ্প্রাণ ও যান্ত্রিক হয়ে পড়ে।

তখন আর ধর্ম সব মানুষের জন্য কাজ করে না, ধর্ম সীমিত হয়ে পড়ে একটা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে, মিলনের চাইতে বিভেদের কথাই তখন বড় হয়ে ওঠে, এবং সম্প্রীতির পরিবর্তে তখন সহিংসতাই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সব চাইতে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন রাষ্ট্রীয় শক্তি এর মধ্যে নাক গলায়, ব্যক্তি মানুষের ধর্ম পালন বা না পালন করার উপর খবরদারি করার অধিকার ও দায়িত্ব যখন রাষ্ট্র নিজের উপর টেনে নেয়। মধ্যযুগে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটিই ঘটেছিল। অবশ্য পাশ্চাত্য জগতে তখন চার্চই ছিল সর্বশক্তিমান, চার্চের সংজ্ঞার মধ্যেই রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় অঙ্গনেই চার্চের ক্ষমতা ছিল সর্বব্যাপী ও চূড়ান্ত।

ধর্মীয় অন্ধত্ব, অসহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামি মধ্যযুগের ইউরোপে এক বিভীষিকাময়

পরিবেশের জন্ম দিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সেখানে খ্রিষ্টিয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানুষ একে অন্যের বিরুদ্ধে ত্রিশ বৎসরব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মকে শাসনের অন্যতম হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা হয়। রোমান ক্যাথলিক চার্চের সমর্থনে সকল রকম মুক্ত চিন্তাকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করার লক্ষ্যে এবং রাজার যাবতীয় স্বৈরাচারী কার্যকলাপকে বৈধতা দানের জন্য তখন ইউরোপে অমানবিক ব্লাসফেমি আইনের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। চার্চের একমুখী বাধ্যতামূলক মতবাদ ও শিক্ষার বিরুদ্ধে যেই প্রশ্ন তুলতো তাকেই ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে পুড়িয়ে মারা হত। ১২১৫ সালে গঠিত ইনক্যুইজিশান আদালত এই কাজটিই করে। অসামান্য সাহসী দেশপ্রেমিক ফরাসী তরুণী জোন অব আর্ক নিজের বিবেকের নির্দেশ উপেক্ষা করে ধর্মযাজকদের এক তরফা রায়কে মেন নেননি, ফলে তাকে নির্মমভাবে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। ওইভাবেই হত্যা করা হয় ১৬০০ সালে বিজ্ঞানী ব্রুনোকে, এবং ব্রুনোর পর গ্যালিলিও-ও শিকার হন ওই ব্লাসফেমি আইনের, যদিও সুচতুর আপসকামিতার সাহায্যে তিনি কোন রকমে বেঁচে যান। ধর্মকে ব্যক্তিগত কর্মের ঊর্ধ্বে তুলে তাকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করলে নানা রকম বিপত্তির সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিরা তখন নিজেদের স্বার্থে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে হিংসাত্মক ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে তুলে রক্তাক্ত সংঘর্ষের পথ সুগম করেন। মধ্যযুগে এ অবস্থা সবচাইতে বেশি ক্রিয়াশীল ছিল, কিন্তু তারপরেও এটা অবলুপ্ত হয়নি, এবং আজও বহু স্থানে এর উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূপে একটি বিশেষ ধর্মের ঘোষণা ও স্বীকৃতি দান মধ্যযুগের দিকে মুখ ফেরানোরই সামিল। অবশ্য সাধারণভাবে বর্তমান বিশ্বে ধর্মকে এখন রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে আলাদা করেই দেখা হয়, প্রতিটি মানুষ যেন স্বাধীনভাবে নিজের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী তার ধর্মমত ও পথ অনুসরণ করতে পারে, অন্য কেউ যেন তাতে বাধা না দেয়, শুধু এটুকু সুনিশ্চিত করাই আজ রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

আমরা আজকের বাংলাদেশে দেখছি ধর্মের চরম অপব্যবহার। একদিকে কতিপয় রাজনীতিক দল ও ব্যক্তি ধর্মকে হাতিয়ার করে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করছে, অন্যদিকে মৌলবাদী ধর্মান্ধ কিছু গোষ্ঠী ও ব্যক্তি ফতোয়াবাজিসহ নানা কুকর্ম দাপটের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠিত সম্প্রদায়ভিত্তিক এইসব তথাকথিত ধার্মিক মানুষেরা ধর্মের প্রাণকে হরণ করে নানা রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আজ দেশকে অসহনীয় অবস্থায় নিয়ে এসেছে। অথচ ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত দিক থেকে বাংলাদেশ একটি উদার ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী সংস্কৃতির দেশ। আমরা চণ্ডীদাস, লালন, হাসন রাজা, রমেশ শীল, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ঐতিহ্যে

লালিত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ও পরবর্তী পাকিস্তানি নয়া-ঔপনিবেশিক শাসন- শোষণের যুগে সুপরিকল্পিতভাবে ওই মানবতাবাদী চেতনা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা হয়েছিল তখন অনেক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাও হয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনের বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল দুটি ঘটনা হল ৫২'র ভাষা আন্দোলন ও ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধই চূড়ান্ত , কিন্তু অনিবার্য মুক্তিযুদ্ধের দিকে আমরা এগিয়ে গেছি ধাপে ধাপে। অলীক রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প দিনের মধ্যেই এ অঞ্চলের মানুষ উপলব্ধি করে যে শুধু ধর্ম নিয়ে একটা জাতি গড়ে ওঠে না এবং দ্বিজাতিতত্ত্ব একটা অগ্রহণযোগ্য অসার তত্ত্ব।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এদেশের মানুষের মনে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনাকে দৃঢ় করে তুলেছিল। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশে আমরা তাই স্বাভাবিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে পেলাম আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল নীতি রূপে। সংবিধানে আরও তিনটি জাতীয় মূল নীতির কথা লিপিবদ্ধ হল : জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। কিন্তু দেশের কিছু প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থপর কুচক্রী ব্যক্তি এই নীতিগুলি আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেই তারা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা একটা প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছিল। সেই কাজটি তারা করল ১৯৭৫-এর আগস্টে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে।

জাতির পিতাকে হত্যা করার পর থেকে দেশকে সুপরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের সকল ইতিবাচক মূল্যবোধে বর্জিত করার অপচেষ্টা চলছে। যে বাঙালিত্বের চেতনা স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রেরণার উৎস ছিল (স্মরণ করুন এই সব স্লোগান : জেগেছে জেগেছে বাঙালি, অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা, জয় বাংলা) তাকে ধূসর, ম্লান ও অর্থহীন করার লক্ষ্যে আমদানি করা হল উদ্ভট বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব, যা প্রকৃত পক্ষে মুসলিম সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদেরই ছদ্মবেশী রূপ। ধর্মনিরপেক্ষতা সরাসরি নির্বাসিত হল সংবিধান থেকে। প্রথমে জেনারেল জিয়ার, তারপর জেনারেল এরশাদের এবং তারপর খালেদা জিয়ার সরকার বাঙালিত্বের চেতনাকে ধ্বংস করতে, ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দিতে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধনীকে আরও ধনী ও দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করার প্রক্রিয়া এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আচার আচরণকে ছলেবলে কৌশলে নস্যাৎ করে স্বৈরাচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে সোৎসাহে ব্রতী হল। আজ বাংলাদেশের চতুর্দিকে মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতার বিকাশ ঘটে চলেছে ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়। মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার অপরিহার্য সঙ্গী হিসেবে আমরা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ

বহু স্থানে আজ দেখতে পাই নিষ্ঠুর পেশীশক্তি এবং হিংস্র সহিংসতার অবিশ্বাস্য বিস্তার। স্বাধীনতাবিরোধী ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তি তাদের রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসংগঠন নিয়ে আজ সন্ত্রাসকে একটা সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনে পরিণত করেছে। অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ছিনতাই রাহাজানি ধর্ষণ সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদির কথা নাই বললাম। অথচ সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে ক্ষমতায় আবারো দীর্ঘকাল থেকে বাংলাদেশকে একটি মধ্যযুগীয় থিওক্র্যাটিক রাষ্ট্রে পাকাপাকিভাবে রূপান্তরিত করার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু এটা কিছুতেই হতে দেয়া চলে না। মুক্তিযুদ্ধে বিপুল ত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ মানবিকতার জয় ধ্বজা উড়িয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তাকে ধর্মান্ধতার ঘূর্ণিঝড়ে কিছুতেই ছিন্নভিন্ন হতে দেয়া চলবে না। একদা যে সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিল, যারা আমাদের জাতীয়তাবাদের অন্যতম উৎস বাঙালি সংস্কৃতিকে কখনো অন্তর থেকে স্বীকার করে নেয়নি, সর্বদা যারা তাকে একটি বিজাতীয় হিন্দু সংস্কৃতিরূপেই দেখেছে সেই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহই নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মিথ্যাচার, ইতিহাস বিকৃতিকরণ, ভণ্ডামি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে সর্বব্যাপী ধ্বংস ও বিরোধের বীজ বপন করে চলেছে। এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালিয়ে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে হবে, যেখানে ধর্ম হবে মানুষের জন্য, সর্বমানুষের কল্যাণের জন্য, যেখানে মানুষ হবে না ধর্মের নামে স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার, মানুষ হবে না মৌলবাদী ধর্মান্ধদের হাতের পুতুল। আমরা বাংলাদেশকে একটি যথার্থ অসাম্প্রদায়িক মানুষের দেশ হিসেবে দেখতে চাই। অসাম্প্রদায়িক মানুষ যান্ত্রিকভাবে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালনকে গুরুত্ব দেয় না, সে গুরুত্ব দেয় মানুষের ধর্মকে, যে ধর্মে মানুষের হৃদয়ই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে হৃদয় সম্পর্কে নজরুল বলেছেন–

> 'এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট
> এই হৃদয়ই সেই নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
> বুদ্ধগয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবাভবন,
> মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়।'

আমাদের মনে পড়ে টমাস পেইনের (১৭৩৭-১৮০৯) কথা। কত আগে তিনি লিখেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি অদ্বিতীয় ঈশ্বরে, তার বেশি কিছু নয়– আমি বিশ্বাস করি মানুষের সাম্যে, এবং বিশ্বাস করি যে ন্যায়বিচার, মমতা, দয়া দাক্ষিণ্য এবং আমাদের সঙ্গী মানুষদের সুখী করার প্রয়াসের মধ্যেই ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ নিহিত– আমার হৃদয়ই আমার চার্চ'।

এটাই মানুষের ধর্ম। সত্যিকার ধর্ম। একজন মানুষ যখন তার নিজস্ব সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে এই মানবধর্মও পালন করে তখনই ধর্ম হয়ে ওঠে মানুষের জন্য।

মানবধর্মকে উপেক্ষা করে শুধু সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করলে মানুষ আর যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে না, তখন আর আমরা মানুষের জন্য ধর্মের কথা ভাবি না, ভাবি যে ধর্মের জন্যই বুঝি মানুষ। বর্তমান বাংলাদেশের দুঃসময়ে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করা অত্যাবশ্যক। যত দ্রুত ও স্পষ্টভাবে সে উপলব্ধি করবে যে মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়, দেশ তত দ্রুত রাহুমুক্ত হবে।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান কি উপাসনা-ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রদীপ দেব

১

রিলিজিয়ন (religion) আর প্রোপার্টি (property) উভয় অর্থেই আমরা ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করি, যদিও শব্দ দুটি একই অর্থবোধক নয়। এই পার্থক্যটুকু বোঝানোর জন্য রিলিজিয়ন শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে প্রবন্ধে উপাসনা-ধর্ম শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

২

প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়া আরো লক্ষাধিক প্রজাতির প্রাণী আছে। কিন্তু শুধুমাত্র মানুষই উপাসনা-ধর্ম পালন করে। কারণ মানুষ তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে উপাসনা-ধর্মের সৃষ্টি করেছে এবং তার সুফল কাজে লাগানোর জন্য নানারকম ফন্দি-ফিকির চালিয়ে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, সে কাজে মানুষ অনেকটাই সফল। মানুষ নিজেদের মতো করে সৃষ্টিকর্তার ধারণা তৈরি করে নিয়েছে বলেই মানুষের তৈরি সৃষ্টিকর্তার বেশিরভাগ আচরণই মানুষের মতো। তার রাগ আছে, অনুরাগ আছে, ঘৃণা আছে, লোভ আছে এমনকি সীমাবদ্ধতাও আছে। কারণ মানুষের তৈরি একেশ্বরবাদীদের ঈশ্বর- আরেকটি ঈশ্বর তৈরি করতে পারেন না। পশুপাখিদের মধ্যে ঈশ্বরের ধারণা থাকলে– তাদের ঈশ্বর তাদের মতই হতো। মানে ছাগলের ঈশ্বর হতো ছাগলের মত, গরুর ঈশ্বর গরুর মতই আচরণ করতো।

মানুষ অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবে বলেই নিজেদের ঈশ্বরকে অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড় বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। এজন্য তারা নানারকম ধর্মগ্রন্থে নানারকম কাল্পনিক কাহিনী-উপকাহিনীর জন্ম দিয়েছে- যেখানে দেখানো হয়েছে– জীব ও জড়বস্তু নির্বিশেষে সকলে ঈশ্বরের

ধারণা মেনে চলছে। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর ভেতরে যে ঈশ্বর বিশ্বাস কাজ করে- তা প্রমাণ করার কোন উপায় নেই।

কিছু কিছু মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। মানুষের জীবনে ঈশ্বর-বিশ্বাস একটি প্রধান সংস্কার। এই সংস্কার ভালো কি মন্দ- সেটা ব্যক্তিনির্ভর। একেক জনের ক্ষেত্রে একেকভাবে কাজ করে এই বিশ্বাস। সে কারণেই ঈশ্বর-বিশ্বাস অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের সাথে একে মেলানোর চেষ্টা করার কোন মানে হয় না। কারণ বিজ্ঞান মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে না। বিজ্ঞান অগ্রসর হয় নিজস্ব পদ্ধতিতে, নিয়ম কানুনের পথ ধরে।

৩

বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে উপাসনা-ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কমতে শুরু করেছে। উপাসনা-ধর্মকে পুঁজি করে আখের গোছানো এখন আর আগের মত সহজ নেই। একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এখন উপাসনা-ধর্মের অলৌকিক আষাঢ়ে গল্পে বিশ্বাস করে না। উপাসনা-ধর্মকে এখন বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে দেখা যাচ্ছে প্রায় সময়েই। উপাসনা-ধর্মে বিজ্ঞান আছে এটা প্রমাণ করতে পারলেই যেন প্রমাণ করা হয়ে যায় যে ধর্মই সকল বিজ্ঞানের উৎস।

ধর্মীয় মোল্লাদের অযৌক্তিক উপাসনা-ধর্ম ব্যাখ্যায় সাময়িক একটি উন্মাদনা সৃষ্টি করা গেলেও মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত শক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে বিজ্ঞান জানা কেউ- বিজ্ঞানের অধ্যাপক বা বৈজ্ঞানিক গবেষক যদি উপাসনা-ধর্মের পক্ষে বলেন- মনে করা হচ্ছে তাতে খুব কাজ হয়। তাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো মোটা অংকের পারিতোষিক দিয়ে বিজ্ঞান জানা লোক ভাড়া করছে উপাসনা-ধর্ম প্রচারের কাজে।

এক্ষেত্রে বাইবেল সমর্থনকারীরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। তারা নতুন নতুন কৌশলে বাইবেলের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটানোর লক্ষ্যে নানারকম জগাখিচুড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব যেহেতু সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে– এবং যেহেতু তা সত্য হলে বাইবেলের জেনেসিস মিথ্যা হয়ে যায়– সেহেতু প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে বুদ্ধিদীপ্ত নকসা বা ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন নামক আপাত মধুর একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের। বুদ্ধিদীপ্ত নকসা আসলে বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বকে টিকিয়ে রাখার একটি প্রাণান্তকর চেষ্টা যাতে বলা হচ্ছে, শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মেই এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে বিবর্তন সম্ভব নয়। বিবর্তন একটি জটিল বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া এবং এর পেছনে অবশ্যই রয়েছে অতি বুদ্ধিমান সত্তার অর্থাৎ ঈশ্বরের হাত। ঈশ্বরই বুদ্ধিবৃত্তিক নকশা তৈরি করে দেন আর সে নকশা অনুসারেই সব ঘটে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যতই তোমরা প্রমাণ কর না কেন

যে, বিবর্তন স্বতঃস্ফূর্ত- আমরা কিন্তু মানছি না। এ সম্পর্কিত একটি চমৎকার লেখা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে মুক্তমনায়। অভিজিৎ রায় ও বন্যা আহমেদ ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন: আমেরিকায় সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন প্রবন্ধে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের মুখোশ উন্মোচন করেছেন সুনিপুনভাবে (১)। সুতরাং বাইবেলে বর্ণিত খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সালের ২৩ অক্টোবর সকাল ৯টায় ঈশ্বর নিজের হাতে পৃথিবী সৃষ্টি করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এ জাতীয় কথার কোন বৈজ্ঞানিক সত্যতা পাওয়া যাচ্ছে না। বরং প্রকৃতিতে যে জীবাশ্ম পাওয়া যাচ্ছে তাতে বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তিই শক্ত হচ্ছে আরও।

এসব মাথায় রেখেই বাইবেলসেবীরা এগোচ্ছে সামনের দিকে। এর মধ্যেই গড়ে উঠেছে নানারকম ক্রিশ্চিয়ান সায়েনস সেন্টার। ভ্যাটিকানের পোপরা রেখে ঢেকে হলেও স্বীকার করছেন যে মধ্যযুগে ধর্মের নামে বিজ্ঞানীদের ওপর অত্যাচার করা উচিত হয়নি। এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে যে কাজটি বাইবেলসেবীরা করতে শুরু করেছে তা হলো বাইবেলের নতুন নতুন ব্যাখ্যা। কিছুদিন পরে সত্যিই দেখা যাবে বাইবেলের নতুন সংস্করণ পুরনো সংস্করণের চেয়ে আলাদা। সেখানে নতুন জেনেসিস লেখা হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।*

৪

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কিছু সুবিধা আছে। যেহেতু তাদের ধর্মের কোন একক প্রবক্তা নেই, ধর্মগ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়– এবং যেহেতু তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বেশিরভাগই আচার-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সংস্কার নির্ভর– এবং যেহেতু তাদের দেবতার সংখ্যা অসংখ্য (তেত্রিশ কোটি!) সেহেতু তারা যেকোন সময়েই তাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যা বদলে নিতে পারে। জ্যোতিষীরা যেমন ঘটনা ঘটে যাবার পরে প্রচার করতে শুরু করে যে ঘটনা ঘটার আগেই তারা তা ঘটবে জানতেন– জ্ঞান অর্জিত হবার পরে তা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কেউ কেউ তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে এই জ্ঞানের কথা খুঁজে পান। রাজীব গান্ধী নিহত হবার পরে অনেক জ্যোতিষী দাবি করেছিলেন যে, তারা তা আগেই জানতেন। পুরনো তারিখ দিয়ে নতুন সংবাদপত্র ছাপিয়ে প্রচার চালানো হয় জ্যোতিষীদের পক্ষে। ঠিক একইভাবে নতুন কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিস্কৃত হবার সাথে সাথে তা ধর্মীয় গ্রন্থে খুঁজে পাবার কথা প্রচারিত হয়।

হিন্দু জ্যোতিষীরা নবগ্রহ বলে যে নয়টি গ্রহের কথা বলেন- তা হলো রবি (সূর্য), সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। রাহু ও কেতু

*কোরানসেবীরাও পিছিয়ে নেই। সম্প্রতি বিভিন্ন ইসলামিক স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে এ ধরনের প্রোপাগাণ্ডা চালানো হচ্ছে জীববিজ্ঞান থেকে মহাজাগতিক বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব ও তথ্য কোরানেই নিহিত। বাংলাদেশের ইসলামসেবী বিজ্ঞানীরাও পিছিয়ে নেই– ড. শমসের আলী, ড. আজাহারুল ইসলাম প্রমুখরা জনগণকে ভ্রান্তপথে চালুর কাজে নিয়োজিত। – সম্পাদক মণ্ডলী

কী জিনিস তা আমি জানি না। হিন্দুধর্মে অনেক প্রবক্তার মতে রাহু আর কেতু হলো যথাক্রমে নেপচুন ও প্লুটো।(২) সে না হয় বোঝা গেলো। কিন্তু সোম আর রবি গ্রহের কী হবে? চাঁদ আর সূর্য দুটোই গ্রহ? এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা নেই। ইউরেনাস আর পৃথিবী কেন তাদের নবগ্রহে ঠাঁই পায়নি তাও জানা যায় না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জ্যোতিষীরা আধুনিক উপায়েই প্রতারণা করেন। তারা কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তথ্য না জেনেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের কথা বলেন, কসমিক রশ্মির কথা বলেন, বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। তারা ইউরেনাস নেপচুন প্লুটোর নামও নেন, আর কম্পিউটারও ব্যবহার করেন গণনা কার্যে। প্লুটো যে এখন আর গ্রহ নয়– তা জানার পরে দেখা যাবে তার পক্ষেও অনেক যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে।

৫

কোরান একদম অপরিবর্তনীয়– এরকম একটি অবস্থান নিয়ে কিছুটা বেকায়দায় আছে ইসলাম ধর্ম-বিশ্বাসীরা। সপ্তম শতাব্দির জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে লেখা কোরানের সব বাণী একবিংশ শতাব্দীতে এসেও একই রকমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। তাই যখনই দেখা যাচ্ছে কোরানে যা লেখা আছে তা মিলছে না বাস্তবতার সাথে, তখনই তাকে বাস্তবসম্মত করার লক্ষ্যে নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, কোরানে যা লেখা আছে তাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। অথচ এই একই কথা বলার জন্য অনেককেই নিগৃহীত হতে হয়েছে অতীতে। দার্শনিক আল কিন্দি (৮০১-৮৭৩) বলতেন, বিজ্ঞজনদের কাজ হচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষেরা যা প্রকাশ করতে পারেননি তা নিজদের ভাষায় এবং সমসাময়িক প্রথামত সম্পূর্ণ করা। কেতাবে সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য যেসব কথা বলা হয়েছে তা যেখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে বড় ভুল হবে। জান্নাতের হুর ও অন্যান্য আকর্ষণীয় বস্তুকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কোরানে যখন বলা হয়, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পর্বতমালা, বৃক্ষ, পশুপাখি আল্লাহকে সিজদা করে তখন সিজদার অর্থ ধরতে হবে মান্য করা, সত্যি সত্যি সর্বাঙ্গ প্রণিপাত করা নয়।' এসব কথা আজকাল যারা কোরানে বিজ্ঞান খুঁজে বেড়ান- তারা খুবই বলেন। অথচ একথা বলার অপরাধে ষাট বছর বয়সী দার্শনিক আল কিন্দিকে সেদিন ৫০ দোররা মারা হয়, আর জনতা সোল্লাসে সেই শাস্তিদান উপভোগ করে।(৩)

৬

একথা সত্য যে সকল ধর্মগ্রন্থেই কিছু ভাল ভাল নৈতিক ও দার্শনিক কথাবার্তা আছে। কিন্তু সেগুলোকে একবারে বিজ্ঞান বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করাটা আসলেই বোকামী। কারণ উপাসনা-ধর্ম বড়জোর কিছু ন্যায়নীতি ভালমন্দের কথা বলে– সৃষ্টিতত্ত্বের কথাও বলে যা বিজ্ঞান নয় মোটেও। কারণ বৈজ্ঞানিক সত্য হলো বস্তুনিষ্ঠ যা সবার জন্যই সত্য। কিন্তু ধর্মীয় সত্য হলো সাম্প্রদায়িক। ইসলামে কিছু কিছু জিনিস হারাম– যা হিন্দুধর্মে হালাল। আবার হিন্দুদের কিছু কিছু হারাম জিনিস– মুসলমানদের জন্য হালাল। বিজ্ঞানে এরকম কোন ব্যাপার থাকতে পারে না। উপাসনা-ধর্মে ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই সর্বশক্তিমানেরও সাধ্য নেই প্রাকৃতিক ধর্মকে অস্বীকার করার। বৈজ্ঞানিক সত্যের কাছে উপাসনা–ধর্ম যেভাবে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে- তাতে সন্দেহ নেই যে, উপাসনা-ধর্ম বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চাইবে। সে কারণেই উপাসনা-ধর্মের পৃষ্ঠপোষকেরা ধর্মের কেতাবে বিজ্ঞান খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কারণ তারা জেনে গেছেন যে উপাসনা-ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান টিকে থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞান ছাড়া উপাসনা-ধর্মের টিকে থাকার কোন উপায় নেই।

তথ্য সূত্র

১. অভিজিৎ রায় ও বন্যা আহমেদ (ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন : আমেরিকায় সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন www.mukto-mona.com/articles/bonna/part 10-ID.pdf
২. সংযোজিত টীকা দেখুন (সম্পাদক)

সংযুক্ত টীকা : রাহু-কেতু উপাখ্যান

বিষ্ণুপুরাণের মতে রাহু ছিলেন একজন দৈত্য বা দানব, তার পিতা ছিলেন বিপ্রাচিত্তির, আর মাতা ছিলেন সিংহিকা। সিংহিকা ছিলেন দিতির কন্যা। পুরাণের কাহিনী মতে, দেবতা-দানবের যৌথ সমুদ্র মন্থনে উত্থিত অমৃত যখন দৈত্যদের বঞ্চিত করে দেবতাদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছিল, সে সময় রাহু দেবতার ছদ্মবেশে দেবতাদের সাথে মিশে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার এই ছদ্মবেশ সূর্য ও চন্দ্রের চোখে ধরা পড়ে। রাহু যখন অমৃত পান করছিল এবং গলা পর্যন্ত পৌঁছানোর মুহূর্তে সূর্য ও চন্দ্র বিষ্ণুকে রাহুর এই ছদ্মবেশের কথা জানিয়ে দিলে বিষ্ণু তার সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহুর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কিন্তু যেহেতু স্বল্প পরিমাণ হলেও রাহু অমৃত পান করেছিল তাই তার খণ্ডিত মস্তক ও দেহ অমর রয়ে গেল। কর্তিত মস্তকটিকে বলা হয় 'রাহু' আর মস্তকহীন দেহকে বলা হয় কেতু। পুরাণ মতে তখন থেকে রাহু ও কেতু সৌর মণ্ডলের সদস্য হয়ে সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গী হয়ে

সতত আকাশে বিচরণ করতে থাকে। এ কারণেই হিন্দু জ্যোতিষীদের আকাশ গণনায় গ্রহের সংখ্যা নয়টি– রবি (সূর্য), সোম (চন্দ্র), বুধ, মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি, শনি, রাহু আর কেতু। এরা সবাই পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকার কক্ষে পরিভ্রমণরত। বিষ্ণুপুরাণ বলে যে সূর্য ও চন্দ্রের ওপর রাহুর তখন থেকেই ক্রোধ, সেজন্য গ্রহণ কালে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করলে চন্দ্র গ্রহণ হয়, আর সূর্যগ্রহণের সময় রাহু সূর্যকে গিলে ফেলে। কিন্তু যেহেতু রাহুর কোন দেহ নেই তাই রাহু চন্দ্র বা সূর্যকে হজম করতে পারে না, কর্তিত গলা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফলে গ্রহণ শেষ হয়।

মহাভারতেও এই উপাখ্যানের বর্ণনা রয়েছে। সেখানে এও বলা হয়েছে যে বিষ্ণু কর্তৃক রাহুর মস্তক ছিন্ন হলে "রাহুর পর্বত-শিরাকার প্রকাণ্ড মস্তক ছেদনমাত্রে গগণ মণ্ডলে আরোহণ করিয়া ভীষণ-নাদে গর্জন করিতে লাগিল। তাহার কবন্ধকলেবর সকাননা সদ্বীপা সপর্বতা বসুন্ধরাকে কম্পিত করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তদবধি চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত রাহুমুখের চিরশত্রুতা জন্মিল। এই নিমিত্তই অদ্যাপি এই রাহু মুখ তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে।" এই হল চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের পৌরাণিক ব্যাখ্যা।

এতো গেল পুরাণের গল্প। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষীরা রাহু ও কেতু বলে যে দুটি তথাকথিত গ্রহের(?) উল্লেখ করে থাকে তার বাস্তবে অস্তিত্ব কোথায়? সূর্য পৃথিবীর ওপর সমান্তরাল আলো ফেলার কারণে তার বিপরীতে একটি ছায়া-শঙ্কু (Shadow cone) সৃষ্টি করে। পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের আপাত বার্ষিক গতির কারণে এই ছায়া শঙ্কুটিও রবিমার্গে ঘুরতে থাকে। রবিমার্গে সূর্যের গড় গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ১৮.৫০ মাইল। পৃথিবী ও সূর্যের কেন্দ্র সব সময় রবিবৃত্ত তলে অবস্থান করে। পূর্ণিমার সন্ধিক্ষণে চন্দ্রপথের পথে রবিবৃত্তের সমকোণে ধৃত সমতলে ছায়া-শঙ্কুটি একটি ছায়াবৃত্ত সৃষ্টি করবে। এই ছায়াবৃত্তটি সেই মুহূর্তে ঐ অবস্থানে থাকা চন্দ্রের পৃষ্ঠে পতিত হলে চন্দ্র গ্রহণ হয়, তবে এ সন্ধিক্ষণে সূর্য-পৃথিবী ও চন্দ্র মোটামুটি একই সমতলে থাকে। হিসেব করে দেখানো যায় যে, পৃথিবীর ছায়া-শঙ্কুটির দৈর্ঘ ৮৫৯,০০০ মাইল এবং ঐ স্থানে ছায়াবৃত্তটির ব্যাসার্ধ ২,৮৫৯ মাইল, অন্যদিকে চন্দ্রের ব্যাসার্ধ ১০৮২ মাইল। তাহলে দেখা যাচ্ছে ২৮৫৯ মাইল ব্যাসার্ধের একটি ছায়া গোলক পৃথিবীর চারদিকে গ্রহ সদৃশ ঘুরতে থাকে, আর একেই হিন্দু জ্যোতিষীরা নাম দিয়েছে রাহু গ্রহ। কেতুর রহস্যটি অনেকটাই ধোঁয়াশে। পুরাণে গ্রহণের ব্যাপারে কেতুর কোন ভূমিকার কথা বলা নেই। পুরাণের কল্পনায় রাহু চন্দ্র ও সূর্যকে পুর্ণিমায় ও অমাবস্যায় গ্রাস করলে যথাক্রমে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়। বস্তুত অমাবস্যার সন্ধিক্ষণে চন্দ্রের ছায়াশঙ্কু পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা সূর্যকে দেখতে পায় না– এটিই হল সূর্যগ্রহণ। পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্র ঘুরতে থাকলে ছায়া-শঙ্কুটিও পূর্বদিকে ঘুরতে থাকে মোটামুটি প্রতি ঘণ্টায় ২১০০ মাইল বেগে। যেহেতু বিষুব রেখায় পৃথিবীর ঘূর্ণন মোটামুটি প্রতি ঘণ্টায় ১০৪০ মাইল, তাই ছায়া শঙ্কুটির কার্যকর বেগও প্রতি ঘণ্টায় ১০৪০ মাইল। চন্দ্রের এই ছায়া বৃত্তটিকে হয়তো হিন্দু জ্যোতিষীরা কেতু নামে গ্রহের মর্যাদা দিয়েছিল। হিসেব করে দেখা গেছে চন্দ্রের ছায়া-শঙ্কুটির দৈর্ঘ ২৩২,৪৯৬

মাইল। আশ্চর্যের বিষয় হিন্দু জ্যোতিষ astrology চর্চায় রাহু ও কেতুর উল্লেখ থাকলেও, ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় astronomy কিন্তু এ দুটি গ্রহের কোন উল্লেখ নেই। বৈদিক আমলে ৫টি জ্যোতিষ্ককে গ্রহের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল যথা রবি (সূর্য), সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্র। সিদ্ধান্ত আমলে আর্যভট্ট, বরাহমিহির প্রমুখ জ্যোতির্বিদরা আরও দুটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছিলেন– বুধ ও শনি। দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় গ্রহের তালিকায় এই ৭টি জ্যোতিষ্কেরই নাম ছিল, রাহু বা কেতুর কোন উল্লেখ নেই।

(দ্রষ্টব্য, পৌরাণিক অভিধান, সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত, ষষ্ঠ সংস্করণ মাঘ, ১৩৯৬, পৃষ্ঠা ১২৭ ও ৪৭৪; মহাভারত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২, কালীপ্রসন্ন সিংহ)।

– অজয় রায়

তৃতীয় অধ্যায়

অন্যান্য প্রসঙ্গ

শিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যম

হাসান আজিজুল হক

দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা সব স্তরেই শিক্ষার মান নিদারুণ নেমে গেছে একথাটা এখন সবাই আপ্তবাক্যের মতো বলেন বটে, কিন্তু এই নেমে যাওয়াটা যে কোন অধঃপতনে যাওয়া তা নির্ণয় করা এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করার কোনো উদ্যম আজ কোথাও আছে বলে মনে হয় না। যেহেতু অ-তল, অর্থাৎ তল বলে কিছু নেই সেজন্য এই নেমে-যাওয়াটা কোথাও বাধা পাচ্ছে না। কৃমি-কীটে খাওয়া কবরস্থ লাশের চেহারা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার। নিজের অভিজ্ঞতায় তার অকাট্য প্রমাণ পাচ্ছি। শিক্ষা বা জ্ঞান আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কোথাও নেই। ছাত্রছাত্রী হিসেবে প্রতি বছর যাদের দেখা পাচ্ছি তারা যেন শিক্ষার্থী হিসেবে আগের বছরের তুলনায় এক সাইজ করে খাটো। অর্থাৎ অধঃপতনটা স্থির নয়, প্রগতিশীল! প্রতি বছরই ক্লাস-কক্ষে, টিউটোরিয়াল ক্লাসে, মৌখিক পরীক্ষায় এবং সর্বশেষে পরীক্ষার খাতায় ছাত্রছাত্রীরা চূড়ান্ত অধঃপতন এবং অবনমনের অমোচনীয় স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন। ব্যতিক্রমধর্মীদের সম্মান জানিয়ে এবং তাদের বাদ দিয়ে বলি শতকরা ৯৫% ভাগ ছাত্রছাত্রী, বই-পুস্তক, পুঁথি গ্রন্থের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন না। কতোই বা তাদের বয়স, তবু এই বয়সেই বই-পত্রের সঙ্গে সম্পর্ক কবেই চুকিয়ে-বুকিয়ে দিয়েছেন। ক্লাশ-কক্ষে বই তো দূরের কথা, অনেকে খাতা-কলমটিও সঙ্গে আনেন না। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, বই-পত্র তাঁরা পড়েন না, পড়ে তেমন সুবিধেও হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার সময়ে বিদ্যার যে পুঁজিটা তাদের ছিল, সেটা বিনিয়োগ করে কোনো লাভ হয় না অর্থাৎ কোনো বই-ই আয়ত্ত তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথম দিকে শুনে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল (এখন অনেকটা সামলে নিয়েছি) যে তাঁরা নোট বইও পড়েন না। তাহলে? তাহলে তাঁরা কি করেন, কেমন করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন? উত্তর খুবই সোজা। তাঁরা তাঁদের অগ্রপথিক যাঁরা, অর্থাৎ যাঁরা এক দুই তিন চার পাঁচ দশ বছর আগে পাস

করে গেছেন, তাঁদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি– পিনআঁটা ফুলস্কেপে লেখা প্রশ্নোত্তরের নোট সংগ্রহ করেন এবং প্রতি বিষয়ের গত চূড়ান্ত পরীক্ষার দশটি প্রশ্ন সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ও তার আগের তিন চার বছরের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরামর্শ করে দশ বারোটি উত্তর আয়ত্ত করে পরীক্ষায় লিখে দিয়ে আসেন। ব্যস, এইটুকুই। সকলেই জানেন আধুনিক প্রযুক্তি অত্যাশ্চর্য ফলদায়ক, সর্বকর্মসাধক। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের রেখে যাওয়া নোটের ফটোকপি তৈরি বা সংগ্রহ করে নেওয়া একশোভাগ শিক্ষার্থীর পক্ষেই সম্ভব। যে প্রাক্তন ছাত্র বা ছাত্রীর নোট এইভাবে সংগৃহীত হলো, সেটি প্রমাদপূর্ণ হতে পারে, তার তথ্যগুলি ইতোমধ্যে বাতিল হয়ে যেতে পারে, জায়গায় জায়গায় কীটদষ্ট হতে পারে, মুছে যেতে পারে, ছিঁড়ে যেতে পারে, তবু কোনো কিছুরই পরোয়া না করে এঁরা এগুলিকেই শেষ অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরে থাকেন। ক্লাশে যাওয়া, শিক্ষকের কাছে যাওয়া, তাঁদের আপ্রাণ প্রয়াস আদায় করে নেওয়া কোনো কিছুতেই ছাত্রছাত্রীদের সম্ভবত কোনো প্রয়োজন নেই। কাজেই শিক্ষা কর্মকাণ্ডের কদর্যতম ফলটি পরিপক্ব হয়ে শোভা পেতে থাকে চূড়ান্ত পরীক্ষার উত্তরপত্রে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাণ্ডজে দলিলে!

তাই, যত কাম্যই হোক 'অন্বেষণ'-এর জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে লেখা পাওয়া সুদূরপরাহত হতে থাকবেই। পরিস্থিতি আজ এমনিই দাঁড়িয়েছে। তবে এর পুরো দায়টা কি ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপিয়ে দিয়েই নিশ্চিত হওয়া যাবে? সব দায়িত্ব যথাযথ পালিত হচ্ছে বলে আমরা শিক্ষকরা কি বিবেক ধুয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি? এমন বিষময় পরিস্থিতির গ্লানি কি আমাদের এতটুকু স্পর্শ করবে না? অবশ্য এসব প্রশ্নই শুধু আমরা তুলতে পারি, সমাধান দিতে পারি না। কারণ সমাধান কোনো এক পক্ষের কাছে নেই। আরও পক্ষ আছে।

এখন দেখা যাচ্ছে 'অন্বেষণ'-এর একটা সাধারণ সম্পাদকীয় লিখতে বসে আমি জটিল একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি। কাজেই আরও কিছু কথা না বললেই নয়। ছাত্রছাত্রীদের কথাই আগে বলি। চমৎকার, মনধাধানো ফল করে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক উৎরে এসে উচ্চ শিক্ষায় ঢুকেই ছাত্রছাত্রীরা মর্মে মর্মে টের পায় তারা অথৈ সাগরে এসে পড়েছে, কোনোদিকেই কূলকিনারা নেই। উচ্চ শিক্ষার প্রধান একটি অবলম্বনই তাদের নেই। সেটি হল কাজ চালানোর মতো আয়ত্ত করা একটি বিদেশী ভাষা এবং আমাদের দেশের বেলায় সে ভাষা হল ইংরেজি ভাষা। কথাটা সরাসরি বলে ফেলা গেল। নানা বিতর্ক থাকলেও, বহুরকম প্রসঙ্গ এর সঙ্গে জড়িয়ে গেলেও এই কথাটি সবাই জানেন, মেনেও নেন। কিন্তু এই একটি বিদেশী ভাষার অবলম্বন না থাকায় ক্ষতিটা যে কতোটা অতলস্পর্শী হয়ে উঠেছে, এই অভাব যে কর্কট রোগের মতোই শিক্ষা ব্যবস্থার পুরো দেহটাকে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে তা ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, সরকার, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী কেউ-ই পুরোপুরি

হৃদয়ঙ্গম করেন বলে প্রমাণ নেই। জানি, এই মুহূর্তে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা বললে প্রায় সকলেই তীব্র প্রতিবাদ করবেন। কেউ আদর্শের কথা তুলে আমাকে দুয়ো দেবেন, বাংলাভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা, আনুগত্য নেই বলে ধিক্কার জানাবেন, বাঙালি জাতির দীর্ঘ রক্তাক্ত লড়াইয়ে আমি বিশ্বস্ত নই বলে অভিযোগও করবেন। অন্যদিকে, অভিভাবকরা, বিশেষ করে খোদ ছাত্রছাত্রীরাই একরকম সুবিধাবাদের ফাঁদে পড়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। ছাত্রছাত্রীরা প্রথমেই ধরে নেবেন এইরকম বদ-উদ্যোগের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাঁদের পাস করা এবং ডিগ্রি পাওয়ার পক্ষে চূড়ান্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। কেউ-ই তলিয়ে ভাববেন না, কেউ-ই বাস্তবকে দেখবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও অনেকে এর প্রতিবাদ করবেন। প্রথমত জ্ঞানচর্চার জন্য অসম্ভব কষ্টকর পরিশ্রম করা এবং উন্নতমানের মেধা নিয়োগের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যে আরামে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তাঁরা, সেটা হারানোর আশঙ্কায় এবং হয়তো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, শস্তা বাজারি বই লিখে কিছু উপার্জনের পথ বন্ধ হওয়ার উপক্রম দেখে। আমার ধারণা যত দিন যাবে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে আসা শিক্ষকদের মধ্যে এই প্রবণতা আরও বাড়বে। অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার দর্শনমাত্র কম্প দিয়ে জ্বর আসবে। বলতে প্রলুব্ধ হই যে আজ এদেশে বাংলা ভাষার প্রতি ঘোষিত মমতাটি একবারেই শস্তা ও মেকি। এর মধ্যে সততা যে নেই তা বোঝা যায় ছাত্রছাত্রীসহ সারাদেশে শিক্ষিত মানুষদের ব্যবহৃত বাংলাভাষার অবর্ণনীয় দুর্দশা দেখে। মাতৃভাষার প্রতি এরকম অসার, নিস্তেজ, নিরুৎসাহজনক, উদাসীন মনোভাব অন্য দেশে কল্পনা করাও কঠিন।

আমরা সবাই জানি পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত ও সভ্য দেশে অন্তত একটি, অবস্থাবিশেষে একাধিক, বিদেশী ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে শিখতেই হয়। কোনো শিক্ষার্থীরই এ থেকে নিস্কৃতি নেই। ভাষাগুলি তো মানবসৃষ্ট জাগতিক ও মানসিক সৃষ্টিভাণ্ডারে ঢোকার এবং তার বিচিত্র বৈভবকে আয়ত্ত করার দরজা! ভাষার ভিতর দিয়েই সারা বিশ্বের মানুষের পরস্পর চেনা-জানা ঘটে। দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আমাদের পক্ষে ইংরেজি ভাষাটি হয়ে দাঁড়িয়েছে একমাত্র বিদেশী ভাষা। এটা এরকম ইতিহাসই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। প্রধানত এই একটি ভাষার দরজা দিয়েই আমাদের আজ বাইরের পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে ঢুকতে হবে। কাজেই, শিক্ষার মান যে এতটা নেমে গেছে, আমার মতে, তার আশিভাগ কারণই হচ্ছে এই একটি বিদেশী ভাষা কাজ চালানোর মতো ভালোভাবে শিখতে না পারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁর শিক্ষাদানের বিষয় নিয়ে ভাবলেই দেখতে পাবেন এর প্রায় নব্বই ভাগ আমাদের দেশে, দীর্ঘ দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ইংরেজি ভাষার জালে আটকে আছে। এটা কাম্য হোক আর না

হোক বাস্তব এটাই। দর্শন বিভাগের কেউ যদি সত্যি সত্যি সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল সম্পর্কে জানতে চায়, আধুনিক যুগের চিন্তার ইতিহাসটা আয়ত্ত করতে চায় দেকার্ত, স্পিনোজা, লিবনিৎস, লক, হিউম, বার্কলে, কান্ট, হেগেলের রচনা বা রচনার টীকাভাষ্য পড়ে, তাহলে ইংরেজি জানাটা তার জন্য বাধ্যতামূলক। ঐসব দার্শনিকের মূল রচনা পড়ার আকাঙ্ক্ষার কথা ছেড়ে দিচ্ছি। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই– সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান– সোজা কথায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের যে জ্ঞানভাণ্ডারে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে, আমাদের কপালবৈগুণ্যে তা বাঁধা পড়ে আছে ইংরেজি ভাষার কাছে। কোনো বিকল্প নেই এটা না শেখার। যাঁরা বাংলা ভাষা নিয়ে অতিচেতন, তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা: এই যে বিশাল ভাণ্ডারটির কথা বলা হলো, আমাদের নিজেদের ভাষার বাইরে যেতে না চাইলে তার কতোটা ছাত্রছাত্রীদের পাইয়ে দেওয়া যায়? পশ্চিমবঙ্গে যে অল্প কিছু কাজ হয়েছে, দেশগর্বে স্ফীত হয়ে যদি তার সাহায্য আদৌ না নিতে চাই, তাহলে বাংলাদেশের ব্লিৎসমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, লেখক, বুদ্ধিজীবী, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পেশার মানুষ বাংলাভাষার যে ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন তা কি যথেষ্ট? তা কি মানসম্পন্ন, তা কি প্রচুর ও মৌলিক, তা কি বেনিয়াবৃত্তি থেকে মুক্ত? এইসব তিক্ত প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে 'না'। প্রয়োজনে শতকরা দশভাগও মিলবে না দেশিয় ভাষার ভাণ্ডার থেকে। এর ফল যে কি রকম ভয়াবহ তা শিক্ষকদের সকলেই চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষে ছাত্রছাত্রীদের রচিত উত্তরপত্র থেকেই বুঝতে পারেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় উদার, খালি হাতে বড় একটা কেউ ফিরে যায় না। আগের তুলনায় অনেক বেশি ছাত্র-ছাত্রী আজকাল কপালে জয়টীকা পরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যান।

এবার সম্পূর্ণ উল্টো একটা কথা বলব। সব উন্নত দেশই শিক্ষার প্রায় শুরু থেকে একটি বা একটির বেশি বিদেশী ভাষা শেখা আবশ্যিক করলেও শিক্ষার একেবারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যমটা রেখে দেয় মাতৃভাষা। তার মানে যা-ই পড়ো আর যত বেশি সংখ্যক ভাষাতেই পড়ো বা শেখো, শিক্ষাদানটা সব সময়ই হবে মাতৃভাষায়। সব পরীক্ষাই দিতে হবে ওই নিজের ভাষায়। এর ব্যত্যয় চলবে না। ইউরোপ আমেরিকা ও এশিয়ার বড়ো বড়ো দেশ– প্রাক্তন রুশ প্রজাতন্ত্র, জাপান, চীন ইত্যাদি সবদেশেই এই ব্যবস্থা। মাতৃভাষায় শিক্ষা– শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। শিক্ষা শেষ করে শিক্ষার উচ্চতম পর্যায় অতিক্রম করার পরে, পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার অভিপ্রায় হচ্ছে একজন ইংরেজ হবে একজন ইংরেজ, জার্মান হবে জার্মান, রুশ হবে রুশি, জাপানি হবে জাপানি। শিক্ষা শেষ করে একজন ইংরেজ জার্মান বা ফরাসি হয়ে উঠবে এটা কেউ কামনা করে না– সে শিক্ষিত ইংরেজই হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। তেমনি শিক্ষা শেষে একজন বাঙালি

বাঙালিই হবে, ইংরেজির ভিতর দিয়ে পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছে বলে সে ইংরেজ হয়ে যাবে না। আমাদের বেলায় এটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সমগ্র উপমহাদেশেরই ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক ব্যাপার ঘটায় বাধা ছিল। এ আমাদের ঐতিহাসিক দুর্ভাগ্য যে উপমহাদেশ গ্রেট ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল। ইংরেজি ভাষাই হয়ে গেল আমাদের বিধিলিপি। এই ভাষার বিষ ও অমৃত এখন আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। জার্মান, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালির উপনিবেশগুলো মূলত উপনিবেশিক শাসকদের ভাষাই নিজেদের দেশে শিক্ষার বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এশিয়া আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশকেও তাই করতে হয়েছিল। উপমহাদেশেও তাই ঘটেছে। খুব উন্নত ও যোগ্য উপমহাদেশীয় ভাষাগুলি থাকা সত্ত্বেও। বাংলার মতো এমন একটা উন্নত ভাষাকেও এই মার খেতে হল। এটা একটা কলঙ্কই বটে। এই কলঙ্ক এমনি অনপনেয় হয়েছিল যে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে চলে গেলে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরও এই ইংরেজিকে আমাদের শিক্ষার মাধ্যম করে রাখা হয়েছিল। এত গুরুত্ব তাকে শাসকরা দিয়েছিল যে দেশের মানুষ যেন মাত্র দুভাগে বিভক্ত– ইংরেজি জানা আর ইংরেজি না-জানা। ইংরেজি জানা মানেই সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতা, বিত্ত সবই। আর না-জানারা প্রায় মানুষ বলেই গণ্য নয়। আমরা ইংরেজিতে পড়েছি, ইংরেজিতে পড়িয়েছি, ছাত্রছাত্রী ইংরেজিতে পরীক্ষা দিয়েছে কিন্তু তাতে আমাদের সম্মান বাঙালি জাতি হিসেবে বাড়েনি, সব সময়ে একটা হীনম্মন্যতা কাজ করেছে। ইংরেজি ভাষাটা 'status symbol' হয়ে যাওয়াতে সাধারণ মানুষের জন্য এই ভাষা না জানাটা অবমাননাই বয়ে এনেছে। ইংরেজি ভাষা হয়ে গেছে প্রভুর ভাষা। এই দিক থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুতেই যথার্থ, সঙ্গত ও আত্মমর্যাদাকর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে বাংলাই হবে শিক্ষার সর্বস্তরের একমাত্র বাহন। সবদিক থেকে সঙ্গত ছিল এই সিদ্ধান্ত– বাংলা ভাষার মান ও যোগ্যতার দিক থেকে, বাংলাদেশের নিজস্ব ইতিহাসের দাবির দিক থেকে, শিক্ষার ভিতরের শক্তিকে শিক্ষার্থীর ভিতরে পরিবাহিত করার দাবির দিক থেকে। আত্মমর্যাদাশীল সব উন্নত দেশ যে তাদের আপন আপন মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করেছে তা শুধুমাত্র দেশগর্ব, জাতিগর্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের দাবির জন্যই নয়, আদতে প্রকৃত শিক্ষা সম্ভবই নয় আপন ভাষার মাধ্যম ছাড়া। খাদ্যের পুষ্টি যেমন রক্তে মেশে এক অভ্যন্তরীণ বিক্রিয়ার মতো, শিক্ষাও তেমনি ব্যক্তির নিজস্ব অর্জন হয়ে ওঠে মাতৃভাষার মাধ্যমে।

প্রশ্ন ওঠে আমরা বিপদে পড়লাম কেন? মাতৃভাষা সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে এটা যেমন স্বাভাবিক, একটি বিদেশী ভাষা, আমাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা, অবশ্য শিক্ষণীয় হবে– অন্তত প্রাথমিক শিক্ষার পর থেকেই– এটাও তেমনি স্বাভাবিক। তাহলে কেন শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিপর্যয়? উত্তর খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না।

উন্নত দেশগুলি জানে তাদের মাতৃভাষা সব দিক থেকেই যোগ্য, শিক্ষার যে বিশাল ভাণ্ডারটি শিক্ষার্থীর জন্য অবশ্যলভ্য, তার প্রায় সবটাই তার নিজের ভাষার মধ্যে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত। তাকে শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেবার জন্য ভাষা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কারণ তা জীবন্ত, চর্চিত, সদা ও সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত। আমাদের মুশকিল ঠিক এখানেই। বাংলা ভাষাও যোগ্য, খুবই যোগ্য। কিন্তু তা ভাষা হিসেবে– অনেকটা ফলার্জন-সাপেক্ষ সম্ভাবনা হিসেবে। সম্ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য সদ্য স্বাধীন দেশে বাংলাভাষা নিয়ে, সর্বক্ষেত্রে তার প্রচলন-উদ্যোগ নিয়ে একটি মহাপরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল। কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে বাংলার প্রচলন যেমন তেমনি, বা তার চেয়ে বেশি ছিল গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় এর ব্যাপক চর্চা ও ব্যবহার নিয়ে। সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক কোথায় সে সম্পর্কে সৎ, নির্ভীক ও সৃষ্টিশীল ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির অভাবের ফলেই আজ পর্যন্ত তেমন সর্বব্যাপী পরিকল্পনা দেখতে পাওয়া গেল না। বাংলাভাষার যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। পৃথিবীর হাজার হাজার ভাষার মধ্যে পঞ্চম এই ভাষা, কথা বলে বিশ কোটির বেশি মানুষ। তবুও এ কথাটা সত্য যে, সমাজ যখন মৃত, ভাষাও তখন মৃত, সমাজ যখন জীবন্ত ও কর্মশীল, ভাষাও তখন জীবন্ত ও কর্মশীল। এই কথাগুলি নেহাত আপ্তবাক্য নয়। ভাষা এক অদ্ভুত সূচক, সবচেয়ে স্পর্শকাতর সূচক। সব বিষয়ে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে ভাষাই দেখিয়ে দেবে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। যে সমস্ত দেশ মাতৃভাষা ছাড়া শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিজ্ঞানে, চিকিৎসায় অন্য কোনো ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে নেবার কল্পনাও করতে পারে না, তারা নিশ্চিত থাকে যে সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার তাদের ভাষায় মজুত আছে এবং এই মজুত থাকার বিষয়টি প্রতি মুহূর্তে চলিষ্ণু। বাংলাদেশের পরিস্থিতি যে নানা কারণে তেমন ছিল না, তা জানার পরেও শুধুমাত্র সস্তা আবেগের বশীভূত হয়ে বা ফাঁকা জনপ্রিয়তার মোহে দেশের শাসকগণ এ পর্যন্ত বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করে দিয়ে নিশ্চেষ্ট থেকেছেন। দেশ স্বাধীন হবার একত্রিশ বছর পর আজ যে ভয়ানক শূন্যতার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তাতে মনে না হয়ে পারে না যে, শিক্ষার প্রতি, জাতির প্রতি চরম অবহেলা দেখানো হয়েছে। প্রথম কাজটিই ছিল, যে বিশাল জ্ঞানচর্চা কাণ্ড– আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শুরু করতে হবে তার সবটা অন্য ভাষা থেকে, প্রধানত ইংরেজি ভাষা থেকে আমাদের ভাষায় অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, আর সেটাকে একটা চলন্ত প্রক্রিয়ায় রূপ দেওয়া। এই কাজ করার জন্য দশ বছর, বিশ বছর মেয়াদি একটি জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সারাদেশের মেধা, অন্য কোনদিকে দৃকপাত না করে এই কাজে নিয়োজিত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ কাজের কেন্দ্র হতে পারত বিশ্ববিদ্যালয় বা বাংলা

একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান; এগিয়ে আসতে পারত নানা সরকারি বেসরকারি সংস্থা, উঁচু পর্যায়ের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। দেখা যাচ্ছে সেরকম কিছুই হয়নি। পাশাপাশি আর একটা পথ ছিল। ইংরেজি ভাষার বইগুলির মানের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে বাংলা ভাষাতেই মৌলিক গ্রন্থ রচনা করে উচ্চ শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসা। কিছুই হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা উচ্চ শিক্ষায় প্রয়োজনের তুলনায় অনুবাদ হয়েছে সামান্য। যা হয়েছে তার বেশির ভাগ অক্ষম অনুবাদ। আর মৌলিক গ্রন্থ যা রচিত হয়েছে সেদিকে চাইলে শিক্ষিত মানুষের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠবে। এসব বই নকল, অনুকৃত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চৌর্যবৃত্তি, কিংবা বিদেশী বইয়ের আদলে রচিত ও গ্রাম্য পণ্ডিতিতে পরিপূর্ণ। এসব গ্রন্থের একটা বিরাট অংশ বিদ্যাব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত। সম্মানিত ব্যতিক্রম ছেড়ে দিলে এসব কথা একটুকুও মিথ্যা নয়, নির্জলা সত্য। এর ফল হয়েছে মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। ছাত্র-শিক্ষক উভয় দিক থেকেই ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে যাওয়াটা প্রায় আঙ্কিক নিয়মে ঘটছে। শিক্ষকরা ধীরে ধীরে ঠেকনো দিয়ে শিক্ষকতা চালানোয় অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। কারণ তাঁরা জানেন তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের যত কম জানাবেন ততই ওদের মঙ্গল। বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন শিক্ষক নিজের জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গত বিকাশ ঘটিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে তার প্রতিফলন যতই আশা করবেন ততই নিরাশ হবেন, ছেলেমেয়েরা ততই পরীক্ষায় ব্যর্থ হবেন। 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' যেসব শিক্ষক পণ্ডিত এবং সৎ তাঁদের আজ চুল ছিঁড়তে দেখি, যাঁরা পরিস্থিতি মেনে নিয়েছেন, অনর্থক আর নিজের বিদ্যাবুদ্ধিকে নাড়াচাড়া করতে চান না তাঁরাই নিরুদ্বেগে থাকবেন, শান্তিতে থাকবেন। শিক্ষার বর্তমান বিষময় চাকা এখন পুনর্বৃত্ত ঘুরে এসেছে।

হাইপেশিয়া : এক বিস্মৃতপ্রায় গণিতজ্ঞ নারীর বেদনাঘন উপাখ্যান

অভিজিৎ রায়



হাইপেশিয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতা সৃষ্টির পেছনে নারীর ভূমিকা একদমই স্বীকার করেননি। তিনি বলেন:(১) 'সাহিত্য কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধি ব্যবস্থায় মিলিয়ে আমরা যাকে সভ্যতা বলি সে হল পুরুষের সৃষ্টি।' আবার ভলতেয়ার নারীর মননশীলতা, শক্তিমত্তা আর বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বীকার করে নিলেও প্রবলভাবেই অস্বীকার করেন নারীর উদ্ভাবনী শক্তিকে। তিনি দাবি করেন(২)

'ইতিহাসে জ্ঞানবতী নারী খুঁজলেই পাওয়া যাবে, এমনকি পাওয়া যাবে নারী-যোদ্ধার অস্তিত্বও, কিন্তু কোথাও নারী উদ্ভাবক পাওয়া যাবে না।'

বলতেই হয়- রবি ঠাকুর এবং ভলতেয়ার দুজনই ছিলেন ভ্রান্ত, অন্তত ইতিহাস পর্যালোচনার এই ব্যাপারটিতে। ইতিহাস খুঁজলে নারী উদ্ভাবক তো পাওয়া যায়ই, পাওয়া যায় বিজ্ঞান আর প্রকৌশলবিদ্যায় নিবেদিতপ্রাণ অজস্র মহীয়সী নারীর অস্তিত্ব, যারা আমাদের সভ্যতার নির্মাণে শুধু সহায়তাই করেননি, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে। এমনি এক বিস্মৃত প্রায় বিদুষী বিজ্ঞানী এবং গণিতজ্ঞ ছিলেন হাইপেশিয়া (Hypatia)– জিওর্দানো ব্রুনোর মতই বিজ্ঞানের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গীকৃত এক প্রাচীন দার্শনিক।(৩,২১)

হাইপেশিয়া জন্মেছিলেন ৩৭০ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়াতে। গণিতজ্ঞ হিসেবে তার উত্থান যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি মর্মান্তিক তার তিরোধানের ইতিহাস। সম্ভবত তিনিই ছিলেন পর্যাপ্ত অবদান রাখা ইতিহাসের প্রথম নারী গণিতজ্ঞ; মার্গারেট অ্যালিক তার 'Hypatia's Heritage' গ্রন্থে হাইপেশিয়াকে বর্ণনা করেন 'মাদাম কুরীর পূর্ববর্তী সবচাইতে উল্লেখযোগ্য নারী বিজ্ঞানী' হিসেবে।(৯) তবে কেবল 'নারী গণিতজ্ঞের' বা 'নারী বিজ্ঞানীর' লেবাস পরিয়ে তার মূল্যায়ন করা হবে স্রেফ বালখিল্যতার সামিল। সত্যিকথা বলতে কি, ইউক্লিডের পর আলেকজান্দ্রিয়াতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এত বড় গণিতজ্ঞের জন্ম হয়নি।(৪,১০,১১) ইতিহাসবেত্তাদের মতে, হাইপেশিয়া ছিলেন মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী ইতিহাসের শেষ 'প্যাগান সায়েন্টিস্ট'। অথচ খ্রিস্টধর্মোন্মাদদের রোষানলে পুড়ে (আক্ষরিক অর্থেই) এই রূপসী বিদুষীকে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হয় মাত্র ৪৫ বছর বয়সে, ৪১৫ খ্রিস্টাব্দে। হাইপেশিয়ার মৃত্যুর পর পশ্চিমা বিশ্বে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান আর বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি সাধিত হয়নি– দীর্ঘদিন, কম করে হলেও প্রায় ১০০০ বছর।(৫) মূলত হাইপেশিয়ার মৃত্যু সূচনা করেছিল মানব ইতিহাসের এক ঘোর কৃষ্ণ অধ্যায়ের, যে সময়ে মুক্তবুদ্ধি, জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান-শিল্প-সাধনা তীব্রভাবে ব্যাহত হয়। এ সময় জ্ঞানচর্চার বদলে চর্চা করা হয় ধর্মীয় আস্ফালন, কূপমণ্ডূকতা, অরাজকতা আর বর্বরতার। এ সময়ে পৃথিবী এগোয়নি এক পাও, বরং প্রগতির চাকাকে ঘোরানো হয়েছে উলটো দিকে। এক কলঙ্কময় সময়টিকে ইতিহাসবিদরা আখ্যায়িত করেন একটি বিশেষ নামে– 'অন্ধকার যুগ'।

হাইপেশিয়ার বাবা থিওন নিজেও ছিলেন একজন বড় মাপের গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ এবং আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ামের পরিচালক। সে সময়টাতে মেয়েদের আক্ষরিক অর্থেই দেখা হত কেবল পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে, কিন্তু তখন থিওন তার মেয়েকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন 'একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে'।(৬) পূর্ণাঙ্গ মানুষ তো হাইপেশিয়া হয়েছিলেনই, আর সেই সাথে ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী,

আর বিদুষী। এ যেন সত্যিকারের মনি-কাঞ্চন যোগ। তাকে বলা হত হত- 'Le souffle de Platon et le corps d'Aphrodite'- অর্থাৎ, 'পরমাসুন্দরী আফ্রোদিতির দেহে প্লেটোর আত্মা' যেন! স্বভাবতই সুদর্শনা আর বিদুষী হাইপেশিয়াকে বিয়ে করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন অনেকেই, কিন্তু স্বাধীনচেতা হাইপেশিয়া তাদের প্রত্যেকের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, আর নিজেকে নিয়োজিত করেন বিজ্ঞানের নিবিড় সাধনায়। বেশ কিছুটা সময় দেশের বাইরেও কাটান তিনি, তারপর দেশে ফিরে এসে গ্রহণ করেন আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতজ্ঞের পদ। অচিরেই তিনি নিজেকে পরিণত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে। তিনি পড়াতেন গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন আর বলবিদ্যার বিভিন্ন জটিল জটিল বিষয়গুলো। দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা শহরে চলে আসতো তার বক্তৃতা শুনতে, আর আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের একটি বিশাল কক্ষে প্রতি সন্ধ্যায় সর্বসাধারণের জন্য হাইপেশিয়া বক্তৃতা দিতেন। পয়সা খরচ করে এ নারীর বক্তৃতা শুনতে হত তখন! সাধারণের জন্য দর্শনী ছিলো একটি মোহর।(৪) তবে সভায় যারা স্বচ্ছল ও স্থায়ী সদস্য, তারা আবার মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সম্মানী প্রদান করতেন। হাইপেশিয়া তার বক্তৃতায় প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দার্শনিক কাজকর্ম নিয়ে প্রচুর কথা বলতেন, তাদের পর্যালোচনা করতেন আর দূর দূরান্ত থেকে আসা লোকজন যেন সম্মোহিত হয়ে তার কথা শুনতো পিন পতন নিস্তব্ধতায়।(৮) তার অনুরাগী ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন খ্যাতনামা খ্রিস্টান। তার মধ্যে একজন ছিলেন সাইরিনের সিনেসিয়াস (Synesius of Cyrene), যিনি পরবর্তীতে Ptolemasis এর বিশপ হন। হাইপেশিয়াকে হত্যার পর তার সমস্ত কাজকর্মও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় খ্রিস্টান মৌলবাদীদের হাতে। ইতিহাসবিদরা হাইপেশিয়ার কাজকর্মের যেটুকু জানতে পেরেছেন তার মধ্যে একটা বড় উৎসই হল এই সিনেসিয়াসের লেখা চিঠিপত্র। সেই চিঠিগুলোতে হাইপেশিয়ার প্রতি ব্যক্ত হয়েছে গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি আর ভালবাসা।

হাইপেশিয়ার মৌলিক কাজের মধ্যে রয়েছে দায়োফ্যান্তাস রচিত অ্যারিথমেটিকা পুস্তকের উপর ১৩ অধ্যায়ের একটি আলোচনা, যার বেশ খানিকটা অংশই পরবর্তীতে দায়োফ্যান্তাইন পাণ্ডুলিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়।(৬) এছাড়া তিনি অ্যাপোলোনিয়াসের শঙ্কু ছেদ (conic section) পুস্তিকার উপর একটা আলোচনা লিখেন,(৫) আর টলেমীর কাজের উপর আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন Astronomical canon শিরোনামে।(৪) তিনি তার বাবাকে জ্যামিতির কালজয়ী গ্রন্থ Euclid's element- এর নতুন সংস্করণ তৈরিতেও সহায়তা করেছিলেন- যে সংস্করণটি আজও পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত হয়।(৫) হাইপেশিয়া আর তার বাবা

যৌথভাবে টলেমীর Almagest এর উপরও কাজ করেন। তবে যে দুটি যন্ত্রের আবিষ্কার হাইপেশিয়াকে 'উদ্ভাবক' হিসাবে মহিমান্বিত করেছে তার একটি হল অ্যাস্ট্রোলেব (Astrolabe)– যেটি ব্যবহৃত হত গ্রহ-নক্ষাত্রাদির দৈনন্দিন ঘুর্ণন গণনায়, আর মহাজাগতিক নানা সমস্যা সমাধানে; অন্যটি হল হাইড্রোস্কোপ (Hydroscope) যা দিয়ে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপা যেত।(৭) এছাড়া তিনি পানির স্তর মাপার জন্য একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন।

কিন্তু হাইপেশিয়াকে মেরে ফেলা হল কেন? এটি বুঝতে হলে তৎকালীন মিশরীয় শাসনতন্ত্রের বিশেষত টলেমী বংশের দিকে একটু চোখ মেলে তাকানো দরকার। ইতিহাসের বই ঘেটে পাওয়া যায়– টলেমী সোতার আর তার ছেলে টলেমী ফিলাডেফেলস থেকে আরম্ভ করে পনের জন টলেমীয় বংশোদ্ভুত রাজা তখন মিসর শাসন করেছিল। তার মধ্যে সবচাইতে যিনি পরিচিতি তাকে নিয়ে হলিউডে ছবি পর্যন্ত হয়েছে, সর্বশেষ শাসক সেই ভুবনমোহিনী ক্লিওপেট্রা। খ্রিস্টপূর্ব ৩১ সালে ক্লিওপেট্রাকে হত্যা করা হয়। আর ক্লিওপেট্রা ও রোম সম্রাট সিজারের ছেলে টলেমী সিজারিয়ান রাজা হন। খ্রিস্টপূর্ব ৩০ সালে তাকে হত্যার মাধ্যমে টলেমী বংশের সমাপ্তি ঘটে এবং মিশর রোম সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। তখন থেকে শুরু করে হাইপেশিয়ার সময় পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়া রোমান শাসনের জাঁতাকলে ভয়াবহভাবে নিস্পিষ্ট এক শহরে পরিণত হয়।(৪) দাসপ্রথার অভিঘাত ধ্রুপদী সভ্যতার প্রাণশক্তিকে একেবারে নিঃশেষিত করে ফেলেছিল। খ্রিস্টীয় চার্চ তখন প্রাচীন প্যাগান মূল্যবোধ, প্রভাব আর সংস্কৃতিকে উপড়ে ফেলে তার নবোত্থিত শক্তিকে সংহত করার চেষ্টা করছে পুরোমাত্রায়। হাইপেশিয়া দাঁড়িয়েছিলেন এই প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিগুলোর ঘূর্ণিকেন্দ্রে- বিদ্যমান সংঘর্ষের এক নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে। মার্গারেট এলিক তার Women and Technology in Ancient Alexandria : Maria and Hypatia প্রবন্ধে বলেন : 'Hypatia was a scholarly pagan and a woman, an espouser for Greek scientific rationalism and an influential political figure. This proved to be a dangerous combination.'তার বিচক্ষণতা আর বিচার বুদ্ধি সমাজে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে নগরপাল অরিস্টিস (Orestes) হাইপেশিয়ার মতামত না নিয়ে কোন কাজ করতেন না।(৮) এই সমৃদ্ধি আর স্বীকৃতিই বোধহয় হাইপেশিয়ার কাল হল! 'তুচ্ছ নারী'র মেধা, মনন আর জ্ঞান অনেক সময়ই পরাক্রমশালী পুরুষতন্ত্রের কাছে নিতান্ত অসহনীয়। তার মধ্যে আবার সে নারী যদি হয় বিজ্ঞানমনস্ক মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী, রাজনীতি সচেতন এক স্বাধীনচেতা রমণী! আমেরিকান বিজ্ঞানী J.W. Draper স্পষ্ট করেই বলেন, 'হাইপেশিয়া ছিলেন ধর্মের বিপরীতে বিজ্ঞানের নিবিড় সমর্থক।' হাইপেশিয়াকে

ড্রাপার দেখেছেন সে সময়কার ইউরোপীয় সভ্যতার বিদ্যমান দুটি ধারার সংঘর্ষে এক বীরোচিত নিয়ামক চরিত্র হিসেবে।[১২] দুটি ধারার একটি হচ্ছে মুক্ত বুদ্ধির চর্চায় সমৃদ্ধ 'লিবারেল' ধারা আর একটি হল কট্টরপন্থী ধর্মান্ধ 'পুরিতানিক' ধারা। হাইপেশিয়ার অনেক বক্তব্যই ছিলো গোঁড়ামি বিরোধী আর মুক্তবুদ্ধির প্রতি সমর্থনসূচক, যা নিঃসন্দেহে কট্টরপন্থীদের উষ্মার কারণ ঘটিয়েছিলো। হাইপেশিয়া তার এক শিষ্যকে বাইবেল সম্পর্কে বলেছিলেন:(৪)

> 'আমি খ্রিস্টান নই। কিন্তু বাইবেলের প্রাচীন ও নবীন দুটো খণ্ডই আমি পড়েছি। আব্রাহাম ইয়াকুব ইউসুফ ধর্মই বল, আর যীশু খ্রিস্টের ধর্মই বল, অহঙ্কার না করেও আমি বলতে পারি, ও দুটির মর্ম আমি উপলব্ধি করেছি। বিশ্বাসের কথা, ঈশ্বরের প্রেমের বাণী ও দুটিতে আছে ঢের, কিন্তু দার্শনিকের দৃষ্টিতে ওসব বালকসুলভ উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। পরিণত বুদ্ধির জাতির জন্য থাকা উচিত যুক্তি-নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক ধর্ম একটা, যা ছিলো গ্রীকদের, যার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়ে আমি যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছি আলেকজান্দ্রিয়ায় বসে।'

এ ধরনের স্বচ্ছ কথাবার্তা যে যুগে যুগে মৌলবাদীদের ক্ষিপ্ত করেছে তা বলাই বাহুল্য। এমনি একজন মৌলবাদী খ্রিস্টান ছিলেন সিরিল (Cyril) যিনি ৪১২ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার আর্চ বিশপ বা পেট্রিয়ার্ক হয়েছিলেন। এই 'পেট্রিয়ার্ক' ব্যাপারটা হয়ত অনেকের কাছেই অপরিচিত। ছোট্ট একটু বয়ান করা যাক এ নিয়ে। পোপের পদ সৃষ্টির পূর্বে খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু ছিলেন তিনজন। তাদের একজন থাকতেন রোমে, একজন বাইজেন্টিয়ামে আর আরেকজন থাকতেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। তাদেরকে বলা হত পেট্রিয়ার্ক। আলেকজান্দ্রিয়ার এই পেট্রিয়ার্ক সিরিল হাইপেশিয়ার রাজনৈতিক দর্শনের জন্য, তার মুক্তবুদ্ধির চর্চার জন্য এবং সর্বোপরি নগরপাল অরিস্টিসের সাথে হাইপেশিয়ার সুসম্পর্কের কারণে তাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। মূলত এই আর্চ বিশপ সিরিল খ্রিস্ট ধর্মের পথ প্রশস্ত করার জন্যই হাইপেশিয়াকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়।(৪) এর পেছনে আরো একটি রাজনৈতিক দিকও ছিলো। সিরিলের সাথে অরিস্টিসের ছিলো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। অরিস্টিসের প্রতি হাইপেশিয়ার প্রচ্ছন্ন সমর্থন সিরিলকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলে। খ্রিস্টীয় অনুরাগীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, আর্চ বিশপের সাথে অরিস্টিসের পুনর্মিলনে হাইপেশিয়াই হচ্ছেন প্রধান অন্তরায়।(১৩)

চার্লস কিংসলের উপন্যাস Hypatia and or the New Foes with an Old face (1853) থেকে জানা যায়, বিশপ সিরিল খ্রিস্টান ধর্মানুরাগী তরুণদের হাইপেশিয়ার বক্তৃতা শুনতে যেতে নিরুৎসাহিত করতেন। তার ভয় হত যে, হাইপেশিয়ার প্রবল ব্যক্তিত্ব ও তার তীক্ষ্ণ যুক্তির কাছে খ্রিস্ট ধর্মের দার্শনিক ভিত্তির

দুর্বলতাটুকু প্রকাশিত হয়ে পড়বে। উপন্যাসে দেখা যায়, সিরিলের প্রিয় এক তরুণ খ্রিস্টান সন্ন্যাসী ফিলামন (Philammon) হাইপেশিয়ার সভায় যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে সিরিল হাইপেশিয়াকে তার সামনে তুলে ধরেন এভাবে : 'হাইপেশিয়া হচ্ছেন সাপের চেয়েও ধূর্ত আর সব ধরনের চালাকাতি ওস্তাদ আর যুক্তিতে পটু।' আর সিরিল ফিলামনকে এই বলে সাবধান করেন যে, 'তুমি যদি ওখানে যাও তবে নিজেকে ঠাট্টার পাত্র বলে মনে হবে, আর লজ্জায় তুমি পালিয়ে আসবে।'(১৪)

ফিলামনের মত সন্ন্যাসীদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিলো হাইপেশিয়ার বক্তৃতামঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে হাইপেশিয়ার সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণিত করা। তারা ভাবতেন তুচ্ছ নারী কী জানবে দর্শনের, বিজ্ঞানের? অথচ তার অনুগামীদের কাছে হাইপেশিয়া ছিলেন মিনার্ভার মত জ্ঞানময়ী, জুনোর মত মর্যাদাময়ী আর আফ্রোদিতির মত সুন্দরী। কিংসলের উপন্যাসে দেখা যায়, ফিলামন কিছুটা কৌতুহল আর অবজ্ঞা নিয়েই প্রথমে হাইপেশিয়ার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন, মূল উদ্দেশ্যটা ছিল হাইপেশিয়াকে ভুল প্রমাণ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা। কিন্তু হাইপেশিয়ার ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা আর জ্ঞানের আলোক স্পর্শে ফিলামন আক্ষরিক অর্থেই সম্মোহিত হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত হাইপেশিয়ার একজন একান্ত অনুরাগীতে পরিণত হন। তাদের বন্ধুতত্ত্ব আর কিছুটা নৈসর্গিক প্রেমের মূর্চ্ছনা হাইপেশিয়ার মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।(১২)

তার প্রিয় খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের হাইপেশিয়া-মোহ সিরিলকে ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতই উন্মত্ত করে তোলে। সিরিল হাইপেশিয়াকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন। '৭১-এ বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার মতই সিরিল বেছে বেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নব্যতান্ত্রিক' নিও-প্লেটোনিস্টদের ধরে ধরে হত্যার মহোৎসবে মত্ত ছিলেন, এমনি একদিন কর্মস্থলে যাওয়ার পথে হাইপেশিয়া মৌলবাদী আক্রোশের শিকার হলেন, অনেকটা আজকের দিনের হুমায়ুন আজাদের মতোই। তবে হাইপেশিয়ার ক্ষেত্রে বীভৎসতা ছিলো আরও ব্যাপক। হাইপেশিয়া-হত্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় পনের শতকে সক্রেটিস স্কলাসটিকাসের রচনায়(১৫)

> 'পিটার নামের এক আক্রোশী ব্যক্তি অনেকদিন ধরেই তক্কে তক্কে ছিলো, শেষমেষ সে হাইপেশিয়াকে কোন এক জায়গা হতে ফিরবার পথে কব্জা করে ফেলে। সে তার দলবল নিয়ে হাইপেশিয়াকে তার ঘোড়ার গাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে কেসারিয়াম (Caesarium) নামের একটি চার্চে নিয়ে যায়। সেখান তারা হাইপেশিয়ার কাপড় চোপড় খুলে একেবারে নগ্ন করে ফেলে, তারপর ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে তার চামড়া চেঁছে ফেলে, তার শরীরের মাংস চিরে ফেলে, তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত হাইপেশিয়ার উপর তাদের অকথ্য অত্যাচার চলতে থাকে। এখানেই শেষ নয়, মারা যাবার পর হাইপেশিয়ার মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে সিনারন (Cinaron) নামের একটি জায়গায় জড় করা হয় আর তারপর পুড়িয়ে তা ছাই করে দেয়া হয়।'

হাইপেশিয়াকে হত্যা করা হয় ৪১৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। হাইপেশিয়ার হত্যাকারীদের তালিকায় ছিলো মূলত সিরিলের জেরুজালেমের চার্চের প্যারাবোলানাস, মৌলবাদী সন্ন্যাসী নেস্তরিয়ান খ্রিস্টীয় ধর্মবাদীরা।(৫) তবে সিরিল নিজ মুখে তার সাঙ্গপাঙ্গদের হাইপেশিয়াকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না তা অবশ্য বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, সিরিল এমন এক ধরনের রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন যা হাইপেশিয়া-হত্যায় ইন্ধন যুগিয়েছিলো। সিরিলকে পরবর্তীকালে ধর্মীয় অধিকার বলে সেইন্ট বা সন্ত হিসেবে অভিসিক্ত করা হয়। ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধের উপযুক্ত ধর্মীয় 'শাস্তি'ই বটে, নাকি পুরস্কার!

যা হোক, অরিস্টিস এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন এবং রোমকে এর তদন্ত পরিচালনা করতে অনুরোধ করেন। তারপর তিনি তার কর্মস্থল থেকে অব্যাহতি নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে চিরতরে বিদায় নেন। আর ওদিকে তদন্ত কাজ পদে পদে 'পর্যাপ্ত সাক্ষীর অভাবে' বাধাপ্রাপ্ত হয়, আর শেষ পর্যন্ত সিরিল জল ঘোলা করতে জনসমক্ষে প্রচার করতে শুরু করেন যে, হাইপেশিয়া নাকি জীবিত আছেন এবং এথেন্সে বহাল তবিয়তে বাস করছেন।(১৬)

হাইপেশিয়ার হত্যাকাণ্ড আলেকজান্দ্রিয়া এবং পুরো রোমান সাম্রাজ্যে বৈজ্ঞানিক আর যুক্তিবাদী শিক্ষার বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। ইউরোপ পুরোপুরি প্রবেশ করে 'অন্ধকার যুগে।' এমন কি মৃত্যুর পরও হাইপেশিয়াকে রেহাই দেয়নি ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা। ৫৮১ খ্রিস্টাব্দে চার্চের পক্ষ থেকে হাইপেশিয়াকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করা হয় 'That woman had neither souls nor reasons'।(৫) গোঁড়া খ্রিস্টধর্মের প্রসারের সাথে সাথে আলেকজান্দ্রিয়া নানা ধরনের ধর্মীয় সংস্থার (cult) ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে যায়, মুক্তবুদ্ধির চর্চা ব্যাহত হয়; নানা ধরনের ধর্মীয় তুক-তাক, জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা, কুসংস্কার, অতীন্দ্রিয়তা আর আধ্যাত্মিকতা ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্থান দখল করে নেয়। ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া আরবদের অধীনস্ত হয় আর সমস্ত গ্রন্থাগারটি পুনর্বার (জুলিয়াস সিজারের আগ্রাসনের পর) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়– এবারে অবশ্য বর্বর খ্রিস্টীয় মৌলবাদীদের আরেক সহোদর ইসলামী মৌলবাদীদের হাতে।(৫) কথিত আছে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের বই-পত্তর ধ্বংস করতে গিয়ে খলিফা ওমর নাকি বলেছিলেন :

> 'বইপত্রগুলো যদি কোরানের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তবে সেগুলো আমাদের দৃষ্টিতে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। কাজেই ওগুলোর ধ্বংস অনিবার্য; আর বই-পত্তরগুলোতে যদি কোরানের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোন কথাবার্তা আদৌ থেকে থাকে তবে সেগুলো হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কাজেই সে দিক দিয়েও ওগুলো ধ্বংস করা জায়েজ।'

অবশ্য অনেক গবেষক আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের উপর ইসলামের আগ্রাসনকে অপ প্রচারণা বলেই মনে করেন।(১৭)

হাইপেশিয়াকে হত্যার পর তাকে যেন আক্ষরিক অর্থে ভুলেই গিয়েছিলো মর্তের বিস্মৃতিপরায়ণ মানবজাতি। স্মৃতির পরতে পরতে পড়েছিলো ধুলোর পুরু স্তর। ৪১৫ খ্রিস্টাব্দে তাকে হত্যার পর প্রায় তেরশ বছর ধরে সত্যিকার অর্থেই যেন নিশ্চুপ হয়ে পড়ে রয়েছিলো সবাই। অনেক অনেক বছর পরে ১৭২০ সালে জন টোলান্ড (John Toland) 'Hypatia or the History of a most beautiful, most virtuous, most learned and in every way accomplished lady; who was torn to pieces by the clergy of Alexandria to gratify the pride, emulation and cruelty of the archbishop commonly but undeservedly titled St Cyril' নামের দীর্ঘ শিরোনাম বিশিষ্ট প্রবন্ধে হাইপেশিয়াকে স্মৃতির ছাইভস্ম হাতড়ে আমাদের সামনে তুলে আনেন। তিনিই বিশ্ববিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলেন এই বলে যে হাইপেশিয়ার মত অনিন্দ্যসুন্দর, বিজ্ঞ এবং নিষ্পাপ দার্শনিকের রক্তে হাত রঞ্জিত করার দায়ে সমস্ত পুরুষতন্ত্রের লজ্জিত হওয়া উচিত।(১২) হাইপেশিয়ার হত্যাকারী হিসেবে খ্রিস্টীয় চার্চ আর তার তৎকালীন পুরোধা সিরিলকে অভিযুক্ত করে টোলান্ড ওই প্রবন্ধে স্পষ্ট করেই বলেন:

> 'সেইন্ট বা সন্ত নামধারী পুরুষতন্ত্রে দীক্ষিত এক বিশপ ছিলেন এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা, আর তার শিষ্যরা ছিলেন তাদের গুরুর জিঘাংসা চরিতার্থ করার নিয়ামক।'

টোলেন্ডর হাত ধরে পৃথিবী যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম থেকে জেগে উঠলো। যে ভলতেয়ার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ইতিহাসে এর আগে কোন 'নারী উদ্ভাবক' পাননি, তিনিই হলেন এবার হাইপেশিয়া বন্দনায় উচ্ছ্বসিত। তিনি 'Examen Important De Milord Bolingbroke Ou Le Toumbeau Du Fanatisme (1736)', বইয়ে বলেন :

> 'এই পাশবিক হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয় সিরিলের মাথা-মুড়ানো ভিক্ষু হিসেবে খ্যাত কতকগুলো 'ডালকুত্তা'র সাহচর্যে, আর উগ্র, গোঁড়া ধর্মবাদীদের আস্ফালনে।'

ভলতেয়ার হাইপেশিয়ার অবদানের কথা উল্লেখ করেছিলেন তার 'Dictionnaire Philosophique' বইয়েও। তিনি সেখানে হাইপেশিয়াকে একজন সম্মানিত শিক্ষক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে উল্লেখ করেন আর সিরিলকে হত্যার অভিযোগে সরাসরি অভিযুক্ত করে বলেন, 'সিরিল তার খ্রিস্টীয় আক্রোশ হাইপেশিয়ার উপর

ঝেড়ে দিলেন।' পরবর্তীতে হাইপেশিয়াকে নিয়ে এন্তার লিখেছেন এডওয়ার্ড গিবন (দ্য ডিক্লায়েন এন্ড ফল অব রোমান এম্পায়ার), দামাস্কিউয়াস (সুদা), হেনরি ফিল্ডিং (আ জার্নি ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড টু দ্য নেক্সট), চার্লস লিকন্ট দ্য লিসল (Hypatie; Hypatie et Cyrille), মরিস বারস (Sous l'oeil des barbares), চার্লস কিংসলে (হাইপেশিয়া অর দ্য নিউ ফো'স উইথ এন ওল্ড ফেস), জে ডবলিউ ড্রাপার (হিস্ট্রি অব ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট ইন ইউরোপ), বার্ট্রান্ড রাসেল (হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি)সহ অনেকেই। ইতালিতে আঠারো শতকে হাইপেশিয়া 'আধুনিক সাহিত্যে'র এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উঠে আসেন। দ্য স্যালুজো, কার্লো প্যাস্কাল, মারিও লুজি হাইপেশিয়াকে নিয়ে কবিতা, প্রবন্ধ আর নাটক রচনা করেন। জার্মান ভাষায় আর্নুলফ জিটলম্যানের ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস 'হাইপেশিয়া' (১৯৮৯) দারুন জনপ্রিয়তা পায়। কানাডাতেও প্রায় একই সময়ে আঁদ্রে ফেরেত্তি আর জ্য মার্সেল হাইপেশিয়াকে নিয়ে দু দুটি দীর্ঘ উপন্যাস রচনা করেন। নারীবাদীরা হাইপেশিয়াকে ঘিরে রচনা করতে শুরু করেন নারীবাদী সাহিত্য। নারীবাদী কবি এবং ঔপন াসিক উর্সুলা মোলিনারো হাইপেশিয়াকে নিয়ে আশির দশকের শেষভাগে রচনা করেন একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। আজ দু' দুটি বিখ্যাত গবেষণা-সাময়িকীর (জার্নাল) নাম হাইপেশিয়ার নামানুসারে রাখা হয়েছে। একটি হল এথেন্স থেকে প্রকাশিত 'হাইপেশিয়া : ফেমিনিস্ট স্টাডিস', এবং অপর 'হাইপেশিয়া : এ জার্নাল অব ফেমিনিস্ট ফিলোসফি'। হাইপেশিয়া উঠে এসেছেন আজকের দিনের নারীবাদী চিত্রকর্ম এবং শিল্পকলাতেও, অত্যন্ত প্রবলভাবেই। ১৯৭৯ সালে হাইপেশিয়াকে নিয়ে নারীবাদী চিত্রকর জুডি শিকাগোর একটি স্থাপত্যকর্ম স্যান ফ্রান্সিসকো মিউজিয়ামের 'আধুনিক চিত্রকলা'তে প্রদর্শিত হয়।(১২) সে তুলনায় বরং বাংলা সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং শিল্পকলায় হাইপেশিয়ার উল্লেখ নিতান্তই অপ্রতুল।

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে নারীরা অবদান রেখেছেন বিপুলভাবে। 'বিশ্বকবি' রবিঠাকুর সভ্যতার বিনির্মাণে নারীর কোন অবদান খুঁজে না পেলেও আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতত্ত্ববিদদের মতে মানব সভ্যতার শুরুর প্রথম দিকে নারী-পুরুষের অবদান ছিলো প্রায় সমান সমান। অনুমান করা হয় আগুনের আবিষ্কারক ছিলো নারী।(৪) যদি তা নাও হয়, এটি নিঃসন্দেহে যে নারীরাই প্রথম আগুন ও তাপ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খাদ্য-সংরক্ষণ করতে শিখেছে। নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এমনকি প্রাচীনকালের পুরাণতত্ত্বগুলোও সাক্ষ্য দেয় যে, নারীরা প্রথম থেকেই খাদ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের ভূমিকায় নিয়োজিত ছিল।[১৮] কাজেই যৌক্তিকভাবেই এটি ধরে নেয়া

হয় যে নারীরাই সেই ব্যবস্থাগুলোর উন্নতি সাধন করেছে। গবেষকরা এও স্বীকার করেন যে, নারীরাই তৈরি করেছে হোর্টিকালচার বা উদ্যানবৃত্তির।[১৯] মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষাধিক বছর পার হয়ে গেছে, অথচ পুরো সময়কালের শতকরা নিরানব্বই ভাগ সময়ই মানুষ কাটিয়েছে সেই প্রাক-উদ্যানবৃত্তির সময়টিতে যখন পুরুষেরা শিকার এবং মৎসাহরণের সাথে যুক্ত ছিলো, আর মেয়েরা যুক্ত ছিলো গৃহস্থালীর নানা রকমের কাজ আর ফলমূল ও অন্যান্য খাবার-দাবার সংগ্রহ আর সংরক্ষণে। গবেষকরা বলছেন যে, সে সময় শিকারের মাধ্যমে পুরুষেরা যে পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করতো, তাতে মাত্র ২০ থেকে ৪০ ভাগ প্রয়োজন মিটতো, বাকি ৬০ থেকে ৮০ ভাগ প্রয়োজনই মেটাতো আসলে নারীরা।(১৮) অর্থাৎ নারীরাই ছিল মূলত খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভাবক এবং নিয়ন্ত্রক। প্রাচীন পুরাণ এবং মিথগুলোও এই মতকে সমর্থন করে। দেখা যায়, রুটি-রুজির সংস্থানকারী হিসেবে যাদের উপাস্য হিসেবে ভাবা হত তারা সবাই ছিলেন দেবী– অর্থাৎ নারী- আইসিস, সাইবেল, অ্যাগদিস্তিস, দিনদিমিন, ইশতার, আসতারতে, রিঅ্যাক্স এবং লক্ষ্মী। প্রায় সব জাতির মধ্যেই যে আদিম রূপকথা প্রচলিত আছে তাতে দেখা যায় স্বর্গের কোন দেবী তার আদ্যাশক্তি বিতরণ করেছিলো এই মর্তের মানুষের মাঝে যার ফলে মানুষ শিখেছিল বীজ বুনতে, উদ্যান তৈরিতে আর কৃষিকাজের জন্য উপকরণ বানাতে। প্রকৃতিজগতেও 'বৈজ্ঞানিক নারীবাদের' সমর্থন রয়েছে। যে শিম্পাঞ্জিকুলের সাথে আমরা গর্বিত মানুষরা শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ সদৃশ জীন বিনিময় করি, তাদের সাথে তুলনা করেও দেখেছি যে, পুরুষ শিম্পাঞ্জীদের তুলনায় স্ত্রী শিম্পাঞ্জীরা অনেক বেশি সময় ব্যয় করে ছোট ছোট হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে। সেগুলো তারা ব্যবহার করে মাটি খোঁড়া আর খাবার সংগ্রহে।(৭)

সম্ভবত মেসোপটেমিয়ার মুরিবেতের মেয়েরাই সর্বপ্রথম ভূমি-কর্ষণ করে বীজ বুনতে শিখেছিলো খ্রিস্টের জন্মের ৮০০০ বছর আগে।(১৮) সে সময় প্যালেস্টাইনে মেয়েরা শিখেছিলো শস্যক্ষেত্র আর সবজি বাগানের পরিচর্যা করতে, আর তুরস্কে গম থেকে রুটি বানাতে। পরবর্তীকালে মৃৎপাত্র তৈরির রাসায়নিক প্রক্রিয়া, সুতা কাটার বিদ্যা, তাঁতের প্রযুক্তি আর শন ও তুলার রকমারি উদ্ভিদবিদ্যা শেখানোর কৃতিত্ব শুধুমাত্র নারীদের। নারীরাই প্রথম চিকিৎসক, শিল্পী আর প্রকৌশলী।(৪) কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে নারীদের কর্মস্থল শুধু রন্ধনশালা আর শয়নকক্ষেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, নারীরা পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে উন্নয়ন ঘটিয়েছিলো সে সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির।

আজ তবে নারী বিজ্ঞানী, গবেষক, গণিতবিদ আর প্রযুক্তিবিদদের এত অপ্রতুলতা কেন পুরুষদের তুলনায়? এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। পুরুষের পাশাপাশি

একদিন যে নারী পত্তন করেছিলো, বিস্তার ঘটিয়েছিলো প্রযুক্তি-নির্ভর সভ্যতার, আজ সে নারীর অধিকাংশই প্রযুক্তি আর সভ্যতা থেকে যোজন মাইল দূরে। পর্দা প্রথা, বিশ্বাস-অপবিশ্বাস আর হাজারো পুরুষতান্ত্রিক নিয়মের ঘেরাটপে বন্দি নারী। এ তো নারী জাতির এক পরাজয়ই বটে। কখন তাহলে ঘটেছিলো নারী জাতির এই 'ঐতিহাসিক পরাজয়'? অনেক গবেষকই আজ দায়ী করেন কৃষি ব্যবস্থাকে।(২০) তারা মনে করেন হোর্টিকালচার থেকে কৃষিব্যবস্থার উত্তরণে সভ্যতা এগিয়েছে অনেক, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে দু দুটি প্রগতিশীল মানবিক সত্ত্বাকে। কৃষিকাজের উদ্ভবের পর থেকেই নারীরা বন্দি হয়েছে গৃহে; মূলত নিয়োজিত হয়েছে গৃহস্থালির পরিচর্যা আর সন্তান লালন-পালনে, আর কৃষি ব্যবস্থার ফলেই নিখুঁতভাবে তৈরি হয়েছে শ্রমবিভাজনের, পরবর্তীতে ব্যক্তিগত মালিকানার। আর এ ব্যবস্থার ক্রমোত্তরণের ফলে নারী ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয় খাদ্যোৎপাদনের তথা প্রযুক্তির মূলস্রোতধারা থেকে। এঙ্গেলস তার 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' (১৮৮৪) নামের কালোত্তীর্ণ বইটিতে দেখিয়েছেন ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভবের সাথে সাথে এক সময় সম্পদ বাড়তে থাকে, আর সেই সম্পদই শেষ পর্যন্ত শত্রু হয়ে দেখা দেয় নারীর জন্য। অরণ্যপর্ব থেকে মানুষ যখন পৌঁছায় কৃষিপর্বে, তখন সম্পদশালী হয়ে ওঠে বিভিন্ন গোত্র। এক সময় ঐ সম্পদ গোত্রপতিদের অধিকারে চলে আসে; তারা হয়ে ওঠে সম্পদশালী, উদ্ভাবন ঘটে ব্যক্তিগত মালিকানার। সম্পদ যত বাড়তে থাকে পরিবারে নারীদের থেকে গুরুত্ব বাড়তে থাকে পুরুষদের, পুরুষ মাতৃধারার প্রথা ভেঙে সৃষ্টি করে পিতৃতন্ত্রের প্রথা, নারী পরিণত হয় পুরুষের সম্পত্তিতে।

ইতিহাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, আর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু ইতিহাসবেত্তারাই মানব সভ্যতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তা বারবার এড়িয়ে গিয়েছেন। অটোমান স্ট্যানলি তার 'মাদারস এন্ড ডটারস অব ইনভেন্সান' বইটিতে হাজারো দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখিয়েছেন যে, পুরুষেরা যখন কোন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়েছে তখন তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, কিন্তু নারীরা যখন কোন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়েছে তখন তা চলে গেছে বিস্মৃতির অন্তরালে। ইতিহাসবিদরা ঢালাওভাবে বলেছেন 'কে, কখন, কিভাবে এ প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না।' বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মেয়েরা যে সমস্ত কাজকর্মে নিয়োজিত ছিল সেগুলোর ক্ষেত্রেই অমন ঢালাও ছাচে-ঢালা মন্তব্য করা হয়েছে। স্পিনিং হুইল বা চরকা এমনি একটি উদাহরণ। সম্ভবত নারীরাই এটির উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলো চীন দেশে, কিন্তু আজ তার কোন লিপিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় না, অথচ সেই চরকা যখন তের শতকের পর পশ্চিমা বিশ্বে প্রবেশ করে 'পুরুষের

হাতে' উন্নত আর বিবর্ধিত হয়, তা তখন থেকেই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ শুরু হয়ে যায়।

তারপরও পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাসের জাল ভেদ করে অনেক নারীই প্রতিটি যুগে আমাদের সামনে চলে এসেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হাইপেশিয়া, মাদাম কুরী, লরা বেসি, সোফিয়া কোভালেভস্কায়া, লিস মিন্টার প্রমুখ। এ কজন ছাড়াও আরও আছেন ক্যারলিন হারসেল, মেরী অ্যানী ল্যাভরশিয়ে এবং ডিএনএ এর উদ্ভাবক রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন। এদের সবাই গবেষণাগারে পুরুষ সহযোগীদের সাথে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন; অথচ ওই সহযোগীরাই তাদের অবদানকে অনেক সময়ই অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছেন। ফ্র্যাঙ্কলিনের কথা তো বলাই যায় ডিএনএর 'যুগল সর্পিলের' রহস্যভেদ করার পরও প্রাপ্য কৃতিত্ব থেকে তাকে অনেকাংশেই বঞ্চিত করা হয়েছে। জোসলিন বেল পালসার আবিষ্কারের পরও নোবেল পুরস্কার পাননি, পেয়েছেন তার পুরুষ সহযোগী অ্যান্থনী হিউয়িশ।(২১) আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব নিয়ে লিখিত যুগান্তকারী পেপারটিতে তার স্ত্রী মিলেভা আইনস্টাইনের অনেক অবদান থাকা সত্ত্বেও তা এড়িয়ে গেছেন।(২২) ভেরা রুবিন 'ডার্ক ম্যাটার' বা গুপ্ত পদার্থ আবিষ্কারারের পরও স্বীকৃতি পেতে তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ সময়। উনিশ শতকে ব্রিটেন এবং আমেরিকায় এমন আইনও করা হয়েছিলো, বিবাহিত নারীরা যদি কোন 'পেটেন্ট' উদ্ভাবন করে থাকেন, তা স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।(৭) এসব কিছুই পুরুষেরা ব্যবহার করেছে নারীর উদ্ভাবনী শক্তিকে অবদমিত আর ব্যাহত করার কাজে। এটি নিঃসন্দেহ যে নারীরা সভ্যতা নির্মাণের এক বড় অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও পুরুষশাসিত সমাজের সীমাবদ্ধতায় পথ হারিয়েছে বারে বারে। কিন্তু যে নামটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব নিয়ে উঠে এসেছে, যার মৃত্যুর সাথে জড়িয়ে আছে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের ধ্বংস, আর মধ্যযুগীয় অন্ধকার যুগের সূচনা– তিনি হলেন হাইপেশিয়া। হাইপেশিয়া হত্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে চার্লস লিকন্ট দ্য লিসল এক সময় নিবেদন করেছিলেন আবেগময় পংক্তিমালা, আমার অক্ষম হাতের অনুবাদে তার অনেকটাই হয়ত নিরস শোনাবে :

'সে একা বেঁচে আছে, যেন শাশ্বত চিরন্তনী হয়ে,
মৃত্যু কেবল বিক্ষিপ্তই করতে পারে এই কম্পমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে।
কিন্তু আজো সৌন্দর্য তার আগুন হয়ে জ্বলে,
আর তার ভিতর পুনর্জন্ম ঘটে যেন সকলের–
এবং ধরিত্রী ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে রয় তাঁর শুভ্র চরণ তলে।'

বার্ট্রান্ড রাসেল তার হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি গ্রন্থে স্পষ্ট করেই বলেছেন, হাইপেশিয়াকে হত্যার মাধ্যমে আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রিস্টীয় মৌলবাদীরা নিশ্চিত করেছিল যেন আর কখনও কোন দার্শনিক ভবিষ্যতে তাদের এমনিভাবে না

জ্বালায়। হাইপেশিয়ার বেদনাঘন উপাখ্যান মনে করিয়ে দেয় আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির বিদুষী নারী 'খনা'কে যার খ্যাতি ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলো তদানীন্তন পুরুষতন্ত্রকে। শেষ পর্যন্ত খনার জিহ্বা কেটে ফেলে পুরুষতন্ত্র– সে সময় পালন করেছিলো তাদের জয়ন্তী উৎসব। ঠিক তেমনিভাবে হাইপেশিয়াকে হত্যার মাধ্যমে পুরুষতন্ত্রের পুরোধা খ্রিস্টীয় চার্চ আকাশে উড়াতে চেয়েছিলো তাদের বিজয় কেতন, যা প্রকারান্তরে সূচনা করে মানব-ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক ঘোর কৃষ্ণ অধ্যায়ের- অন্ধকার যুগ বা ডার্ক এজ-এর।

তথ্যসূত্র

১. পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ।

২. Women in Philosophical Dictionary, Voltaire, Vol. 10, Dumon Paris, 1764 (1901).

৩. ব্রুনোর আত্মত্যাগ ও যুক্তিবাদ- শহিদুল ইসলাম, মুক্ত-মনা; জিওর্দানো ব্রুনো স্মরণে সেমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট মিলনায়তন, ২৯ এপ্রিল ২০০৫।

৪.মহাজ াগতিক আলোয় ফিরে দেখা, আসিফ, সময় প্রকাশন, ২০০৩।

5. Women and Technology in Ancient Alexandrial : Maria and Hypatia, Margaret Alic, Women's Studies Int. Quart., Vol.4, No.3 pp 305-312, 1981.

6. Women, Technology and Innovation, ed. Joan Rothschild, New York : Pergamon, 1982.

6. Diophantus of Alexandria : A study on the History of Greek Algebra, Thomas L. Health, Dover, New York, 1964.

7. Mothers and Druthers of Invention : Notes for revised History of Technology, Autumn Stanley, The Scarecrow Press, Inc. Metuchen, N. J., & London, 1993.

8. Hypatia, Joseph McCabe, Critic, Vol 43, pp 267-272.

9. Hypatia's Heritage, Margaret Alic, Boston, 1986.

10. Humanisms and History of Mathematics, A. W. Richeson, ed. G.W. Dunnington, National Mathematics Magazine, Vol. 15, 1940, pp 74-82.

11. Women of Mathematics, R. Jacobacci, Arithmetic Teacher, Vol. 17.4 1970, pp 316-234.
12. Hypatia of Alexandria, Maria Dzielska, Translated by F. Lyra, Harvard University Press, England, 1995.
13. Life of Hypatia, Socrates Scholasticas, from his ecclesiastical History, Alexandra 2, Cosmology, Philosophy, Myths and culture, Ed. David Fideler, Phanes Press.
14. Hypatia and or the New Foes with and Old face, Charles Kingsley, Conkley, Chicago, 1853 (1906).
15. The Murder of Hypatia. Socrates Scholasticus. Fifth Century (1953). In: Freemantle, Ann ed, A Treasury of Early Chrisianity, pp. 379-380. Viking, New York.
16. Women in Mathematics. Lynn M. Osen. The MIT Press, Cambridge (1975).
17. The Decline and Fall of Roman Empire, vol 1-3, Edward Gibbon, Everyman's Libraryl Boxed ed (1993).
18. Daughters of ISIS, Daughters of Demeter : When Women Sowed and Reaped, Autumn Stantely, Women's Studies Int. Quart., Vol 4, No. 3, pp. 289-304 (1981).
19. Female of the Species, M. Kay Martin & Barbara Voorhies, New York : Columbia University Press, 1975.
20. The Worst Mistake in the History of the Human Race, Jared Diamond, Discover Magazine, pp Pages 64-66, May 1987
২১. আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায়, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫।
২২. আজি হতে শতবর্ষ আগে, অভিজিৎ রায়, সাপ্তাহিক যায়াযদিন, ১৫ মার্চ, ২০০৫।

শাশ্বত এথেন্সের নারী ও তার বিপর্যস্ত ধারাবাহিকতা

হাসান আল আবদুল্লাহ

পুরুষ-শাসিত সমাজে মেয়েরা সর্বদাই উপেক্ষিত। সামাজিক কাজ কর্মে তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা পুরুষের থেকে সব ক্ষেত্রেই কম গুরুত্ব পায়। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৩০০ অব্দে (যাকে ক্লাসিকাল এজ বলা হয়) এথেন্সের মেয়েদের অবস্থান এবং সামাজিক সম্মানের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। তখন দাসদের থেকেও কোনো কোনো পর্যায়ে নিচু অবস্থানে ছিলেন মেয়েরা। প্রচলিত ধারণা এই ছিলো যে, নারীর জন্ম হয়েছে শিশু পালন এবং ঘরের কাজ করে সময় কাটানোর জন্যে। সামাজিক পীড়ন, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি এবং জীবন বিধাতার দান ও তার দেয়া অবস্থানকে মেনে নিতে হবে, এসব কথা ভেবে মেয়েরা গৃহবধূ ও হোম-মেকার হিসেবে মুখ বুজে কাজ করে ঘরের কোণে থাকাই মেনে নিয়েছিল। তথাপি কখনো কখনো কেউ কেউ যে বিদ্রোহ করে বসেনি তা কিন্তু নয়, যেমন বিদ্রোহ করেছিলেন এ্যাসপাসিয়া ও ইউরিপেডিস লিখিত 'এ্যান্টিগনি' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের নায়িকারা। যদিও তখনকার সমাজে নারীদের অবস্থান পর্যালোচনার জন্যে আমাদের হাতে পর্যাপ্ত তথ্য নেই, তথাপি হিরোডাটাস ও থুসিডিডিস রচিত গ্রীসের ইতিহাস, প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, চিত্রাঙ্কিত পাত্র, ভাস্কর্য এবং ফলকের উপর লিখিত গীতিকথা গ্রীক সমাজ ও মেয়েদের সম্পর্কে দিগন্তে সরু রেখার মতো একটি মোটামুটি ধারণা দেয়।

আমরা জানি যে, গ্রীসের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা সোলোন একদা 'ভালো মহিলা' ও বেশ্যাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। ব্যাপারটি হাস্যকর হলেও তিনি একটি ভালো কাজ করেন, তা হলো নারী বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা। পণ্যের মতো নারীকে বিক্রি করা হয়েছে প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র। শুধু গ্রীসে কেন, মিসর ও বেবিলনের সভ্যতা, ইয়োরোপ, আফ্রিকা এবং পরবর্তীতে মার্কিন দেশে দাস প্রথার কালেও যৌনাঙ্গ ব্যবহারের উৎকৃষ্ট পণ্য হিসেবে বিকিয়েছেন নারীরা।

যুগে যুগে যুদ্ধে পরাজয়ের নিষ্ঠুরতম আঘাতটি পোহাতে হয়েছে– নারীদেরই দাসত্ব বরণ ও শরীর পুরুষের হাতে তুলে দেয়ার মাধ্যমে। গণিমতের মাল হিসেবে যুদ্ধে ধরে আনা নারীদের মোহম্মদও হালাল করে দিয়েছেন অনুসারীদের মধ্যে। এমতাবস্থায় সোলোনের নারী বিক্রি নিষিদ্ধ করার কাজটি ছিলো যথেষ্ট মানবিক ও উদার নীতির উদাহরণ। তথাপি 'The right of the male guardian to sell an unmarried woman who had lost her virginity' দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেয়া হয়। যদিও সোলোন প্রতিষ্ঠিত আইন ও গণতন্ত্রের নতুন ধরন ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে যথেষ্ট সু-প্রভাব রেখেছিলো, তথাপি 'সতীত্ব হারানো অবিবাহিত' মেয়েদের জন্যে তার উল্লিখিত আদেশ ছিলো বর্বর। তাছাড়া তার এ আইন তখনকার নারীদের উপর পুরুষ জাতির হীন মনোভাবেরই প্রকাশ, কেননা 'সতীত্ব হারানো' অবিবাহিত পুরুষদের শাস্তি প্রদানের কোনো আইন ছিলো না। ফলে কেউ কেউ এ আইন মহিলা বিদ্বেষপ্রসূত আখ্যা দিয়ে নতুন সৃষ্ট গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও পুরুষের হাতকে আরো শক্তিশালী করার নামান্তর বলে উল্লেখ করেছেন। সোলোনের গণতন্ত্রের সমালোচনা করা যদিও আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এটাও সত্য যে নারীদের জন্যে প্রণীত এই আইন পরবর্তী কয়েক শতাব্দী বহাল থাকে এবং এখানে আলোচিত সনাতনী যুগেই এর নারী সমাজকে ন্যুব্জ করে দেয়। 'সে সময় নারী ও দাসদের অবস্থান বস্তুত একই রকম ছিলো।' বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই যে 'শাশ্বত এথেন্স' নারীদের খুবই নিচু চোখে দেখত এবং কখন কখন এদের সামাজিক অধিকার দাসদের থেকেও দুঃখজনকভাবে নিম্ন পর্যায়ে ছিল। উদাহরণ, দাসরা বাজারে যাবার অর্থাৎ ঘরের বাহির হবার অনুমতি পেলেও নারীরা তা থেকে ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ঘরের কাজ, সন্তান পালন ও পুরুষের যৌন ক্ষুধা মেটানো ছিল তখনকার মেয়েদের প্রধান দায়িত্ব। তবে বিংশ শতাব্দীর কোন কোনো বুদ্ধিজীবী এথেন্সে মেয়েদেরকে দাসদের থেকে বেশি মর্যাদা দানের কথা উল্লেখ করেছেন, যা কি না অন্যরা কল্পনা প্রসূত ও অত্যন্ত স্থূল বলে তাদেরই সমালোচনা করেছেন। যেমন অধ্যাপক স্যারা বি. পামোরয়, তার 'গডেস, হোরস, ওয়াইফস এন্ড স্লেভস' গ্রন্থে ওইসব বুদ্ধিজীবীদের কৌশলগত প্রকৃতি নির্ণয় করে বলেন, '... তারা নিজস্ব সময় ও সামাজিক ধারার বলি।'

অধীনস্থ করা এবং যৌন ক্রিয়াকলাপের সুবিধার জন্যেই হয়তো পুরুষ ইচ্ছা করে নারীদের ঘরে বেধে রাখার প্রচলন করেছিলো। যদিও অনেক স্থানই ছিলো যেখানে গিয়ে পুরুষ তাদের যৌন ক্ষুধা অনায়াসে মেটাতে পারত, তথাপি স্ত্রীর স্বভাবের উপর পুরুষের ভাগ্যের স্তর নির্ধারণ করার নিয়মও ছিল। সমাজে প্রচলিত ছিল, 'যদি তোমার স্ত্রী সত্যিই একজন ভালো নারী হয়ে থাকে, তাহলে বলা যায়

যে তুমি একজন প্রকৃত ভাগ্যবান, নতুবা তুমি সমস্যাশঙ্কুল।' শুধু তাই নয়, নারীরা ঘরের বাইরে বেরুলে অন্য পুরুষের দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে এবং ফলত স্বামীকে সমস্যায় ফেলতে পারে তাই সে সময়ে সাধারণত নারীদের কোন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেয়া হত না, উপরন্তু কোনো রাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রতিনিধি হওয়া তাদের পক্ষে তখন ছিলো অকল্পনীয়। তবে কয়েকজন 'দেবী' বা 'গডেস' যেমন সেলিনি, গেরা, এথিনা প্রমুখ মোটামুটি উচ্চাসনে অবস্থান করতেন। অন্যদিকে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেন যে, শাশ্বত এথেন্সে নারীদের মাত্র দুটি ভাগে বিভক্ত করা যেতো : দেবী ও বেশ্যা। সাথে সাথে এটাও লক্ষ্ণীয়, খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে এথেন্সে মধ্যবিত্ত সমাজ বেশ ধন সম্পদের মালিক হন। সুতরাং কেউ কেউ মনে করেন ঐ সময়টা ছিলো সমাজে মেয়েদের জন্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাচীন, অন্ধকার যুগের পৌরাণিক তথ্যাদিও সমাজে নারী ও পুরুষের বিপুল পার্থক্য নির্দেশ করে। বিভাজনের এই মানসিকতা এথেন্সের সাধারণ মানুষের মন থেকেও কোনভাবেই বিলুপ্ত হয়নি, বরং সময় ও সুযোগ মতো নারীদের উপরে ধর্মের ধ্বজা তুলে এসব কঠোরভাবে ব্যবহারের চেষ্টা চালানো হয়েছে। ফলত পূর্ণ বয়স্কা কোনো নারীর অকাল মৃত্যুতে শোক পালন ব্যতিরেকে কর্তব্য কর্মে অকৃতকার্য হয়েছে বলে ধরে নেয়া হতো, কারণ সন্তান উৎপাদনই যেখানে তার একমাত্র কাজ সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে বীজ বপন না করে এরকম চলে যাওয়াকে সামাজিক নিষ্ঠুরতার সামিল বলে গণ্য করা হতো। এই সব অমানবিক চিন্তা চেতনার চিহ্ন পাওয়া যায় বহুবিধ চিত্রাঙ্কিত পাত্র ও প্রাচীন ফলকের উপর লিখিত গীতিকথায়।

আজকের দিনের মতই তখনও মেয়েদেরকে কোনো না কোনো পুরুষ অভিভাবকের অধীনে বাস করতে হতো, যদিও এ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন এসেছে পশ্চিমা সমাজে, পুবের মেয়েদের এখনও অভিভাবক নামক পুরুষ ব্যক্তির আদেশ মেনে নিতে হয়। অভিভাবক প্রধানত পিতা, তার অবর্তমানে বাড়ির অন্য কোনো মুরুব্বির পুরুষ চাচা, বড় ভাই...। বিবাহিতাদের জন্যে স্বামী প্রবর। স্বামীর মৃত্যুজনিত অনুপস্থিতিতে, পরিবারের অন্য কোনো উপযুক্ত পুরুষকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতে হতো। আরো লক্ষ্ণীয় যে, আজ যেমন আমাদের সমাজে যৌতুকের রেওয়াজ চালু আছে, এমনটি সেই প্রাচীন সময়েও ছিল; অভিভাবক বিয়ের সময় মেয়েকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ বা যৌতুক দিতেন যা দিয়ে তিনি অনায়াসে জীবন কাটাতে পারবেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এই অর্থ সর্বদাই স্বামী প্রবরটির হাতে থাকতো। তবে আইন ছিলো, স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে যৌতুকের অর্থ ফেরত দিতে হবে। এককালীন ফেরত না দিতে পারলে প্রাপ্য অর্থের

আঠারো শতাংশ সুদ দিতে হতো। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীকে তালাক দেয় সে ক্ষেত্রে ওই অর্থ স্ত্রী ফিরে পাবেন কি না এ ব্যাপারে তেমন কোনো তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত তখনকার সমাজে, যদিও এখনও কোথাও কোথাও একই নিয়ম বহাল রয়েছে, স্ত্রী স্বামীকে তালাক দেয়ার অধিকার পেত না। কিন্তু বিয়ের আগে মেয়েটির সতীত্ব যাচাই করার নিয়মও প্রচলিত ছিলো।

বিয়ের আয়োজন সাধারণত অভিভাবকই করতেন। অভিভাবকের পছন্দের পুরুষ বিয়ে করার বিকল্প ছিল না। এখানে মেয়ের মতামতের কোনো মূল্য দেয়া হতো না, বা তার কোনো মত আছে কি না সেটিও যাচাই করা দরকার বলে মনে করা হতো না। এসব ক্ষেত্রে কনে বাসর ঘরে যাবার আগে বরের সাথে সাক্ষাতের তেমন সম্ভাবনা থাকতো না। তবে কিছু কিছু বিয়ে যেমন চাচাতো বা মামাতো ভাইবোনদের মাঝে সংগঠিত হলে, মেয়েটি হয়ত ছেলেটিকে বিয়ের আগে পারিবারিক 'শব যাত্রায়' দু'একবার দেখার সুযোগ পেলেও পেতে পারতেন।

সতীত্ব রক্ষার কথা চিন্তা করে সাধারণত মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেয়ার নিয়ম চালু ছিল; অনূর্ধ্ব-১৪ বছর বয়সে একজন মেয়েকে স্বামী নামক পুরুষের হাত ধরতে হতো। এখানো আলোচিত সময়ের প্রায় এক হাজার বছর পরেও ঐতিহাসিকভাবে এ ঘটনার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব। মোহাম্মদ ৫৬ বছর বয়সে ছয় বছরের আয়েশাকে বিয়ে করেন এবং আয়েশার বয়স যখন নয় বছর তখনই স্বামীর সাথে তার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ডাক পড়ে।

> "...(H)e married the little daughter of his close friend Abu Bakr, a rich merchant of Mecca who embraced Islam in the early days of the call. The girl, named Aisha, was only six years old when the marriage contract was made. Three years later,... the little girl of nine was delivered to his harem. The apostle of Allab, in his passion to possess her, was in such a hurry that he did not even wait for nightfall; he asked the bride's mother to send her to his bedchamber in the morning hours after the wedding ceremony (Hekmet, 430)."

ব্যাপারটি জোরালোভাবে সমর্থন করতে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন মতামত পেশ করেন, তবে মোহাম্মদের অবর্তমানে খেলাফত বা উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পাবার বিষয়টি অনেকেই সমর্থন করেন, যদিও ইসলাম প্রবর্তনের সময় বিয়ে ব্যবস্থা, এর আচার অনুষ্ঠানের ধরন, ভিন্নতর ছিল। স্বামী গৃহে স্ত্রীর প্রশ্নাতীত অবস্থানকে ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব দিলেও, প্রাচীন গ্রীসে বৈবাহিক সম্পর্ককে সম্পূর্ণ বলে ধরা হতো স্ত্রীর একটি ছেলে সন্তান জন্ম দেয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে। 'সন্তান জন্ম, প্রধানত

একটি ছেলে সন্তান জন্ম হওয়ার মাধ্যমে একটি বিবাহ প্রক্রিয়ার সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরা হতো।' বিয়ের সময় প্রচুর বীচিযুক্ত ফল খাইয়ে মেয়ের উর্বরতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো হতো, তবে পুরুষ যে সর্বদা উর্বর নয় এ চিকিৎসাশাস্ত্রীয় জ্ঞান তাদের ছিলো না, ফলত পুরুষের উর্বরতা বাড়ানোর কোনো ফলটলও বাজারে পাওয়া যেতো না!

বিয়েতে মেয়েদের সতীত্বে উপর প্রচণ্ড জোর দেয়া হতো; অসতী হলে বিয়ের সম্ভাবনাই নাকচ হয়ে যেত, যদিও ছেলেদের যৌন ক্রিয়াকলাপের কোনো হিসেব নিকেষ বা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। পুরুষেরা যখন ঘরের বাইরে থাকতেন, যেমন যুদ্ধক্ষেত্র বা বাণিজ্যে– যৌন ক্রিয়ার জন্যে বেশ্যাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে দেখা যেত। তাছাড়া বাড়িতে থাকলেও স্ত্রী ব্যতীত তাদের যৌন সঙ্গী হতো দাসীরা, যদিও বাড়িতে স্ত্রীদের উপেক্ষা করে স্বামীরা দাসীদের ব্যবহার করতেন কি না সে ব্যাপারে সমাজ বিজ্ঞানিদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তথাপি, '...একজন পূর্ণবয়স্কা দাসী তার মনিবের যৌন আবেদন বা মনিব যদি তাকে সাময়িকভাবে কারো মনোরঞ্জনের জন্যে মনোনীত করতেন– তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার ছিল না।'

এথেন্সের মতো বড় শহরে কিছু নারী বেশ্যাবৃত্তি করেই জীবন ধারন করতেন। এ পেশায় নিয়োজিতদের তিন ভাগে ভাগ করা হতো : প্যারোনাইয়া– যারা শুধুই অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্রি করতেন, হিটাইরায়া– যারা তাদের খরিদ্দারদের শুধু দেহ দানই নয়, নাচ দেখাতেন এবং সামান্য গানও শোনাতেন, প্যাটাকাইয়া– এরা ছিলেন ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গী, নাচ গানে পারদর্শী; কখন কখন এরা উক্ত ব্যক্তির সন্তানও ধারন করতেন, যেমন এ্যাসপাসিয়া, তিনি প্রিকেলসের সন্তান ধারন করেছিলেন। এ ছাড়াও এথেন্সের অধিবাসীরা মূল নাগরিক ও বহিরাগত বাসিন্দা, উভয় গ্রুপই বেশ্যালয় খুলে তা দাসীদের দ্বারা পূর্ণ করার অধিকার পেতেন– এক্ষেত্রে এইসব দাসীরা জন্মগতভাবে সাধারণত বেশ্যা বা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতেন। এবং কোনো পুরুষ একজন নারীর সাথে যখন ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হতেন– অধিকাংশ সময়েই ওই নারী বেশ্যাদের ভেতর থেকে আসতো কারণ সে সময়ে একজন মেয়ে যিনি বৈধ নাগরিক তার সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব ছিল না, যদিও বিবাহ ক্রিয়ার মাধ্যমে এটা করা যেত। ফলত কেউ কেউ মনে করেন তখনকার সমাজ ছিল পুরুষের যৌন স্বর্গ।

পুরুষ থেকে নারীদের দূরে রাখার প্রচেষ্টাও 'শাশ্বত এথেন্সে' কম ছিলো না। এ ধরনের পৃথকীকরণ শুরু হতো বাল্যকালেই। অল্প বয়সেই একটি মেয়েকে সমবয়সী ছেলেদের থেকে দূরে রাখা হতো। অর্থাৎ মেয়েটি পার্শ্ববর্তী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরে তার মায়ের সাথে বসবাস করতো। 'আমার মেয়ে কখনোই ঘরের

বাইরে যায়নি' একথা বলতে পেরে বাবারা গর্বে বুক ফোলাতেন। তখনকার একজন 'ভাল মহিলা' কোনো অবস্থাতেই বাড়ির বাইরে যাবার অনুমতি পেত না। বাড়িতে অতিথি আসলে তাদের সামনে যাওয়া এবং আপ্যায়ন করার ভার ছিল বাড়ির পুরুষ ছেলে এবং দাসদাসীদের উপর। নারীরা অতিথিদের সামনে যাওয়া থেকেও বিরত থাকতেন। এমনকি কোন সুহৃদ পুরো পরিবারকে দাওয়াত করলে স্বামী এবং ছেলে সন্তানেরা সে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতেন, স্ত্রী ও মেয়েদের এ ধরনের সামাজিকতায় অংশ নেয়ার অনুমতি দেয়া হতো না। শুধু তাই নয়, স্ত্রী বাড়িতেও স্বামীর সাথে বসে খাবার অনুমতি পর্যন্ত পেতেন না, স্বামীর খাওয়া শেষে দাসদাসীদের সাথেই তাকে ভক্ষণ ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হতো।

এথেন্সে গরিব পরিবারগুলোতে অবশ্য ছেলেমেয়ে পৃথকীকরণের নিয়ম তেমন চালু ছিল না। পেটের ধান্ধায় নারী পুরুষ উভয়কেই বাড়ির বাইরে যেতে হতো। এ ধরনের অনেক পরিবারের নারীরা শাকসবজি বিক্রির জন্যে হাটে বাজারে যেতেন এবং পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভূমি কর্ষণের মতো শক্ত কাজও করতেন। তাছাড়া দরিদ্র শ্রেণী থেকেই বেশ্যাদের আগমন ঘটতো; অবশ্যই অর্থোপার্জন বা পেট বাঁচানোই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে নারীদের অবস্থান অত্যন্ত উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ। নাটকধর্মী ট্রাজেডিগুলোতে যেসব নারী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে তারা শক্তিশালী মহাকবিদের সৃষ্ট নায়িকাদের থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না। নারী চরিত্রগুলো শুধু পারিবারিক ক্ষেত্রেই শক্তিশালী অবদান রাখেননি, সামাজিকভাবেও যে তারা মানসম্মান এবং ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তা স্পষ্ট দেখিয়েছেন তখনকার বেশ কয়েকজন মহাকবি। হোমার ও থিসিয়াসের কবিতাগুলো এর যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে। অন্যদিকে ইরিপিডিসের নাটক ও 'থিবান এপিক সাইকেল' দিয়েছে ইডিপাসের মতো অদ্বিতীয় অথচ বেদনাঘন কাহিনী; এন্টিগনি তার চরিত্রে যে শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার এবং পুরুষ শাসিত অন্ধকার সমাজকে অবাক করে দেবার মতোই বটে, তার চরিত্র কোনো অবস্থাতেই পিঞ্জরে অবাধ্য কোনো রমণীর গা-বাঁচানো ভাবলেশহীন উপস্থাপন নয়।

হয়তো উল্লিখিত নারী চরিত্রের সাথে 'শাশ্বত এথেন্সে'র প্রকৃত নারী চরিত্রের কোন মিল ছিল। হয়তো অন্ধকারের অতলে নিমজ্জিত সেই সমাজকে ঝাকি মেরে ওঠানোর জন্যে মুক্তচিন্তার লেখকদের কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে সেইসব নারী যাদের সামাজিক মর্যাদা আছে। কেউ কেউ মনে করেন এসব চরিত্র উঠে এসেছে লেখকদের পরিচত গণ্ডির ভেতর থেকে, অর্থাৎ যেসব নারী প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে বিদ্রোহ করেছেন বা করতে চেয়েছেন তারা ওইসব লেখকদের বন্ধুস্থানীয় বা পরিচিত। ফলত ধরে নেয়া যায় যে, নির্যাতিত নারীদের পাশাপাশি একদল ছিলেন

যারা প্রচলিত সমাজ ভেঙ্গে দিতে বিদ্রোহ করেছেন। এন্টিগনির উক্তি, 'যখন আমি কিছুই করতে পারব না, তখনই কেবল শান্ত হব', আমাদের এমন এক চরিত্রের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় যিনি 'করবো নয় মরবো' শপথে নারী মুক্তির সংগ্রাম করেন। কিন্তু একই সাথে যখন ইসমিন বলেন, '... আমরা মহিলা, স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের সাজে না...' আমরা এও ভাবতে ভুলে যাই না যে নারীরা দ্বিধান্বিত, সন্ত্রস্ত, দুর্বল ও সামাজিক অবস্থানের কাছে বন্দি।

'লাইসিসট্রাটা' নাটকে নারীরা ছিলেন শান্তির পক্ষে, তারা চাননি যে পুরুষেরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হোন। পুরুষ যখন তাদের আবেদনে সাড়া দেননি তখন স্বামীদের বিরুদ্ধে স্ত্রীরা 'যৌন হরতাল' ডেকে বসেন। নাটকটি যদিও হাস্যরসে সমৃদ্ধ, তথাপি যখন লাইসিসট্রাটা বলেন, 'এ শহরের ভবিষ্যৎ আমাদের উপর (এরিসটোফেন, ১৮১)', তখনই ক্লাসিকাল এথেন্সের নারীদের দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের বলিষ্ঠ উদাহরণ পেয়ে যাই। এই নাটকে লাইসিসট্রাটা আত্মপ্রত্যয়ী, অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সফল, কিন্তু তিনি স্বীকার করেন তার সমস্ত জ্ঞানের উৎস পিতা, স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য পুরুষেরা, যা প্রকারান্তরে প্রমাণ করে যে সে যুগে পুরুষই ছিল সকল জ্ঞানের ধারক ও বাহক। তথাপি কিছু নারী যে সম্মানিত ও শিক্ষিত ছিলেন তাও মিথ্যা নয়, যেমন এ্যাসপাসিয়া। 'তিনি ছিলেন সক্রেটিসের বন্ধু-স্থানীয় যিনি বাগ্মিতার শিক্ষা দিতেন।' এথেন্সের বিখ্যাত রাজনীতিক ও স্ট্রাটোপাস- নির্বাচিত সাংসদ প্রিকেলসের সাথেও এ্যাসপাসিয়ার অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক ছিলো। প্রিকেলস ও তার স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর এ্যাসপাসিয়া হিটাইরায়া হিসেবে তার সাথে বসবাস করতেন। এ সময় তাদের একটি ছেলে সন্তানও জন্ম নেয়। প্রিকলসের মৃত্যুর পর অন্য একজন প্রিয় রাজনীতিক লিসিকেলসের সাথে তার সম্পর্ক হয়। এ সময়ে এ্যাসপাসিয়ার গুরুত্ব আরো স্পষ্ট হয় যখন প্লেটোর মতো দার্শনিকও তাকে নিয়ে লেখেন।

শাশ্বত এথেন্সের নারীদের সামাজিক অবস্থান যদিও বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তথাপি হাতে গোনা দু'একজন ছাড়া সব নারীই ছিলেন অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়ন, নিষ্পেষণের শিকার। কিন্তু প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে আজকের সমাজে ধর্ষণ, খুন, একাধিক বিবাহ, শারীরিক নির্যাতন অর্থের অসম বণ্টন, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি যখন প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দেখা দিয়েছে তখন নারীদের অবস্থা কতটুকু উন্নত? আমরা হয়তো এ নিয়ে ভাবতে পারি। ভাবা দরকার।

ডারউইনিজমের আতঙ্ক

ভিক্টর স্টেংগার
অনুবাদ : বন্যা আহমেদ

'আমাদের চারপাশের বিশ্বজগতে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলেই বোঝা যায় এর মধ্যে কোন পরিকল্পনা নেই, উদ্দেশ্য নেই, নেই কোন অশুভ কিংবা শুভের অস্তিত্ব; আসলে অন্ধ, করুণাহীন উদাসীনতা ছাড়া এখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না।'

- রিচার্ড ডকিন্স, জীব বিজ্ঞানী এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির Public Understanding of Science বিভাগের অধ্যাপক

সরলতার বিপদ :

বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় ধারণা হচ্ছে যে, যুগে যুগে বিজ্ঞান তার পুরানো তত্ত্বগুলোকে আবর্জনার স্তুপে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নতুন তত্ত্বকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়ে এবং এভাবে ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পদার্থবিদ এবং চিন্তাবিদ থমাস কূন, তার বহুলপাঠ্য 'The Structure of Scientific Revolution' বইয়ে প্রথম এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তার বদৌলতেই আজকে এই 'Paradigm shift' কথাটি আমাদের নিত্যদিনের শব্দভাণ্ডারের অংশ হয়ে গেছে। 'বিজ্ঞান আকস্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে থাকে'– এই ধারণাটি আসলে এক ধরনের অতিরঞ্জন বৈ আর কিছু নয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পদার্থবিদ স্টিভেন ভাইনবার্গের মতে, বিজ্ঞানের ইতিহাস খুঁজলে থমাস কুনের বলা এই ব্যাপক 'Paradigm shift'-এর উদাহরণ খুবই কম দেখা যায়। সত্যি কথা বলতে কি, বিজ্ঞানের বেশিরভাগ পরিবর্তণই ক্রমান্বয়িকভাবে আস্তে আস্তে ঘটে এবং নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের পরেও অনেকদিন ধরে পুরানো তত্ত্বগুলো ব্যবহৃত হতে থাকে, নতুন আবিষ্কারগুলো পুরানোগুলোকে হটিয়ে বিদায় করে না দিয়ে বরং

নিজেরাই নতুন পরিসরে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, যদিও প্রায় এক শতাব্দী আগেই কোয়ান্টাম বিপ্লব নিউটনীয় তত্ত্বকে আপাত 'ভুল' বলে প্রমাণ করেছিল, কিন্তু পদার্থবিদ্যা পাঠ্যক্রমের বেশিরভাগ জুড়ে এখনও চিরায়ত নিউটনীয় মতবাদই আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। ভাইনবর্গের মতে তার সহকর্মী থমাস কূনও, হাভার্ড এ তার ছাত্রদেরকে ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যাই শিক্ষা দিতেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা চিরায়ত পরিসরকে (classical domain) কেন্দ্র করে কাজ করে এবং পারমাণবিক, আন্তপারমাণবিক এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও এর অনন্য কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু নিউটনীয় বলবিদ্যা যে সময় বিকশিত হয়েছিল সে সময় কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রমাণ করার মতো কোন উপাত্ত বিজ্ঞানীদের হাতে ছিল না।

তবে গত পাঁচ শতাব্দীতে অন্তত পক্ষে দুটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে বড় Paradigm shift হিসেবে চিহ্নিত করা যায়: (১) ষোড়শ শতাব্দীতে কোপর্নিকাসের আবিস্কৃত তত্ত্ব– পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এবং (২) উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৫৯ সাল) চার্লস ডারউইন এবং এ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস এর প্রস্তাবিত প্রকল্প– প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তন। এ দুটি তত্ত্ব শুধু যে মানুষের চিন্তাধারাকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করেছিল তাই নয়, তারা তখনকার প্রাচীন এবং গভীরভাবে সুরক্ষিত চিন্তা পদ্ধতিকে সরিয়ে দিয়ে পুরানো ধারণাগুলোর ওপরও আধিপত্য বিস্ত ার করেছিল। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্মণীয় যে, তত্ত্ব দুটোই পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রাচীন চিন্তাধারাসমূহকে প্রবলভাবে আঘাত হেনেছিলো– যেগুলোকে মানুষ এতদিন ধরে সৃষ্টিকর্তার অভ্রান্ত বাণী হিসেবে বিশ্বাস করতো। এই দুই তত্ত্বকেই সে সময় খ্রিষ্টান ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি এক প্রাণঘাতী বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল।

এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক বিবর্তনবাদ ডারউইনের প্রস্ত াবিত প্রাথমিক ধারণার পরে, বিশেষ করে মৌলিক ডিএনএ'কে কেন্দ্র করে আণবিক কার্যপ্রণালী আবিস্কৃত হওয়ার পর থেকে, অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আবার কারও কারও মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের বাইরেও অন্যান্য প্রাকৃতিক পদ্ধতিও বিবর্তনে ভূমিকা রাখে। আমি এখানে 'ডারউইনিজম' বলতে শুধুমাত্র আকস্মিকতার প্রাকৃতিক পদ্ধতি এবং প্রাকৃতিক নিয়মের (natural process of chance and natural law) সমন্বয়ে ঘটা জৈবিক বিবর্তনকেই বুঝাচ্ছি।

ষোড়শ শতাব্দীতে রোমান চার্চ গ্যালিলিকেও কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব, যাকে গ্যালেলিও শুধুমাত্র একটি গণিত শাস্ত্রীয় মডেলই নয় বরং 'বাস্তব সত্য' হিসেবে তুলে ধরেছিলেন, তা অস্বীকার করতে বাধ্য করিয়েছিল। খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, পৃথিবী সৌরজগতের অনড় কেন্দ্র।

chron. ১৬.৩ তে উল্লেখ আছে, 'হ্যা পৃথিবী শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কখনই নড়বে না....'। Ps ১০৪:৫ দৃঢ়তার সাথে বলে, 'তিনি পৃথিবীকে তার ভিত্তির উপর স্থাপন করেছেন, যাতে কোন দিনও একে নাড়ানো না যায়।...' একইরকম আরও অনেক উক্তি দেখা যায় যেমন: Ps.৯৩:১ এবং ৯৬:১০ এ। তা সত্ত্বেও প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যেই কোপারনিকাসের সৌর-তত্ত্বের বিরুদ্ধে ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের সংগ্রাম ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। মূলত কোপারনিকাসের তত্ত্বের পক্ষে জোড়ালো সাক্ষ্য প্রমাণগুলো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো যে, ধর্মকে হয় একসময় বাস্তব সত্য গ্রহণ করে নিতে হত না হয় ধ্বংস হয়ে যেতে হত। শেষ পর্যন্ত বলতে গেলে, এক ধরনের প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্য দিয়েই ধর্মকে মেনে নিতে হয় যে, পৃথিবী আসলেই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। এর ফলে গোড়া ধার্মিকেরাও এটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় যে, বাইবেলে লেখা সব কিছুকে সবসময় আক্ষরিক অর্থে মেনে নেওয়া যাবে না। এখান থেকেই ধর্মবাদীদের (Apologistic) পক্ষ থেকে নতুন জ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে বাইবেলকে পুনর্ব্যাখ্যার প্রয়াস শুরু হয়, তা বাইবেল-বিবৃত আক্ষরিক বাণীর সাথে সাদা চোখে যতই অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হোক না কেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী আসতে আসতে ইউরোপে চার্চের ক্ষমতা ভীষণভাবে কমে আসে, এবং সে কারণেই ডারউনিকে গ্যালিলিওর মত দুঃখজনক পরিণতির স্বীকার হতে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ডারউইনকে তার বর্ণিল জীবনের শেষে নিউটনের পাশে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবিতে সমাহিত করা হয়। তারপরও, চিন্তাবিদ ড্যানিয়েল ডেনেট ডারউইনের মতবাদটির নাম দিয়েছেন 'ডারউইনের বিপজ্জনক প্রস্তাব'। এটি 'বিপজ্জনক' কারণ এটি বলে যে, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী থেকে ওপরওয়ালার নির্দেশনা ছাড়াই, শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সরল প্রাণ থেকে ক্রমান্বয়ে উৎপত্তি লাভ করেছে। আর সে কারণেই ডারউইনের এই তত্ত্বটি সে সময়ে খুব কম জায়গায় সাদরে গৃহীত হয়েছিল। আজও ডারউইনের এই বিপজ্জনক তত্ত্বটি বিজ্ঞান এবং অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

বিবর্তন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিকতা

সর্বসাধারণের মধ্যে বিবর্তনবাদ আসলেই বৈজ্ঞানিক কিনা এ নিয়েই বিতর্ক থাকলেও বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলোতে আদৌ এমন কোন তর্ক-বিতর্কের নজীর পাওয়া যায় না, সেখানে বিতর্কযুদ্ধ চলে বিবর্তনবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খতা নিয়ে, কখনও মতবাদটির মৌলিক ব্যাপারগুলো নিয়ে নয়। ডারউইনের সময়কাল থেকে এখন পর্যন্ত বিবর্তনবাদের সপক্ষে পরীক্ষা লব্ধ সাক্ষ্য প্রমাণের সংখ্যা হাজারগুণে বৃদ্ধি

পেয়েছে। প্রাণের উৎপত্তি এবং গঠনের ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদ এতখানিই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে যে একে এখন জীববিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

ডারউইন যা জানতেন তার চেয়ে আমরা এখন অনেক অনেক বেশি জানি, এবং আজকে আমরা এই অগ্রসর জ্ঞানের আলোকে বিবর্তনবাদের মূল তত্ত্বের আমূল সত্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা এখন জীন তত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু এবং তাতে ডি.এন.এ কি ভূমিকা পালন করে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বুঝতে পেরেছি। এ সকল আবিষ্কারই বিবর্তনবাদের মূল মতবাদকে আরও সুদৃঢ় করেছে। আজকে আমরা জিনের ভিতরেই বিভিন্ন প্রাণের মধ্যে বিদ্যমান নিবিড় সম্পর্ক এবং তাদের সাধারণ উৎপত্তির ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি।

আমি যখন এই বইটি লিখছিলাম তখনই মানুষের জিনোম প্রজেকটের ফলাফল প্রকাশিত হয়। এখন পর্যন্ত যত প্রাণীর জিনোম পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে পাওয়া পরিচিত ডি.এন.এ'র অনুক্রমগুলো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, সকল জীব একই উৎস থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে– ঠিক যেমনটি ডারউইন বলেছিলেন। ল্যাবরেটরিতে ব্যাকটেরিয়া, ফলের মাছি (ফ্রুট ফ্লাই), এবং অন্যান্য প্রাণীর বিবর্তন আমরা চোখের সামনেই দেখেছি। চিকিৎসাবিদ্যার গবেষণায় বিবর্তন একটি অপরিহার্য অংগ হিসেবে বিবেচিত হয়। আজ সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, বিবর্তনবাদ থেকে পাওয়া জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা ইতোমধ্যে হাজার হাজার মানুষের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি।

কোন কার্যক্রম বৈজ্ঞানিক কিনা তা বিচারের মানদণ্ড নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু নীচের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, বিবর্তনবাদ যে বিজ্ঞান তা নিয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। এখানে অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ (emperical observation) নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং পরীক্ষণযোগ্য এমন ভবিষদ্বানী (testable predications) করা হয় যা ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিক মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বিশেষ করে, ডারউইন এবং ওয়ালেসের প্রস্তাবিত বিবর্তন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলে তা খুব সহজেই ভুল প্রমাণিত হয়ে যেত।

ডারউইন এবং ওয়ালেসের সময়, বেশিরভাগ মানুষ বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী বিশ্বাস করতো যে, ছয় হাজার বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিল। ঠিক এই সময়েই ভূতত্ত্ববিদরা প্রমাণ পেতে শুরু করেন যে পৃথিবীর বয়স আসলে তার থেকে অনেক বেশি এবং এই নতুন তথ্যটি ডারউইনকে এতই আলোড়িত করেছিল যে তিনি বিগেলের সমুদ্রযাত্রার সময় চার্লস লিয়েলের লেখা 'ভূতত্ত্বের মূলনীতি'

বইটি সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'On the Origin of the Species by Means of Natural Selection' বইটির প্রথম সংস্করণে ডারউইন, ভূততত্ত্বব থেকে পাওয়া জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে, সাধারণ একটি অনুমান করেন যে পৃথিবীর বয়স আসলে কয়েকশ' কোটি বছর। সেখান থেকেই তিনি দেখান, প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটা এবং তার মাধ্যমে বহু প্রজাতির জীব সৃষ্টি হওয়ার জন্য যে লম্বা সময়ের দরকার তা আমাদের এই পৃথিবীর আছে।

বিখ্যাত পদার্থবিদ উইলিয়াম থমসন (যিনি পরে লর্ড কেলভিন উপাধিতে ভূষিত হন) এই অনুমানের বিরোধিতা করে বলেন যে পৃথিবীর বয়স আসলেই ডারউইন যা বলেছেন তার থেকে অনক কম। থমসন থার্মো-ডাইনামিকসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন, তিনিই প্রথম থার্মো-ডাইনামিকসের দ্বিতীয় সূত্র এবং চরম তাপমাত্রা স্কেল আবিষ্কার করেন। থমসনের সময় বিজ্ঞানীরা সৌর রশ্মির বিকিরণে অবদান রাখতে পারে এমন শক্তির উৎস হিসেবে শুধুমাত্র রাসায়নিক শক্তি এবং মাধ্যাকর্ষণের কথাই জানতেন। থমসন দুইটি প্রক্রিওয়ার মাধ্যমেই আলাদা আলাদাভাবে সূর্যের বয়স নির্ধারণ করে দেখান, মাধ্যাকর্ষণ বল ব্যবহার করলে সূর্যের বয়স সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় এবং সেটাও কিনা হচ্ছে মাত্র কয়েকশ লক্ষ বছর। থারমো-ডাইনামিকসের সুত্র ব্যবহার করে কেলভিন এটাও প্রমাণ করেন যে, এমনকি মাত্র কয়েক লক্ষ বছর আগেও পৃথিবীর তাপমাত্রা এতই বেশি ছিল যে সেখানে কোনরকম প্রাণের উৎপত্তি ঘটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

ডারউইনের সময়কালে বিজ্ঞানীরা পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে যা জানতেন তা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা সম্পর্কে বড় ধরনের সন্দেহের জন্ম দেয়। ডারউইন বিবর্তন তত্ত্বের আরেক আবিষ্কারক ওয়ালেসকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে থমসনের দৃষ্টিভঙ্গী আমার সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' থমসনের সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হত তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনতত্ত্ব তখনি ভুল প্রমাণিত হয়ে যেত। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ প্রসঙ্গে থমসনের সিদ্ধান্তই আসলে ভুল ছিল এবং সে কারণেই ডারউইনের তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায়নি। কিন্তু থমসনকেও এখানে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তিনি সেই সময়ের জানা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যবহার করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।. তারপর, বিংশ শতাব্দীতে নতুন আরেকটি শক্তির উৎস হিসেবে পারমাণবিক শক্তি আবিস্কৃত হওয়ার পর দেখা গেল যে এটি রাসায়নিক বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। এর ফলে সূর্যের বয়স নিখুঁতভাবে হিসেব করার জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য একটি পরিমাপক খুঁজে পাওয়া গেল। আরো দেখা গেল

যে, থমসন পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে আসার ক্ষেত্রে সময়ের হারের যে হিসেব করেছিলেন তা সম্পূর্ণই ভুল কারণ পৃথিবী প্রাকৃতিক পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার মাধ্যমে তার পূর্ববর্তী অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি তাপ উৎপাদন করে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির মধ্যে বিজ্ঞানীরা বেশ ভালভাবেই প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন যে, পারমাণবিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেই সূর্যের ভিতরকার তাপের সৃষ্টি হয়। এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ সূর্য হতে প্রাপ্ত নিউট্রিনো পর্যবেক্ষণ করার (এমন একটি পরীক্ষায় আমি নিজেও অংশগ্রহণ করেছিলাম) মাধ্যমে সূর্যের শক্তির উৎস হিসেবে পারমাণবিক শক্তির যথার্থতা আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় এবং সূর্যের সম্ভাব্য বয়সও হিসেব করে বের করা হয় প্রায় একশ কোটি বছর। এর আগেই রেডিওঅ্যাকটিভ এবং ডেটিং এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে পৃথিবীর বয়স আসলেই কয়েকশ' কোটি বছর, এবং প্রত্নতত্ত্ববিদরাও প্রায় কাছাকাছি সময়কালের মধ্যেই পৃথিবীতে প্রাণের খোঁজ পেয়েছেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, বিবর্তনবাদ অন্য যে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মতই একটি বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ, এবং বিজ্ঞান কাজ করে উন্মুক্ত সীমায়, কাজেই কেউ দিব্যি দিয়ে বলতে পারেন না যে, ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের কোথায় কী পরিবর্তন করতে হবে। তবে এই মুহূর্তে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বর্ণিত বিবর্তনবাদকে ভবিষ্যতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে (অন্ততপক্ষে একটি ব্যাপক পরিসরে) বললে, ভবিষ্যতে পৃথিবী আবার সমতল প্রমাণিত হবে বলার মতই শোনাবে।*

---

*বিজ্ঞানী ভিকটর স্টেংগার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের সংযুক্ত অধ্যাপক। তিনি 'কলোরাডো সিটিজেন অব সায়েন্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং মুক্ত-মনার একজন মন্মানিত সদস্য। ড. স্টেংগার Timeless Reality, The unconscious Quantum, physics and psychics, and not by design সহ অনেক সুলিখিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের প্রণেতা। অনূদিত প্রবন্ধটি অধ্যাপক স্টেংগারের অনুমতিক্রমে তার সর্বশেষ বই 'Has Science Found God? The Latest Results in the Search for purpose in the Universe' এর একটি অধ্যায় থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

সমকামিতা কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ

অর্ণব দত্ত

বিশ্বব্যাপী সমকামীরা* একপ্রকার ঘৃণা ও বঞ্চনার শিকার হন। তার প্রধান কারণ সমকাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানের মতে সমকামিতা কখনই প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ নয়। সে প্রেমে প্রেম থাকে না, বা সমকামী মাত্রই শরীর সর্বস্ব ব্যভিচারী। বর্তমান প্রবন্ধে আমি তাই বিজ্ঞান ও যুক্তির সাহায্যে সমকামিতাকে বুঝবার চেষ্টা করেছি।

সমকামিতা কি? বিশ্বের বৃহত্তম অনলাইন বিশ্বকোষ উইকিপেডিয়ায় সমকামিতা বা Homosexuality-এর সংজ্ঞায় লিখেছে,

> "Since its coining, the term homosexuality has acquired multiple meanings. In the original sense, it refers to a sexual orientation characterized by aesthetic attarction, romantic love, and sexual desire exclusively for members of the same sex or gender identity. It can also refer to the manifestation of that orientation in the identity of an individual, which may or may not be at odds with that person's sexual behavior. Finally, it can refer to sexual relations with another of the same sex regardless of one's sexual orientation, self-identification or gender identity."

দেখা যাচ্ছে সমকামিতা শুধু যৌন প্রবৃত্তি (sexual urge) দিয়ে নির্ধারিত হয় না। তার সাথে জড়িয়ে রয়েছে প্রেম ও সৌন্দর্যবোধও। শেক্সপিয়রের সনেটগুচ্ছ বা

মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিডের মর্মরমূর্তি তার বাস্তব প্রমাণ।

সমকামিতা প্রসঙ্গে সকল কুসংস্কারের মূলে যেসব ভ্রান্ত ধারণাগুলি সর্বাপেক্ষা কার্যকর তার মধ্যে একটি হল, সমকামিতাকে যৌন প্রবৃত্তি হিসাবে একটি পছন্দ বা choice মনে করা। Time পত্রিকার বিগত একটি সংখ্যায় প্রকাশিত মাইকেল ডি. লেমনিকের লেখা একটি প্রতিবেদন এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত। লেমনিক লিখেছেন,

> Sure enough, when the Swedish scientists ran the experiment this time, the results were striking: when gay men were exposed to male pheromones, their hypothalamus lit up just like a woman's. Female hormones did nothing for them.
> "What the studay does not show, however – despite what some scientists claimed – is that sexual preference is biologically hardwired and thus present from birth. That idea is pretty much accepted by most gays and many biologists as well. But it is refuted by those – generally on the religious right – who have a stake in believing that homosexuality is a personal choice rather than an inborn trait." Time, (Asian Edition) 23 May, 2005. p.42

ধর্ম ও সমপ্রেমের সংঘাতের জায়গাটা কোথায়? আসুন এবার তা আলোচনা করা যাক।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সংগঠিত ও বর্তমান ধর্ম হিন্দুধর্মে সমপ্রেম সম্পর্কে আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। বলা যেতে পারে হিন্দুশাস্ত্র এই বিতর্ক সুনিপুণভাবে এড়িয়ে গেছে। সে কারণে বর্তমানকালে সমপ্রেম বিষয়ে হিন্দুধর্মের অবস্থান নিয়ে এক বিতর্কের সুত্রপাত হয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রে প্রেম ও কাম নিছক শরীর রঞ্জনের উপায় না থেকে এক সনাতন শক্তির স্তরে উন্নীত হয়েছে। নরনারীর যে মিলন সন্তান উৎপাদনে সক্ষম তাকে জীবনের ধারা রক্ষার একটি মুখ্য উপায় বলে বর্ণনা করে তাকে এক পবিত্র কর্তব্যের পর্যায়ে পর্যবাসিত করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মসূত্রে বিবাহকে প্রজা (বংশরক্ষা), ধর্ম (কর্তব্যপালন) ও রতি (প্রিয় সাহচার্য) এই তিন উদ্দেশ্যের বিধেয় বলে বিধৃত হলেও হিন্দুদের প্রধান শাস্ত্রগুলি সরাসরি সমকামকে ঈশ্বর বিরোধীতা বলে গণ্য করেনি বা তার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দেয়নি। শোনা যায় বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও সমকামিতা বিষয়ের একটি গোটা অধ্যায় নির্দিষ্ট করা ছিল। সেটিও রহস্যজনকভাবে অবলুপ্ত হয়। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের মিথুন মূর্তিগুলি পরিদর্শন করলে বেশ কিছু সমপ্রেম বিষয়ক মুর্তিও দেখা যাবে।

সমপ্রেম ও খ্রিষ্টধর্মের বিরোধ সর্বজনবিদিত। পৃথিবীতে সমপ্রেম সর্বাপেক্ষা বেশি নিন্দিত হয়েছে এই ধর্মেই অথচ প্রাচীন প্যাগানদের (যথা গ্রীক ও রোমান) বাদ দিলে সমপ্রেমের সর্বাধিক অনুশীলন এই মতাবলম্বীদের মধ্যেই দেখা যায়। মারলো, শেক্সপীয়র, বায়রণ, অস্কার ওয়াইল্ড, মাইকেল এঞ্জেলো, দ্য ভিঞ্চি থেকে হালের উইলফ্রেড ওয়েন, এলটন জন, জর্জ মাইকেল প্রমুখ বেশিরভাগ সমকামী সেলেব্রিটিই ছিলেন খ্রিষ্টান। ইহুদি ধর্মে সমপ্রেমের অবাধ প্রচলন ছিল। আদি বাইবেলে তার অনেক সূত্র রয়েছে। মনে করা যেতে পারে প্যাগান ও ইহুদিদের থেকে স্বতন্ত্র বজায় রাখার জন্য খ্রিষ্টীয় শাস্ত্রকারগণ এই সমপ্রেম বিরোধিতা আমদানি করেন।

ইসলামের বিভিন্ন চিন্তাধারায় (school) সমকাম সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। কোথাও বিধেয় হয়েছে সামান্য দণ্ড, তো কোথাও প্রস্তরাঘাতে হত্যারও বিধান দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় যে সমপ্রেমকে ধর্মগ্রন্থ আকারে ইঙ্গিতে ঈশ্বরের আইনবিরোধী বলেছেন, তা কতটা প্রকৃতির নিয়ম বিরোধী।

মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে ৪৫০টিরও বেশি প্রজাতি সমকাম অনুশীলন করে। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সেখানকার সেন্ট্রাল পার্ক পশুশালায় একজোড়া পুরুষ পেঙ্গুইন নিজেদের সঙ্গী নির্বাচন করেছে। নিউইয়র্ক শহরে অনেক পেঙ্গুইনই এরূপ সমকামী নির্বাচন করেছে বলে খবরে প্রকাশ। হয়ত অনেকেই জানেন না বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখেছেন, পেঙ্গুইন, গিরগিটি, ভেড়া, চিত্রিত হায়না (spotted hyena) বা বোতলনাক ডলফিনের মত প্রাণীও সমকামিতায় অভ্যস্ত। জাপান, জার্মানি পশুশালাগুলিতে পেঙ্গুইনদের সমসঙ্গী নির্বাচন করে নিতেও দেখা গেছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে মানবসমাজে সমকামিতা কোনো জৈব অস্বাভাবিকতা নয়, তা প্রাকৃতিক একটি প্রথামাত্র। তাই নিছক ধর্মীয় কুসংস্কারের বশে সমপ্রেমকে নিষিদ্ধ করে রাখা অযৌক্তিক।

সমকামিতা সম্পর্কে আরেকটি অভিযোগের জবাব না দেওয়াটা অন্যায়। অনেকে মনে করেন সমকামিতা একপ্রকার শরীরসর্বস্বতা। এ অভিযোগ অযৌক্তিক বলে মনে হয়, আধুনিক ভোগবাদী সমাজে সমকাম অসমকাম সবচাইতেই একই প্রকার শরীরসর্ব্বস্বতা দেখা যায় না কি? এক হিসাব অনুযায়ী প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে একজন নারী ধর্ষিত হন। সে কি শরীরসর্বস্বতার চরম উদাহরণ নয়? নিষিদ্ধ বস্তুকে পাবার আগ্রহ ও নিষিদ্ধ সমাজের গণ্ডী সমকামীকে বিকারের পথে পরিচালিত করছে।

সমকামকে সমপ্রেম বলতে আমার কোন বাধা নেই। কারণ আমি

সমপ্রেমীদের ভালোবাসার যথেষ্ট উদাহরণ প্রত্যক্ষ করেছি। কলকাতার খ্যাতনামা মনস্তত্ত্ববিদ ড. নীলাঞ্জনা সান্যাল কথা প্রসঙ্গে একবার আমায় বলেছিলেন, সচিনকে দিয়ে জোর করে বাঁ হাতে ক্রিকেট খেলালে আমরা সচিনকে পেতাম না। কারণ তার প্রতিভার বিকাশের পথটিও এর দ্বারা বন্ধ হয়ে যেত। তেমনই যে সমকামী তাকে জোর করে অসমকামীতে পরিণত করা বোকামি। কারণ, সেই বিজ্ঞান। সমকাম মধুমেহ রোগ নয় যে মিষ্টি নিষিদ্ধ করে তার চিকিৎসা করানো সম্ভব। এ হল মানব চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা খুব কম মানুষই পান। ভাবুন তো কি হত যদি শেক্সপীয়র তার অপূর্ব সনেটগুচ্ছ রচনায় হাত না দিতেন, যদি মাইকেল এঞ্জেলো ও দ্য ভিঞ্চি তাদের অপূর্ব পুরুষমূর্তিগুলি না বানাতেন। মানব সংস্কৃতিকে সমপ্রেমিক মন যে অপূর্ব সম্পদ দান করেছে, তা কোন অংশে ন্যূন বা হীন নয়। একথা বুঝতে পেরিয়ে গেল দুটি সহস্রাব্দ।

তবে সুখের বিষয়, পৃথিবীব্যাপী সমকামীদের বিশাল আন্দোলনের চাপে মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় ধীরে ও বিলম্বিত লয়ে হলেও– হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রগতিশীল দেশে সমকামিতা আইনসিদ্ধ। বহুদেশ সে পথেই হাঁটছে। কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে এ সম্পর্কে একটি পজিটিভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তিলোত্তমা মজুমদার 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' উপন্যাসে নারী সমকামিতার সমস্যাগুলি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। ভারতে দিল্লি, মুম্বাই বা চেন্নাই শহরে আজ সমকামীরা যে রকম সংঘবদ্ধ, কলকাতায় তা হয়তো ঠিক এই মুহূর্তে সম্ভব হয়নি। তবে সাধারণ মানুষের এ সম্পর্কে ধারণা পাল্টাচ্ছে। প্রতি বছর জুন মাসে অনুষ্ঠিত সমকামী মানুষদের বিশাল পদযাত্রা ও তাদের প্রতি মিডিয়ার সংস্কারশূন্য মনোবৃত্তি অনেক আশা সঞ্চার করেছে। সর্বোপরি ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট মাস কয়েক আগে ভারতীয় সংসদকে এক নির্দেশ দিয়ে সমকাম আইনসিদ্ধ করার পরামর্শ দেয়।

বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে সমকামিতা নিয়ে সচেতনতা কিঞ্চিৎ কম। সমকাম সম্পর্কে অযথা ভীতি ও অবৈজ্ঞানিক মধ্যযুগীয় ধারণা নির্মূল করার কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদের মত কুসংস্কারও মানবতার এক প্রধান শত্রু। কবিগুরুর ভাষায় :

যে জাতি জীবনধারা অচল অসার
পদে পদে বাধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

সৃষ্টিতত্ত্ব

বেগম রোকেয়া

সে দিন গল্প করিতে করিতে আমাদের অধিক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল, জিন, পরী, ভূত। কেহ শ্বেতশ্মশ্রু জিনকে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছেন; কেহ দেখিয়াছেন, সিতবসনা পরী এবং কেহ ভূতকে মাছভাজা খাইতে দেখিয়াছেন। মিস ননীবালা দত্ত ঘুমাইয়া পড়িলেন; আমি একটা সোফায় বসিয়াছিলাম। জাহেদা বেগম আমাকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া ল্যাম্প নিবাইয়া আপন কামরায় চলিয়া গেলেন। শিরীন বেগম আপন কামরায় না গিয়া আমারই পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। ল্যাম্প নিবিল, কিন্তু এক কোণে মোমবাতি জ্বলিতেছিল, তাহার আলোক গৃহসজ্জা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বলিতে পারি না, আমার বিশ্বাস আমি জাগ্রত ছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ভয়ানক একটা শব্দ হইল। তাহাতে ননীবালা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'কিসের শব্দ হলো?'

"বলতে পারি না। কিছুদিন হলো আমি সংবাদপত্রে ছবি দেখেছিলুম, বিলেতে একটা এরোপ্লেন ইঞ্জিন ভেঙে কোন বাড়ির ছাদের উপর পড়ে গিয়েছিল, আর এরোপ্লেনের আরোহী ভাঙা ছাদ গলিয়ে অক্ষত শরীরে একেবারে কামরার ভিতর পালঙ্কের উপর গিয়ে পড়েছিল। আমাদের এ উলু খাওয়া ছাদের উপরও কারুর এরোপ্লেন ট্রেন এসে পড়েনি ত? জানালা খুলে দেখুন না?"

মিসিস বীণাপণি ঘোষ যথাবিধি পর্যঙ্কে শয়ন করিয়া গাঢ়নিদ্রা সুখ ভোগ করিতেছিলেন, তাহার দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, "বিছানা ছেড়ে উঠুন শিগগির!"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? আমি ননীকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা পুনরাবৃত্তি করিলাম।

ননী বলিলেন, "যে ঝম ঝম বৃষ্টি পড়ছে, জানালা খুলব কি করে? তা ছাড়া আমার ভয় করে। আপনার যত সব ভূতের গল্প বলেছেন!"

"আচ্ছা আমি জানালা খুলে দেখছি" বলিয়া বীণা গবাক্ষ খুলিয়া ফেলিলেন।

বাতায়ন খুলিবামাত্র এক ঝাপটা বাতাস ও বৃষ্টিজল আসিয়া আমাদের ভিজাইয়া দিল– তৎসঙ্গেই মস্ত এক উল্কাপিণ্ড প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে আমাদের ত চক্ষু স্থির। গোলমাল শুনিয়া শিরীন জাগিয়া উঠিয়াছেন, অন্য কক্ষ হইতে আফসার দুলহিন দৌড়িয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও নির্ব্বাক! আমরা চিৎকার করিয়া বাড়িময় সকলকে জাগাইয়া তুলিব, না, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিস্ময় বিস্ফোরিত নেত্রে সেই অগ্নি স্তূপের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অগ্নিস্তূপ ক্রমে এক জ্যোতির্ম্ময় মনুষ্য মুর্তিতে পরিণত হইল। আমার মনে হইল, এই মহাপুরুষকে কোথায় যেন কখন দেখিয়াছি। কিন্তু ঠিক চিনিতে পারিলাম না। কারণ, মানুষের মুখ চিনিয়া রাখা আমার অভ্যাস নয়, সে জন্য অনেক সময় অপ্রস্তুতও হইতে হইয়াছে। আগন্তুক অগ্নিমূর্ত্তি বলিলেন–

"বৎসে! তোমরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছ? আমি অভয় দিতেছি, কোন ভয় নাই।"

শিরীন। সে দিন আমাদের এখানে একটা টিকটিকি বোবা ফকির সাজিয়া আসিয়াছিল, আপনি তাহাদেরই কেহ নাকি?

ননী। আপনারা মওলানা সাহেবের বাড়ির কাছে বাসা নিয়াছেন, তাই ত টিকটিকির উপদ্রব।

অগ্নিমুর্তি। (সতেজে) না মা! আমি সেসব কিছু নই। আমি বিশ্বশ্রষ্টা ত্বস্তি।

'ত্বস্তি' নাম শ্রবণ করিবা মাত্র বীণা ও ননী তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তখন আমারও স্মরণ হইল, কলিকাতায় 'নারী সৃষ্টি' লিখিবার সময় আমি এই জ্যোতির্ম্ময় মহাত্মার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। আমরা সসম্মানে ত্বস্তিদেবকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। বীণা বলিলেন, "অসময়ে নরলোকে পদধূলি (বর্ষাকালে 'ধুলি' না বলিয়া 'পদকর্দ্দম' বলিতে হয়!) দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

ত্বস্তি। কারণ? (আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) কারণ ঐ মেয়েটা!

আমি সবিস্ময়ে, সভয়ে, সবিনয়ে বলিলাম, "মহাত্মা বলেন কি, আমি?"

ত্বস্তি। হ্যাঁ, তুমি! আমার নারী সৃজনের ইতিহাস বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া এই গোলমাল বাধাইয়াছ। তা, তোমারই বা দোষ দিব কি; কতক দোষ 'সওগাত' আফিসের।

ননী। সে কি রকম?

ত্বস্তি। তাহা এই : ইনি 'নারী সৃষ্টি' লেখাটা 'সওগাত' নামক মাসিক পত্রিকায় দিয়াছিলেন। সে সময় সম্পাদক মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না; আফিসের গণ্ডমূর্খগুলা ইহার লিখিত পাদটীকা দুইটি বাদ দিয়া তাহা প্রকাশ করে। পাদটীকা অভাবে রচনাটি স্থলবিশেষে দুর্ব্বোধ হইয়াছে। সুতরাং সুবোধ পাঠকেরা উহা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না! তখন তাহারা বলেন,

"ডাক ব্যাটা ত্বস্তিকে, ইহার কোথায় কি ভ্রান্তি আছে, বুঝাইয়া দিয়া যাউক!" তাই দেখ না, সময় নাই, অসময় নাই, একটা প্ল্যানচেট পাইলেই ইহারা আমাকে সুরলোক হইতে ডাকিয়া আনিয়া বিরক্ত করে। অদ্যকার ঘটনা শুন;– কতকগুলি যুবক 'সত্যগ্রহ' ব্রত লইয়া মাতিয়াছে। রাজপুরুষেরা বলেন, "তোমরা 'সত্যগ্রহ' ছাড়য়িা 'মিথ্যাগ্রহণ' কর।" কিন্তু উহারা অবোধ বালক, হিতোপদেশ মানে না। 'মিথ্যাগ্রহণ' না করার ফলে পুলিশের তাহাহুড়া খাইয়া দুইজন উকিল বাবু পলাইয়া রাঁচি আসিয়াছেন। তোমাদের বাড়ির অদূরেই তাহাদের বাসা। কিন্তু জান, "চোর না শুনে ধরম কাহিনী।" রাঁচির এই অবিরাম বৃষ্টি কাদাতেও তাহাদের শান্তি নাই। তাহারা আদা জল খাইয়া, দিনের বেলা বালি কাঁকর কাদা জল মাখিয়া 'মিথ্যাগ্রহণ'-এর বিরুদ্ধে সত্য প্রচার প্রয়াসে লেকচার দিয়া দিয়া দেশের শান্তি নষ্ট করিয়া বেড়ান; আর রাত্রিকালে দুই বন্ধুতে প্ল্যানচেট লইয়া বেদলোকের শান্তিভঙ্গ করেন। রাত্রি ১২টা/১টা পর্যন্ত উকিল বাবুদের ডাকাডাকির জ্বালায় অস্থির থাকিতে হয়। তোমাদের নরলোকে যা হোক শান্তিনেশে যুবকদের শাস্তি দিবার জন্য সিআইডি আছে; কিন্তু সুরলোকে তাহাদের জব্দ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। তাই দেখ না, এত রাত্রে উকিল বাবুদের বাসা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় আমার বাষ্পরথ তোমাদের ছাদের কলসে আটকাইয়া পড়ে, আমিও সশব্দে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছি। বৃদ্ধ বয়সে বৃষ্টি ভেজা সহ্য হয় না, তাই যেমনই বীরবালা বীণা বাতায়ন খুলিয়াছেন, অমনি আমি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছি।

ননী। কিন্তু দেব! বাতায়নে লোহার গরাদে আছে যে।

ত্বস্তি। আরে, রাখ তোমার উইদষ্ট গরাদে! বিশেষতঃ আমাকে আটকায় কে?

ননী। দেব! আপনি কি কি উপাদানে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জানিতে বড় কৌতূহল হয়।

ত্বস্তি। না বাছা! আমরা সময় নাই। এখন আমি আসি। তোমরা ঘুমাও।

কিন্তু আমরা সকলেই তাহাকে বেশ করিয়া ধরিয়া বসিলাম। পুরুষ সৃষ্টির রহস্য না শুনিয়া তাহাকে কিছুতেই যাইতে দিব না।

শিরীন। আপনি অনেকক্ষণ বৃষ্টিজলে ভিজিয়াছেন, এক পেয়ালা গরম চা খাবেন। আপনি গল্প বলুন, আমি চা প্রস্তুত করিতে বলি। (অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,) মারো–

ত্বস্তি (সচকিতে) সে কি? কাহাকে মারিবে?

শিরীন হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন। ত্বস্তি। উনি লাঠিয়াল ডাকিতে গেলেন না কি?

বীণা। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া) না, তিনি চাকরাণী ডাকিতে গেলেন। উহার

চাকরাণীর নাম 'মারো'![১] আপনি এখন গল্প বলুন। ঐ দেখুন, শিরীন বেগম সাহেবাও ফিরিয়া আসিয়াছেন।

তৃপ্তি। তোমরা নেহাৎ ছাড়িবে না, তবে আর কি করা! তোমরা মেয়েরাও দেখিতেছি, উকিল বাবুদের চেয়ে কম নও! তাহারা তবু আইন কানুনের দোহাই মানেন, তোমরা কিছুই মান না। শুনিলে ত তোমাদের মন থাকিবে না। তবে ননি, তুমি কাগজ কলম লইয়া বস। আমি বলিয়া যাই, তুমি তাড়াতাড়ি লিখ। দেখ, খুব দ্রুতগতি লিখিবে।

ননী কতক্ষণ কলম দোয়াত অন্বেষণ করিতেছিলেন, ততক্ষণে বীনা কাগজ পেন্সিল হস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "দেব! সময়ের অল্পতার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনি বলুন, আমি শর্টহ্যান্ডে লিখিয়া ফেলিতেছি। আমি মিনিটে শটহ্যান্ডের তিন শত শব্দ লিখিতে পারি।" ইহা শুনিয়া মহাত্মা তৃপ্তি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলেন, বীণা লিখেন, আর আমরা নীরবে শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলাম।

দেখিলাম, বেচারা তৃপ্তিদেব নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। তিনি কখনও বা হাই তুলিয়া ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়নে অনুচ্চস্বরে বলিতেছিলেন; আবার কখনও চক্ষুমর্দ্দন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলেন এবং বীণা ঠিক লিখিয়াছেন কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন। ভুল থাকিলে তাহা কাটিয়া পুনরায় লিখাইতেছিলেন। তিনি যে নিদ্রা-কাতর নহেন, এতখানি বাগাড়ম্বর দ্বারা যেন তাহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। একবার তিনি গর্জ্জনস্বরে বলিলেন,

"জান বৎসেগণ! কন্যা রচনার সময় আমার হস্তে কোন বস্তুই ছিল না; সুতরাং আমাকে কোন দ্রব্যের গন্ধ, কোন বস্তুর স্বাদ এবং কোন পদার্থের বাষ্প মাত্র সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পুরুষ নির্ম্মাণের সময় আমাকে কিছু মাত্র ভাবিতে হয় নাই। আমার ভাণ্ডারে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ছিল, হস্ত প্রসারণ করিলে যাহা হাতে ঠেকিয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। যথা– দন্ত নির্ম্মাণের সময় সর্পের বিষদন্ত আমূল লইয়াছি; হস্ত পদ নখ প্রস্তুত করিতে শার্দ্দুলের সমস্ত নখর লইয়াছি; মস্তিষ্কের কোষসমূহ (cells) পূর্ণ করিবার সময় গর্দ্দভের গোটা মস্তিষ্কটাই ব্যবহার করিয়াছি। নারী সৃজন কালে আমি শুধু অনলের উত্তাপ লইয়াছিলাম; পুরুষের বেলায় একেবারে জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়াছি। বাছা! তুমি তাহাই লিখ।"

বীণা লিখিলেন, (জ্বলন্ত অঙ্গার)।

---

১. বেচারী চাকরাণীর সুন্দর 'মরিয়ম' নামটি বিকৃত হইয়া 'মারো'তে পরিণত হইয়াছে। আমি বেহার অঞ্চলে থাকাকালীন অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কতিপয় মহিলার নাম শ্রবণের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। যথা– 'হাশো', 'লাতো', 'দন্নু', 'উল্লু', 'জুব্বা', ইত্যাদি। নামগুলির স্বরূপ না দেখাইলে উহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে এবং পাঠিকা ভগিনী ও তৃপ্তিদেবের মত ভীত হইতে পারেন। তবে শুনুন, 'হাশমত আরা' 'লতিফন্নেসা', 'অলিউন্নেসা' এবং 'জোবেদা'।

ত্বস্তি। বৎসে! মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, রমণীর বেলায় আমি তুহিনের শৈত্যটুকু মাত্র লইয়াছিলাম, পুরুষের বেলায় তুষার খণ্ড– এমনকি আস্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা ব্যবহার করিয়াছি। তাহা কি তুমি লিখিয়াছ বীণা?

বীণা কাগজ দেখাইলেন–(তুষার, কাঞ্চনজঙ্ঘা)।

শিরীন। আগ্নেয়গিরি বিসুবিয়াস (Vesuvius) এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা যে পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই আমরা পুরুষের নিজের ভাষায়ই পুরুষের বর্ণনা এইরূপ দেখিতে পাই যে এখনই–

'জ্বলিল ললাট বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ,
ধরিল সংহার মূর্ত্তি, রুদ্র ব্যোমকেশ
গর্জ্জিয়া সংহার শূল করিলা ধারণ।'

আবার পর মুহূর্তেই (অবশ্য "পার্ব্বতী বাক্যেতে রুদ্র ত্যাজি উগ্রভাব")–

'সহাস্য বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা,
আখণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম।'

শ্রুতলিপি শেষ হইলে মহাত্মা ত্বস্তি বলিলেন, "দেখ বাছা! তুমি ইহা সহজ ভাষায় লিখিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে, যেন একটি শব্দ, এমনকি একটি ছেদ পর্যন্তও এদিক ওদিক না হয়।"

বীণা। তাহাই হইবে; আপনি ভাবিবেন না। আমি বেশ সাবধানে লিখিব। নচেৎ প্রভুর অত্যন্ত কষ্ট হইবে– এখন ত কেবল পুরুষেরা ডাকাডাকি করে, তখন মেয়েরাও জ্বালাতন করিয়া মারিবে!

অতঃপর ত্বস্তিদেব বিদায় হইলে সকলে যে যাহার শয্যা আশ্রয় করিলেন। কিন্তু আমি শয়ন করিতে যাইবার সময় কি জানি কিরূপে পড়িয়া গেলাম। সেই পতনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি আমি তখনও সোফায় বসিয়া; গৃহকোণে মোমবাতিটা মিটিমিটি জ্বলিতেছে, আর শিরীন ও বীণা মড়ার সহিত বাজি রাখিয়া ঘুমাইতেছেন! দূরাগত কুক্কুটধ্বনি শ্রবণে বুঝিলাম, রজনীর অবসান হইয়াছে। তবে কি এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম?

কেন আমার মৃতদেহ মেডিকেলে দান করেছি

আরজ আলী মাতুব্বর

বিগত ৩০শে ফালগুন ১৩৮৭ তারিখের 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে 'মানব কল্যাণে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত' শীর্ষক নাম দিয়ে। তাতে বরিশাল মেডিকেল কলেজে আমার মৃতদেহ দানের প্রসঙ্গটির উল্লেখ আছে। সংবাদটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথে বহু লোকে আমাকে প্রশ্ন করতে থাকে– কেন আমার মৃতদেহ মেডিকেলে দান করছি, তার কারণ জানার জন্যে। অনেকে আবার ওর কারণ আবিষ্কার করেও ফেলেছেন, আমার কাছে ও বিষয়ে কিছু শোনবার আগেই। তাদের মতে ওর কারণ নাকি– কবরে মনকির ও নকির নামক ফেরেস্ত াদ্বয়ের দৌরাত্ম এড়ানো। এরূপ মনোভাব যারা পোষণ করেন, তাদের কাছে আমি সবিনয়ে বলছি, কারণ ওটি নয়, অন্য রকম দুটি।

প্রথম কারণ

চার বছর বয়সে আমার বাবা মারা যান। কায়িক শ্রমের দ্বারা বহুকষ্টে আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন স্বামী ও বিত্তহীনা আমার মা। বিশেষত আমি আমার মার একটিমাত্র সন্তান। তাই আমার উপর তার স্নেহটা ছিলো অন্যান্য মাদের চেয়ে অনেক বেশি। পক্ষান্তরে বাবা জীবিত না থাকায় আমার পিতৃস্নেহটুকুও পতিত হচ্ছিলো মায়ের উপরেই। তাই আমার মাতৃস্নেহ ছিলো অন্যান্যদের চেয় কিছু বেশিই।

বিগত (ইং) ২৭-১০-৭৮ তারিখের 'বিচিত্রা' পত্রিকা, ১০-৬-৮১ তারিখের 'সংবাদ' পত্রিকা, ১৯-৭-৮১ তারিখের 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পত্রিকা এবং ৪-৯-৮১ তারিখে প্রকাশিত 'বাংলার বাণী' পত্রিকা যারা পাঠ করেছেন, তারা হয়তো জানেন আমার দুঃখজনক একটি ঘটনা। তবুও সেই অবিস্মরণীয় বিষাদময় ঘটনাটি সংক্ষেপে এখানে বলছি। যে ঘটনা করেছে আমাকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দ্রোহী।

১৩৩৯ সালে আমার মা মারা গেলে আমি আমার মৃত মায়ের ফটো তুলি। তা দেখে আমার মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করতে যে সমস্ত আলেম ও মুসল্লিরা এসেছিলেন, তারা আমার মার নামাজে জানাজা ও দাফন করা ত্যাগ করে লাশ ফেলে চলে যান, যেহেতু ফটো তোলা নাকি হারাম। অগত্যা কতিপয় অমুসল্লি নিয়ে জানাজা ছাড়াই আমার মায়ের মরদদেহটি সৃষ্টিকর্তার হাতে সোপর্দ করতে হলো কবরে। আমার মা ছিলেন অতিশয় ধার্মিকা নারী। তার নামাজ- রোজা বাদ পড়া তো দূরের কথা, 'কাজা' হতেও দেখিনি কোনোদিন আমার জীবনে, বাদ পড়েনি কখনো তার তাহাজ্জোদ নামাজ মাঘ মাসের শীতের রাতেও। এহেন পুণ্যবতী মায়ের জানাজা হলো না আমার একটি দুষ্কর্মের ফলে। হায়রে পবিত্র ধর্ম! (আজকাল ওসব হারামের তম্বি নেই বললেই চলে।)

ইসলামের দৃষ্টিতে ছবি তোলা দূষণীয় হলেও এক্ষত্রে সে দোষে দোষী হয়তো স্বয়ং আমিই, আমার মা নন। কেননা এত আমার মার সম্মতি ছিলো না। আমার অপরাধে কেন যে আমার মার মরদেহের অবমাননা করা হলো, তা আজও আমি খুঁজে পাচ্ছি না। পক্ষান্তরে নানা কারণে আমার নিজের বহু ফটো তোলা হয়েছে ও হচ্ছে। বিশেষত আমার ছেলেরা আমার মৃতদেহের ফটো তুলে রাখারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমতাবস্থায় আমার মৃতদেহটি গোঁড়া মুসল্লিদের কাছে আনুষ্ঠানিক সৎকারের মর্যাদা না পাওয়াই সম্ভব। যদিও পায় তবে আমার মায়ের মরদেহের অমর্যাদা ও আমার মরদেহের মর্যাদা দেখে তাতে আমার বিদেহী আত্মা তুষ্ট হবার কথা নয়। তাই আমি আমার মৃতদেহটিকে বিশ্বাসীদের অবহেলার বস্তু ও কবরে গলিত পদার্থে পরিণত না করে, তা মানবকল্যাণে সোপর্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

দ্বিতীয় কারণ

এককালে মানব সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকলেও বর্তমান শিক্ষিত সমাজ বিশেষত বৈজ্ঞানিক সমাজ ভূত- প্রেত, দেও-দানব, জ্বীন-পরী, শয়তান- ফেরেস্তা ইত্যাদি কাল্পনিক জীবগণকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করে অযথা সময় নষ্ট করেন না। এমনকি আধুনিককালের কোনো ঔপন্যাসিকও ওসব অতিজীবকে নিয়ে বা ওদের সমন্বয়ে কোনো উপন্যাস রচনা করেন না। কেননা এখন আর এসব উপন্যাস বাজারে বিকায় না। তাই আমিও ওসব অতিজীবকে নিয়ে কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা করি না, করি মানবকল্যাণের চেষ্টা যতোটুকু পারি। মানবকল্যাণ আমার ব্রত।

কোনো অট্টালিকা ধ্বংস হলে তা পরিণত হয় রাবিশে এবং মানুষের যথোপযুক্ত কাজে লাগে। অনুরূপভাবে জীকের মৃতদেহগুলো পচে গলে নষ্ট হলে তা পরিণত হয় কতোগুলো জৈবাজৈব পদার্থে এবং তা মানুষের কল্যাণ সাধন করে নানাভাবে। কৃষক হিসেবে আমি আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছি। মাঠের

কোথাও কোনো জীবদেহ পঁচে-গলে নষ্ট হলে সেখানের মাটিতে কয়েক বছর যাবত যে কোনো ফসল জন্মে ভালো। ওতে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। তবে ওর একটি অকল্যাণেরও আশংকা রয়েছে। সেটি হচ্ছে– শবদেহ পচে গলে নষ্ট হবার প্রাক্কালে দুর্গন্ধে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হবার আশংকা। বোধ হয় যে, সে কারণেই সেমিটিক জাতিরা মানুষের শবদেহ মাটিতে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এতে মানুষের অকল্যাণের পথ রুদ্ধ হলেও কল্যাণের পথ ততো প্রশস্ত হয়নি। কেননা যতোটুকু গভীরে শবদেহ রাখা হয়, কোনো ওষধি জাতীয় ফসলের শিকড় ততোটুকু গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। তাই তাতে কোনো ফসল বাড়ে না। তবে আম,কাঁঠাল ইত্যাদি গাছের শিকড় ততোধিক গভীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই দেখা যায় যে, কবরের উপর কোনো ফলের গাছ জন্মালে তাতে ফল ধরে প্রচুর। বিশেষত জীবের অস্থিতে থাকে 'ফসফরাস' নামীয় একটি পদার্থের আধিক্য এবং তা হচ্ছে ফলের স্বাদ ও ফলন বৃদ্ধির সহায়ক। পক্ষান্তরে শবদেহ জলভাগে পতিত হলে তা জলজীবের ভক্ষ্য হয় এবং জলজীবগুলো নানাভাবে মানুষের কাজে লাগে। এসবে দেখা যায় যে, জীবের মৃতদেহগুলো মানুষের কল্যাণ সাধন করে নানারূপে– প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে, মুখ্য বা গৌণভাবে। কিন্তু এতে কারো ইহকালের মনমানসের সম্পর্ক থাকে না। সম্পর্ক যদি থাকতো, তবে তাদের নিজেদের দেহের এরূপ মানবকল্যাণের ভূমিকা দেখে তারা নিশ্চয়ই আনন্দলাভ করতো।

মেডিকেলে আমার দেহদানের কারণ মায়ের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আমার মরদেহটি দ্বারা মানবকল্যাণের সম্ভাবনা বিধানে আমার সজীব মনের পরিতোষ ও আনন্দলাভের প্রয়াসমাত্র। আমার মরদেহটির সাহায্যে মেডিকেল কলেজের শল্যবিদ্যা শিক্ষার্থীগণ শল্যবিদ্যা আয়ত্ত করবে, আবার তাদের সাহায্যে রুগ্ন মানুষ রোগমুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করবে। আর এসব প্রত্যক্ষ অনুভূতিই আমাকে দিয়েছে মেডিকেলে শবদেহ দানের মাধ্যমে মানবকল্যাণের আনন্দলাভের প্রেরণা। এতে আমার পরিজনের বা অন্য কারো উদ্বিগ্ন হওয়া সমীচীন নয়।

মৃতদেহ দানপত্র

রে. তাং..... দলিল নং....

গৃহীতা

১। বাংলাদেশ সরকার পক্ষে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ।

দাতা–

১। আরজ আলী মাতুব্বর, পিতা-মৃত এস্তাজ আলী মাতুব্বর, সাকিন-লামচরি, থানা-কোতোয়ালী, জিলা- বরিশাল, জাতি-মুসলমান, পেশা- হালুটী।

কস্য মৃতদেহ দান পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে আমি মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর

আমার মৃতদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে দান করিলাম। কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার মৃতদেহটি দ্বারা উক্ত কলেজের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক যে কোন কাজ করিতে পারিবেন। আমার মৃত্যুর পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমার ওয়ারিসগণ আমার মৃতদেহটি কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছাইয়া দিবে। কিন্তু কোন কারণে যদি এমন কোন স্থানে আমার মৃত্যু ঘটে, যাহাতে আমার মৃতদেহটি আমার ওয়ারিসগণের আয়ত্তে না থাকে, তবে তাহারা আমার মৃত্যুর সঠিক তারিখ ও মৃত্যুর নির্দিষ্ট স্থানের নাম অবিলম্বে কলেজ কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাত করাইবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে এবং সম্ভব হইলে তাহাদের দায়িত্বে কলেজের কাজে ব্যবহারের জন্য আমার মৃতদেহটি আনাইয়া লইতে পারিবেন। তাহাতে আমার ওয়ারিসদের কোন ওজরাপত্তি থাকিবে না।

প্রকাশ থাকে যে, আমার চক্ষুদ্বয় চক্ষু ব্যাংকে দান করা বাঞ্ছনীয়।

এতদার্থে আমি আমার সরল মনে, সুস্থ শরীরে, স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে অত্র দানপত্র দলিল লিখিয়া সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩৮৮ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ, ইং তাং ৫-১২-৮১।

কৈফিয়ত– অত্র দলিলের প্রথম পাতায় আট ছত্রে 'মেডিক্যাল' শব্দ তোলা লিখা।

রেফ- ২ ফর্দ।
লিখকসহ ইসাদি ৪ জন।

লিখক
মোহাম্মদ হোসেন
সাং চরবাড়িয়া L. 1350

(স্বা. আরজ আলী মাতুব্বর)

ইসাদি
মো. ইয়াছিন আলী সিকদার
সাং- লামচরি।

ইসাদি ও পরিচিত
আ. মালেক মাতুব্বর
পিং- আরজ আলী মাতুব্বর
সাং লামচরি।

ইসাদি
মো. গোলাম রসুল মোল্লা
সাং- লামচরি।

গ. অছিয়তনামা

রে. তাং.....

দলিল নং....

লিখিতাং আরজ আলী মাতুব্বর, পিতা- মৃত এন্তাজ আলী মাতুব্বর, সাং- লামচরি, থানা- কোতোয়ালী, জিলা- বরিশাল, জাতি- মুসলমান, পেশা- হালুটী।

কস্য অছিয়তনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে ১. আবদুল মালেক মাতুব্বর (পুত্র), ২. আবদুল খালেক মাতুব্বর (পুত্র), ৩. আবদুল বারেক মাতুব্বর (পুত্র), ৪. মোসাম্মৎ ফয়জরন নেছা (কন্যা), ৫. মোসাম্মৎ নূরজাহান বেগম (কন্যা), ৬. মোসাম্মৎ মনোয়ারা বেগম (কন্যা), ৭. মোসাম্মৎ বিয়াম্বা বেগম (কন্যা), ৮. মোসাম্মৎ সুফিয়া খাতুন (স্ত্রী); সাকিন- লামচরি, থানা- কোতোয়ালী, জিলা- বরিশাল, জাতি– মুসলমান, পেশা- হালুটী। এতদ্বারা তোমাদিগকে অছিয়ত করা যাইতেছে যে, তোমরা আমার উত্তরাধিকারী বটে। আমার স্থাবরাস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির ন্যায় আমার মৃতদেহটিরও উত্তরাধিকারী তোমরাই। তোমরা জান যে, মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে আমার মৃতদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে দান করিয়া যাইতেছি, তাই আমার মৃত্যুর পর তোমাদের এই বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত অছিয়ত করিয়া যাইতেছি। আমি আশা করি, তোমরা আমার অছিয়তসমূহ পালন করিবা, কিন্তু যদি আমি এমন কোন স্থানে মারা যাই যাহাতে আমার মৃতদেহ তোমাদের আওতাধীনে না থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রে আমার এই বিষয়ের অছিয়ত পালনের কোন দায়িত্ব তোমাদের থাকিবে না। তবে অন্যান্য সম্বন্ধে থাকিবে।

অছিয়তসমূহ

১. মৃত্যুর পর আমার শবদেহটি জলে ধৌতপূর্বক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া (নতুন বা পুরাতন) বস্ত্রাবৃত করিবা। হয়ত খোশবু ব্যবহার করিবা। ইহা ছাড়া অন্য কোনরূপ চিরাচরিত প্রথা রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইবা না।

২. আমার বিদেহী আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার জন্য কাহাকেও পীড়াপীড়ি বা সেই জন্য অর্থ ব্যয় করিবা না। তবে কাহারও স্বেচ্ছাকৃত প্রার্থনা বা আশীর্বাদ আমার অবাঞ্ছিত নহে।

৩. কোনরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটিলে ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমার মরদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবের কাছে পৌছাইয়া দিবা।

৪. মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে সোপর্দ করিবার পূর্বে তোমাদের সুবিধামত সময়ে আমার মৃতদেহটির ফটো তুলিবা, এবং তাহার কপি এনলার্জ ও বাঁধাই করিয়া আমার লাইব্রেরি ভবনে রাখিবা।

৫. মৃত্যুর পরে বরিশাল মেডিকেল কলেজে আমার শবদেহটি পৌছাইবার ও অন্যান্য খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যে আমি বরিশাল জনতা ব্যাংক (চকবাজার

শাখা একাউন্ট নং-৪১৫৮ তাং ২০-৭-৮২)-এ একটি সেভিংস একাউন্ট ফাণ্ড করিয়াছি এবং এতদ্দুশ্যে সেই ফাণ্ডে অন্যূন ৫০০.০০ টাকা সতত মজুত থাকিবে। আমার মৃতদেহটি লইয়া তোমাদের মেডিকেল কলেজে যাতায়াত খরচ ও ফটো তোলা ইত্যাদি যাবতীয় খরচ তোমরা সেই ফাণ্ড হইতে বহন করিবা এবং তোমাদের ইচ্ছা হইলে কাফন, সমাগতদের অভ্যর্থনা ইত্যাদি খরচও সেই ফাণ্ড হইতে বহন করিতে পারিবা।

আমার মৃত্যুদিনটির স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে পরবর্তী বৎসরগুলিতে আমার 'মৃত্যুদিবস' অনুষ্ঠান পালনের জন্য আমি বার্ষিক মং ১০০.০০ টাকা করিয়া ব্যয় বরাদ্দ করিয়া যাইতেছি এবং তাহা বহন করিতে হইবে লাইব্রেরির সাধারণ তহবিলের টাকা হইতে, কিন্তু আমার সদ্যমৃত দিনটিতে মং ১০০.০০ টাকা দান করিতে হইবে উপরোক্ত সেভিংস ফাণ্ডের টাকা হইতে।

৬. উপরোক্ত যাবতীয় খরচ বহনের পর যদি আমার সেভিং একাউন্টে অর্থ মজুত থাকে, তবে তাহা হইতে তোমাদের মধ্যে যেই যেই ব্যক্তি মেডিকেলে আমার দেহদান ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিবা, সেই সেই ব্যক্তি তাহাদের পরিশ্রম বাবদ মোট মং ৫০.০০ টাকা গ্রহণ করিতে পারিবা। তদ্বাদে যদি উক্ত ফাণ্ডে কোন টাকা মজুত থাকে, তবে তাহা উক্ত ব্যাংকে আমার স্থায়ী আমানত তহবিলে (একান্ট নং ৩৬৬১১২/১০৮ তাং ৩-৪-৭৯) জমা হইবে এবং সেই টাকার মুনাফার দ্বারা আমার মৃত্যু অনুষ্ঠানে কাঙ্গালের সংখ্যা বাড়াইয়া তাহাদের যথানিয়মে সাহায্যদান করা যাইবে। এমতাবস্থায় তখন আমার সেভিংস তহবিলে টাকা থাকিবে না।

৭. প্রতি বৎসর আমার মৃত্যু অনুষ্ঠান দিনটির পূর্বে লাইব্রেরির নির্বাহী কমিটির স্থানীয় সদস্যদের যে কোন তিনজনের পরামর্শ লইয়া আমার নিকটতম প্রতিবেশী কাঙ্গাল হইতে ক্রমশ দূরবর্তী ২০ জন কাঙ্গাল-কাঙ্গালীকে মনোনীত ও আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে মং ৫.০০ টাকা করিয়া (মোট ১০০ টাকা) সাহায্যদান করিতে হইবে। তবে সেভিংস একাউন্টের টাকার দ্বারা তহবিল বৃদ্ধি পাইলে তদ্বারা কাঙ্গাল-কাঙ্গালীর সংখ্যা বাড়াইতে পারা যাইবে।

৮. আমার বংশাবলীর মধ্যে (পুরুষ বা নারী) বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা কাঙ্গাল-কাঙ্গালীদের হাতে সাহায্যদান করিতে হইবে। তদভাবে নির্বাহী কমিটির সম্পাদক উক্ত সাহায্যদান করিবেন।

৯. এমন কখনো না হউক– যদি আমার বংশাবলীর মধ্যে (পুরুষ বা নারী) কেহ জীবিত না থাকে, তখনও লাইব্রেরির নির্বাহী কমিটির সম্পাদকের দ্বারা যথানিয়মে আমার মৃত্যুদিনে নির্ধারিত মং-১০০.০০ টাকা সাহায্যদান করিতে হইবে।

১০. তোমরা আমার (পুত্রগণ) লাইব্রেরিতে রক্ষিত ১৩/ক/৫ নং খাতাটির (বংশাবলী বা বংশলতা নামীয়) অনুকরণে আমার ঊর্ধ্বতন পুরুষ হইতে তোমাদের নিজ নিজ 'বংশাবলী' বা 'বংশলতা' লিখিয়া রাখিবা এবং তোমাদের অধস্তন পুরুষগণকে পুরুষানুক্রমে তাহাদের নিজ নিজ বংশাবলী বা বংশলতা রাখিতে উপদেশ দিয়া যাইবা। যেহেতু আমার বংশপরিচয় না থাকিলে লাইব্রেরি সংক্রান্ত কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করা যাইবে না।

প্রকাশ থাকে যে, আমার বংশাবলীর মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার অছিয়তের বাক্য পালন করিবে না, সেই ব্যক্তি আমার ত্যাজ্য স্থাবরবাস্থাবর কোন সম্পত্তির 'উত্তরাধিকারী' বলিয়া দাবি করিতে পারিবে না। দাবি করিলে তাহা সর্বাদালতে বাতিল হইবে।

এতদ্বারা আমি আমার সরল মনে, সুস্থ শরীরে, সজ্ঞানে অত্র অছিয়তনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম ইতি সন ১৩৮৮ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ, ইং তাং- ৫-১২-৮১।

কৈফিয়ত– অত্র দলিলের ৩য় পাতায় ১২ ছত্রে 'আমার' শব্দ তোলা লিখা।
রেফ মোট ৬ ফর্দ।
লিখকসহ ইসাদি ৪ জন।

লিখক
মো. হোসেন
সাং- চরবাড়িয়া
L. 1350

(স্বা. আরজ আলী মাতুব্বর)

ইসাদি
মো. ইয়াছিন আলী সিকদার
সাং- লামচরি।

ইসাদি ও পরিচিত
আ. মালেক মাতুব্বর
পিং- আরজ আলী মাতুব্বর
সাং- লামচরি।

ইসাদি
মো. গোলাম রছুল মোল্লা
সাং- লামচরি।

যারা লেখা দিয়েছেন

অপার্থিব

মুক্তমনার ফোরামের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অপার্থিব এর সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা হিসেবে ও লেখক হিসেবে। পুরো নাম অপার্থিব জামান, তবে অপার্থিব নামেই লিখে থাকেন। তার লেখা তীক্ষ্ণ কুশলী ও বিশ্লেষণমুখী। বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, যুক্তিবাদ অধিবিদ্যা তার প্রিয় বিষয়। সাহিত্য-মনন এই লেখক বিজ্ঞানকে দেখেন শিল্পের এক অনিন্দ্য প্রকাশ হিসেবে। পদার্থবিদ্যার এই স্নাতক বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত। অপার্থিবের কিছু লেখার সাথে পাঠক পরিচিত হতে পারবেন মুক্তমনার ওয়েবসাইট থেকে :
http://www.mukto-mona/articles/aparthib/
তার ইমেইল aparthib@yahoo.com

অজয় রায়

জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক, প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক। বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও নিবেদিতপ্রাণ গবেষক। মানবতাবাদী ও মানবাধিকার রক্ষায় সদা উচ্চকণ্ঠ। চেতনা চিন্তায় প্রকৃতিবাদী ও সংশয়বাদী এবং মনেপ্রাণে সেক্যুলারিস্ট। ছাত্রাবস্থা থেকে ভাষা আন্দোলনসহ সকল বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ এরই স্বাভাবিক পরিণতি। বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন সহস্রাধিক প্রবন্ধ। সে তুলনায় পুস্তক লিখেছেন অনেক কম। তার লেখা 'আদি. বাঙালি' ও 'জড়ের সন্ধানে' শিরোনামে গ্রন্থ দুটি পাঠকপ্রিয়তায় ধন্য। বাঙলা একাডেমি প্রকাশিত ৫ খণ্ডে লেখা 'বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান কোষের' অন্যতম সম্পাদক ও লেখক। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবাধিকার সংগঠনের সাথে যুক্ত। ইতিহাস পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি, শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের সভাপতি ও দক্ষিণ এশীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংগঠনের

সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রায় শিক্ষক হিসেবে কার্জন হল চত্বরে কাটিয়েছেন চল্লিশটি বছরেরও বেশি সময়।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী। বর্তমানে অবরপ্রাপ্ত। উদার ও মুক্তবুদ্ধি চিন্তার জন্য সুখ্যাত। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতি সচেতন ও সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ। লেখক ও প্রবন্ধকার। সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত অথচ মুক্তবুদ্ধির চর্চায় নিবেদিতপ্রাণ এই পণ্ডিতের প্রিয় লেখ্য বিষয় সমাজ রাজনীতি ইতিহাস। প্রচুর গ্রন্থের রচয়িতা ও অসংখ্য প্রবন্ধের লেখক। মননশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'নতুন দিগন্তের' সম্পাদক এবং সমাজ রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্রের পরিচালক।

গোলাম মুর্শিদ

লেখক ও গবেষক। মুক্তমনার সদস্য। দেশের বাইরে বিবিসির সাংবাদিক হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। এরও আগে বেশ কয়েক বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সম্প্রতি বাংলা একাডেমি এবং প্রথম আলো সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, আশার ছলনে ভুলি : মাইকেল জীবনী, রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ: পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা ইত্যাদি। ই- মেইল : ghulam2murshid.co.uk

অভিজিৎ রায়

যন্ত্র ও কম্পিউটার প্রকৌশলী এবং জীব-প্রযুক্তিবিদ্যার একনিষ্ঠ গবেষক। মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তরুণ প্রজন্মের প্রতিবাদী সমাজ সচেতন লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী', 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে', 'বিশ্বাসে ভাইরাস' এবং সম্পাদিত গ্রন্থ 'বিশ্বাস ও বিজ্ঞান'। দেশের দৈনিকগুলোতে, সাপ্তাহিকে ও প্রতিষ্ঠিত জার্নালসমূহে নিয়মিত লিখে থাকেন। বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম তার লেখার প্রিয় বিষয়। মুক্তবুদ্ধির চর্চায় নিবেদিত প্রাণ এই তরুণ লেখকের রয়েছে একটি বিশ্লেষণধর্মী এবং যুক্তিবাদী মন যা পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে। তার রচনা শৈলীর একটি বড় গুণ তৎসম ও তদ্ভব শব্দবর্জিত আটপৌরে শব্দের সরল বাক্যবিন্যাস। তিনি ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে ঢাকায় একুশে বইমেলা থেকে বের হওয়ার সময় ধর্মান্ধ জঙ্গী আততায়ীদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

আহমদ শরীফ

প্রয়াত ড. আহমদ শরীফ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক। মধ্যযুগীয় পুথিসাহিত্যের গবেষক ও সুপণ্ডিত। মধ্যযুগীয় পুথিসাহিত্যের ইতিহাস তার অনন্য কীর্তি। ক্লাশে পড়াতেন বৈষ্ণব সাহিত্য। প্রথাবিরোধী ও স্রোতের বিপরীতে চিন্তার ধারক, সুবক্তা ও সুলেখক হিসেবে সুপরিচিত। ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার পক্ষে ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় যে 'শিক্ষক দ্রোহ' দেখা দিয়েছিল তার অন্যতম সংগঠক ছিলেন এই মুক্তমনা ও মুক্তচিন্তার মানুষটি। অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : বিচিত-চিন্তা, স্বদেশ চিন্তা, সংস্কৃতি ও বিচিত্র ভাবনা, বাঙলা বাঙালি ও বাঙালিত্ব, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য, মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ....। বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন আজীবন, সেই লক্ষ্যে নিজ অবস্থান থেকে সংগ্রাম করেছেন অনলস।

বশীর আল হেলাল

কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, সাহিত্য গবেষক। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন। বহু গ্রন্থের প্রণেতা তিনি।

শহিদুল ইসলাম

মুক্তমনের মানুষ ও সেক্যুলারিস্ট অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম প্রাবন্ধিক হিসেবে সুপরিচিত। শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতি তার লেখার প্রিয় বিষয়। ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তির অধ্যাপক হিসেবে দীর্ঘদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নব প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের তিনি ছিলেন প্রথম পরিচালক। সমাজ ও রাজনীতি সচেতন এই শিক্ষাবিদ শিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধীয় সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের সাথে জড়িত। শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের অন্যতম সহ-সভাপতি। দুটি খণ্ডে সম্প্রতি প্রকাশিত তার গ্রন্থটির নাম 'বিজ্ঞানের দর্শন।' তার কয়েকটি পরিচিত গ্রন্থ হলঃ সাম্প্রদায়িকতা রাষ্ট্র রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ : সাম্প্রদায়িকতা রাষ্ট্র ও রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ : সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, প্রসঙ্গ : শিক্ষা, দেশভাগ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

পারভেজ আমির আলী হুডবয়

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে কায়দে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ে পারমাণবিক ও উচ্চ শক্তি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। ২০০১ সালে লেখা প্রবন্ধটির ইংরেজি শিরোনাম 'How Islam lost its way. Yesterday achievements were golden; today, reason has been eclipsed'। ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ এখানে পুনর্মুদ্রিত হল। প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল যতীন সরকার লিখিত 'প্রসঙ্গ মৌলবাদ' গ্রন্থে, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-১০০০, ২০০৪।

জাহেদ আহমদ

সমাজ সচেতন উদারমনা মানবতাবাদী অতি কর্মতৎপর মুক্তবুদ্ধির লেখক। নানা বিষয়ে লিখে থাকেন এর মধ্য বিজ্ঞান একটি প্রিয় বিষয়। সুপরিচিত 'মুক্তমনা' নেটওয়ার্কের অন্যতম মডারেটর, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং মুক্তমনার অন্যতম চালিকা শক্তি। এছাড়া নিউইয়র্কস্থ 'Center for Inquiry Metro New York'-এর South Asian Humanist Group– আলোচনা গ্রুপের মডারেটর। যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কে বসবাসকারী প্রবাসী তবে আদ্যোপান্ত বাঙালি। তার ই- মেইল : worldcitizen@yahoo.com

ড. হুমায়ূন আজাদ

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের এক পণ্ডিত ব্যক্তি। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং তুলনামূলক সাহিত্যের গ্রন্থ রচনা ছাড়াও তিনি একজন স্পষ্ট নারীবাদী এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিশঙ্ক সমালোচক। তার রচনার সম্ভার বিপুল, রচনা করেছেন নারীর মত গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, যা মৌলবাদী সরকারের কোপানলে পড়ে নিষিদ্ধ ছিল চার বছর।

প্রথাবিরোধী মুক্তচিন্তার অধিকারী বলে খ্যাত তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। মুক্তমনার একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন। এই লেখাটি তিনি মৃত্যুর কিছুদিন আগে মুক্তমনার জন্য লিখেছিলেন। সারা জাগানো উপন্যাস 'পাক সার জমিন সাদ বাদ'সহ তার মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী লেখা মৌলবাদীদের বিশেষ করে জামাত শিবির কর্মীদের ক্ষেপিয়ে তোলে। তারই সহিংস প্রকাশ ঘটে– ২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির বইমেলা প্রাঙ্গনে ঘাতকদের চাপাতির নির্মমতার শিকার হন, যা তাকে প্রলম্বিত মৃত্যুর দিকে (১১ আগস্ট, ২০০৪) ঠেলে দেয়।

সুমিত্রা পদ্মানাভন

ভারতীয় মানবাধিকার সমিতির সাধারণ সম্পাদক। উচ্চমানের বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধকার। ধর্ম দর্শন ও বিজ্ঞান তার প্রিয় বিষয়। বর্তমান প্রবন্ধটি দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম নামক গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। শ্রীমতি পদ্মনাভন মুক্তমনার সম্মানিত সদস্য।

অনন্ত বিজয়

পুরো নাম অনন্ত বিজয় দাশ। সিলেটে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র। সংরক্ষণশীল সনাতন ধর্মের মিথ, কুসংস্কার অনুদার সমাজ কাঠামোর একজন তীক্ষ্ণ সমালোচক। রূপকথা ও মহাকাব্যকে কী ভাবে পবিত্র ধর্মগ্রন্থে পরিণত হয় তা তার বিশ্লেষণী লেখায় উজ্জ্বলভাবে উঠে আসে। মানবতা ও যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার জন্য মুক্তমনা-২০০৫ সাল সম্মাননায় তাকে ভূষিত করা হয়। শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'যুক্তি'র সম্পাদক। মুক্তমনার একজন সক্রিয় সদস্য ও নিয়মিত লেখক। ই মেইল : anantabijoy@yahoo.com

জাহিদ রাসেল

ইংল্যান্ড প্রবাসী লেখক। মুক্তমনার সদস্য। ইন্টারনেটে মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদ বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেন।

হাসান মাহমুদ (ফতে মোল্লা)

শারিয়া ও ইসলামিক ল', মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেসের ডিরেক্টর, ক্যানাডা, আমেরিকা ও ইউরোপে কনফারেন্স/ সেমিনারে ইসলামে মানবাধিকারের ওপর বক্তা। মুক্তমনার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন। প্রকাশিত বই : আল্ ভোঁদড়ের দেশ, শারিয়া কি, শারিয়া কেন, ইসলাম শারিয়া ও রাজনীতি, থ্রেট অফ পলিটিক্যাল ইসলাম (ইংরেজি)। শারিয়ার ওপরে তথ্য সিনেমা 'হিল্লা' ও তথ্য নাটক 'রক্তগোলাপ'– শারিয়া-বিষয়ক ২টি তথ্য-ভিসিডি প্রকাশ করেছেন। ই-মেইল : fatemolla@hotmail.com

অধ্যাপক মীজান রহমান

গণিতের অধ্যাপক। ক্যানাডায় অটোয়া প্রবাসী বাঙালি লেখক। বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধকার। তার বেশ কটি জনপ্রিয় প্রবন্ধ সঙ্কলন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কেম্ব্রিজ থেকে গণিতে উচ্চশিক্ষা নিয়ে পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে বেশ ক'বছর শিক্ষকতা করেছেন। ২০১৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

রিচার্ড ডকিল

খ্যাতনামা বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিক অভিব্যক্তিবাদী। বিজ্ঞান জগতের একজন নামকেনা নাস্তিক। 'ঈশ্বর প্রবঞ্চনা' (God Delusion) গ্রন্থটি পাঠককে বাধ্য করে ভাবতে যে ঈশ্বর বিশ্বাস শুধু ভ্রান্ত নয়, ব্যক্তি ও সমাজের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকরও। বইটি পড়লে পাঠক বুঝতে পারবেন যে নাস্তিকতা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সৃষ্টি করে সজীব অন্তদৃষ্টি।

রিচার্ড ডকিন্স হলেন অক্সফোর্ডে 'বিজ্ঞানের জন-ধীশক্তি বিষয়ের চার্লস সিমোন্যিই অধ্যাপক' (Charles Somonyi Professor of the Public Understanding)। তার সম্পর্কে বলা হয় যে তার প্রবন্ধ আসক্তির পশ্চাতে থাকে শ্রদ্ধামিশ্রিত সাহিত্য- শৈলীর মনোহর সমর্থন। নিউইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ তাকে এমন একজন লেখক হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছে যে, যিনি বিষয়গুলোকে এত পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন যে তিনি পাঠককে বোঝাতে বাধ্য করতে পারেন।

বন্যা আহমেদ

বাংলাদেশের মেয়ে বন্যা ছিলেন ছাত্রী জীবনে মেধাবী ছাত্রী। এক সময়ে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবতেন। পরবর্তীকালে রাজনীতি থেকে সরে এলেও রাজনীতিবিমুখ হননি। দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী জীবনে অভ্যস্ত। ইতিমধ্যে স্টেটসে পাঠ নিয়েছেন তথ্যপ্রযুক্তিতে। কাজ করেছেন ক্যানাডায়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে আটলানটায় একটি কোম্পানিতে সিসটেম এনালিস্ট হিসেবে কর্মরত। বিবর্তনবাদের ওপর তার অপরিসীম কৌতূহল ও গভীর জ্ঞান, যার প্রকাশ পেয়েছে সদ্য প্রকাশিত 'বিবর্তনের পথ ধরে' গ্রন্থে। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন দৈনিকে ও সাপ্তাহিকে নিয়মিত লিখে থাকেন। ইমেইল : bonna-ga@yahoo.com

অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে দীর্ঘদিন শিক্ষকতার পর সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। নানা বিষয়ে তার অগাধ বিচরণ– বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লেখায় অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। বর্তমানে প্রবন্ধটি ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'ধর্মনিরপেক্ষতা' গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

কাজী আব্দুল ওদুদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে একটি সংগঠনের জন্ম হয়, তার মূল মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি।' এই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের বলা যায় প্রধান পুরুষ ছিলেন কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)। কাজী ওদুদের স্বদেশপ্রেম ছিল কুপমণ্ডূকতা ও সাম্প্রদায়িকতা বিবর্জিত– উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সেক্যুলাজিম ছিল তার রাজনৈতিক দর্শন। একদিকে তিনি ছিলেন পশ্চিমী উদারনৈতিক দর্শনের অনুসারী, আর সেই সুবাদেই বিশ্বাস করতেন ঊনিশ শতকের বাংলাদেশে অভ্যুদয ঘটেছিল একটি রেনেসার যার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাই বিস্মিত হতে হয় না যখন দেখি তিনি রামমোহন ও কামাল আতাতুর্কের আদর্শকে আত্মকৃত করতে পেরেছেন। এ প্রসঙ্গে তার উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে : 'বুদ্ধির মুক্তি, অর্থাৎ বিচার বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তি দান– বাংলার মুসলমান-সমাজে (হয়ত বা ভারতের মুসলমান-সমাজে) এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। দৃশ্যত এর প্রেরণা এসেছিল মুস্তফা কামালের উদ্যম থেকে, কিন্তু তারও চাইতে গূঢ়তর যোগ এর ছিল বাংলার বা ভারতের একালের জাগরণের সঙ্গে আর সেই সূত্রে মানুষের প্রায় সর্বকালের উদার জাগরণের প্রয়াসের সঙ্গে।' কাজী ওদুদ ছিলেন অর্থনীতির শিক্ষক, কিন্তু সাহিত্যের সাথে ছিল আত্মার যোগ। সাহিত্য চর্চা কেবল তার কাছে নান্দনিক নয় বিচার করে এসেছেন বুদ্ধি মুক্তির লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে। এরই প্রকাশ পেয়েছে তার বৈচিত্রময়ী নানা প্রবন্ধে। 'শ্বাশ্বত বঙ্গ' তার একটি অমূল্য প্রবন্ধ সঙ্কলন, যা বাঙালি মাত্রেরই হওয়া উচিত অবশ্যপাঠ্য।

আনিসুজ্জামান

শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও স্বতন্ত্র ভাবনার এই মানুষটি আমাদের মননশীল জগতের এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা

অধ্যাপক। সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রগতিশীল সাহিত্যধারা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে ছিলেন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এরই স্বাভাবিক পরিণতি পেয়েছে ভাষা আন্দোলনে, ঊনসত্তরের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার আন্দোলনে ও পরিশেষে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। সুবক্তা হিসেবে খ্যাতিমান ড. আনিসুজ্জামান নানা মানবতাবাদী সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এককালের সাম্যবাদের অনুসারী। চিন্তাচেতনায় উদার মানবতাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আস্থাশীল। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা ইতিহাস নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজারের 'আনন্দ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। উচ্চ শিক্ষালাভ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও যুক্তরাষ্ট্রে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি বই– দুটিই স্মৃতিচারণমূলক, একটি 'আমার একাত্তর', অন্যটি নিজের জীবন চরিত 'কাল নিরবকধি'। গ্রন্থ দুটি পাঠকপ্রিয়তায় ধন্য। বর্তমানে 'কালি কলম' সাহিত্য পত্রিকার প্রধান সম্পাদক।

কবীর চৌধুরী

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর জন্ম ১৯২৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি। শিক্ষা-নাট্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের উজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব কবীর চৌধুরীর নতুন করে পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনন্য কৃতী ছাত্র, ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করেছেন ১৯৪৪ সালে। আদ্যোপান্ত শিক্ষক কবীর চৌধুরী প্রায় সারাটা জীবন কাটিয়েছেন শিক্ষাঙ্গনে। শিক্ষকতা করেছেন পাবনা এডওয়ার্ড, রাজশাহী এবং ঢাকা কলেজে, অধ্যক্ষতার কাজ করেছেন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে এবং ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে। সবশেষে ১৯৭৪ সাল থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বাংলা একাডেমির পরিচালকের পদও তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সরকারি চাকরিও করেছিলেন। সাংস্কৃতিক ও মানবতাবাদী বহু সংগঠনের সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট– এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণ সম্মেলন, থিয়েটার নাট্য গোষ্ঠী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ।

বিভিন্ন বাংলা কবির কাব্যগ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন (Poems of Nazrul Islam, Selected Poems of Shamsur Rahman, 14 young poets of Bangladesh etc.)। বাংলা সাহিত্যের কতিপয় উপন্যাস ও সাহিত্য কর্মের অনুবাদ করেছেন (Laughter of a Slave, Three Plays, Folktales of Bangladesh, Rifles, Bread and Women Plumbed Peacock)। অনেক বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ও নাট্যকারের রচনা বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

এছাড়া ইংরেজিতে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন বেশ কটি। সব মিলিয়ে তার গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় দু'শর কাছাকাছি। তবে কবীর চৌধুরীর সবচাইতে বড় পরিচয় মানবতাবাদী ও মানবকল্যাণধর্মী মনের পরিচয় বহনকারী একজন মুক্তমনা মানুষ হিসেবে, যাকে ভাল না বেসে পারা যায় না।

প্রদীপ দেব

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স স্নাতক ও এমএসসি করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার কুইনসল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি থেকে মেডিকেল ফিজিক্সে এমএস এবং মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি থেকে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে পিএইচডি। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার কুইনসল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে মেডিকেল ফিজিক্সে গবেষণারত। প্রকাশিত বই : অস্ট্রেলিয়ার পথে পথে (২০০৫), আলবুকারকি থেকে হলিউড (২০০৬), আইনস্টাইনের কাল (২০০৬)। মুক্তমনার একজন সক্রিয় সদস্য। লক্ষ্য মুক্তমনের মানুষ হওয়া। ই- মেইল pradipdeb2006@gmail.com

হাসান আজিজুল হক

চিন্তায় ও রাজনৈতিক দর্শনে উদার মুক্তমনা ও সেক্যুলারিস্ট। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের নামকরা অধ্যাপক। সম্প্রতি কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। রাজশাহীতে শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের সভাপতি।

হাসান আল আবদুল্লাহ

কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক। পেশায় শিক্ষক। শব্দগুচ্ছের সম্পাদক। বাংলাভাষায় নতুন ধরনের সনেটের প্রবক্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ১১। এছাড়া মহাকাব্যিক গ্রন্থ 'নক্ষত্র ও মানুয়েল প্রচ্ছদ' প্রকাশের অপেক্ষায়। মুক্তমনায় সদস্য। ই-মেইল : habdu056@aol.com

ড. ভিক্টর স্টেংগার

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সংযুক্ত অধ্যাপক। 'কলোরাডো সিটিজেন অব সায়েন্স' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং মুক্তমনার একজন সম্মানিত সদস্য। Timeless Reality, The unconscious Quantun Physics, Physics and Psychics, Not by Design, Has Science found God? প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ও

প্রবন্ধমালার প্রণেতা তিনি। আলোচ্য প্রবন্ধটি তার সর্বশেষ Has Science found God? গ্রন্থের শিরোনামের অধ্যায় থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

অর্ণব দত্ত

কলকাতা নিবাসী সাহিত্যিক এবং গবেষক। মুক্তমনার সদস্য। বেশ ক'বছর ইন্টারনেটে নিয়মিত লিখছেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী কবিতার বাংলা অনুবাদের কাজও করেছেন।

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)

রোকেয়া ছিলেন বাংলাদেশে নারী জাগরণের অগ্রদূত। নারী শিক্ষা প্রচলেন ও নারীর অধিকার অর্জনে অসীম সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন যা একালেও আমাদের অবাক করে। ছিলেন জনপ্রিয় লেখিকা। বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সুলতানার স্বপ্ন, অবরোধবাসিনী, মতিচূর প্রভৃতি।

আরজ আলী মাতুব্বর

সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশের সবচাইতে আলোচিত দার্শনিক। তার দর্শন চিন্তার মূলে রয়েছে ইজাগতিকতা, সমাজবাদ ও মানবতাবোধ। স্বচেষ্টায় অগাধ জ্ঞানের অধিকারী কী ভাবে হওয়া যায় আরজ আলীর জীবন তারই সাক্ষাৎ নিদর্শন। প্রকাশ্য ধর্মবিদ্রোহী না হয়েও ধর্মের দুর্বল দিকগুলো ও এর সীমাবদ্ধতা সম্যকভাবে তুলে ধরেছেন তার লেখায়। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সত্যের সন্ধানে, অনুমান, সৃষ্টি রহস্য প্রভৃতি। জন্ম ১৩০৭ সালের ৭ই পৌষ এবং লোকান্তরিত হন ১৩৯২ সালের ১লা চৈত্র তারিখে। মৃত্যুর আগে তার চোখ ও দেহ দান করে যান বরিশাল মেডিকেল।